উপনিষদের উপদেশ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর।

উৎসর্গ-পত্রম্।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিতাভ্যন্তর-মহামহিমান্বিত-

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়—

'ভাইস্-চ্যান্সেলর'—

শ্রীশ্রীমদ্-আশুতোষ-মুখোপাধ্যায়-সরস্বতী-

M. A. D. L., C. S. I. F. R. A. S., F. R. S. E.,

মহোদয়-করকমলেভ্যঃ—

গ্রন্থারম্ভে সনতি বিধিবৎ প্রেম মে হ্যাশুতোষে

ক্ষেমায়াসীৎ, গুণবতি গুরু-জ্ঞান-রত্নৈক-কোষে।

যস্য প্রাপ্য শিরসি সদনং বঙ্গভাষাখ্য-গঙ্গা

নৃত্যন্তীবোচ্ছলিত-সলিলা নিত্য-ভাস্বত্তরঙ্গা॥ ১॥

ঊর্দ্ধস্রোতা ঋষিরিব সদা যঃ স্বয়ং ধ্যানমগ্নঃ,

প্রেম্না বদ্ধোরসি বিজয়তে যোগমায়া চ যস্য।

আস্তে কল্পদ্রুমইব সতামাশ্রয়ে যোঽনপায়ী,

ক্রান্তং ধাম্না ক্ষপিত-তমসা যেন দিক্-চক্রবালম্॥ ২॥

(মুদ্রাকম্)।

বিদ্বদ্-বর্য্য ! স্মৃতি-শত-সমাশ্লিষ্ট-নিত্যোপকার-

প্রাপ্ত্যুৎসাহোচ্ছ্বসিত-মনসা বদ্ধ এষোঽঞ্জলির্মে।

আশা চৈষা হৃদি চির-ধৃতা—যত্নবান্ ভক্তিভাজঃ

গ্রন্থে চাস্মিন্ মম করুণয়া স্নেহদৃষ্টিং বিদধ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অদ্বৈত-বাদ-মুকুরঃ কিল শঙ্করস্য

গাঢ়ং কুতর্ক-রজসা বহুলাবকীর্ণঃ।

তস্যৈব ভাষ্যমবলম্ব্য ময়া কৃতোঽস্মিন্

কামং মলাপনয়নেঽস্য মহান্ প্রযত্নঃ ॥ ৪ ॥

পরিচিন্তিত মত্র 'তৎ' পদং

গ্রথিতা ব্রহ্ম-কথা পুরাতনী।

ইদমস্তু করে সমর্পিতং

ভবতঃ, সাদরমাত্মতুষ্টয়ে ॥ ৫ ॥

অনুগতেন

গ্রন্থকারেণ।

প্রণতি।

১। হে জনক! হে জননি! রজনী ও উষার গম্ভীর সন্ধি-ক্ষণে, তোমরা উভয়ে একদিনে, একই সময়ে, ঊর্দ্ধধামে চলিয়া গিয়াছিলে।

বিস্ময়ে, ভয়ে, পুলকে—সেদিন বুঝিয়াছিলাম, পর-লোকে ও এই মর-লোকে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

জননি! শৈশবে, প্রথম সূর্য্যালোক-দর্শনের ন্যায়, প্রথম বর্ণমালা তোমার নিকটে শিখিয়াছিলাম। পিতঃ! বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে, তুমিই প্রথমে এ হৃদয়ে ব্রহ্মালোক প্রকাশিত করিয়াছিলে।

হে তাত! তোমারই জ্ঞানালোক, তোমারই প্রদর্শিত পন্থা,—এ গ্রন্থে অনুসৃত হইয়াছে। হে মাতঃ! তোমারই কণ্ঠোচ্চারিত ভাষা এ গ্রন্থের উপজীব্য। তোমরা উভয়ে আশীর্ব্বাদ কর, এতদ্দ্বারা পর-লোক ও ইহ-লোকের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত হউক্।

২। তোমরা উভয়ে যেদিন চলিয়া যাও, সেদিন বুঝিয়া-ছিলাম,—দেশের ব্যবধানে ও প্রকৃতির বন্ধনে আত্ম-শক্তির কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। নতুবা, হে মাতঃ! ভিন্ন-দেশে ও ভিন্ন-দেহে বদ্ধ থাকিলেও, কোন্ প্রভাবের বলে, তুমি জনককে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে? এই সেদিনও, যামিনীর শেষভাগে—সুস্পষ্ট চন্দ্রালোকে—হে জননি! তোমার পুত্রবধূ যোগমায়াকে তাহাই বুঝাইতে আসিয়াছিলে।

তোমরা উভয়ে সেই উর্দ্ধলোক হইতে আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই লোকে পুনরায় তোমাদের চরণ-রেণুতে সম্মিলিত হইতে পারি। প্রণাম করিতেছি। ওঁ তৎসৎ।

কোচবিহার।
২৫ অগ্রহায়ণ।
সন ১৩১৩ সাল।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

অবতরণিকা।

পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়। (ছান্দোগ্য)।

দ্বিতীয় অধ্যায়। (বৃহদারণ্যক)।

অবতরণিকা।

৩৮.৩৭

অবতরণিকা।

গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যাদি।

১। ভারতবর্ষের উপনিষদ্-সমূহে যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, সে গুলি যে বিশাল জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ এখন আর এ কথা কাহারই অবিদিত নাই। ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণ দেশে কতিপয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যবসায়শীল মহাপুরুষের যত্নে ও চেষ্টায় এবং ভারতবর্ষে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের এবং এই বঙ্গদেশের কতিপয় উদ্‌যোগী মহাত্মার প্রসাদে, এই রত্ন-ভাণ্ডার উপনিষদ-গ্রন্থ সমূহের অধিকাংশই, ইউরোপে ও ভারতে অনূদিত হইয়া প্রচারিত হওয়াতে, এখন এই ঔপনিষদিক-জ্ঞান লোকের সহজ-বোধ্য না হউক, সহজ-প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশে যে অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একখানিতেও শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ

নাই; বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আজ পর্য্যন্ত অনূদিত হয় নাই। প্রচারিত উপনিষদ্ গুলিতে শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ না থাকায় এবং শঙ্কর-ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারা অতীব কঠিন বলিয়া, ঐ সকল সংস্করণের গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষা কিয়ৎপরিমাণে লাভবতী হইলেও, তত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তির যে তত লাভকর হইয়াছে, এরূপ আমাদের মনে হয় না। বিশেষতঃ, কোন পুস্তকেই, শ্রুতির দার্শনিক মত ও ধর্ম্মমতের ধারাবাহিক আলোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যতদূর এবং যেভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ভারতবর্ষে একসময়ে কতদূর উর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করিয়াছিল। দেবদেবীপ্রধান ও কর্ম্মকাণ্ড-বহুল বেদগ্রন্থে যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে কীর্ত্তিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কালক্রমে যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন সকাম-কর্ম্মকাণ্ডের দুর্ভেদ্য জালের মধ্যে পতিত হইয়া, যে ব্রহ্মবিদ্যা লোকলোচনের অন্তরালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্ সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিক্রমে উদ্ধারসাধন করিয়া,—সেই অদ্বিতীয়, নিত্য, সত্য, ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ, জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং তাঁহার ভাবনা ও উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি মহা-তত্ত্ব সকল অতি পরিস্ফুটভাবে ও বিস্ময়কর প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। কোথাও বা গল্পচ্ছলে. আর কোথাও বা যুক্তিতর্কদ্বারা এই দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্ব, অতি মধুর ভাষায় এবং তদপেক্ষাও মধুরভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থীর হৃদয়ে অঙ্কিত ও প্রস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্ত্তী হিন্দু-দর্শন, যে সকল মতের পুষ্টিসাধন ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া, বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল দার্শনিক-তত্ত্ব গূঢ়ভাবে এই উপনিষদ্ গুলিতে কোথাও অস্ফুট কোথাও বা পরিস্ফুট-রূপে নিহিত এবং বিবৃত রহিয়াছে।

প্রথম পাঠকালেই, উপনিষদে প্রধানতঃ দুইটী অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অংশ উপাখ্যান-বহুল; দ্বিতীয় অংশ কর্ম্মকাণ্ডাদি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রণালীতে পূর্ণ। প্রথম অংশে, নানাবিধ মনোহর আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া ও বহুবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, সৃষ্টি-তত্ত্বাদি নানাপ্রকারের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য এই উভয় ভিত্তির উপরেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ শারীরক-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, উপনিষদের এই প্রথম অংশটীই খাঁটী দার্শনিক অংশ। উপনিষদের এই তর্ক-বহুল দার্শনিক অংশ বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়া, বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করা আমরা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করি। আমরা অনেক দিন হইতে, উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও যথার্থ ব্যাখ্যা বহুদিনের পরিশ্রমে যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই ব্যাখ্যা-প্রচারে নিযুক্ত আছি *। এক্ষণে, প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ হইতে, উহাদের সেই সুমধুর, হৃদয়-স্পর্শী উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তাত্মক অংশগুলি আমরা, স্বদেশীয় প্রিয় বঙ্গবাসী

* নব্যভারত এবং বান্ধব পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি এবং সেই জন্যই এই যত্ন ও পরিশ্রম।

এই আশা লইয়াই, সম্প্রতি "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। এই খণ্ডে আমরা বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই উভয় উপনিষদ্ প্রকাশ করিলাম। এই উপনিষদ্ দুইখানি সুবৃহৎ এবং অন্য সকল উপনিষদ হইতেই বিষয়-গৌরবে ভারতে চির-প্রসিদ্ধ। শঙ্কর-ভাষ্যের সহায়তা ভিন্ন, উপনিষদ্-গুলির দুরূহ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা এই কার্য্যে শঙ্কর-ভাষ্যই গ্রহণ করিয়াছি। এই বর্ত্তমান গ্রন্থে, আমরা এই দুই বৃহৎ উপনিষদের সমস্ত আখ্যায়িকাংশই গ্রহণ করিয়াছি এবং শঙ্করভাষ্যের অনুবাদও সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা ভাষ্যানুবাদে কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের এই ভাষ্যানুবাদ ঠিক অক্ষরানুক্রমে অনুবাদ নহে; মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ এবং তাঁহার ভাষ্যের গূঢ় অভিসন্ধি কি প্রকার, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। যাহাতে ভাষ্যের মর্ম্মগ্রহণে কষ্ট না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে *। যে সকল

---

* কোন কোন স্থলে, ভাষ্যের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, ভাষ্যের অন্যস্থলে সেই বিষয়টী সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহাও সেই অংশেই গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্থল অত্যন্ত কঠিন তাহারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল দুই একটী স্থলের কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিচারের অংশ-বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারও মর্ম্ম যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উপনিষদের কোন কোন মত ও বিষয় কিছু অদ্ভুত বোধ হইতে পারে; সেই সেই স্থলগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের নিম্নস্তরের বলিয়া বোধ হয়; আমরা সেইরূপ স্থলগুলি একেবারে পরিত্যাগ করা সঙ্গত-বোধ করি নাই। সেই অতি প্রাচীন কালে কোন্ কোন্ মত কিরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল, লোকে মনস্তত্ত্বই বা (Psychology) কতদূর অবগত ছিল, তাহা দেখাইতে হইলে, সেই স্থলগুলি পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। তবে যেগুলি নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক কথা,—দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা উত্তপ্ত লৌহ-গোলক দ্বারা তস্করের পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি—সেই গুলিকে আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি। আর একটী কথা আছে; এই আখ্যায়িকাগুলি ও তদন্তর্গত দৃষ্টান্ত ও মতের বিবরণ দিতে গিয়া, আমরা, মূল উপনিষদে যে উপাখ্যানটীর পরে যে উপাখ্যানটী আছে, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য রাখি নাই। আমরা উপাখ্যানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইয়া লইয়াছি যে, উপদেশের একটী ক্রম-উন্নত স্তর যাহাতে সুরক্ষিত থাকে।

সম্প্রতি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমরা

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য উপনিষদ্-গুলিরও আখ্যায়িকাংশ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিব, এরূপ ইচ্ছা আছে *। এই গ্রন্থে আমরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যায়িকাংশ লইয়া, উপাসনাংশ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার কারণ পরে উল্লিখিত হইবে। উপাখ্যানাংশই, প্রায় সকলগুলি উপনিষদের প্রধান অঙ্গ এবং অধিক অংশই এতদ্দ্বারা পূর্ণ। উপাখ্যানাংশ লওয়াতেই, প্রায় সমগ্র উপনিষদ্ই লওয়া হয়। বৃহদারণ্যক ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টী ও শেষ দুইটী অধ্যায়† ব্যতীত ;— অবশিষ্ট তিনটী সুবিস্তৃত অধ্যায়ই এই উপাখ্যানাংশ দ্বারা গঠিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আট অধ্যায়ে (প্রপাঠকে)

---

* "উপনিষদের উপদেশের', দ্বিতীয় খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কঠ ও মুণ্ডক এবং তৃতীয় খণ্ডে ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ শঙ্করভাষ্য-সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উভয় খণ্ডেই সুবিস্তৃত অবতরণিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

† কিন্তু প্রথমাধ্যায়ের "তৃতীয় ব্রাহ্মণোক্ত" বিষয়গুলির তাৎপর্য্য "সপ্তান্নবিদ্যার" টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্রাহ্মণোক্ত সমস্ত বিষয় "সপ্তান্ন-বিদ্যায়" গৃহীত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়গুলি অবতরণিকার সাধনাংশে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ, "ইন্দ্রিয়বর্গের কলহে" গৃহীত হইয়াছে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণোক্ত "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা" দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে; তৃতীয় হইতে পঞ্চম ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়গুলি বর্ত্তমানকালের উপযুক্ত নহে। পাঠক তবেই দেখুন প্রায় সমগ্র বৃহদারণ্যকই গৃহীত হইয়াছে।

বিভক্ত ; তন্মধ্যে প্রথম তিন অধ্যায় ব্যতীত, অবশিষ্ট পাঁচটী সুবিস্তৃত অধ্যায়ই* এই আখ্যায়িকাংশ দ্বারা গঠিত। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, আমরা উভয় উপনিষদের প্রায় সমুদয় স্থলই গ্রহণ করিয়াছি। আবার, পরিত্যক্ত অংশে শঙ্কর-ভাষ্যে যে সকল সুন্দর সুন্দর যুক্তি আছে, সে যুক্তিগুলিও, অবিকল আমরা এই আখ্যায়িকাংশে যে যে স্থলে আবশ্যক বোধ করিয়াছি সেই সেই স্থলেই গাঁথিয়া দিয়াছি। আর, এই অবতরণিকার শেষ অংশে সেই পরিত্যক্ত অংশগুলি সম্বন্ধেও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল অংশ মূল গ্রন্থে পরিত্যাগ করাতেও কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। পাঠক, শঙ্কর-ভাষ্যের সঙ্গে মিলাইয়া এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখিলেই, আমাদের কথাগুলির প্রামাণ্য বুঝিতে পারিবেন।

মূল উপনিষদে, এই সকল আখ্যায়িকার ভাষা এত মধুর বোধ হয় যে বারংবার পড়িলেও প্রত্যেক বারেই সেগুলিকে নূতন বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তগুলি এত সহজ ও হৃদয়স্পর্শী

---

* প্রথম তিন অধ্যায়োক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশগুলির তাৎপর্য্য অবতরণিকার সাধনাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ের ১ম ও ২য় খণ্ডোক্ত বিষয় "ইন্দ্রিয়বর্গের কলহে" গৃহীত হইয়াছে এবং ৩য় হইতে ১০ম খণ্ডোক্ত "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা" দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া গিয়াছে এবং অষ্টমাধ্যায়ের কতিপয় স্থল অবতরণিকায় আছে। পাঠক তবেই দেখুন্ প্রায় সমগ্র ছান্দোগ্যই গৃহীত হইয়াছে।

যে, যিনি একবার তাহা শুনিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-পটে সেগুলি পাষাণ-রেখাবৎ অঙ্কিত না হইয়া পারে না। দুরূহ ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝাইবার এরূপ সহজ ও মধুর উপায় উপনিষদ্ ব্যতীত, আর কোথায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্য্য বড়ই গুরুতর ও শ্রম-সাপেক্ষ। মূল উপনিষদের এবং শঙ্কর-ভাষ্যের ভাষা স্থানে স্থানে বড় জটিল এবং স্থানে স্থানে তাৎপর্য্য নির্ণীত হওয়াও বড় কঠিন। এরূপ-ভাবে অনুবাদ প্রচারও সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং এই কার্য্যে আমাদের ভ্রম-প্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। তজ্জন্য আমরা বিনীত-ভাবে পাঠকবর্গের এবং যাঁহারা ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিতে ও তাহার পুনঃপ্রচারে আন্তরিক যত্নশীল, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করি।

২। এখন আমরা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে এইরূপ একটী মন্তব্য লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন—

"সর্ব্ব এব দ্বিপ্রকারঃ। অন্তঃ প্রাণ উপষ্টম্ভকঃ গৃহস্যেব স্তম্ভাদি-লক্ষণঃ প্রকাশকোঽমৃতঃ। বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণোঽপ্রকাশকঃ উপজনাপায়-ধর্ম্মকঃ তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্যেব সত্য-শব্দবাচ্যো মর্ত্ত্যঃ। তেন অমৃত-শব্দবাচ্যঃ প্রাণশ্ছন্ন ইতিচোপসংহৃতঃ। স এব চ প্রাণো বাহ্যাধার-ভেদেষু অনেকধা বিস্তৃতঃ" (বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ১।৬।৩)।

শঙ্করাচার্য্যের এই মন্তব্যটীর তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বের সকল বস্তুই ‘প্রাণ’ এবং ‘অন্ন’ নামক দুইটী অংশ দ্বারা গঠিত। একটী অন্তরাংশ, অপরটী বাহ্যাংশ। প্রাণাংশটী —প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত। অন্নাংশটী—অপ্রকাশক, ক্ষয়-বৃদ্ধি-শীল, স্থূল। এই প্রাণকে অনেক স্থলে ‘করণাংশ’ বলা হইয়াছে এবং অন্নকে ‘কার্য্যাংশ’ বলা হইয়াছে*। এই অন্ন—প্রাণের আধার; অন্নের আশ্রয়ে থাকিয়াই প্রাণ বিবিধ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়।

জড়-শক্তির দুইরূপ।—প্রাণ ও অন্ন।

এখন আমরা এই ভাষ্যাংশটীর প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহাই নির্ণয় করিব। এই আলোচনা হইতে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে শ্রুতির সিদ্ধান্তও সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

শ্রুতি এই জগৎকে ‘অগ্নি-সোমাত্মক’ বলিয়াছেন। অনেক স্থলে সোমকে—রয়ি বা অন্ন এবং অগ্নিকে—প্রাণ, অত্তা বা অন্নাদ (অন্নের ভক্ষক) বলা হইয়াছে †। ইহারা উভয়ে উভয়ের উপকারক বলিয়া, অন্ন ও অন্নাদ নামে পরিচিত। যে

* “দ্বিরূপোহি ··কার্য্যমাধারঃ ··করণঞ্চ আধেয়ম্”।—বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৩।৫।১১—১৩। “কার্য্যাত্মকে নামরূপে শরীরাবস্থে, ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণ-স্তয়োরুপষ্টম্ভকঃ; অতঃ কার্য্য-করণানামাত্মা প্রাণঃ”—বৃহ০ ভা০, ৩।৩।১৯।

† “ইদং সর্ব্বমন্নঞ্চৈব অন্নাদশ্চ। সোম এব অন্নম্, অগ্নিরন্নাদঃ”—বৃহ০ ভা০, ১।৪।৬।

যাহার পোষণ করে, তাহাই তাহার 'অন্ন' এবং যে সেই অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়, তাহাকে সেই অন্নের 'অন্নাদ' বলা যায়। এই জন্যই শ্রুতির অনেক স্থলে, অন্ন প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, উভয় অংশকে একত্রে ভাবনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে *। আধুনিক ইংরাজী বিজ্ঞানের ভাষায়, এই প্রাণ বা অন্নাদকে (Motion) এবং অন্নকে (Matter) বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে। ইহারা কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; কেহই একাকী ক্রিয়া করিতে পারে না। শক্তিকে তাহার আধার হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভাবিতে পারা যায় না। প্রত্যেক পদার্থ ই—যাহা 'বিষয়' বলিয়া অভিহিত—তাহা, এই করণাংশ (Motion) এবং কার্য্যাংশ (Matter) এই উভয় অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই প্রাণ এবং অন্ন—এই দুইটী অংশ আছে।

* "উপকার্য্যোপকারকত্বাৎ অত্তা (করণাংশ) অন্নঞ্চ (কার্য্যাংশ) সর্ব্বম্"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য, ২।২। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে দেখা যায়—'অন্ন অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদও অন্নে প্রতিষ্ঠিত"।—অর্থাৎ আধার ব্যতীত শক্তির এবং শক্তি ব্যতীত আধারের কল্পনা করা যায় না; একটী অন্যটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। "ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেন উপকারঃ, তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেন উপকারঃ"—বৃহ০ মধুবিদ্যা, ৪।৫।১—১৯॥ "কার্য্যাত্মকে নামরূপে শরীরাবস্থে, ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণস্তয়োরুপষ্টম্ভকঃ। অতঃ কার্য্য-করণানামাত্মা প্রাণঃ"—বৃ০ ভাঃ, ৩।৩।১৯॥

মূল প্রাণশক্তি স্পন্দনাত্মক *। মহাকাশের একদেশে এই প্রাণ-স্পন্দন অভিব্যক্ত হইয়া যখনই ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখনই উহা করণ-রূপে ও কার্য্য-রূপে প্রকাশ পাইল। সূক্ষ্ম স্পন্দন এই প্রকারেই ক্রিয়ার বিকাশ করে। ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে হইলেই উহার একটী বাহ্য আধার আবশ্যক, নতুবা ক্রিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রাণ-স্পন্দন, মহাকাশে অভিব্যক্ত হইয়া, বেগ ও গতির (Motion) তারতম্যানুসারে আপনাকে বিকাশিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার জড়াংশও (Matter) তদনুসারে পরিণত হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, এই বাহ্য জড়াংশও—শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। শক্তি যেমন করণরূপে বিকাশিত হয়, শক্তি তেমনই কার্য্যরূপেও সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। জড়ের (Matter) অর্থ কি? যাহা ক্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয়া জন্মায়, যাহা প্রযুক্ত-বলের প্রতি-রোধক, যাহা উহার উপরে প্রয়োজিত ক্রিয়াকে বাধা দেয় বা প্রতিরোধ করে, উহাই আমাদের নিকটে জড় নামে পরিচিত। এই বাধাদায়িনী ক্রিয়াই জড়ের অস্তিত্ব-বোধক, অতএব জড়ও

জড়শক্তি—সূক্ষ্ম স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্ত।

* "প্রাণঃ···অজায়ত 'পরিস্পন্দাত্ম' কর্ম্মণে"। "নহি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ"-বৃহ০ ভা০, ১।৫।১২॥ "পরিস্পন্দলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।১৭॥ "প্রাণস্য চ 'পরিস্পন্দাত্মকত্বং'··· আধ্যাত্মিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ···অনুবর্ত্ত্যমানম্"—বৃ০ ভা০,। ইহাই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ এবং সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব।

শক্তিরই রূপান্তর মাত্র; উহাও আমাদের নিকটে ক্রিয়াত্মক-রূপেই প্রতিভাত *।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও ইহাই সিদ্ধান্ত।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer বলেন যে,—শক্তির দুই রূপ। এক—বাধা-ক্রিয়া-জনক রূপ, ইহাই জড়াবস্থা। অপর—এই জড়াবস্থার আশ্রয়ে যে নানা প্রকারের ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহা শক্তির দ্বিতীয় রূপ। শক্তির এই দুইটী রূপ একসঙ্গে অভিব্যক্ত এবং ইহারা একসঙ্গে ক্রিয়া করে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

"The forms of our experience oblige us to distinguish

* পাশ্চাত্য দর্শনে জড়ের অস্তিত্ব প্রধানতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং জড়ও শক্তির রূপান্তর। শ্রুতি ও শঙ্করাচার্য্য বলেন যে,—জড়বস্তু মাত্রই কেহন না কোন নাম বা রূপ দ্বারা পরিচিত। নাম—শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে এবং রূপ—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয়—ইহারা ক্রিয়াত্মক, শক্তিবিশেষ; সুতরাং জড়—শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। "শব্দ-সামান্যমাত্র মেতদেষাং নামবিশেষাণাং,...রূপাণাং চক্ষুঃশব্দাভিধেয়ং রূপসামান্য মাত্রম্" ইত্যাদি দেখুন।—বৃহং ভাং, ১।৬।১—২॥ মৈত্রেয়ীর আখ্যায়িকায় শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—করণাত্মক ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি জড়ীয় বিষয়বর্গেরই রূপান্তর মাত্র; উভয়ই এক জাতীয় বস্তু। সুতরাং যাহাকে 'জড়' বলা যায়, উহা শক্তিরই রূপান্তরমাত্র।

between *two modes* of Force ;—the force by which *matter* demonstrates itself to us as *existing*, and the force by which it demonstrate itself to us as *acting* ;—the one not a worker of change and the other as a worker of change, actual or potential".

তিনি আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"Matter, in all its Properties, is the unknown cause of all sensations it produces in us, of which the one which remains when all the others are absent is *resistance* to our efforts. In imagining a *unit* of matter we may not ignore this symbol, by which alone a unit of matter can be figured in thought as an *existence* ;—by this it is distinguished from empty space." "The force by which matter exists is passive but independent, while the force by which it moves is active but dependent on its past and present relations to other atoms."

এই Matter বা জড়াংশকে সাংখ্যের "তমঃ-শক্তি" বলা যাইতে পারে,—এই তমের আশ্রয়েই শক্তির নানা প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মশক্তি—কিরূপে স্থূল হয়? অভিব্যক্তির প্রণালী।—

বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণশক্তির বিকাশের প্রণালী সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।—

"ব্রহ্মের অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত এই দুইটী রূপ। অমূর্ত্ত রূপটী নিত্য; মূর্ত্ত রূপটী ধ্বংসাত্মক। মূর্ত্ত-রূপটী—অমূর্ত্ত রূপটীর আধার। আকাশ ও বায়ু *—ইহারা অমূর্ত্ত এবং তেজঃ, জল ও পৃথিবী—ইহারা মূর্ত্তরূপ"।†

পদার্থমাত্রই অমূর্ত্তাবস্থা হইতে মূর্ত্তাবস্থায় আসিয়াছে এবং পুনরায় মূর্ত্তাবস্থা হইতে অমূর্ত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। যাঁহা পূর্ব্বে ব্যাপক সূক্ষ্মাবস্থায় (Diffused state) ছিল, তাহাই পরে ঘনীভূত হইয়া স্থূলাবস্থায় (Integrated state) আসিয়াছে। এই কথা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি, আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থাকে অমূর্ত্তরূপ এবং তৈজস, জলীয় ও পার্থিব অবস্থাকে মূর্ত্তরূপ

---

* শ্রুতি-কথিত এই 'বায়ু' স্থূল বায়ু নহে। মহাকাশে প্রাণস্পন্দন অভিব্যক্ত হইলেই 'করণ' রূপে ও 'কার্য্য'রূপে প্রকাশিত হয়। সেই করণাংশই এই—বায়ু (Motion)। "পরিম্রিয়ন্তে অস্মিন্ অন্তে দেবা ইতি পরিমরো "বায়ুঃ"। ব্রহ্মণঃ সংহর্ত্তৃত্বং বায়ুদ্বারকং।. বায়ুরাকাশেন অনন্ত ইতি আকাশংবায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমরমিত্যুপাসীত"—তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ভৃগুবল্লী. ২।১০॥ "বায়ুশ্চ আকাশেন গ্রস্ত ইতি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ"—উপদেশ-সাহস্রী, রামতীর্থ॥ অব্যক্ত প্রাণস্পন্দন প্রথমে মহাকাশে বায়ুরূপে ব্যক্ত হয়। এই বায়ু-বিশিষ্ট আকাশই শ্রুতির "ভূতাকাশ"। এইজন্যই বৃহদারণ্যকে আকাশ ও বায়ুকে—অমূর্ত্তাবস্থা বলা হইয়াছে। এইজন্যই ছান্দোগ্যের "ত্রিবৃৎ প্রকরণে" আকাশ ও বায়ু উল্লিখিত হয় নাই।

† বৃহদারণ্যক, ২।৩।১-৬ দেখ। 'দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা প্রাণ-শক্তিরই পাঁচপ্রকার রূপান্তর। এই সকলই, এক প্রাণ-শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।

আমরা অমূর্ত্ত বা সূক্ষ্মাবস্থায় শক্তিকে দেখিতে পাই না। যাহা অমূর্ত্তাবস্থায় কেবল ক্রিয়াত্মক রূপে অনুমিত হয়, মূর্ত্তাবস্থায় তাহা ক্রিয়াত্মক ও জড়াত্মক* উভয়ভাবেই উপস্থিত হয়। ইহা ঘনীভবনের (Integration) ফলমাত্র। ক্রিয়া এবং যাহার আশ্রয়ে ক্রিয়া কার্য্য করে,—উভয়ই ঘনীভূত বা সংহত হইয়া স্থূল হইয়াছে †। তাই আমরা, স্থূল বিষয় মাত্রকেই করণরূপে ও কার্য্যরূপে—উভয়ভাবে মিলিত দেখিতে পাই। সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আসিতে হইলেই, শক্তি ও শক্তির আশ্রয় জড়াংশের উভয়েরই ঘনীভবন আবশ্যক। সুতরাং যখনই স্থূলাকারে শক্তির প্রত্যক্ষ হয়, তখনই উহাকে জড়াংশের আশ্রয়ে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়। এইজন্যই শ্রুতি ও ভাষ্য-কার, প্রত্যেক স্থূল পদার্থকেই—করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক বলিয়াছেন। পদার্থমাত্রই অন্য পদার্থে শক্তি বিকীর্ণ করিয়া থাকে এবং অন্য পদার্থ হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যখনই

* ক্রিয়াত্মক—Motion. কার্য্যাত্মক—Matter.

† "Concrete *motion* arises by the integration of diffused motion and concrete *matter* arises by the aggregation of diffused matter."—Herbert Spencer. "The parts can not become progressively integrated, without their *motions* becoming *more integrated*"—Ibid.

করণাংশ (Motion) তেজরূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার কার্য্যাংশও (Matter) ঘনীভূত বা সংহত হইতে থাকে *, এই রূপে স্থূলতা প্রাপ্ত হয় বা মূর্ত্তরূপ গ্রহণ করে।

পঞ্চভূত কাহাকে বলে ?

আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থায় যে শক্তি অমূর্ত্তভাবে ক্রিয়া করিতেছিল, তাহা যতই সংহত হইতে লাগিল বা স্থূলাবস্থায় আসিতে লাগিল, ততই উহা যেমন তেজাদির আকারে বিকীর্ণ হইয়া ক্ষয়িত হইতে লাগিল, ততই উহার জড়াংশও ঘনীভূত হইতে থাকে এবং জলীয় ও পার্থিব অবস্থা গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা স্থূল বায়ু বলি, উহা অগ্নি-জলাদির সহিত অনুগত রূপেই অভিব্যক্ত হয় †। এই জন্যই, ছান্দোগ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় বায়ুর উল্লেখ নাই ; তেজের কথা বলাতেই বায়ুর কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শঙ্করও বলিয়াছেন—"বায়ু দ্বারা

---

* ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেন উপকারঃ, তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেন উপকারঃ"।—বৃ০ ভাষ্য, শঙ্করাচার্য্য। /

† "The current of *air* is the *effect* of the difference in the *heat* of the different parts of the earth's surface," "বায়ুনা হি সংযুক্তং জ্যোতির্দ্দীপ্যতে, দীপ্তং হি জ্যোতিরন্নকণ্ঠং সমর্থো-ভবতি"—ঐতং আরণ্যকং ভাষ্য ২।৩। "তেজঃ বায়ুনা গ্রস্তং, বায়ুশ্চ আকাশেন গ্রস্তঃ"—উপ০ সাহস্রী। স্পর্শতন্মাত্রার দুই আকার ;—উষ্ণস্পর্শ বা অগ্নি, শীতস্পর্শ বা জল।

দীপ্ত হইয়াই তেজঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে”। অতএব, তেজই ক্রিয়ার প্রথম স্থূল অভিব্যক্তি। এই প্রকারে ‘করণাংশ’—তেজঃ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে উহার ‘কার্য্যাংশ’ও ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে। এই ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা—‘জল’ (তরল) এবং আরো ঘনীভূত হইলে উহার শেষ অবস্থা—‘পৃথিবী’ (কঠিন) *। এই প্রকারে পঞ্চভূত অভিব্যক্ত হইয়াছে। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনই—করণরূপে (Motion) ও কার্য্যরূপে (Matter) বিকাশিত হইয়াছে এবং এই অংশ-দ্বয়ের ঘনীভবনের ফলে, পঞ্চভূত অভিব্যক্ত হইয়াছে †।

---

* “Every mass from a grain of sand to a planet, *radiates heat* to other masses and absorbes heat radiated by other masses; and in so far as it does the one it becomes *integrated*, while in so far as it does the other it becomes disintegrated. If the loss of molecular motion proceeds, it will presently be followed by *liquefaction* (জল) and eventually by *solidification* (পৃথিবী)” —Herbert Spencer. শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—“অগ্নেঃ আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি”। এবং “তেজসা বাহ্যান্তঃ পচ্যমানঃ যোঽপাং শরঃ স সমহন্যত,সা পৃথিবী অভবৎ”।

† দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় এই সৃষ্টি-তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

সকল স্থূল পদার্থই এই পঞ্চভূতের বিকার। এই পঞ্চভূতেরই সংমিশ্রণের তারতম্যে স্থূল পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূল বিকার-বর্গের মধ্যে, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থ-গুলিকে শ্রুতি 'আধিদৈবিক' ও বৃক্ষ, লতা, লৌহ, নদী, শরীর প্রভৃতি পদার্থ-গুলিকে 'আধিভৌতিক' এবং জীবদেহস্থ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গকে 'আধ্যাত্মিক' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থূল মূর্ত্ত পদার্থ-মাত্রই যখন করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক, তখন চন্দ্র-সূর্য্যাদিও অবশ্যই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। আবার, মনুষ্যাদি প্রাণীও করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। গর্ভস্থ ভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ-শক্তি অভিব্যক্ত হয়। এই প্রাণ-স্পন্দন আপনাকে পাঁচভাগে * বিভক্ত করিয়া দৈহিক সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রাণেরই অংশ, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছে †। এইরূপে, প্রাণের 'করণাংশ' —ইন্দ্রিয়

প্রাণ-শক্তিই—করণরূপে ও কার্য্যরূপে বিকাশিত হইয়া, সকল পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে।

---

* প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় প্রাণের ক্রিয়া। পায়ু ও উপস্থে অপান। নাভিদেশে সমান ভুক্ত অন্নের পরিপাক করে। দেহব্যাপ্ত স্নায়ুছিদ্রে ব্যান সঞ্চরণ করে। উদানবায়ু মনুষ্যকে মৃত্যুকালে যথাযোগ্য লোকে লইয়া যায়,—সুষুম্না-নাড়ীর মধ্যে উদানের স্থান।

† এই প্রাণ-শক্তিই রস-রুধিরাদির পরিচালনা দ্বারা গর্ভের পোষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে উহার 'কার্য্যাংশ' সংহত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ

ও অন্তঃকরণ রূপে ক্রিয়া করে এবং উহার 'কার্য্যাংশ' হইতে দেহ ও দেহাবয়ব নির্ম্মিত হয়। অতএব, প্রাণ-শক্তিরই করণাংশ, উহার কার্য্যাংশের সহিত একত্রে দেহের অবয়ব ও ইন্দ্রিয়-বর্গের গোলক-গুলি নির্ম্মাণ করে এবং উহাদের আশ্রয়ে দর্শন-শ্রবণাদি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে *। অতএব জীবের দর্শন-শ্রবণাদি

ইন্দ্রিয়ের গোলক বা স্থানগুলি (organs) নির্ম্মিত হইতে থাকে। এই রূপে দেহাবয়বগুলি নির্ম্মিত হইতে থাকিলে, উহার 'করণাংশ'ও ঐ সকল গোলকের আশ্রয়ে বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে (Functions) অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে প্রাণীরাজ্যে, 'কার্য্যাংশ' দেহরূপে এবং 'করণাংশ' ইন্দ্রিয়াদি-শক্তি-রূপে ব্যক্ত হয়। "অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ" (বৃহৎভাষ্য)।

"In organism the advance towards a more integrated distribution of *retained motion* which accompanies the advance towards a more integrated distribution of component *matter*, is what we understand as the developement of *Functions*."—Herbert Spencer.

* "ভূতবিকারে ইদানীমুচ্যতে প্রাণিজাতে। পুরুষস্ত যচ্চক্ষুঃ তজ্জ্যোতি-রগ্নি র্দেহে; যানি খানি সুষিরাণি তানি আকাশঃ; যল্লোহিতং শ্লেষ্মা রেতঃ তাঃ আপঃ; যৎ শরীরং কাঠিন্যাৎ সা পৃথিবী; যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ। দেহান্তঃ প্রাণঃ সর্ব্বক্রিয়াহেতুঃ। বাক্চতাঃ সর্ব্বজ্ঞান হেতুভূতাঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাগিত্যেতাঃ—প্রাণাপানয়ো র্নিবিষ্টা...তদনুবৃত্তয়ঃ।" ঐতং আরণ্যকে শঙ্কর। পাঠক দেখুন, শঙ্করের সিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানি-কের সিদ্ধান্ত কেমন একই পথ অনুসরণ করিয়াছে। পাঠক অবেই দেখিতেছেন যে—প্রাণ-স্পন্দন, অন্নাদ ও অন্নরূপে (Motion এবং Matter রূপে) ব্যক্ত হইয়া, এই উভয় অংশের ঘনীভবনের দ্বারা আধ্যাত্মিক দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি গড়িয়া তুলিয়াছে। সূর্য্য-চন্দ্রাদিতেও যে প্রণালী, প্রাণীরাজ্যেও সেই প্রণালী। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞান-গুলিকে * প্রাণ-শক্তিরই একরূপ শেষ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কেন না, প্রাণ-শক্তি যদি ইন্দ্রিয়-বর্গের স্থানগুলি (গোলক) নির্ম্মাণ না করিয়া দিত এবং তদাশ্রয়ে বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে পরিণত না হইত, তবে জীবের জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি হইতে পারিত না †। অতএব আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাণ-স্পন্দনই—অন্নাদ ও অন্নরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, এই উভয় অংশের ঘনীভবনের ফলে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বাহ্য জগতের রচনা সম্বন্ধে ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

প্রাণশক্তি—ব্রহ্মের সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত।

শ্রুতি-মতে, ঈশ্বরের বহু হইবার সংকল্প বা ইচ্ছা (WILL) হইতেই, এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সংকল্প—জ্ঞানেরই ক্রিয়া ‡। কিন্তু জ্ঞানের ক্রিয়া হইতে হইলেই অস্ফুট শব্দ-রূপে উহা অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞান-ক্রিয়া ও শব্দ—পরস্পর সংপৃক্ত, একথা যাঁহারা আধুনিক (psychology) শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই

* শব্দবিজ্ঞান, স্পর্শবিজ্ঞান, ক্রোধবিজ্ঞান প্রভৃতি (States of conseiousness), † "শরীরদেশে ব্যূঢ়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভমান উপলভ্যতে"। "অস্মিন্ হি" করণানি অধিষ্ঠিতানি প্রলব্ধাত্মকানি উপলব্ধিদ্বারং ভবন্তি"।—বৃহ° ভা°, ২।২।১

‡ "নাম-রূপাকারেণ আবির্ভবেয়মিতি পর্য্যালোচনরূপম্"— তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাষ্য, ২।২। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৬।২। "যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব তপঃ"—মুণ্ডকভাষ্য শঙ্কর, ১।১।৯॥ "প্রধান মায়াহজ্ঞান[illegible] বিকারঃ তদুপাধিকং জ্ঞানবিকারঃ তপঃ"—আনন্দগিরি-টীকা।

জানেন। এই জন্যই জগৎ শব্দাত্মক *। অতএব জ্ঞানের প্রথম অভিব্যক্তি শব্দাত্মক। ইহাই প্রাণের স্পন্দন নামে শ্রুতিতে বিদিত। আমরা উপরে দেখিয়া আসিলাম যে, স্পন্দনই মহাকাশে বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী-রূপে অভিব্যক্ত হয়। অতএব শ্রুতি-তে, স্পন্দনই বিশ্বের মূল। এই স্পন্দন—ব্রহ্মেরই জ্ঞান-ক্রিয়া বা সংকল্প। সুতরাং ইহা, ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। ইহা ব্রহ্ম-সত্তারই রূপান্তর, অবস্থান্তর বা আকার-বিশেষ মাত্র। † একটা বিশেষ-আকার বা অবস্থান্তর ধারণ করিলেই বস্তু একেবারে স্বতন্ত্র একটী বস্তু হইয়া উঠে না ‡। অতএব এই স্পন্দন—ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

১। প্রাণশক্তি—ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে।

* বৃহদারণ্যকের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমেই এই তত্ত্ব আছে। "তন্মনোঽকুরুত।...মনসা বাচং সম্ভবনং কৃতবান্।...মনসা বাচা আলোচনমুপগম্য ইদং সর্ব্বমসৃজত"। মাণ্ডুক্যেও এই তত্ত্ব আছে—বাগনুরক্ত বুদ্ধি-বোধ্যত্বাৎ বাঙ্মাত্রং সর্ব্বম্' ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আধুনিক Herbert Spencer এর Rhythem দ্রষ্টব্য।

† শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে ও মুণ্ডক-ভাষ্যে ইহাকে "জায়মানাবস্থা" ও 'ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে ইহাকে 'আগন্তুক" ও 'কাদাচিৎক'ও বলা হইয়াছে। ইহা সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র আসিয়াছে বলিয়াই ইহা "আগন্তুক"। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা এ ভাবে ছিল না; তখন ইহা ব্রহ্মে একাকার-ভাবে ছিল।

‡ ন চ বিশেষ-দর্শন-মাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি··· স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ'—বেদান্ত-ভাষ্য, ২।১।১৮।

কিন্তু যদিও এই স্পন্দন-শক্তি—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে; তথাপি কিন্তু ব্রহ্ম—ইহা হইতে স্বতন্ত্র *। ব্রহ্ম—এই আগন্তুক প্রাণ-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

২। কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

কেননা, ব্রহ্ম অনন্ত, পূর্ণ। একটা মাত্র জগৎ-সৃষ্টির সংকল্পেই, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের ইয়ত্তা বা শেষ হইয়া যায় না।" এ বিশ্ব ছাড়াও, কত প্রকার সৃষ্টি-সংকল্প বা বিশ্ব-বিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি, তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই তাঁহাকে

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, ১৪৩পৃঃ হইতে ১৪৭পৃঃ দেখ। "অতো নাম-রূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী। ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্"।—শঙ্করভাষ্য, ৈত্তিরীয়; "ঈক্ষণীয়-ব্যাকর্ত্তব্য-প্রপঞ্চাৎ "পৃথক্" ঈশ্বর-সত্ত্ব-শ্রুতে র্ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"—বেদান্তরত্নপ্রভা, ২।১।২৭। কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎ ভেদেঽপি, অধিষ্ঠানস্য ততো ভেদঃ"। "কারণং কার্য্যাৎ ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাৎ ভিন্নম্"।—রত্নপ্রভা ও শঙ্কর। অর্থাৎ শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে,—যাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা তাহাই সৃষ্টির প্রাক্কালে সবিশেষ হয়,—সৃষ্টির উন্মুখাবস্থা ধারণ করে। এই উন্মুখাবস্থাই জগতের প্রাগবস্থা। ইহা আগন্তুক অবস্থামাত্র। ইহাকেই অব্যক্তশক্তি বা প্রাণ-স্পন্দন বলে। ইহা "আগন্তুক" বলিয়াই, ব্রহ্ম ইহা হইতে চির স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা ব্রহ্মেরই একটা আগন্তুক "অবস্থাবিশেষ" বলিয়া, ইহা ব্রহ্ম হইতে একেবারে "স্বতন্ত্র" কোন বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রাণ-স্পন্দন, ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহাই তত্ত্ব-দর্শীর অনুভব। পাঠক শঙ্করের এই মীমাংসা মনে রাখিবেন।

কার্য্য-কারণের অতীত, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে *।

শ্রুতি-কথিত স্পন্দন-বাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত।

আমরা উপরে যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও নিতান্ত অনুগত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব-গুলি উপনিষদের নানাস্থানে উল্লিখিত আছে। পাঠক তাহা উপনিষদের সেই সেই স্থল-গুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। "সংবর্গ-বিদ্যায়"† আমরা দেখি যে, চন্দ্র-সূর্য্যাদি বাহ্যিক সকল পদার্থই স্পন্দনাত্মক বায়ু হইতে জাত; এবং দেহের চক্ষুঃকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তি হইতে উৎপন্ন। প্রাণ ও বায়ু—এক স্পন্দনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম; উহারা উভয়ই স্পন্দনাত্মক ‡। অতএব গতি ও বেগের তারতম্যানুসারে স্পন্দনই, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ পদার্থে পরিণত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও নানাস্থানে এই তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মন, বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই প্রাণাত্মক। ইহারা প্রাণ হইতেই অভিব্যক্ত হয় (নিদ্রার পরে); আবার সুষুপ্তি ও মৃত্যু-কালে

* আমরা এই সকল কথা দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃতভাবে, শঙ্কর-ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া, আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে অতি সংক্ষেপে কথিত হইল।

† ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, ৪।২ দেখ।

‡ ""বায়োশ্চ প্রাণস্তচ পরিস্পন্দাত্মকত্বম্"—শঙ্করাচার্য্য (বৃহং ভা°

প্রাণেতেই তিরোহিত হইয়া যায়*। এই স্থলেই আবার আমরা দেখি যে, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি প্রাণ-ব্রত ধারণ করিল এবং বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গও প্রাণ-ব্রত ধারণ করিল†। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া ও ব্যাপার-গুলি সকলই স্পন্দনাত্মক। সুতরাং সকল পদার্থই যে, স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত এবং প্রাণ-শক্তিই যে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার আকারে বিকাশিত,—ইহাই বুঝা যাইতেছে। আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, চক্ষুঃ, কর্ণ, বাক্য, মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলি—আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতিরই রূপান্তর মাত্র ; আধিদৈবিক শক্তিগুলিই প্রাণি-দেহে ইন্দ্রিয়াকারে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে‡। ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণের যাহা 'করণাংশ,' তাহাই সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে তেজঃ,

---

*"নহি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ, চলনব্যাপার-পূর্ব্বকাণ্যেব হি সর্ব্বদা স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যন্তে বাগাদীনি"।—বৃহদারণ্যক, ১।৫।২১—২৩ দেখ। "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি" ইত্যাদি॥

† "প্রাণাদ্বা এষ সূর্য্য উদেতি, প্রাণে অস্তমেতি" ইত্যাদি দেখ, বৃহং ভা° ১।৫।২৩। বৃহদারণ্যকের ১।৩ দেখ।

‡ "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়তি, এষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ" ইত্যাদি দেখ ; প্রশ্ন-উপনিষদ, ৩।১।১ ১০ দেখ। শঙ্কর বলেন যাহারা পরস্পর উপকারক, তাহাদের মূলকারণ একই। "যচ্চ লোকে পরোপকারকোপ-কার্য্যভূতং তদেককারণ-পূর্ব্বকম্" বৃহ° ভা°, মধুবিদ্যা।

আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে ; আবার প্রাণেরই 'করণাংশ', প্রাণি-দেহেও চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং মূলতঃ উহারা একই প্রাণ-শক্তির দুই প্রকার অবস্থা-ভেদমাত্র। বৃহদারণ্যকের 'মধুবিদ্যাতে'ও এই মহা-তত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে *। এক প্রাণ-শক্তিই যে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ-গুলির মূল-কারণ,—তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদে ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে, গর্ভস্থ ভ্রূণে সর্ব্ব-প্রথমে প্রাণ-শক্তির উদ্ভব হয় এবং এই প্রাণ-স্পন্দনই রস-রুধিরাদির পরিচালনা করতঃ, ইন্দ্রিয়ের গোলকগুলি নির্ম্মাণ করে এবং তদাশ্রয়ে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুঃ-কর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাকে †। আবার, প্রাণ-শক্তি যে করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ইহাও শ্রুতির সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বাহ্য স্থূল জড়ের আশ্রয়ে থাকিয়া যে প্রাণ-শক্তি পুষ্ট হয় ও ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, এবং প্রাণ-শক্তি যে সর্ব্বত্র বাহ্য স্থূল জড়াংশ দ্বারা আচ্ছন্ন,—ইহা সর্ব্ব-

* "পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং জগৎ সর্ব্বং পৃথিব্যাদি। যচ্চ লোকে পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং তদেককারণপূর্ব্বকং এক-সামান্যাত্মকমেক-প্রলয়ঞ্চ দৃষ্টম্। এষ হ্যর্থোঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে প্রকাশ্যতে"—শঙ্করাচার্য্য।

† "নাপ্রাণং শুক্রং বিরোহতীতি প্রথমো বৃত্তিলাভঃ প্রাণস্য চক্ষুরাদিভ্যঃ ....নিষেককালাদারভ্য গর্ভং পুষ্যতি প্রাণঃ" বৃহ০ ভা,০ ৬।১।১-৩। প্রভৃতি দেখ। এবং ছান্দোগ্যের, ৬।১।১-১৫ দেখ।

ত্রই উল্লিখিত আছে*। সুতরাং শ্বেত-কেতুর আখ্যায়িকায় সকল স্থূল পদার্থকেই যে তেজঃ, অপ্ ও অন্নাত্মক বলা হইয়াছে,—এখন আমরা তাহারও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ঘনীভূত হইতে হইলেই শক্তির ক্ষয় হয়; শক্তি-ক্ষয় হইলেই তেজের উদ্ভব অনিবার্য্য এবং শক্তির আশ্রয় জড়াংশও সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে জলীয় ও পরে কঠিন পার্থিব আকারে ঘনীভূত হইতে থাকে। এই জন্যই ছান্দোগ্যে, অপ্ ও অন্নের † সঙ্গে সঙ্গে তেজের কথা বলা হইয়াছে। আবার এই স্থলেই,—বাক্, মন ও প্রাণকে যথাক্রমে তেজঃ, অপ্ ও অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাণ-শক্তি কখনই জড়ীয় অবলম্বন ব্যতীত স্বতন্ত্র-ভাবে আত্ম-বিকাশ করিতে পারে না এবং আমরা অন্ন-পানাদি গ্রহণ করতঃ যে শক্তি সঞ্চয় করি, তদ্দারাই ইন্দ্রিয়-শক্তির পোষণ হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রুতিতে প্রাণকে, অন্ন-পানাদি দ্বারা পুষ্ট বলা হইয়াছে ‡।

---

* "সর্ব্বএব দ্বিপ্রকারঃ, অন্তঃ প্রাণ উপষ্টম্ভকঃ ··বাহ্যশ্চ কার্য্য-লক্ষণঃ"। "কার্য্যাত্মকে নামরূপে শরীরাবস্থে, ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণ স্তয়োরু পষ্টম্ভকঃ"। "অতঃ কার্য্য-করণাত্মা প্রাণঃ"—ইত্যাদি ভাষ্য দেখ।

† অপ্—জল। অন্ন—পৃথিবী।

‡ "অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ"—বৃহ০ ভা,০ ১।৩।১৮-২০॥ "অন্নেন হি দামস্থানীয়েন অস্মিন শরীরে বদ্ধঃ প্রাণঃ—ঐত০ আ০ ২।১॥ এই জন্যই শ্রুতিতে প্রাণকে

তবেই পাঠক, শ্রুতির এই সকল উক্তি হইতে এখন দেখিতেছেন যে, অধুনাতন অত্যুন্নত বিজ্ঞানের যাহা সিদ্ধান্ত, শ্রুতিতেও অত প্রাচীনকালে, সেই সকল কথাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং বিবিধ পদার্থও ক্রিয়ার অন্তরালে শক্তির মৌলিক একত্ব তৎকালে বিদিত ছিল। ইহা কি হিন্দু জাতির কম গৌরবের কথা? হিন্দুজাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিরূপ উন্নত ছিল, ইহা দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। অথচ হিন্দুজাতি, জড়ীয় বিকারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের কথাটীও ভুলেন নাই।

প্রাণ-শক্তি—ব্রহ্মেরই শক্তি: ব্রহ্মেরই সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত।

তত্ত্বদর্শী বৈজ্ঞানিকের চক্ষে, পদার্থগুলির কোনটীই, এক একটী 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তিনি জানেন যে বিশ্বব্যাপী কতকগুলি ক্রিয়া এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া—কোথাও বৃক্ষ, কোথাও লতা, কোথাও স্বর্ণ, কোথাও জল, কোথাও বা প্রাণিদেহ-রূপে

'অন্ন-বন্ধন' বলা হইয়াছে এবং জলকে প্রাণের 'বস্ত্র' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে পাঠককে Herbert Spencer এর মীমাংসাও শুনাইব।—

"At the outset, animal absorbs under the form of *food*, an amount of latent force greater than it daily expends and the surplus is daily equilibrated by growth" ইত্যাদি। মূলগ্রন্থের 'ইন্দ্রিয় বর্গের কলহ' উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে *। সকল পদার্থই শক্তিরই রূপান্তর। আবার মূলে এই শক্তি—স্পন্দনাত্মক। অতএব, এক প্রাণ-শক্তিই স্পন্দিত হইয়া নানা পদার্থাকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সংকল্প-বশতঃ তাঁহারই জ্ঞান-শক্তি স্পন্দিত হইয়া, সেই স্পন্দনেরই প্রকার ভেদে, এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। এই স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তি—ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ইহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বা ক্রিয়া নাই †। কিন্তু ব্রহ্ম—

---

* Compare :—"we find a progressive reduction of differences,—sound, light, heat, electricity transformed from mere qualitative distinctions into varieties of *Motion* ; ... several kinds of force are capable of passing into each other, and in their apparent contrast are only *modes of the same*" "The scientific observer regards the *objects* as individualizations of the *powers* in the course of their history. The individual that presses upon sense is but the phenomenal meeting point or the show-place of permanent and universal powers". *Martineau.*

† "অধিষ্ঠানাতিরেকেণ সত্তা-স্ফুরণয়োরভাবাৎ ভেদদর্শনমবিবেকিনাম্"—আনন্দগিরি। "God is the being, the one universal being whose *power* (স্ফুরণ) and *essence* (সত্তা) penetrates and fills all spaces and times."—Paulsen (*Introduction to Philosophy*).

এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ;—ব্রহ্ম-চৈতন্যই এই প্রাণ-শক্তির অধিষ্ঠান * ।

জগতের সকল পদার্থই পরিণামী, বিকারী। সুতরাং এ সকলের কারণ-রূপে একটী মূল পরিণামি-উপাদান নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়। নতুবা, অসৎ হইতে—শূন্য হইতে—জগৎ অভিব্যক্ত

---

* চৈতন্যস্য নিত্যত্বেন জগদ্ভিন্নত্বেন চ তস্য সত্যত্বাৎ, 'অধিষ্ঠানো'-পপত্তেঃ"—প্রশ্ন—উপ, আনন্দগিরি, ৬।৮। "কল্পিতস্য অধিষ্ঠান-ধর্ম্মবত্ত্বম-ভেদাৎ; নতু অধিষ্ঠানস্য কল্পিত-কার্য্যধর্ম্মবত্ত্বং, তস্য কার্য্যাৎ 'পৃথক্—সত্ত্বাৎ"—বেদান্ত-ভাষ্য, রত্ন-প্রভা।

শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে—ব্রহ্ম অপরিণামি, নিরবয়ব, পূর্ণ। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই পূর্ণ, নির্ব্বিশেষ সত্তারই একটা পরিণামোন্মুখ বিশেষ-অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই পরিণামোন্মুখ বিশেষ আকারটাকেই মায়া-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি বলে। ইহা 'আগন্তুক'। ইহাই বিকারি জগতের মূল-উপাদান। পরমার্থতঃ, ইহা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে একান্ত 'ভিন্ন, কোন বস্তু নহে। কেন না, বিশেষ একটা অবস্থান্তর হইলেই বস্তুটী একটী 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে না। কিন্তু ব্রহ্ম—ইহা হইতে স্বতন্ত্র। কেননা, ইহা সেই সত্তারই একটা 'আগন্তুক" অবস্থা ; ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মে একাকার ছিল ; সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র উপস্থিত হইল। প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, ব্রহ্মকেই জগতের 'উপাদান-কারণ' বলা হইয়াছে। আবার, ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, ব্রহ্মকে জগতের 'নিমিত্ত-কারণ' বলা হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে।

হইয়াছে বলিতে হয় *। আরো একটী কথা আছে। বাহিরে ও ভিতরে যাহা শক্তিরই খেলামাত্র, তাহাই আবার আত্মার নিকটে 'অনুভূতি' নামে পরিচিত। ইন্দ্রিয়-পথে বাহ্যিক বিষয়-গুলি ক্রিয়া করিলেই, তাহা অনুভূতি-রূপে আত্মায় প্রতিভাত হয়। বিষয়-সংযোগে—এক নিত্য-জ্ঞানের অবস্থান্তর বা বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং এই সকল অনুভূতির মূল-কারণ-রূপে একটী উপাদান স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে †।

আমরা এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের নিজের উক্তি এবং তাঁহার তিন জন টীকাকারের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি——

"প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষ মেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব

---

* যদি অসত্যমেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণো ব্যবহার্য্যস্থ গ্রহণদ্বারাঽভাবাৎ অসত্ত্ব-প্রসঙ্গঃ"—গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১।৬। "বীজাত্মকত্ব মপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ, সৎশব্দবাচ্যতা চ।·· তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্ব—ব্যপদেশঃ" মাণ্ডুক্যভাষ্য, ১।২॥ প্রলয়ে জগৎ কারণ-শক্তিরূপে বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টিকালে এই কারণ শক্তি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং শক্তিই জগতের বীজ। এই বীজ দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মকে সদ্‌ব্রহ্ম বা 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা হয়। "কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তি-নিয়ামকতয়া—'শক্তিঃ'। বেদান্ত-ভাষ্যে রত্ন-প্রভা, ২।১।১৮॥ "অর্থবতী হি সা, অন্যথা জগৎ-স্রষ্টৃত্বং ন সিধ্যতি "শঙ্কর, বেদান্ত-দর্শন, ১।৪।৩

† "অনুভাব্যে নাম-রূপে অনুভবাত্মক-ব্রহ্ম-রূপে কথ্যেতে" ঐতরেয় ভাষ্যে জ্ঞানামৃত।

চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ” (বেদান্ত-ভাষ্য ১।৩।৩০)। আবার “সা বীজশক্তি রব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া।…অর্থবতী হি সা, ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ” (বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৪।৩) *।

আনন্দগিরি টীকাকার বলিতেছেন—

“প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্যকরণ-শক্তীনা মবস্থান মভ্যুপগন্তব্যং, শক্তিত্ব-লক্ষণস্য নিত্যত্ব-নির্ব্বিহায়। তাসাং শক্তীনাং সমাহারো ‘মায়াতত্ত্বম্’। ”সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমবক্ত্যং; তস্য পরাত্ম-পারতন্ত্র্যাৎ পরমাত্মন উপচারেণ ‘কারণ’ ত্ব মুচ্যতে ন তু অব্যক্তবদ্বিকারিতয়া। অব্যক্তস্য পারতন্ত্র্যং—পৃথক্ সত্ত্বে প্রামাণাভাবাৎ আত্মসত্ত্বয়ৈব সত্ত্বাবত্ত্বাচ্চ; অতো ব্রহ্মণঃ ন অদ্বিতীয়ত্ব-বিরোধঃ” †। /

---

* “এই জগৎ কারণ-শক্তি-রূপে প্রলয়ে লীন হইয়া যায়; পুনঃ-সৃষ্টি কালে সেই শক্তি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত হয়। এই কারণ-শক্তি-স্বীকার না করিলে, এ জগৎ শূন্য হইতে জন্মিয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু অসৎ বা শূন্য কাহারও কারণ হইতে পারে না; অসৎ বা শূন্য হইতে কিছু জন্মিতেও পারে না। “এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল।” জগতের এই অব্যক্ত-অবস্থাকে জগতের ‘বীজ-শক্তি’ বলা যায়। ব্রহ্মে এই শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কেননা, (আগন্তুক, পরিণামোন্মুখ) শক্তি-স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তি-রহিত পদার্থের ক্রিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না।”

† তাৎপর্য্য এই—শক্তির ধ্বংস হইতে পারে না। প্রলয়কালে সকল পদার্থই শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে। এই শক্তি-গুলিকে সমষ্টিভাবে ‘মায়া-তত্ত্ব’ বলা যায়। জগতের এই কারণ-শক্তির নাম অব্যক্ত। এই অব্যক্তই

১ রত্ন-প্রভাকার বলিয়াছেন—

"এতদব্যক্তং কূটস্থ-ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্ব—সিদ্ধ্যর্থং স্বীকার্য্যং, জীবভেদোপাধি-মত্বেনাপি তৎস্বীকার্য্যম্"। *

ঐতরেয় ভাষ্যের টীকাকার জ্ঞানামৃত বলিতেছেন—

"আরোপিতস্য অনুভব-প্রত্যাখ্যানেন সিদ্ধা সম্ভবাৎ, 'অনুভাষ্যে' নাম-রূপে অনুভবাত্মক-ব্রহ্মরূপে কথ্যেতে, নতু ঐক্যাভিপ্রায়েণ। ন চ 'বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' শ্রুতিবলাৎ আত্মন এব উপাদানত্বাৎ নোপাদনান্তরাপেক্ষেতি বাচ্যং;—বিয়দাদে র্ব্যবহারিকত্বেন ঘটাদিবৎ পরিণামিত্বাৎ, তস্য 'পরিণা-ম্যুপাদানং' বক্তব্যং; নতু আত্মা তথা ভবিতুমর্হতি নিরবয়বত্বাৎ। তত্র বিয়দাদেঃ পরিণামিত্ব মঙ্গীকৃত্য, তত্র অনভিব্যক্ত-নামরূপাবস্থং 'অব্যাকৃতং' —পরিণাম্যুপাদান মস্তি। নামরূপয়ো-রাত্মমাত্রত্বেন মৃষাত্বাৎ আত্মনোঽদ্বিতীয়ত্বং ন বিরুধ্যতে" †।

তবে যাবতীয় বিকারি পদার্থের 'কারণ'। ব্রহ্ম-চৈতন্যই—এই উপাদান-কারণের অধিষ্ঠান। এই উপাদান-যোগেই ব্রহ্মকেও 'কারণ' বলা যায়। ব্রহ্ম হইতে—এই অব্যক্ত-কারণটার স্বতন্ত্র,স্বাধীন সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। সুতরাং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না"।

* "এই বিকারি জগতের একটা 'অব্যক্ত-কারণ' আছে। ইহা স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারিত না। আরো একটা কথা আছে। জীব-চৈতন্যেরা যে পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন—এই ভিন্নতা, এইরূপ একটা উপাদান-কারণ স্বীকার না করিলে, সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই জগতের একটা অব্যক্ত উপাদান আছে"।

† "বিষয়মাত্রেই জ্ঞানের নিকটে 'অনুভূত' স্থানীয়। এই অনুভূতিগুলি বাস্তবিক জ্ঞানেরই স্বরূপভূত; জ্ঞান হইতে ইহাদের পৃথক সত্তা

এই সকল উক্তি হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর-মতে এই জগতের উপাদান-রূপে একটী কারণ-শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই বলিয়া, ব্রহ্মই জগতের 'কারণ' হইতেছেন। অত-এব এক নিত্য জ্ঞানেরই শক্তি * স্পন্দিত হইয়া, এই জগৎরূপে

প্রাণশক্তিই—এই জগতের উপাদান।

নাই। এই অভিপ্রায়েই যাবতীয় পদার্থকে জ্ঞান-স্বরূপ বলা যায়। এই জ্ঞান এবং তাহাতে আরোপিত অনুভাব্য পদার্থ-গুলি (অনুভূতিগুলি)—উভয়ে ঠিক্ এক বা অভিন্ন নহে; ইহাদের ভিন্নতা থাকিবেই। আবার আকাশ, ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই পরিণামী, বিকারী। অতএব ইহাদের কারণ-রূপে একটী পরিণামি-উপাদান অবশ্যই আছে। ব্রহ্ম ত নিরবয়ব, অপরিণামী। সুতরাং ব্রহ্ম এরূপ পরিণামি উপাদান হইতে পারেন না। অতএব এই বিকারি ঘট-পটাদি পদার্থ যাহাতে অব্যক্ত ভাবে লীন থাকে, তাহাকেই 'অব্যক্ত' উপাদান বলে। এই পরিণামী, অব্যক্ত উপাদানকে 'অব্যাকৃত' শব্দেও অভিহিত করা যায়। কারণ ইহা হইতেই যাবতীয় বিকার অভিব্যক্ত বা ব্যাকৃত হয়। এই বিকারি পদার্থ-গুলি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে মিথ্যা। সুতরাং ইহার দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না।

* বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরে এই কথাই পাওয়া যায়। চক্ষুঃ কর্ণ, বাক্য, প্রাণাদি দ্বার আত্মার বিশেষ বিশেষ খণ্ড ক্রিয়ামাত্র প্রকাশ পায়; ইহাদের দ্বারা আত্মার 'পূর্ণ-শক্তি' প্রকাশ পায় না। আত্মা—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপ। চক্ষুঃ-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং

পরিণত হইয়াছে *। এবং এই শক্তি-সংসর্গে সেই জ্ঞানেরও অবস্থান্তর প্রতীত হইতেছে †। জ্ঞান—নিত্য, একরূপ, নির্ব্বিকার। শক্তিই—পরিণামিনী। এই শক্তির পরিণামের সংসর্গেই, সেই এক নিত্য নিরবয়ব জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান (States of consciousness) অনুভূত হইতেছে ‡। আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের § প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলেও, আমরা একথা অনায়াসে বুঝিতে পারি।

এখন আমরা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বাক্য-প্রাণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সেই জ্ঞান ও শক্তির আংশিক বিকাশ হইতেছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আত্মা—সমুদয় জ্ঞান ও ক্রিয়ার পূর্ণ আধার। "আত্মনি সর্ব্বোপসংহারবতি দৃষ্টে তত্ত্বদর্শী—কৃৎস্নদর্শী—ভবতি" ইত্যাদি।

* ইহ দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্কর 'পরিণাম-বাদকেও' উড়াইয়া দেন নাই।

† ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্কর 'বিবর্ত্ত-বাদও' গ্রহণ করিয়াছেন। পরিণাম-বাদ ও বিবর্ত্ত-বাদ সম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, পৃঃ ৬৯ হইতে পৃঃ ৭৫ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

‡ "ন অধ্যক্ষস্য সাক্ষিণঃ পরিণামঃ, তস্য অবিশেষত্বাৎ। স্বতঃ পরতো বা নিরবয়বস্য বিশেষাসম্ভবাৎ ; কিন্তু বুদ্ধেরেব সাভাসায়া অবস্থা-বিশেষঃ"—উপদেশ-সাহস্রী—টীকা। ২০।৫৭।

§ Sense-perception.

মনে করা যাউক্, আমার সম্মুখে একটী কমলালেবু রহিয়াছে। আমি উহাকে হস্ত দ্বারা তুলিয়া চক্ষুর নিকটে লইয়া আসিলাম। হস্ত বুঝিল—উহার স্পর্শটী বেশ কোমল; চক্ষুঃ দেখিল—উহার সুন্দর লোহিতাভ বর্ণ আছে। লেবুর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিলাম। জিহ্বা বলিল—উহার কেমন মিষ্ট আস্বাদন। নাসিকার নিকটে লইয়া যাওয়াতে, নাসিকা বুঝিল—উহা হইতে সুমধুর স্নিগ্ধ গন্ধ আসিতেছে। তবেই কমলালেবুর প্রত্যক্ষ অর্থ এই যে, আমার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গুলি, উহার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করিল। কেবল ইহাই নহে। কমলালেবুটী আমার অন্তঃকরণে সুখের উদ্রেক করিয়াছে; এবং ভবিষ্যতে আরো একটী লেবু পাইবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে। এই লালসা ও ঔৎসুক্যে ধাবিত হইয়া আমি আর একটী লেবু লইয়া আসিলাম। এখন দেখা যাউক্, আমার যে এতগুলি অনুভূতি হইল, এগুলির প্রকৃত অর্থ কি? ঐ সকল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস সুখাদি কি কমলা-লেবুতেই নিহিত, না উহারা আমারই অন্তঃকরণের বোধ মাত্র? কমলালেবুটী আমার চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়াই, উহা আমার ইন্দ্রিয়-গুলির প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ-প্রকার ক্রিয়ার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছে। উহা চক্ষুর রূপ-বোধাত্মক ক্রিয়া উদ্রেক করাইয়াছে; নাসিকার গন্ধ-বোধাত্মক ক্রিয়া উদ্রেক করাইয়াছে;—এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-

ঐন্দ্রিয়িক-বোধ এবং ক্রিয়ার স্বরূপ-নির্ণয়।

গুলিরও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। ইহাতে এই হইল যে, আমার বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আমার অন্তঃকরণে কতকগুলি উপলব্ধি (Sensations) আসিল মাত্র। আমার অন্তঃকরণ যদি ইন্দ্রিয়-বর্গের এই ক্রিয়া-গুলির সহিত সংযুক্ত না হয়, উহাদিগকে সজ্জিত না করে,—তবে ঐ উপলব্ধিগুলি চিরদিন উপলব্ধিমাত্রই রহিয়া যাইত; উহারা আমার বোধের অঙ্গীভূত হইতে পারিত না। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবামাত্র আমার অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার-যোগে, বিষয়াকার ধারণ করে—বিষয়াকারে পরিণত হয় *। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা উপলব্ধিগুলি (Sensations) উদ্রিক্ত হইবামাত্র বুদ্ধি, উহাদিগকে প্রথমতঃ 'দেশে' ও 'কালে' সাজাইয়া লয় †। দেশ ও কাল—এই দুইটি বুদ্ধির হস্তধৃত সূত্র-স্বরূপ। এই সূত্র দুইটী দ্বারা উপলব্ধি-গুলি সূত্রিত ও গ্রথিত হইয়া থাকে। এতদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই উপলব্ধি-গুলি আমার বাহির হইতে আসিতেছে বা আমার ভিতরেই জন্মিয়াছে? পূর্ব্বে কি কখনও এই উপলব্ধির অনুরূপ বা এই

---

* বুদ্ধিরেব সর্ব্বাসু অবস্থাসু অর্থাকারা দৃশ্যতে; চিত্তং রূপাদীন্ বিষয়ান্ ব্যাপ্নবৎ তদাকারং দৃশ্যতে"। "চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারক-বুদ্ধিবৃত্তিঃ বহিঃ-প্রসৃতা, রূপাদিবিষয়োপ-রঞ্জিতা, জানাতিক্রিয়াত্মিকা উচ্যতে, সা 'দৃষ্টিঃ'। ধিয়ো বিষয় ব্যাপ্তিঃ পরিণামমন্তরেণ ন ভবতি"।—উপদেশ-সাহস্রী টীকা, ১৪ অধ্যায়।

† "যদি বিবেককৃৎ মনোনাম নাস্তি, ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেক-প্রতিপত্তিঃ"?—বৃহং ভাং, ২।৫।৩

উপলব্ধি হইতে ভিন্ন রকমের অন্য কোন উপলব্ধি পাইয়াছিলাম? * বুদ্ধি এইরূপে বিচার করিতে আরম্ভ করে; তবে উহারা আমার বোধের অঙ্গীভূত হয়। আত্মাই—এই বিচার-ক্রিয়ার প্রেরক ও দ্রষ্টা। †

দেশ।

কমলালেবুটী যে সকল উপলব্ধি আমাতে দিয়াছে, সেই উপলব্ধিগুলি আমা অপেক্ষা ভিন্ন দেশ হইতেই আমাতে আসিয়াছে—দেশ-বোধ এই কথা বলিয়া দেয়। কমলালেবুটী যে আমরা সম্মুখে কি

---

* "নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যো 'দেশ'-'কালাদি'-বিশিষ্টতয়া তদস্তদিত্যুক্তম্"—শঙ্করাচার্য্য। (সমান জাতীয়—similar; অসমান জাতীয়—Different)।

† বিষয়বর্গ জড়; সুতরাং উহারা নিজেই নিজকে জানিতে পারে না। উহারা আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হয়। "বিষয়ঃ শব্দাদির্গন্ধান্তঃ স্বয়ং প্রকাশ-স্তাবন্নাস্তি, ন তথা পরস্পরেণাপি, জড়ত্বাৎ। অতঃ স্ববিলক্ষণেন অজড়েন প্রকাশ্যা এব বিষয়াঃ"—উপ° সাহস্রী, ১৪। ৪১॥ "বুদ্ধিদ্বারা চিদাত্মা বাচমিন্দ্রিয়ং সমারুহ্য তস্যাঃ প্রেরকোভূত্বা ··সর্ব্বাণি নামানি বক্তব্যত্বেনাপ্নোতি; চক্ষুষা রূপাণি চাপ্নোতি দ্রষ্টা ভবতি। তথাচ সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বং চিদাত্মনি বুদ্ধের্ধর্ম্মঃ"।—বেদান্তভাষ্য, রত্নপ্রভা॥ "কেনেষিতং পততি প্রেরিতং মনঃ?—শ্রুতি। [প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোন 'কর্তৃত্ব' নাই। বুদ্ধিরই কর্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারাই আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই শঙ্করের মীমাংসা। বৃহ° ভা° ১।৩।২ মন্ত্রের ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা দেখ। প্রশ্ন° ভা°, ৪র্থ প্রশ্ন, ৫ মন্ত্র দেখ।] ["কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ"—বেদান্ত-দর্শন দেখ]

পশ্চাতে, দক্ষিণে কি বামে, নিকটে কি দূরে—ইহা আত্ম-কেন্দ্র হইতে তুলনা করিয়াই বুঝা যায়। যে কেন্দ্রে উপলব্ধি-গুলি উপস্থিত হইয়াছে, সেই কেন্দ্র হইতেই—সম্মুখ-পশ্চাৎ, বাম-দক্ষিণ প্রভৃতি দেশ-বোধ তুলনা দ্বারা লব্ধ হয় *। ইহাই দেশ বোধের স্বরূপ। আবার, কমলালেবুটীর গন্ধ যে মধুর—

কাল।

বর্ত্তমানকালের এই মধুর গন্ধটী বুঝিতে হইলে, বর্ত্তমানকালের পূর্ব্বে (অতীত-কালে) অনুভূত এতৎসদৃশ অপর একটী উপলব্ধির স্মৃতি আবশ্যক। অথবা. সেই অতীত-কালের অনুভূতিটী বর্ত্তমানের এই অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের, তাহার স্মৃতি আবশ্যক। নতুবা উহার গন্ধটী যে মধুর, তাহা বুঝা যাইবে না। ইহাই কাল-বোধের স্বরূপ †। চিত্তের এই বিচার ক্রিয়াকে লক্ষ্য

* সম্মুখবর্ত্তী 'ক' আমাতে যেরূপ অনুভূতি দিল, বামদিকে অবস্থিত 'খ' আমাতেই তদপেক্ষা ভিন্ন প্রকারের অনুভূতি দিল। সুতরাং 'ক' হইতে 'খ' ভিন্ন পদার্থ। আত্মার অনুভূতির ভিন্নতা দ্বারাই পদার্থের ভিন্নতা বুঝা যায়। আবার, আমি 'ক' ও 'খ' উভয় হইতেই ভিন্ন; কেন না, 'ক' ও 'খ' এর ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আমিই পাইয়াছি।

† এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচারকে—সাংখ্যদর্শনে 'সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের আলোচনা' বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যাকারে পদার্থ আলোচিত হয়; পরে বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহাতে পদার্থটী, অনুগত (Similar) ও ব্যাবৃত্ত (dissimilar) ধর্ম্ম সহকারে বিচারিত হইয়া, পদার্থ নিরূপিত

করিয়াই চিত্তকে সংকল্পবিকল্পাত্মক * বলা হইয়াছে। দেশ-বোধ জানাইয়া দিল যে, কমলালেবুটী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া যে কতকগুলি উপলব্ধি জাগাইয়া তুলিয়াছে, এগুলি অবশ্যই আমার অন্তরেই অনুভূত হইতেছে; কিন্তু কমলালেবু উপস্থিত হওয়াতেই ঐ সকল উপলব্ধি আমি পাইয়াছি; লেবুটী আসিবার পূর্ব্বে ত ঐ প্রকারের উপলব্ধি অন্তরে জাগে নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যদিও অনুভূতিগুলি আমারই অন্তরের অনুভূতি বটে; কিন্তু তথাপি ঐ উপলব্ধিগুলির উৎপাদক 'কারণটি' আমার বাহিরেই অবস্থিত— আমা হইতে ভিন্ন দেশে অবস্থিত। সুতরাং আত্মা এই অনুভূতি

১) দেশ ও কাল দ্বারা, বিষয়ী ও বিষয়ের স্বতন্ত্রতা বুঝা যায়।

হয়। "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং। ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্ম্মৈ র্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা" (সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী)।

Compare :—Our idea of an object exists *first* as an undivided unit, on which the several qualities come to the front one after another through the experience of *similars* with a *difference*; and we may say these qualities were implicit (নির্বিকল্পক), before they were explicit (সবিকল্পক)"—"*Study on Religion*", *vol 1.*

* সংকল্প-বিকল্প—"সামান্তেন প্রতিপন্নানাং রূপাদীনাং শুক্লকৃষ্ণাদিনা সম্যক্ পরিকল্পনম্" ।—আনন্দগিরি।

গুলি হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু। আবার, কাল-বোধ আমাকে কি বুঝাইল? এই আত্মাতে বর্ত্তমানকালে যে অনুভূতি জাগিয়াছে, সেই আত্মাতেই ত অতীতকালে ইহারই অনুরূপ বা ইহা হইতে বিসদৃশ অন্য কত অনুভূতি জাগিয়াছিল; সুতরাং একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন 'কালের' অনুভূতি গুলি অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং কাল-বোধ আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেয় যে, যে আত্মাতে এই অনুভূতি গুলি জাগিয়াছে, সেই আত্মা এই অনুভূতি-গুলি হইতে 'স্বতন্ত্র' পদার্থ। কেন না, বর্ত্তমানের এই অনুভূতি গুলি আসিবার পূর্ব্বেও ত এই একই আত্মা ছিল *। অনুভূতি গুলি আত্মার দৃশ্য, এবং আত্মা এই অনুভূতি গুলির দ্রষ্টা। সুতরাং আত্মা 'স্বতন্ত্র'। এইরূপে উপলব্ধি গুলি যখন দেশে ও কালে সজ্জিত হইতে থাকে, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মাতেই অনুভূতি হয় বটে, কিন্তু আত্মা অনুভূতি-গুলি হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। আত্মা স্বতন্ত্র না হইলে, আত্মা কখনই বুদ্ধি-দ্বারা অনুভূতি গুলিকে বিচার করিতে পারিত না—দেশ ও কালে সজ্জিত করিয়া লইতে পারিত না। আত্মা যদি অনুভূতিগুলি

---

* "চক্ষুর্দ্বারজনিতা রূপাকারাকারিতা মানসী বৃত্তিঃ। সা আত্মস্বরূপয়া নিত্যয়া দৃষ্টা চৈতন্যপ্রকাশ-লক্ষণায়া নিত্যমেব দৃশ্যতে"। "যাতু চক্ষুরাদিদ্বারনিরপেক্ষা অন্তর্মনসি চিত্তে স্মৃতি-রাগাদি-রূপা সাপি পূর্ব্বোক্তয়াত্মদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে"।—উপ০ সাহস্রী, রামতীর্থ। "জাগ্রদবস্থায়াং বুদ্ধিবৃত্তি-সাক্ষিত্বেন চিদাত্মনঃ পরিণামাভাবেঽপি ধী-ব্যাপ্যত্বম্"। "জাগ্রদ্দৃশ্যাদপি স আত্মা অন্য এব দ্রষ্টৃত্বাৎ"।

হইতে স্বতন্ত্রই না হইবে, তাহা হইলে—ঐ অনুভূতিগুলি একজাতীয় না ভিন্ন জাতীয়; উহারা অনেক না এক,—ইত্যাদি প্রকারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করাও মনের দ্বারা সম্ভব হইত না।* আত্মা সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির 'দ্রষ্টা', অনুভূতি-গুলি আত্মার 'দৃশ্য'। দ্রষ্টা ও দৃশ্য—একজাতীয় বস্তু হইতে পারে না। দৃশ্যবর্গ হইতে দ্রষ্টা স্বতন্ত্র না হইয়া পারেন না †। এই বিচার-ক্রিয়ায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু কমলালেবুটী ইন্দ্রিয়ের পথে যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি উপলব্ধির উদ্রেক করিয়াছিল, সেই ক্রিয়াগুলিতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব সূচিত হয় না; কেন না, আত্মা ইচ্ছা করুক্ আর নাই করুক্, লেবুটী ইন্দ্রিয়-বর্গের পথে উপস্থিত হইলেই উহা সেই ক্রিয়াগুলি উত্তেজিত করিবেই। সুতরাং উপলব্ধি-গুলি Passive এবং আত্মার বিচার-ক্রিয়া Active। আত্মাকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলে—বিষয় হইতে বিষয়ী স্বতন্ত্র না হইলে—এই উভয় প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং অনুভূতি-গুলি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

---

* ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি 'স্বতন্ত্রঃ'; ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাতন্ত্র্যস্য মন-উপাধিকৃতত্বাৎ" —প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য। "বিচার-দশায়াং মন-আদি-সংঘাতস্য ক্রিয়াদি-শক্তি মত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাদিস্তদাশ্রয়ঃ প্রতীতঃ"—আনন্দগিরি, বৃহ°, ১।৩।২॥

† "দ্রষ্টা সদৈব দৃশ্যাৎ অসজাতীয়ঃ, দৃশ্যাংশস্য অচেতনত্বাৎ"—উপ°সাহ°, ১৫।৫॥ "অন্যথা, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োরসজাতীয়ত্বানঙ্গীকারে, দ্রষ্টুঃ পরিণামিত্বাৎ ধীবৎ, সাক্ষিতা—আত্মতা—ন স্যাৎ"।

আবার, কমলালেবু হইতে ইন্দ্রিয়-পথে এই যে উপলব্ধি-গুলি জন্মিয়াছে, এই উপলব্ধি-গুলির উৎপাদক—'কারণ', অবশ্যই কমলালেবু। কমলালেবুই ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উদ্রেক করিয়াছে। সুতরাং কমলালেবুটীও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, আত্ম-কেন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র দেশে অবস্থিত। এই প্রকারে বিষয়ী ও বিষয়ের স্বতন্ত্রতা বুঝা যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিবেচনা করিলেও ইহাই প্রমাণিত হয়।

(২) অন্য প্রকারেও বিষয়ী ও বিষয়ের স্বতন্ত্রতা বুঝা যায়।

আমি যখন হস্তপ্রসারণ করিয়া কমলালেবুটী গ্রহণ করিলাম, এস্থলে এই 'গ্রহণ' অর্থ কি? এস্থলে আমি বুঝিতে পারি যে, বাহিরে 'একটা কিছু' উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে গিয়া আমার হস্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে,—যাহা আমার হস্তের ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিয়াছে। প্রতিরোধ করিয়াছে বলিয়াই আমি উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছি। এইরূপে আমরা 'বিষয়ের' অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি। আমার আত্মা হইতে হস্ত-যোগে শক্তি-প্রেরিত হইয়া কমলা লেবুর উপরে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মা 'বিষয়ী'। আবার, ঐ লেবু হইতে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া আমার হস্তে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং লেবুটী 'বিষয়' নামে পরিচিত। বিষয়ী আত্মাকে, হস্তপ্রসারণ ক্রিয়ার মূল-'প্রেরক' রূপে বুঝিতেছি এবং লেবুকেও হস্তের উপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়ার উৎপাদক 'কারণ' রূপে বুঝিতেছি *। অতএব বিষয়ী ও বিষয় উভয়েই উভয় হইতে স্বতন্ত্র।

* আত্মা বা বিষয়ী—অপরিণামি নিত্য। বিষয়—পরিণামি নিত্য।

অতএব এখন আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে,—যে উপলব্ধি-গুলির উপরে আমি (বিষয়ী) মনঃ-সংযোগ দ্বারা বিচার করিয়াছিলাম * এবং যে ক্রিয়া আমা হইতে প্রেরিত হইয়া বাহিরে একটী পদার্থে (বিষয়ে) প্রযুক্ত হইয়াছে—সেই 'অনুভূতি' ও 'ক্রিয়া' উভয়ই 'আমার'। আবার, বাহিরের যে পদার্থটী আমাতে উপলব্ধির উদ্রেক করিয়াছে এবং যাহার উপরে আমার প্রেরিত বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে বা যাহা হস্ত-স্পর্শকে প্রতিরোধ করিয়াছে—সেই পদার্থটী 'আমি' নহি, উহা আমা হইতে স্বতন্ত্র। একটী 'বিষয়ী'; অন্যটী 'বিষয়'। ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষের সময়ে এইরূপে বিষয়ী ও বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনুভূতি-গুলি ও ক্রিয়াগুলি—অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমি—নিত্য, অপরিণামী। বাহিরের বিষয়টী—অনুভূতি ও ক্রিয়ার জনক বা 'কারণ' রূপে অবস্থিত। ভিতরের 'আমি' বা 'বিষয়ীটী'—অনুভূতি-গুলির অনুভব কর্ত্তা † এবং হস্ত-প্রসারণাদিক্রিয়ার প্রেরক বা উৎপাদক 'কারণ' ‡ রূপে অবস্থিত; কিন্তু সেই

বিষয়ী-ও বিষয়ের প্রত্যক্ষ।

---

* যস্য অসন্নিধৌ চক্ষুরাদেঃ স্বস্ববিষয়-সম্বন্ধেঽপি রূপাদি-বিজ্ঞানং ন ভবতি, তদস্তি মনঃ"—বৃহ° ভা°, ১।৫।৩।

† "অবগতিনিষ্ঠা অবগতিরবসানে"—গীতাভাষ্য। "ভোগশ্চিদবসানঃ"—সাংখ্যসূত্র।

‡ "প্রাণাদিপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠাননিবন্ধনা"—রত্নপ্রভা। "যৎ... সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং...তদ্‌ব্রহ্মেতি"—শঙ্কর।

অনুভূতি ও ক্রিয়াগুলি হইতে আমি স্বতন্ত্র *। বিষয়-প্রত্যক্ষ-কালে, আমাদের এইগুলি অভ্রান্তরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এখন আরো বুঝা যাইতেছে যে আমাদের অন্তরের এই সকল অনুভূতির (States of consciousness) উৎপাদক এই যে 'বিষয়'টী, ইহা ত ক্রিয়ার কেন্দ্র †। বাহ্য বিষয়মাত্রই—এক মূল শক্তিরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র, ইহা আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি। এক প্রাণ-শক্তিই পরিণত হইয়া, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ-রূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব শক্তি-সংসর্গে—শক্তিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের ভেদে—এক নিত্য, অপরিণামি জ্ঞানের (বিষয়ীর) বিবিধ অবস্থান্তর অনুভূত হইতেছে ‡। শ্রুতি এই মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞান ও শক্তি—ইহাদের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

ঐন্দ্রিয়িক-বোধের আলোচনা করিতে গিয়া, আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, আত্মা—নিত্য, স্থির, অপরিণামী। আমাদের বাহিরে 'কি একটা' পরিণাম-শীল পদার্থ আছে; এই পদার্থই ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়োদ্রেকের 'কারণ'। নিত্য,

* দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ। সেস্থলে, জাগ্রদবস্থা ব্যতীত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাতেও আত্মার 'স্বতন্ত্রতা' প্রমাণ করা হইয়াছে।

† মূল উপাদান-শক্তিই—বিষয়বর্গের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। বেদান্ত এই জন্যই ইহাকে 'পরিণামি-নিত্য' বলিয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত 'পরিণাম-বাদও' স্বীকার করিয়াছেন।

‡ বেদান্ত-কথিত 'বিবর্ত্তবাদের' মূল এইখানে।

অপরিণামি আত্মার উপরে,বাহিরের সেই 'কারণটী' হইতে কতক-গুলি উপলব্ধি,ইন্দ্রিয়-যোগে, নিরন্তর উপস্থিত হইতেছে এবং আত্মা হইতেও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রেরিত হইয়া, ইন্দ্রিয়-যোগে বাহিরের সেই 'কারণটী'তে প্রযুক্ত হইতেছে। আত্মাকে 'বিষয়ী' বলা যাউক্ এবং বাহিরের কারণটীকে 'বিষয়' বলা যাউক্। এই বিষয়ীটী—বিষয়জ-অনুভূতি ও বিষয়জ-ক্রিয়ার অধিষ্ঠান। কেন না, ইহারা এই বিষয়ীর উপরেই আসিতেছে এবং বিষয়ী হইতেও ক্রিয়া প্রেরিত হইতেছে। বিষয়ী—নিত্য, অপরিণামী, চেতন। বিষয়—বিকারী, পরিণাম-শীল, জড়। এই পরিণামশীল বিষয়ের যাহা মূল-উপাদান, শঙ্করাচার্য্য তাহার নাম রাখিয়াছেন—'মায়া-শক্তি', 'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত' 'নামরূপের বীজ'। শ্রুতি ইহার নাম রাখিয়াছেন—'প্রাণ-শক্তি' *। সাংখ্যদর্শন ইহাকে

---

* এই প্রাণ-শক্তি বা মায়া-শক্তি যে মনের একটা 'বিজ্ঞান' বা Idea মাত্র নহে, তাহারও শঙ্কর আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। ইহা জড় জগতের মূল উপাদান। মাণ্ডুক্য-ভাষ্যে আনন্দগিরির টীকায় সিদ্ধান্ত দেখুন্—"ননু অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজভূতং নাস্ত্যেব মিথ্যা-জ্ঞান-তৎসংস্কারাণামজ্ঞানশব্দবাচ্যত্বাত্তত্রাহ ··অতঃ 'উপাদান'ত্বেন অনাদ্য-জ্ঞানসিদ্ধিঃ"। গীতাতেও একথা সুস্পষ্ট—"মায়াশব্দস্যাপি 'প্রজ্ঞা'নামসু পাঠাৎ বিজ্ঞানশক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ—ত্রিগুণাত্মিকামিতি" (৪।৬)। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

নিগুর্ণব্রহ্ম—এই শক্তিদ্বারাই 'কারণ-ব্রহ্ম' বা 'সদ্ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। ··বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব

'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বিষয়ীর নাম রাখিয়াছেন—'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম'; সাংখ্যকার ইহাকে 'পুরুষ' বলেন। বিষয়ী—চেতন। বিষয়—জড়।

উপলব্ধি বা নাম-রূপগুলিকে কেন 'অসত্য' বলা হইয়াছে?

আমরা এইস্থলে পাঠক-বর্গকে একটী কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। বিষয়-বর্গ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথে উপস্থিত হইয়া, বিবিধ উপলব্ধির উদ্রেক করে এবং আমরা ইহাদিগকে নিজের বোধের অঙ্গীভূত করিয়া লই। পাঠক দেখিয়াছেন যে, বিষয়বর্গই এই সকল উপলব্ধির উৎপাদক 'কারণ'। শঙ্করাচার্য্য এই উপলব্ধি গুলির সাধারণ নাম রাখিয়াছেন—'নাম-রূপ' বা 'নাম-রূপাত্মক বিকার'। ইহারা কোন না কোন নাম ও কোন না কোন রূপে পরিচিত। ইহারা অস্থির, চঞ্চল, উৎপত্তি-বিনাশশীল, আসিতেছে যাইতেছে, নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। 'বিষয়'-বর্গই ইহাদের উৎপাদক 'কারণ,' পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। কার্য্য ও কারণ—এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ? শঙ্কর-মতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ এইরূপ—কার্য্যের নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নাই; কারণের সত্তাতেই কার্য্যের সত্তা।

* প্রাণ-শব্দত্বং সতঃ, সৎশব্দবাচ্যতাচ। তস্মাৎ সর্বজন্মাভূ প... সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষুচ 'কারণত্ব'-ব্যপদেশঃ"।—...ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য।

কিন্তু কার্য্য-বর্গ হইতে কারণের সত্তা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র *। মৃত্তিকা ঘটের 'কারণ'। মৃত্তিকার সত্তাই প্রকৃতপক্ষে ঘটের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। মৃত্তিকার সত্তা ব্যতীত, ঘটের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শঙ্করাচার্য্য আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহার নিজের কোন সত্তা নাই, যাহা অন্যের সত্তার উপরে নির্ভর করে,—তাহা 'অসত্য', 'কল্পিত,' 'মিথ্যা' †। সুতরাং এই নাম-রূপাদি বিকার গুলি—অসত্য, কল্পিত, মিথ্যা †। এই নাম-রূপ গুলির বা উপলব্ধি-গুলির নিজের কোন সত্তা নাই, ইহাদের সত্তা 'বিষয়ের' সত্তার উপরেই নির্ভর করে,—সুতরাং ইহারা 'অসত্য'। এইজন্যই শঙ্কর অনেক স্থলে, এই জগৎকে ইন্দ্র-জালবৎ অসত্য, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন। নাম-রূপাত্মক অংশকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল কথা বলা হইয়াছে, পাঠক ইহা ভুলিবেন না। কিন্তু এই নাম-রূপগুলির মধ্যে যে 'কারণ'-সত্তা

---

* "কার্যস্য কারণাত্মত্বং, নতু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বম্"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।৬ "কারণং কার্য্যাদ্ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নম্"—রত্নপ্রভা, ১।১।৮ "নাম-রূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী, ন ব্রহ্ম তদাত্মকং"—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২.৬২

† "আগন্তুকত্বয়া স্বরূপ-সত্তাঽভাবাৎ। যৎ প্রাগেব সিদ্ধং ..পশ্চাদপ্যবশিষ্যমাণং, তন্ন 'কল্পিতম্', কিন্তু 'স্বতঃ সিদ্ধম্'। যন্ন স্বতঃ সিদ্ধং তৎ 'কল্পিতম্'।—উপদেশ সাহস্রী। স্বতন্ত্রত্বনিরাসেন তত্র (ব্রহ্মণি) 'কল্পিতত্বং' সিধ্যতি। আত্মতাদাত্ম্যেন 'মৃষাত্বাৎ'।—আনন্দগিরি। "বস্তুতঃ কারণাদ্ভিন্নো নাস্তি বিকারঃ, তস্মাৎ মৃষৈব সঃ"—রত্নপ্রভা, ১।২।৮

অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই কারণ-সত্তা কদাপি অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না *। জগতের যাহা মূল-কারণ, জগতের যাহা উপাদান-সত্তা, তাহাই জগতের 'বিষয়'-বর্গে—জগতের প্রত্যেক পদার্থে—অনুস্যূত রহিয়াছে। তাহারই সত্তায়, জগতের সত্তা। সুতরাং তাহা অসত্য হইতে পারে না, তাহা সত্য। সুতরাং বিষয়-বর্গের মধ্যে যে 'সত্তা' অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাই এই নাম-রূপাদির উৎপাদক 'কারণ'। উহা অলীক নহে। উহা নাম-রূপাদি উপলব্ধি-গুলি হইতে স্বতন্ত্র ও সত্য। এই জন্যই ইহাকে 'পরিণামি-নিত্য' বলা হইয়াছে। পাঠক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটী মনে রাখিবেন †;

প্রাণ শক্তির অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য কি?

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের স্বরূপ এই যে—বিষয়ী আত্মা ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হইয়াই, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই এই সম্বন্ধের দ্বার;

* যদ্বিষয়া বুদ্ধি র্ব্যভিচরতি তৎ 'অসৎ'; যদ্বিষয়া বুদ্ধির্নব্যভিচরতি, তৎ 'সৎ'।...সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তী ইত্যেবং সর্ব্বত্র"—গীতাভাষ্য, ২।১৬ দেখ। "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি' একঞ্চ পুনঃ 'সত্ত্বম্'"।—বেদান্তভাষ্য।

† এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১২৩ পৃঃ হইতে ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইহারাই বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ করাইয়া দেয় *। এই সম্বন্ধ হইতেই বাহ্য বিষয়টীকে আমরা শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-সকলের উৎপাদক কারণ বলিয়া বুঝিয়া লই। প্রাণ-শক্তিই—জগতের বিষয়-বর্গের মূল উপাদান; প্রাণ-শক্তিই বিষয়-বর্গের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। একই প্রাণ-শক্তি যেমন সূর্য্য-চন্দ্রাদি গড়িয়াছে; উহাই আবার ক্রম-উচ্চ পরিণতি-ক্রমে, বাহ্য বিষয়বর্গ গড়িয়াছে; উহাই আবার মনুষ্যের দেহ ও অন্তঃকরণ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই প্রাণ-শক্তি বা প্রকৃতি-শক্তিই তবে বিষয়াকারে—নানা পদার্থাকারে—পরিণত হইয়াছে। কেন এ পরিণতি হইল? ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই স্বরূপ-বিকাশের নিমিত্ত, প্রাণ-শক্তির এই পরিণতি †। তত্ত্বদর্শীর অনুভব এই

* "যস্য অসন্নিধৌ চক্ষুরাদেঃ স্ব স্ব বিষয়সম্বন্ধে, রূপাদি-বিজ্ঞানং ন ভবতি, যস্য চ ভাবে ভবতি, তদস্তি মনো নাম 'অন্তঃকরণং' (অন্যত্র-মনা আসং নাদর্শমিত্যাদি)। যদি চ 'বিবেককৃৎ' মনো নাম নাস্তি, তন্মাত্রেণ কুতো—হস্তসম্বয়ংস্পর্শঃ জানোরয়মিতি—বিবেক প্রতিপত্তিঃ"? —শঙ্কর, বৃহ° ভা°, ১।৫।২

† ঋগ্বেদও আমাদিগকে এই তত্ত্ব বলিয়া দিয়াছেন। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়" (৬।৪৭।১৮)। জীবের নিকটে আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই (প্রতিচক্ষণায়="প্রতি-খ্যাপনায়। যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে, তদা অস্যাত্মনো রূপং প্রজ্ঞানঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত। যদা পুনঃ কার্য্য-করণাত্মনা নামরূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ, তদাঽস্যরূপং প্রতিখ্যায়েত"—শঙ্করাচার্য্য, বৃহদারণ্যক, মধুবিদ্যা) বিবিধ নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। জগতে ব্রহ্ম-

যে—প্রাণশক্তি, ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপের পরিচায়করূপে, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য ও মহিমা-বিকাশের নিমিত্ত, জগদাকারে পরিণত হইয়াছে*। প্রাণ-শক্তি যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রথমে সৌর-

---

সত্তার অনুভব হইবে বলিয়াই, ব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যে শঙ্কর ইহা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার-পরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্ম-দর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনি-যুজ্যতে ...নতু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে (২।১।১৪)।

* এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য, প্রাণ-শক্তি বা মায়া-শক্তিকে ব্রহ্মেরই 'ঐশ্বর্য্য' ও 'বৈভব' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "যদ্যপি জন্মাদি-সর্ব্ববিক্রিয়া-শূন্যং বস্তুতঃ ব্রহ্ম কূটস্থমাস্থীয়তে, তথাপি তদৈশ্বর্য্যেণ তদীয়-শক্ত্যাত্মকেন অনি-র্ব্বাচ্যাজ্ঞান-বৈভবেন যোগাৎ, আকাশাদি-কার্য্যাত্মনা জন্মসম্বন্ধং প্রাপ্য, জগতোনিদানমিতি ব্যপদেশভাক্ ভবতি, তথাচ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ব্রহ্মণো 'জগৎ-কারণত্বং' প্রসিদ্ধম্"।—মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য-ব্যাখ্যায় আনন্দ-গিরি। এই জন্যই বেদান্ত-দর্শনে, আকাশ ও প্রাণাদি পদার্থকে শঙ্করাচার্য্য "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতা-ভাষ্যেও জগতের পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্মেরই "বিভূতি" বলা হইয়াছে। "যস্য নাম মহৎযশঃ"—ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য জগতের পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্মের "যশঃ" বা মহিমা বা ঐশ্বর্য্য-দ্যোতকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, এই জগৎকে ব্রহ্ম-দর্শনের উপায়রূপে, দ্বাররূপে অনুভব করাই কর্ত্তব্য। এইজন্য ছান্দোগ্যে, সত্যকামের আখ্যায়িকায়,—সূর্য্য-চন্দ্র প্রাণ-মন প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মেরই 'পাদ'রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—"সৃষ্ট্যাদি-শ্রুতীনামাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্ত্যর্থপরত্বাৎপ্রকৃতমেব তস্য দর্শনম্"—বৃহঃ ভা,০ ১।৪।৭

জগতের আকারে দেখা না দিত, আবার উহাই উদ্ভিদাদি-রূপে পরিণত না হইত, আবার উহাই প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-রূপে উদ্ভূত না হইত *,—তবে কেমন করিয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, মহিমা, সৌন্দর্য্যাদির প্রকাশ হইত? মনুষ্যের ইন্দ্রিয়

* কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সৃষ্টির ক্রম-উন্নত-বিকাশের মতটা আমরা আধুনিক Evolution Theory হইতে গ্রহণ করিয়া, শ্রুতির উপরে চাপাইয়া দিয়াছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, শ্রুতিই এই ক্রমোন্নত-বিকাশের তত্ত্ব প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন। (১) ঐতরেয়-উপনিষদে সৃষ্টির এইরূপ প্রণালী আছে। পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টির পরে, সমষ্টি-ইন্দ্রিয়াত্মক অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুদাদি দেবতা সৃষ্ট হইল। ইহারাই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। এইরূপে সমষ্টি সৃষ্টি করিয়া, প্রজাপতি ব্যষ্টি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমতঃ গো, পরে অশ্ব সৃষ্টি করিলেন। পরে পুরুষ বা মনুষ্য সৃষ্টি হইলে, অগ্ন্যাদি দেবতারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-রূপে সেই পুরুষ-দেহে প্রবেশ করিল। এস্থলে আর একটা কথা আমরা দেখিতে পাই। "ওষধি-বনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্"। সুতরাং গো, অশ্বাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেই উদ্ভিদ্ সৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব প্রথমে সৌর-জগৎ, পরে উদ্ভিদ্, পরে ইতর-প্রাণী, পরে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে—এই কথাই আসিল। (২) বৃহদারণ্যকে (১।২।১-৭) ও, এইরূপ ক্রম-বিকাশ দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি, সৃষ্টি-পর্য্যালোচন-ক্ষম মন ও বাক্য এই মিথুন-যোগে—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য সৃষ্টি করিলেন এবং পরে জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইল। তৎপরে 'অন্ন' (জড়-পদার্থ-সকল) সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট 'শরীর' (প্রাণীবর্গ) সৃষ্টি করিলেন। এস্থলেও সৃষ্টির ক্রমোন্নত বিকাশই পাওয়া যাইতেছে। (৩) তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দের তার-

ও অন্তঃকরণরূপে যদি প্রাণ-শক্তি ব্যক্ত না হইত, তবে কিসের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যাদি বুঝা যাইত? অন্তঃকরণ আছে বলিয়াই ত আমরা, সেই অন্তঃকরণের দ্বারাই, তাঁহার বিবিধ ঐশ্বর্য্য বুঝিতে সমর্থ হইতেছি*। সুতরাং প্রাণ-শক্তি তাঁহার

তম্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, শ্রুতি বলিয়াছেন—মনুষ্য-লোক অপেক্ষা গন্ধর্ব্ব-লোক, গন্ধর্ব্ব-লোক অপেক্ষা পিতৃ-লোক, পিতৃ-লোক অপেক্ষা দেব-লোক —এইরূপে ক্রমশঃ উন্নত-তর লোকগুলিতে আনন্দের ক্রম-উন্নত বিকাশ হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও আমরা সৃষ্টিপ্রণালীর একটা ক্রম-উন্নত-বিকাশ বুঝিতে পারি। এস্থলে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। শ্রুতির যখন মত এই যে, প্রাণ ও অন্ন—উভয়ই এক সঙ্গে পরিণত হইয়া জগৎ গড়াইয়াছে; এবং সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে যাহা অন্নাংশ, তাহাই উদ্ভিদাদির দেহ এবং অবশেষে মনুষ্যের দেহ গড়াইয়াছে; আবার যাহা সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে যাহা প্রাণাংশ, তাহাই যখন প্রাণী-দেহ গঠিত হইল, তখন, তদাশ্রয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ইহাও সুনিশ্চিত কথা যে, এক জড়-শক্তিই—সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরে পরিণত হইয়াছে। "অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ" এবং "অগ্নির্বাক্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"—ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য পাঠক স্মরণ করুন্। তবেই শ্রুতিতেই ক্রম-বিকাশবাদ সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য্যও এই জন্যই বলিয়াছেন যে—"স্থাবরাদারভ্য 'উপর্য্যুপরি' আবিস্তরণমাত্মনঃ"। পাঠক দেখিবেন যাহা শ্রুতি ও ভাষ্যে উক্ত হয় নাই, এরূপ কোন কথা আমরা এই গ্রন্থে বলি নাই।

* 'করণসংসর্গাদেব···চৈতন্যাভিব্যক্তিঃ, ন স্বতঃ। অন্তঃকরণস্ত অব্যবধানেনৈব চৈতন্যাভিব্যঞ্জকম্"—আনন্দগিরি (তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে)।

স্বরূপ-বিকাশেরই দ্বার মাত্র। অন্তঃকরণাকারে পরিণত হইয়া এই প্রাণ-শক্তি, জগতের যে ছবি দেখাইতেছে, উহা প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য; উহা আর কিছুই নহে। সুতরাং জগৎকে ও অন্তঃকরণকে ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা, যদি আমরা জগতের পদার্থ-গুলিকে এই ভাবে গ্রহণ না করিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ-রূপেই ধরিয়া লই, তবে তাহাই হইল অজ্ঞানতা। যদি আমরা উহা-দিগকে ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচায়করূপে না দেখিয়া, উহাদিগকে বৃক্ষ, লতা, সুখ, দুঃখাদি-রূপেই ধরিয়া লই ও সেইগুলিতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তাহা হইলেই অজ্ঞানতার কার্য্য হইল *। ইহাকেই শঙ্করাচার্য্য—ভেদবুদ্ধি, অবিদ্যা, মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন †। অজ্ঞের দৃষ্টিতেই এই জগৎ, ব্রহ্মের আবরকরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্যই ঐতরেয়-আরণ্যকের ভাষ্যে ইন্দ্রিয়-বর্গকে শঙ্কর, "গিরি" বলিয়াছেন। যাহা ব্রহ্ম-স্বরূপকে গিরণ করে—গিলিয়া ফেলে—ঢাকিয়া রাখে, তাহাই "গিরি"। অজ্ঞ সাধারণ লোক—এ জগতে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সত্তা দেখিতে

---

* "অবিদ্বদ্-দৃষ্টৈব অবিদ্যাবরণং সিধ্যতি, নতু তত্ত্বদৃষ্ট্যা ইতি ব্যাচষ্টে"—আনন্দগিরি, গৌড়পাদ-কারিকা, ৪'৯৮

† "স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া...নাম-রূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভা-বিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোঽস্তি। অয়ং বস্ত্বন্তরাভি-নিবেশস্তু বিবেকিনাং নাস্তি"—বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ২।৪।১৩-১৪। অবিদ্যা... আত্মনোঽন্যৎ বস্ত্বন্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি"—বৃহ° ভা,° ৪।৩।২০-২১॥

পায় না। উহারা নাম-রূপ লইয়াই ব্যস্ত থাকে; উহারা জগতের পদার্থ-গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী জানেন যে, নাম-রূপের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন পদার্থেরই নিজের কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, অনুস্যূত রহিয়াছে*। শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—"স্তম্ব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত পদার্থে ব্রহ্মের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে,—ক্রমোন্নত ভাবে—হইয়াছে" †। "স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত পদার্থে, স্বয়ং আত্মা ক্রমোন্নত-ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যেই তাঁহার জ্ঞানাদির প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে"‡। সুতরাং নামরূপ-গুলিকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বিকারী পদার্থরূপে গ্রহণ না করিয়া তত্ত্বদর্শীগণ, ইহাদিগকে

---

* কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষুকালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি; একঞ্চ পুনঃ 'সত্ত্বম্'।"—বেদান্ত-ভাষ্য, ২।১।১৬।

† ......"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসুখরূপশক্তীনাং তারতম্য-রূপাবিশেষা ভবন্তি। তৈরেকরূপস্ত আত্মনঃ উত্তরোত্তরং মনুষ্যাদি-হিরণ্যগর্ভান্তেষু আবির্ভাব-তারতম্যং"। "মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি" ইত্যাদি (বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৩।৩০)॥

‡ "জগতঃ স্রষ্টা অব্যাকৃতে নামরূপে ব্যাকুর্ব্বন্, পঞ্চভূতানি··· ভৌতিকঞ্চ স্থাবরজঙ্গমং···প্রবিশ্য আবিরভবৎ আত্মপ্রকাশনায়। তত্র স্থাবরাদারভ্য 'উপর্য্যুপরি' আবিস্তরণমাত্মনঃ"—ঐত০ আরণ্যক ভাষ্য, ২।৩

ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন এবং ইহাদিগের মধ্যে এক ব্রহ্ম-সত্তাকেই অনুস্যূত দেখিতে পান। প্রাণশক্তি— ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উহার কোন সত্তাও নাই, ক্রিয়াও নাই *। প্রাণ-শক্তি—ব্রহ্মেরই স্বরূপ বুঝাইবে বলিয়া, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবে বলিয়া, বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া, বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিয়া, প্রাণ-শক্তি—জগৎটাকে ব্রহ্মেরই স্বরূপের কতকটা পরিচায়করূপে বুঝাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

কেন ইহাকে 'মায়া-শক্তি' বলা যায়?

যিনি জগৎকে এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। যদি এই ভাবে গ্রহণ না করিয়া আমরা জগৎকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করি,—জগতের পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বাধীনরূপে, শব্দ-স্পর্শরূপ-রসাত্মক পৃথক্ পৃথক্ পদার্থরূপে গ্রহণ করি এবং উহাদিগকে কেবল আপনারই স্বার্থ ও সুখের লালসায় ব্যবহার করিবার জন্য ধাবিত হই, তবে আমরা অজ্ঞানতার কার্য্য করিব। ইহাই অবিদ্যা,

* "অধিষ্ঠানাতিরেকেণ সত্তা-স্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ"—মাণ্ডুক্যকারিকায় আনন্দগিরি, ৩।৩০॥ "সকলবিকারানুস্যূত-সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপঃ বিকারোপমর্দ্দেন অনুসন্ধেয়ঃ"।—আনন্দগিরি ও রামতীর্থ। "অব্যক্তাবস্থায়াং মায়ায়াঃ আত্মতাদাত্ম্যোক্ত্যা 'স্বতন্ত্রত্ব'-নিরাসঃ"—জ্ঞান° যতি°।

ইহাই মায়া *। সংসারের লোক, এই ভাবেই বিষয়-দর্শন করিয়া থাকে এবং বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আরো একটা কথা এস্থলে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এই মনুষ্য-লোকে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ জগৎকে যে ভাবে দেখাইতেছে, তাহা অবশ্যই ব্রহ্ম-স্বরূপেরই পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মনুষ্য-লোকে, অন্তঃকরণ যে ভাবে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, মহিমা, জ্ঞানাদি দেখাইতেছে, উহাই কি যথেষ্ঠ? তবে কি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ঐ পর্য্যন্ত? যদি তাহাই হয়, তবে ত অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে পরিমিত করা হইল!! এই জন্যই আবার, এই অন্তঃকরণাদি যাহা দেখাইতেছে, তাহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক ও ঐশ্বর্য্য-

---

* অজ্ঞানী জীব, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র-রূপে বাহ্য পদার্থের ও সুখ দুঃখাদির অস্তিত্ব ধরিয়া লয়। কিন্তু পরমার্থ-দর্শীর চক্ষে, কোন বস্তুরই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হয় না। এ জগৎ কার্য্য; ব্রহ্মই জগতের কারণ। কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গে অনুস্যূত থাকে। সুতরাং কারণ-সত্তা হইতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী এইরূপে জগতের প্রত্যেক পদার্থে এক ব্রহ্ম-সত্তাকেই অনুভব করেন। "নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি" – শঙ্কর, তৈত্তিরীয়, ২।১॥ "নহি ঘটো যথাভূত মৃদ্রূপদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, পটো বা তন্তুব্যতিরেকেণ, তন্তবশ্চ অংশুব্যতিরেকেণ—ইত্যেবমুত্তরোত্তর-পরমার্থদর্শনাৎ" — শঙ্করাচার্য্য। "তত্ত্ব-দর্শিনাং স্ফুরণাতিরিক্তবস্ত্বনুপলম্ভপ্রদর্শনেন বৈচিত্র্যাদর্শনং দুঃখোপলব্ধিশ্চ প্রত্যুক্তা"—আনন্দগিরি। পরমার্থ-দর্শীর চক্ষে – "অধিষ্ঠানচৈতন্যাতিরেকেণ গ্রাহ্যগ্রাহকভেদেন মনঃস্পন্দিতস্য অসত্ত্বম্"।

বোধক বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ইহাই যে যথেষ্ঠ নহে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। মনুষ্য-লোক অপেক্ষা উন্নত-তর লোকে প্রাণ্-শক্তি হয় ত অন্য প্রকার উন্নত-তর ভাবে পরিণত হইয়া, তদ্‌যোগে আত্মাতে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাদির আরো উন্নত-তর ভাবে পরিচয় দিতেছে। সুতরাং এই অন্তঃকরণাদিও 'মায়া' মাত্র---একথাও শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন। অতএব, প্রাণ-শক্তি যে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া বিবিধ 'কার্য্যের' আকারে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কার্য্য-গুলির ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া যিনি বোধ করেন, তিনিও অজ্ঞানী *। আবার, যিনি এই কার্য্যগুলি দ্বারাই ব্রহ্ম-স্বরূপের নিঃশেষরূপে —পূর্ণরূপে—পরিচয় পান, অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে এই কার্য্যগুলি দ্বারা যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য মহিমাদির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, উহাই যথেষ্ঠ, উহাই তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা,—এরূপ ব্যক্তিও অজ্ঞানী †। সুতরাং এই দুই ভাবেই কার্য্যগুলিকে 'অসৎ', 'মিথ্যা' বলা যায়। অতএব, প্রাণ-শক্তি ও তাহার অভিব্যক্তি (কার্য্যবর্গ)—ব্রহ্মেরই অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের কিয়দংশের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ব্রহ্ম-সত্তা

---

* "ন কার্য্যং কারণাৎ পৃথগস্তি, অতঃ অসত্যম্"—বেদান্ত-ভাষ্যটীকা।

† "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমম্—গীতা, "এতানি প্রাণাদীনি……ন কৃৎস্নাত্ম-বস্তুবদ্যোতকানি" ইত্যাদি দেখ,—বৃহং ভা০ ১।৪।৭

হইতে প্রাণ-শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তাই উহাতে অনুস্যূত। এই ভাবে মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রাণ-শক্তিকে ব্রহ্মেরই শক্তিরূপে, ব্রহ্মেরই নিতান্ত অনুগত, আশ্রিত শক্তি-রূপে* গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু সাংখ্য-দর্শনে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতিশক্তি—স্বাধীনা, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা। মহাজ্ঞানী কপিল কি তবে বাস্তবিকই প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র শক্তি-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন? আমাদের কিন্তু সেরূপ ধারণা নাই। সাংখ্যকারের প্রকৃতি, পুরুষ হইতে নামে মাত্র স্বাধীন বা স্বতন্ত্র—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শক্তি স্বাধীন, কি চৈতন্যের অধীন? সাংখ্য-মতের বিবরণ ও আলোচনা।

---

* ...জগৎ প্রাগবস্থায়াং ..."বীজশক্ত্যবস্থং" অব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি। ...পরমেশ্বরাধীনাতু ইয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতো অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা" —বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৩॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষাবস্থা ধারণ করে। ইহা অভিব্যক্তির উন্মুখ-অবস্থা। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ইহা সবিশেষ। কেন না, যাহা পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ভাবে ছিল, তাহারই সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ আকার স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। "নহি বিশেষদর্শন-মাত্রেণ বস্ত্বন্তত্বং ভবতি"। তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, একটা বস্তু কোন বিশেষ আকার ধারণ করিলেই উহা 'স্বতন্ত্র' কোন একটা পদার্থ হইয়া উঠে না। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দেখ।

এখন সাংখ্যের প্রকৃতি বাস্তবিকই 'স্বাধীন' কিনা, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাংখ্যে ও বেদান্তে প্রকৃতই বিরোধ আছে কিনা, এই আলোচনা হইতে তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

সাংখ্যে ও বেদান্তে কি প্রকৃতই বিরোধ আছে?

নির্গুণ পূর্ণ ব্রহ্ম-পদার্থ, যখন সৃষ্টি-ক্রিয়ায় নিযুক্ত, বেদান্ত তখন সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে "কারণ-ব্রহ্ম" বা "ঈশ্বর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জগতের একটী বীজ বা মূল-উপাদান আছে। এই বীজের নাম 'প্রাণ-শক্তি'। এই বীজ-যুক্ত ব্রহ্মই জগতের কারণ। ইহাকে 'কারণ ব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর' বলা যায় *। শঙ্কর-দর্শনে. নির্গুণ ব্রহ্মই—'অব্যক্ত' শক্তি বা 'প্রাণ'-শক্তি দ্বারাই 'কারণ-ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বেদান্তের 'মায়া' বা 'প্রাণ-' শক্তি এবং সাংখ্যের 'প্রকৃতি' একই বস্তু।

* "প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ 'শক্ত্য'বশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তি-মূলমেবচ প্রভবতি"—বেদান্তভাষ্য, ১।৩।৩০। "ইদমেব ব্যাকৃতং নাম-রূপ-বিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং·····'বীজশক্ত্যবস্থং'·····সৈব 'দৈবী-শক্তিঃ'·····নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা," ১।৪।৯॥ এই বীজশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা হয়।" সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্ব-ব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ 'কারণত্ব'-ব্যপদেশঃ"—"বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ, সচ্ছব্দবাচ্যতাচ" গৌড়পাদ-কারিকার শঙ্করভাষ্য, ১।২॥ নির্বীজ ব্রহ্ম, কাহারও 'কারণ' হইতে পারে না। তিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত। "ন সৎতৎ নাসদুচ্যতে"॥

এই শক্তি হইতে ব্রহ্ম অবশ্যই স্বতন্ত্র। সুতরাং বেদান্তের "কারণ-ব্রহ্ম"—নির্গুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। যখন শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম উল্লিখিত হন, কেবল তখনই ব্রহ্মকে 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা যায়। বেদান্তের কারণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—বস্তুতঃ শক্তি-দ্বারাই 'কারণ-ব্রহ্ম' *।

শঙ্করাচার্য্যও—ত্রিগুণাত্মক অচেতন 'মায়া' স্বীকার করেন। সাংখ্যও—ত্রিগুণাত্মক জড় 'প্রকৃতি' স্বীকার করেন। তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ কোথায়? শঙ্কর বলেন—এই শক্তি কখনই 'স্বাধীন' ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে শক্তি, কখনই স্বাধীন ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু পাঠক জানেন যে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বাধীনা। এই অংশ লইয়াই শঙ্করাচার্য্য, সাংখ্যের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছেন। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—"প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলা যায় না। আমরা 'অব্যক্ত-শক্তিকে' ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না। এই অব্যক্ত-শক্তির ন্যায়, যদি 'প্রকৃতিকে' ব্রহ্ম হইতে তোমরা 'স্বতন্ত্র' বলিয়া মনে না কর, তবে তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই" †।

---

* এইটী লক্ষ্য করিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যভাষ্যে বলিয়াছেন যে—"অস্মাকং তু কারণ-ব্রহ্ম পরিপূর্ণচেতন-সামান্য-বাচি, নতু ব্রহ্ম-মীমাংসায়ামিব ঐশ্বর্য্যোপলক্ষিত-পুরুষবিশেষবাচীতি"। [মায়া-শক্তি যে ব্রহ্মের 'ঐশ্বর্য্য' তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।]

† "নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ 'স্বতন্ত্রং' তত্ত্বমভ্যুপগম্য তস্মাচ্ছেদব্যপদেশ

শঙ্করের টীকাকারও অন্যস্থলে এই তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরাও, অচেতন ত্রিগুণাত্মক, মায়া-শক্তি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের মতে এই মায়া-শক্তি স্বাধীন নহে; ইহা চেতন-দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে" *। পাঠক তবেই দেখুন্ যে, প্রকৃতির এই 'স্বাধীনতা' লইয়াই সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের বিবাদ। আমরা কিন্তু দেখাইতে চেষ্টা করিব যে প্রকৃত-পক্ষে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বাধীন নহে। প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথা মাত্র।

সাংখ্যের 'প্রকৃতি' কি প্রকৃতই স্বাধীন?

প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র 'পুরুষ' আছেন, তৎসম্বন্ধে যুক্তি দিতে গিয়া, সাংখ্যকার এই কারিকাটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

"সংঘাত-পরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ, অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"

সাংখ্যের এই বিখ্যাত কারিকা হইতে আমরা, 'পুরুষের' অস্তিত্ব পক্ষে প্রধানতঃ চারিটী যুক্তি পাইতেছি। (১) যাহা

উচ্যতে। কিং তর্হি? যদি প্রধানমপি কল্পমানং শ্রুত্যবিরোধেন 'অব্যাকৃতাদি'-শব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যেত, কল্প্যতাম্"—বেং ভাং, ১।২।২২।

* "কিমনুমানৈঃ অচেতনপ্রকৃতিকত্বং জগতঃ সাধ্যতে, স্বতন্ত্রাচেতন প্রকৃতিকত্বং বা? আদ্যে সিদ্ধসাধনতা, অস্মাভিরপি ত্রিগুণমায়াঙ্গীকারাৎ। দ্বিতীয়ে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিমাহ—অনাদিজড়প্রকৃতিঃ চেতনাধিষ্ঠিতা পরিণামিত্বাৎ মৃদাদিবদিত্যাহ"—রত্নপ্রভা, ২।১।১।

সংহত পদার্থ *—একই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যাহার অবয়ব-গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে—বুঝিতে হইবে যে উহা নিজেরই কোন প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হয় নাই; উহা নিজ হইতে স্বতন্ত্র কাহারও প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং দেহাদি সংহত-পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন। (২) ভোগ্য বা জ্ঞেয় থাকিলেই, তাহার ভোক্তা বা জ্ঞাতা আবশ্যক। (৩) অচেতন জড়ের স্বাধীন প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়ের ক্রিয়া অসম্ভব। (৪) এমন একটী অবস্থা আসিবে যখন এই জড়ের বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিবে। সে অবস্থায় পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবেন।

সাংখ্য-মতের প্রবল প্রতিপক্ষ অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্যও—এই প্রকারের যুক্তি গুলিকেই নির্গুণ, অদ্বয় ব্রহ্ম-বাদের পোষক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক, তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য দেখিবেন—

চেতনের "অধিষ্ঠান' ব্যতীত, কখনই জড়-পদার্থ ক্রিয়া করিতে পারে না। জড়-পদার্থ, চেতনের দ্বারা চালিত না হইলে, ক্রিয়াশীল হইতে পারেনা। কতকগুলি অবয়ব কোন একটী প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে

* সংহত পদার্থ—Aggregate, যেমন দেহাদি পদার্থ। "একার্থ-বৃত্তিত্বেন সংহননং, ন অন্তরেণ চেতনমসংহতং, সংভবতি"।—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৭।২।

যে, উহা চেতনের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই কার্য্য করিতেছে এবং উহা চেতনেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে। সাংখ্য-কারও, "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ" এবং "অধিষ্ঠানাৎ"—এই দুইটী যুক্তিদ্বারা তাহাই বলিতেছেন। জড়-প্রকৃতির কার্য্য-প্রবৃত্তি —ক্রিয়াশীলতা—চেতন হইতেই লব্ধ,—আমরা এই কথাই পাইতেছি*। চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই জড়-প্রকৃতি প্রথমে কার্য্যাভিমুখিনী হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও জড় বস্তুর অধিষ্ঠাতারূপে চেতন সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই, আমরা জড় বস্তুকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতেছি। ইহাই সাংখ্যের যুক্তি। একথার সহিত বেদান্তের বিরোধ কোথায়? যদি এইরূপই হইল, পাঠক তাহা হইলে দেখুন, প্রকৃতির স্বাধীনপ্রবৃত্তি রহিল কৈ? চেতনের সত্তা বা অধিষ্ঠান ব্যতীত ত প্রকৃতি, কার্য্য করিতেই সমর্থ হয় না।

১। পুরুষের সংযোগ ও অধিষ্ঠান ব্যতীত,—প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইতে পারে না।

প্রিয় পাঠক সাংখ্যের আর একটি কারিকা দেখুন্ঃ—

পুরুষস্য দর্শনার্থং, তথা প্রবৃত্তেঃ প্রধানস্য
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি যোগঃ,—তৎকৃতঃ সর্গঃ" ॥

এই বিখ্যাত কারিকায়, কি প্রকারে প্রকৃতি সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টির উন্মুখ হইয়াছিল, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

* এইজন্যই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—"সামান্যাত্ম-ঘনাকাশ-সান্নিধ্যোরিতশক্তিভিঃ। জায়তে লীয়তে ভূত্বা ভূয়োয়ং জগদম্বুদঃ" (সাংখ্য-সার)।

এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, পুরুষের যোগ-ব্যতীত, প্রকৃতির সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইয়া তবে প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সাংখ্যকার কেন একথা বলিলেন? আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, সাংখ্যকার পুরুষকে প্রকৃতির 'অধিষ্ঠাতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখিতেছি তিনি, সৃষ্টির সহিত পুরুষের সংযোগের কথা বলিয়াছেন! এই উভয় কথারই উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, বেদান্তের ন্যায় সাংখ্যও—প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনের যোগ বা 'অধিষ্ঠান' আবশ্যক—ইহাই স্বীকার করিয়াছেন!

তবেই আমরা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই পাইতেছি যে—চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই জড়প্রকৃতি সৃষ্টি-সময়ে প্রথমে কার্য্যাভিমুখিনী হইয়াছিল। এখনও জড়বর্গের অধিষ্ঠাতারূপে চেতন সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বলিয়া, আমরা জড়বর্গকে ক্রিয়াশীল দেখিতেছি। পাঠক তবেই দেখুন, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রতি যদি পুরুষের সংযোগ ও অধিষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির স্বাধীনতা রহিল কৈ?

সাংখ্যের 'পুরুষ' কি প্রকৃতই উদাসীন?

পাঠক আরো একটী কথা লক্ষ্য করুন্। সাংখ্যকার "ঈশ্বর" স্বীকার করেন না *। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, অনন্ত-দেশ-কাল-ব্যাপ্ত চেতন যখন সৃষ্টি-প্রবৃত্তিতে নিযুক্ত,

* "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—সাংখ্য-দর্শন, ১।৯২ সূত্র দেখ।

বেদান্ত তাহাকেই 'কারণ-ব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন। কিন্তু পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন্—সাংখ্যমতেও, প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা কার্য্যোন্মুখতার সঙ্গে অধিষ্ঠাতা পুরুষ-চৈতন্যকেও, এ হিসাবে "ঈশ্বর"-সংজ্ঞায় অভিহিত করায় আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না। পাঠক আরো দেখুন্। বেদান্ত-মতে কারণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, কেবল যে প্রবৃত্ত্যুন্মুখ তাহা নহে; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ববিৎ ও সর্ব্ব-শক্তিমান্ *। সাংখ্যের পুরুষ-চৈতন্যও যে প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, তাহা প্রমাণ করাও কঠিন নহে। উপরি-উদ্ধৃত দুইটী কারিকার—"অধিষ্ঠানাৎ", ও "ভোক্তৃভাবাৎ" এবং "পুরুষস্য দর্শনার্থম্"—এই কয়েকটী কথা দ্বারাই তাহা প্রমাণ করা যায়। দ্রষ্টা ব্যতিবেকে দৃশ্য এবং জ্ঞাতা-ব্যতিরেকে জ্ঞেয় কখনই থাকিতে পারে না;—ইহাই কি "ভোক্তৃভাবাৎ" এবং

সাংখ্যের পুরুষ—প্রকারান্তরে 'সর্ব্বজ্ঞ' 'সর্ব্ববিৎ' ও 'সর্ব্বশক্তিমান্'।

* "অস্তি তাবৎ নিত্যবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং ব্রহ্ম" —বেদান্ত-ভাষ্য, ১।১।১॥ "জায়মান-প্রকৃতিত্বেনৈব 'সর্ব্বজ্ঞং' নির্দ্দিশতি"—বেদান্ত ভাষ্য, ১।২।২১। "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ"—শ্রুতি। মায়া-শক্তির উপলক্ষেই নির্গুণ ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলা যায়। "অস্য শক্তির্মায়া, স্বকার্য্যাপেক্ষয়া দ্বারা" ইত্যাদি রত্নপ্রভা, ১।১।৫। উপনিষদের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, পৃঃ ৬৫—৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"দর্শনার্থং"* কথা দুইটীর তাৎপর্য্য নহে? এরূপ জ্ঞাতা ও ভোক্তা যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, সাংখ্যকার তাহাও "অধিষ্ঠানাৎ" কথাটী দ্বারা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন। আমরা সাংখ্য-দর্শনের "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" (৩।১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারাই তাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিতে পারি। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ের মতেই, জাতি (Species) হইতে ব্যক্তি (Individual) একান্ত ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে। ব্যক্তি—জাতিরই অন্তর্ভুক্ত †। জাতিই পরিণত হইয়া বহুবিধ ব্যক্তির আকারে অভিব্যক্ত হয়। ব্যক্তি যখন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত, তখন জাতির জ্ঞানে অবশ্যই ব্যক্তির জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব যে পুরুষ-চৈতন্য—জাতির (অবিশেষের) অধিষ্ঠাতা, তাহা ব্যক্তিরও (বিশেষের) অধিষ্ঠাতা। প্রকৃতি যখন পুরুষের 'জ্ঞেয়', তবে তাহা সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় প্রকারেই জ্ঞেয়। ব্যষ্টি যখন সমষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত,—বিশেষ যখন অবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত,—তখন ইহাও নিশ্চয় কথা যে—যে পুরুষ-চৈতন্য সমষ্টি-রূপা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রকৃতির জ্ঞাতা, সে চৈতন্য কাজেই সমষ্টি-ভাবে 'সর্ব্ববিৎ' এবং ব্যষ্টি-ভাবে 'সর্ব্বজ্ঞ'। সুতরাং সাংখ্যকার, নিজের কথা দ্বারাই

---

* দর্শন শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের বোধের জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। ইহাই সাংখ্য-কারিকার অর্থ।

† "বিশেষাণাঞ্চ সামান্যে অন্তর্ভাবঃ"—শঙ্কর (বৃহং ভাং, ১।৬।৩)।

প্রকারান্তরে পুরুষ-চৈতন্যকে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও সর্ব্ববিৎ বলিতেছেন। শঙ্কর-ভাষ্যেও একথা দেখিতে পাওয়া যায় —

"অবিশেষ ভাবেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্ববিৎ,
বিশেষ ভাবেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞম্"।

প্রকৃতির ক্রিয়ার মূলে যখন পুরুষের সংযোগ ও অধিষ্ঠান না হইলে চলে না—যখন জড়-প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রবৃত্তি চেতন হইতেই লব্ধ *—তখন, বেদান্তের 'কারণ-ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর এবং সাংখ্যের 'পুরুষ' একই দাঁড়াইতেছেন। আবার, সাংখ্যের পুরুষ যে 'সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট' তাহাও প্রমাণ করা কঠিন নহে। পাঠক জানেন যে, সাংখ্য—কার্য্য-কারণের অভেদবাদী †। কার্য্য-বর্গ উহার কারণের মধ্যেই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে; উৎপত্তির সময়ে সেই কারণ হইতেই অভিব্যক্ত হয়। কার্য্য-গুলি প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়াই, প্রকৃতির নাম—"অব্যক্ত"। জড়ীয় কার্য্য-মাত্রই, তাহাদের একমাত্র মূল-

---

* এই জন্যই বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সারে বলিয়াছেন যে—"সামান্যাত্ম-ঘনাকাশ-সান্নিধ্যেরিত শক্তিভিঃ। জায়তে লীয়তে ভূয়া ভূয়োঽয়ং জগদম্বুদঃ"। "ত্রিগুণাত্মকমায়াং স্বাং সান্নিধ্যাৎ পরিণাময়ন্। মায়ীতি কথ্যতে চাত্মা তৎকৃতানুতবেশধৃক" ইত্যাদি।

† "উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যস্য কারণাভেদঃ শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। সতশ্চ কার্য্যস্য কারণ-ব্যাপারাৎ অভিব্যক্তিমাত্রম্"—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

কারণ প্রকৃতিতে শক্তিরূপে লুক্কায়িত ছিল *। প্রকৃতিকে কার্য্য-জননী শক্তি না বলিলে, তাহা হইতে কার্য্য-বর্গ অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। পাঠক দেখিয়াছেন, সাংখ্যকারিকায় পুরুষকে, প্রকৃতির 'অধিষ্ঠাতা' বলা হইয়াছে। সুতরাং এই পুরুষ—প্রকৃতি হইতে যে কার্য্য-স্রোত বাহির হইবে তাহারও তবে অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা হইতেছেন। তবেই পাঠক দেখুন, সাংখ্যের পুরুষ "সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত" হইতেছে কি না? সাংখ্যকার তাঁহার প্রকৃতি নামক দ্রব্যটীকে যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দারাও এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই প্রকৃতি বা অব্যক্ত-অবস্থাটী যে জ্ঞানেরই প্রবৃত্ত্যুন্মুখ অবস্থামাত্র, তাহা সাংখ্যকার সুস্পষ্ট না বলিলেও, তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। সাংখ্যের প্রকৃতির বর্ণনা কিরূপ? মহত্তত্ত্বাদি যাবতীয় পদার্থই, কার্য্য-রূপে, পরিচ্ছিন্ন ও সাবয়ব। কিন্তু প্রকৃতি—অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব। মহত্তত্ত্বাদি দ্রব্য—সুখ-দুঃখাদি বিকার-জনক, কিন্তু প্রকৃতি সেরূপ নহে। প্রকৃতি—সুখ-দুঃখাদি বিকারের উপাদান বটে; কিন্তু উহা নিজে সুখ-দুঃখাদি বিকার জন্মাইতে পারে না। কার্য্যাকারে (বুদ্ধি

* "শক্তিশ্চ কার্য্যস্য অনাগতাবস্থৈব। কার্য্য-শক্তিমত্ত্বমেব উপাদান-কারণত্বম্"—সাংখ্যসূত্র, বিজ্ঞান ভিক্ষু, ১।১১৭ সূত্র। বেদান্তভাষ্যে রত্ন-প্রভাও এই কথাই বলিয়াছেন—"কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তি-নিয়ামকতয়া—শক্তিঃ"—২।১।১৮।

প্রভৃতিরূপে) পরিণত না হইলে, উহা স্বয়ং বিকার জন্মাইতে পারে না। উহা বিশেষ বিশেষ বিকারী জ্ঞানের ভিত্তি-স্থানীয়মাত্র।

২। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-প্রবৃত্তি পুরুষ-সাপেক্ষ।

আরো একটী কথা অনুধাবন-যোগ্য। বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন দুগ্ধ, গো-স্তন হইতে আপনা আপনি ক্ষরিত হয় ;—অচেতন প্রকৃতিও তদ্রূপ আপনা আপনি স্বাধীন-ভাবেই ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় *, আমরা একথাও সাংখ্যে দেখিতে পাই। আবার জড়-প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রবৃত্তি চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই হইয়া থাকে, আমরা একথাও সাংখ্যে দেখিতে পাই। সাংখ্যে এই দুই প্রকার কথাই আছে। এই বিরোধি উক্তির মীমাংসা কি ? এই দুই প্রকার উক্তির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয় যে, বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবার একটা অন্তর্নিহিত শক্তি (Potentiality) জড়ের আছে ; কিন্তু জড়-প্রকৃতির প্রবৃত্ত্যু-ন্মুখতা—চৈতন্যের সংযোগ বা প্রেরণা ব্যতীত উৎপন্ন হয় না।

---

* "বৎস-বিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" (কারিকা, ৫৭)। অচেতন বস্তুও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ দেখা যায়। যেমন বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয় (তৃণ-উদকাদি, গবাদিদ্বারা ভক্ষিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, ঐ দুগ্ধ-নিঃসৃত হইয়া বৎসের পুষ্টি সম্পন্ন করে), তদ্রূপ প্রকৃতিও অচেতন হইয়াও, স্বয়ং (স্বাধীন-ভাবে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দ্রষ্টা পুরুষ ও তাহার দৃশ্য প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগ বশতঃই, প্রকৃতি হইতে কার্য্যের প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয় এবং সৃষ্টিসম্পন্ন হয় *। সাংখ্য-মতে পুরুষনিষ্ক্রিয়, উদাসীন। সুতরাং (Logically) সাংখ্যকার কেমন করিয়া বলিবেন যে—সেই নিষ্ক্রিয়-উদাসীন চৈতন্যই জড়কে প্রবৃত্তি প্রদান করেন? সাংখ্য সে ভাবে "ঈশ্বর" স্বীকার করিতে পারেন না। তাই সাংখ্য, প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন যে—উভয়ের যোগ-ব্যতীত প্রবৃত্তি হয় না, উভয়ের সংযোগ হইলে তবে প্রকৃতি সৃষ্ট্যুন্মুখ হয়;—অর্থাৎ পুরুষের প্রেরণাবশতই প্রকৃতির প্রথম প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। কথাটা এই যে, এক নিষ্ক্রিয় পূর্ণ-সত্তার বক্ষঃ-স্থলেই, এই প্রবৃত্তি-পরম্পরা কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কার্য্যের অব্যক্ত-অবস্থার নামই "শক্তি"। এই অবক্তাবস্থাই 'প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতি—কার্য্য-বর্গের জননী শক্তিমাত্র এবং ইহা চেতনের অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত (১৭ কারিকা দেখ)। ইহার তাৎপর্য্য তবে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে,—নিষ্ক্রিয় চৈতন্য-সত্তার বক্ষঃস্থলে ক্রিয়ার বীজ বিধৃত রহিয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্য-মতে, চৈতন্য-সত্তার বক্ষঃধৃত অব্যক্ত-সত্ত্ব † হইতে সর্ব্ব প্রথমে

* "দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ"—পাতঞ্জলদর্শন, ২।১৭।

† "যস্মিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ "নিরসৎ অব্যক্ত" মলিঙ্গং 'প্রধানং'।—পাতঞ্জল, ব্যাস-ভাষ্য, ২।১৯। অর্থাৎ, প্রকৃতি নিঃসত্তা অর্থাৎ সত্তাহীন নহে। ইহা নিরসৎ, অর্থাৎ অসত্তাহীন, অর্থাৎ 'সদ্বস্তু'॥

'মহত্তত্ত্ব * উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্বের তিন অংশ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অংশের নাম—বুদ্ধি(জ্ঞান-শক্তি); রাজসিক অংশের নাম—অহঙ্কার (ক্রিয়া-শক্তি); তামসিক অংশ হইতে বিষয়-বর্গ উৎপন্ন হয় †। একথার তবে আমরা এই অর্থই পাইতেছি যে—প্রথমে জ্ঞানের স্বষ্ট্যুন্মুখ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাত্মক 'ক্রিয়া' প্রাদুর্ভূত হইল। তবেই 'জ্ঞানাত্মক' ও 'ক্রিয়াত্মক' এই উভয়বিধ প্রবৃত্তি হইতেই নিখিল কার্য্য দেখা দেয়, ইহাই সাংখ্যের হৃদ্‌গত তাৎপর্য্য। সাংখ্যের এইরূপ তাৎপর্য্যের সহিত, বেদান্তের

* শঙ্করাচার্য্যও এই 'মহত্তত্ত্ব' স্বীকার করিয়াছেন। "অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং 'মহানাত্মা'" (কঠভাষ্য, ৩।১১)। মহত্তত্ত্বকে প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে সমষ্টি-করণ বা করণাত্মক বলা হইয়াছে। করণ বা ইন্দ্রিয়-গুলি জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। সুতরাং সাধারণ-করণ-স্বরূপ 'মহত্তত্ত্বও'—জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। আনন্দগিরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"জ্ঞানশক্তিভিঃ ক্রিয়াশক্তিভিশ্চ অধিষ্ঠিতং জগৎ ব্যষ্টি-রূপং, তস্য সাধারণঃ সমষ্টিরূপঃ সূত্রাত্মা (মহত্তত্ত্ব)"—মুণ্ডক, ১।১।৮-৯। ইহাই অব্যক্ত-শক্তির প্রথম বিকার। এই মহত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্করের মত কি, তদ্বিষয়ে "উপনিষদের উপদেশ," দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, পৃঃ ১৫৬-পৃঃ ১৬২ দেখ। "সত্যেব 'অহঙ্কারে' মমকারো ভবতি, তয়োশ্চভাবে সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ"—গীতাভাষ্যে, আনন্দগিরি, ৭।৪॥ বেদান্তে মহত্তত্ত্ব—হিরণ্য-গর্ভ, সূত্র (স্পন্দন) নামে বিদিত।

† "মহতোঽপি তৎকারণস্য ত্রৈবিধ্যং মন্তব্যম্" ইত্যাদি।—সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্য, ২।১৮॥

বিন্দুমাত্র বিরোধ সম্ভবে না। সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতির স্বাধীনতা কেবল কথার কথামাত্র।

৩। প্রকৃতির অভিব্যক্তিদ্বারা পুরুষেরই বোধের বিকাশ হয়। সাংখ্যোক্ত পরিভাষাই তাহার প্রমাণ।

আরও কথা আছে। সাংখ্যকার এই জগৎ-সৃষ্টির যে বিবরণ ও প্রণালী দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব নামক পদার্থ অভিব্যক্ত হয় এবং উহাই পরে অহঙ্কার রূপে দেখা দেয়। অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন, রাজসিক অংশ হইতে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং তামসিক অংশ হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়-সমূহ উদ্ভূত হয়। এখন বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি ত জড়—অচেতন। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি ত জ্ঞানেরই অবস্থান্তর। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন; শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান; চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়—এগুলি কাহার? অচেতন জড় হইতে—বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি "জ্ঞান" ত কদাপি উৎপন্ন হইতে পারে না *। অথচ আমরা সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে

* প্রকৃতির যে 'জ্ঞান' নাই, প্রকৃতি যে জড়, তাহা সাংখ্যকার কারিকায়—প্রকৃতিকে "অন্ধ" বলিয়া নির্দ্দেশ করাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই কারিকার 'দর্শন' শব্দের অর্থ টীকাকার 'জ্ঞান' করিয়াছেন। জড়-প্রকৃতির সংসর্গে পুরুষেরই জ্ঞান হয়—ইহাই কারিকার অর্থ। বেদান্তেরও তাহাই মত। "ন কেবল-জড়বৃত্তির্জ্ঞানপদার্থঃ; কিন্তু সাক্ষিবোধ-বিশিষ্টাবৃত্তিঃ, বৃত্তি-ব্যক্তবোধো বা 'জ্ঞানম্।—বেদান্তভাষ্যে রত্নপ্রভা, ১।১।৫।

পাই যে, জড় প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি উৎপন্ন হয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক। সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চেতন আত্মার উপরে ভৌতিক বিকার ও ক্রিয়া দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। নতুবা জড় হইতে—বুদ্ধি, মন, প্রভৃতি বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, এ সকল কথার কোনই অর্থ থাকে না। এই তত্ত্বটী বিশেষরূপে মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সাংখ্য-শাস্ত্রের আলোচনার সময়ে এই কথাটী ভুলিয়া যাই বলিয়াই, প্রকৃতিকে স্বাধীন-সত্তাবতী বলিয়া মনে করি। পুরুষকে এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র তুলিয়া রাখিয়া, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে গ্রহণ করিলে, সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় না। প্রকৃতির প্রত্যেক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকেও অবস্থিত দেখিতে হইবে *। ভৌতিক বিকার সমূহই—আত্ম-জ্ঞানের অবস্থান্তর ঘটায় †। সেই জ্ঞান-গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র ভৌতিক পরিণাম বা বিকার-গুলির বিবরণ দিতে গেলেই, এইরূপ ভ্রম-প্রমাদে পড়িতে হয়। সাংখ্যকার ভৌতিক বিকার-গুলির

* এই জন্যই পুরুষকে প্রকৃতির 'অধিষ্ঠাতা' বলা হইয়াছে।

† বেদান্তমতও অবিকল তাহাই। "প্রত্যর্থং পরিণাম-ভেদেন ব্যঞ্জকত্বাৎ বুদ্ধেরেব ক্রমঃ উপযুক্তঃ, কৃৎস্নস্য অধ্যক্ষস্য সর্ব্ববিক্ষেপাস্পদতয়া সর্ব্বত্রানুগতপ্রকাশস্বরূপস্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মনঃ ন যুক্তঃ স ক্রমঃ"—উপদেশ সাহস্রী টীকা।

যেরূপ পরিভাষা ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দারাই তাঁহার মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আমরা সাংখ্য-শাস্ত্রের আলোচনা-কালে, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাই !! বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়— এগুলি সমস্তই এক অখণ্ড জ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর-জ্ঞাপক শব্দ। বুদ্ধি বলিতে, পুরুষ বা চেতনেরই বুদ্ধি বুঝায়, জড়ের বুদ্ধি বুঝায় না। অহঙ্কারাদি শব্দও তদ্রূপ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে—সাংখ্য-শাস্ত্রানুশীলন-সময়ে আমরা মনে করি যে, যেন একটা জড়ীয় উপাদানই বিকৃত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে ক্রমে ক্রমে পরিণত হইতেছে এবং কেবল সেই জড় অচেতন বিকার-গুলিকেই যেন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি বলিয়া থাকে ! সেই জড়ীয় বিকারগুলি দ্বারা যে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরই (চেতনের) অবস্থান্তর ঘটিতেছে এবং সাংখ্যকার যে সেই জ্ঞানেরই অবস্থান্তর-প্রাপ্তির বিবরণ দিতেছেন,—এই অত্যাবশ্যক কথাটী আমরা একে-বারেই ভুলিয়া যাই ! এবং মূলে এই ভুল করি বলিয়াই সাংখের প্রকৃতিকে স্বাধীন-সত্তাবতী বলিয়া মনে করি ! হা দুরাদৃষ্ট !!

৪। প্রকৃতির অভিব্যক্তি— পুরুষেরই প্রয়োজনে।

আমরা উপরে সংক্ষেপে যে সকল আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাই সাংখ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য—ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। এই ভাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃতি কদাপি স্বাধীনা হইতে পারে না এবং বেদান্তের 'ঈশ্বর' এবং সাংখ্যের 'পুরুষ', প্রকারান্তরে, একই বস্তু দাঁড়ায়। বেদান্তের ন্যায়, সাংখ্যও প্রকারান্তরে

প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ বা 'ঈশ্বর' স্বীকার করিতেছেন। লৌকিক ঈশ্বর স্বীকার করিতে না পারায় সাংখ্যের কোন দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ বেদান্তের ঈশ্বরে ও সাংখ্যের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষে—কোনই প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টি-তত্ত্বে, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন-ভাবে, প্রকৃতির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ প্রকৃতি যে পুরুষের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া, একা স্বতন্ত্র ভাবে বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন, সাংখ্য হইতে আমরা এরূপ কথা পাই না। উপরে প্রথমেই যে সাংখ্য-কারিকাটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে—"সংঘাত-পরার্থত্বাৎ"—বলিয়া একটী যুক্তি আছে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। এখন আমরা এই যুক্তিটীর আর একটী দিক্ আলোচনা করিয়া আমাদের মীমাংসার দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। যাহা সংহত-পদার্থ, তাহা অপরের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতি এবং তাহার বিকারবর্গ —সংহত পদার্থ (Aggregate)। সুতরাং ইহারা, ইহাদের অপেক্ষা 'স্বতন্ত্র' কাহারও (পুরুষ-চৈতন্যের) প্রয়োজন সাধন করে। এই কথার সহিতও বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। অদ্বৈত-বাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যও, এইরূপ যুক্তিরই অবতারণা নানাস্থানে করিয়াছেন।' বৃহদারণ্যকের "মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে" আমরা এইরূপ কথা দেখিতে পাই—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি .....
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি" – ইত্যাদি।

এইস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে—জড়-বস্তুমাত্রেই জড়াতিরিক্ত চৈতন্যের প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত অবস্থিত। আমরা এতদ্দ্বারা ইহাই পাইতেছি যে, জড়-বর্গের ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি, উহার নিজের প্রয়োজনের জন্য হইতে পারে না, পুরুষ-চৈতন্যের প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থই জড়-বর্গের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতো, যৎ-প্রয়োজন-প্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদি-কলাপো গৃহাদিবদিতি সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা" (কেনোপনিষদ্ভাষ্য)।

অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ সকলই সংহত পদার্থ; ইহারা অসংহত চেতনেরই প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে সংহত হইয়াছে। অতএব ইহাদের ক্রিয়া দ্বারা চেতনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আবার, গীতা-ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—

"পাণি-পাদাদয়ঃ জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাব-নিমিত্ত-স্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়-সদ্ভাবে লিঙ্গানি" (গীতা, ১৩।১৩)।

আনন্দগিরি এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ শক্তিসন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তন-সামর্থ্যাৎ,
তৎসত্বং নিমিত্তীকৃত্য স্বকার্য্যবন্তো ভবন্তি পাণ্যাদয়ঃ"।

অর্থাৎ, জড়-ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া-প্রবৃত্তি, নিজেরই স্বার্থের জন্য হইতে পারে না। ইহারা আত্মারই প্রয়োজন সাধনার্থ প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও ক্রিয়াশীল। চৈতন্য-শক্তি আছেন বলিয়াই ইহারা ক্রিয়াশীল হইতেছে। সাংখ্যকারও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

"পুরুষার্থং করণোদ্ভবঃ" (সাংখ্যদর্শন, ২।৩৬)। সাংখ্য-মতে এই পুরুষার্থ কাহাকে বলে ? এই 'পুরুষার্থ' কথাটী দ্বারা আমরা সাংখ্যের আর একটী চমৎকার তাৎপর্য্য দেখিতে পাইব। সাংখ্যের পুরুষ ত উদাসীন, নিষ্ক্রিয় এবং সাংখ্য ঈশ্বরও স্বীকার করেন না। অথচ বলিতেছেন যে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া "পুরুষার্থের" জন্যই হইয়া থাকে। ভোগ এবং অপবর্গ (মুক্তি)ই —পুরুষার্থ। পুরুষ—প্রকৃতিকে ভোগ করিবে এবং ভোগানন্তর প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে—এই দুইটী উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই জড়-প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়। প্রিয় পাঠক, কথাটী ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখুন্। পুরুষ আপনার ভোগ ও মুক্তির জন্য, প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি-ক্রিয়ায় নিযুক্ত,—সাংখ্যের ইহাই কি অভিপ্রায় নহে ? যদি তাহাই হইল, তবে আর প্রকৃতির স্বাধীনতা কোথায় রহিল ? এই কথা ভাবিয়াই ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু, সাংখ্য-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৫ ও ৫৬ সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে—

"সূত্রদ্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্যমপি প্রতিপাদয়তি।"

অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি স্বাধীন হইতে পারিতেছে না। প্রকৃতি—পরবশা ; প্রকৃতি—পরাধীনা।

পাঠক এই সকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, বেদান্ত প্রকৃতি-শক্তিকে (মায়াকে)—আত্মারই নিতান্ত অনুগত ও অধীন শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সত্তা হইতে কাহারই

প্রকৃতির স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম কিরূপ ?

স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতি বা বিকার-বর্গের কাহারই সত্তা নাই। শঙ্করাচার্য্য বারংবার বলিয়াছেন—"আমরা সাংখ্য-দিগের ন্যায় প্রকৃতির স্বাধীন-সত্তা স্বীকার করি না"*। তবে কি, বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের বিরোধ ঘটিল? আমরা উপরে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সাংখ্যের প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথা মাত্র। কিন্তু তথাপি সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বাধীন বলিয়া, শঙ্করা-চার্য্য যে সাংখ্যকে আক্রমণ করিলেন, তাহার তবে অর্থ কি? ইহারও তাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্যক। বেদান্ত-মতে, প্রকৃতি বা মায়ার স্বাধীন সত্তা নাই। কিন্তু তথাপি, বেদান্তও প্রকৃতিকে একভাবে স্বাধীন না বলিয়া পারেন নাই। পাঠক দেখিবেন শঙ্করের নিতান্ত অনুগত ভক্ত বিদ্যারণ্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "পঞ্চ-দশী" গ্রন্থে, প্রকৃতির স্বাধীনতা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই—

"অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতে র্বিনা চিতিম্।
স্বতন্ত্রাঽপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ" (৫।৩২)।

অসঙ্গ নিরবয়ব আত্মার অবস্থান্তর ঘটায় বলিয়া, প্রকৃতিকে স্বাধীনাও বলিতে হয়। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের প্রতীতি বা স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভব নহে, জ্ঞাতার জ্ঞানেই জ্ঞেয়-বস্তু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তথাপি জ্ঞেয়ের পার্থক্য তিরোহিত হয় না। উভয়ের

* বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৪।৩ দেখ।

মধ্যে ভিন্নতা থাকিবেই। এই ভিন্নতা না থাকিলে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়;—বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া পড়ে। চেতন ও জড় উভয়েই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে দৃঢ়-সম্বদ্ধ তাহা নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা সর্ব্বতোভাবে এক বা অভিন্ন হইতে পারে না *। এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাংখ্যকার, প্রকৃতির স্বাধীন-সত্তার কথা তুলিয়াছেন। চেতন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতেই যাবতীয় জ্ঞান হইয়া থাকে—একথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া চেতন ও জড়, এক হইতে পারে না। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, এইজন্যই, উহাদিগকে ‘অভিন্ন’ বলা হয় নাই, কিন্তু ‘অনন্য’ বলা হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যেও প্রকৃতির এইরূপ স্বাধীনতা ও অধীনতা দুই-ই বলা হইয়াছে; সেই স্থলটী বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য।

“তদেতৎ দৃশ্যং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য ⋯ অনুভব-কর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পর-তন্ত্রম্”।

এই ভাষ্যের “অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নং পুরুষস্য” এই বাক্যটী এবং “স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম্” এই বাক্যটি,

* “জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেব, জ্ঞাতা জ্ঞাতৈব ন জ্ঞেয়ং ভবতি”—শঙ্করভাষ্য, গীতা, ১৩।৩।

এই দুইটী বাক্য হইতেই আমাদের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। প্রকৃতি—পুরুষের 'অনুভবকর্ম্ম-স্থানীয়'। একথাটীর অর্থ এই যে, পুরুষ জ্ঞাতা, প্রকৃতি তাঁহার জ্ঞেয়; পুরুষ কর্ত্তা, প্রকৃতি তাঁহার কর্ম্ম-স্থানীয়। আত্মার যতপ্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে, সকল-গুলিই প্রকৃতি দ্বারা উৎপাদিত। সুতরাং প্রকৃতির যত কিছু পরিবর্ত্তন (বিকার) তৎসমস্তই আত্মার অনুভূতি-স্থানীয় হইল। পাঠক দেখুন, প্রকৃতির বিকার মাত্রই যদি পুরুষের অনুভূতি-স্থানীয় হইল, তাহা হইলে প্রকৃতি যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া যায়—এই কথাটী নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। আবার, পুরুষের অনুভূতি প্রভৃতি প্রয়োজন-সাধনার্থ যদি প্রকৃতির ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি হইল, তবে প্রকৃতির স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করার কথাটা নিতান্তই কথার কথামাত্র হইল না কি?

"পুরুষস্য দর্শনার্থং উভয়োরপি যোগঃ"—

এই কারিকাটীও সেই কথাই প্রমাণ করিতেছে। 'দর্শন' অর্থ 'জ্ঞান'। পুরুষ অপরিণামী অখণ্ড-জ্ঞান-স্বরূপ। এই অপরিণামী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান-গুলি উৎপন্ন হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই এই কারিকাটী রচিত হইয়াছে। পুরুষের জ্ঞানে, এজগৎ জ্ঞেয়াকারে অবস্থিত। খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান-গুলি * পুরুষে কি প্রকারে আসিল, ইহার কারণ

* শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, সুখজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ লৌকিক জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে (States of consciousness).।

অনুসন্ধানের জন্যই—'প্রকৃতি বলিয়া একটী সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন ইহা দ্বারা জ্ঞেয়-বস্তুটীর কোন স্বাধীনতা আসে না। অপর পক্ষে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এক বা অভিন্নও হইতে পারে না, ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং একভাবে প্রকৃতির স্বাধীনতাও সিদ্ধ হয়। এই জন্যই ব্যাস-ভাষ্যে—'স্বতন্ত্রমপি পরতন্ত্রম্" উক্ত হইয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পুরুষের যে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলি জন্মিতেছে, তাহাতে সেই অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষের অখণ্ড-বোধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে না। এইরূপ, প্রতি-মুহূর্ত্তে পুরুষে যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনাদি ক্রিয়া-গুলি হইতেছে, তাহাতেও পুরুষের মূল কর্ত্তৃত্ব-শক্তির হানি হইতেছে না। তিনি এক অখণ্ড-জ্ঞাতা; অথচ সেই জ্ঞাতার বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান আসিতেছে। তিনি এক অখণ্ড-কর্ত্তা; অথচ সেই অখণ্ড-কর্ত্তা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইতেছে ও আসিতেছে। উভয়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; অথচ উভয়ে এক বা অভিন্ন নহে। খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ও ক্রিয়া-গুলি—সেই এক অখণ্ড জ্ঞাতা ও অখণ্ড কর্ত্তার সংবাদ আনিয়া দেয়। আবার, এই নির্ব্বিকার নিত্য জ্ঞাতা ও নির্ব্বিকার নিত্য কর্ত্তার স্বরূপ বুঝিতে হইলে—এই সকল খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান ও ক্রিয়া না থাকিলে চলে না। প্রকৃতিই—আত্মাতে এই সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার উদ্রেক করে। ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব। ইহাই বেদান্তের নির্গুণ-সগুণতত্ত্ব। ব্রহ্ম-চৈতন্য এক হইয়াও বহু; বহু হইয়াও এক। যাহা বহু, তাহা একেরই অভিব্যক্তি এবং তাহা সেই একেরই স্বরূপ বুঝাইবার জন্য

পরিণতি পাইতেছে। সেই একেকে যেমন লোপ করিতে পার না, তদ্রূপ এই বহুরও একান্ত বিলোপ সম্ভব নহে *। সুতরাং এই এক ও বহু—পুরুষ ও বহুবিকার-ময়ী-প্রকৃতি—উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে, মহা-প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। উভয়ে একও নহে, একান্ত ভিন্নও নহে †। মহাজ্ঞানী কপিল, এই মহা-তত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জ্ঞানের-ভাণ্ডার বেদান্তও একথা স্বীকার না করিয়া পারেন না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতি স্বাধীনা হইলেও, উহা যে পুরুষকে ছাড়িয়া দিয়া, 'স্বতন্ত্র' ভাবে—'স্বাধীন'রূপে—ক্রিয়া করিয়া যাইবে,—সাংখ্যকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা নহে। দোষ সাংখ্যের নহে;

* "তত্র যদি তাবৎ বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চঃ—দেহাদিলক্ষণঃ আধ্যাত্মিকঃ, বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ—প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত, স পুরুষমাত্রেণ অশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রবিলয়োপদেশঃ অশক্যবিষয়ঃ স্যাৎ" —বেদান্ত-ভাষ্য, ৩।২।২১। পরমার্থদৃষ্টিতে—এক ও বহুর কোন ভেদ না থাকিলেও, ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে এই ভেদ অনিবার্য্য এবং এই ভেদ সত্য। —বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৩ প্রভৃতি দেখ।

† এই জন্য শঙ্করাচার্য্য—নামরূপকে, প্রকৃতিকে, মায়াকে "তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে...মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি" বলিয়াছেন (২।১।১৪) এবং (১।৪।৩)। অর্থাৎ ইহা (প্রকৃতি বা নাম-রূপ) ব্রহ্ম-সত্তা হইতে একান্ত ভিন্নও নহে, আবার অভিন্নও নহে। "নাম-রূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ, নাপি ঈশ্বরাদন্যত্বং, কল্পিতস্য পৃথক্-সত্ত্বাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ"—আনন্দগিরি ও রত্নপ্রভাটীকা।

দোষ আমাদের বুদ্ধির! আমরাই সাংখ্যের প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ। সাংখ্য—জড়-বিজ্ঞানবাদী। কিন্তু তাঁহার জড়-বিজ্ঞান, আধুনিক জড়-বিজ্ঞান নহে। বর্ত্তমানকালের জড়-বিজ্ঞান-বাদীরা যেমন জড়ে ও জ্ঞানে (Consciousness) কোনপ্রকার সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না * সাংখ্যকার সেই প্রাচীনকালেও সেরূপ ভ্রম করেন নাই। সাংখ্যকার জানিতেন যে—উভয়ের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য; এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ধন্য মহর্ষি কপিল!!

পুরুষ কি প্রকৃতির সম্বন্ধ-শূন্য?

এই উপলক্ষে সাংখ্যের আর একটী কথাও বুঝিয়া দেখিতে হইবে। পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, সাংখ্যকার যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সেগুলি অন্বয়ী-মুখের (Positive) যুক্তি। "অধিষ্ঠানাৎ", "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ", "ভোক্তৃভাবাৎ"

---

* "The passage from the physics of the brain to the corresponding facts of conscionsness is unthinkable. Granted that a definite thought and a definite molecular action occur in the brain simultaneously, we do not posses the intellectual organ which would enable us to pass by a process of reasoning from the one phenomenon to the other. They appear together, but we do not know why"..."The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable"—*Prof. Tindal.*

—প্রভৃতি যুক্তি-গুলি দ্বারা সাংখ্যে পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন *। সাংখ্যকার পুরুষের অস্তিত্ব ত অন্যভাবেও প্রমাণ করিতে পারিতেন। পুরুষ—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ইত্যাদি বলিয়াও ত ব্যতি-রেক-মুখে (Negatively) প্রমাণ করা যাইতে পারিত। তবে কেন সাংখ্যকার অন্বয়-মুখের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? যাহা সংহত-বস্তু, তাহা পুরুষেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ। প্রকৃতি সংহত-পদার্থ; অতএব উহা পুরুষের জন্যই অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ও ক্রিয়া-শীল। সংহত-বস্তু—অসংহত বস্তুরই অস্তিত্ব সূচিত করে। প্রকৃতি দৃশ্য; সুতরাং উহা দ্রষ্টা পুরুষের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতি বিকারময়ী; সুতরাং উহার ক্রিয়া বা বিকার গুলি—নির্বিকার অধিষ্ঠাতার সত্তা সূচিত করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যকার, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। আধুনিক জড়-বিজ্ঞানবাদীগণ যেমন নির্বিকার সত্তাকে (Noumenon)—'অজ্ঞেয়' ও সর্ব্ব-সম্বন্ধ-বর্জ্জিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সাংখ্যকার তাহা করেন নাই †। সাংখ্যের উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষ প্রকৃতির অতীত হইয়াও, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক-

* ৬১ পৃষ্ঠায় যে কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখ।

† শ্রুতিতে ও হিন্দু দর্শনে কোথাও 'অজ্ঞেয়বাদ' অবলম্বিত হয় নাই।

সূত্রে জড়িত। আমরা যে কেবলমাত্র পরিবর্ত্তন, বিকার বা ক্রিয়া-গুলিরই (Changes) জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি তাহা নহে। বিকারের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, বিকার-বর্গের অন্তরালবর্ত্তী নির্ব্বিকার সত্তারও জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হই। অন্তরে ও বাহিরে যেমন আমরা প্রাকৃতিক বিকার-বর্গকে প্রত্যক্ষ করিতেছি ও অনুভব করিতেছি; এই বিকারগুলি উহাদের অন্তরালবর্ত্তী নির্ব্বিকার অধিষ্ঠাতারও সংবাদ লইয়া আইসে। যাহা জ্ঞেয় (Object), তাহা কখনই জ্ঞাতা (Subject) হইতে পারে না *। নির্ব্বিকার অধিষ্ঠাতার সত্তা ব্যতীত, বিকারের অস্তিত্ব ও বুঝিতে পারা যায় না। অতএব নির্ব্বিকার সত্তার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই, বিকারবর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া থাকে। এই গভীর তথ্যটী বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সাংখ্যকার, অন্বয়মুখে, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। Noumenon এবং Phenomena উভয়েই যে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত এবং আমাদের জ্ঞানে যে ঐরূপ সম্পর্কিত হইয়াই উভয়ে দেখা দেয়,—এই মহাতত্ত্বটী বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সাংখ্যকার ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বেদান্তও এই উদ্দেশ্যেই আত্মাকে বিকার-

---

* এইজন্যই সাংখ্যকার সূত্র করিয়াছেন—"ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি" (সাংখ্যদর্শন, ৬।৩)। "বিজ্ঞান-গুলি "আমার"; বিজ্ঞানগুলিই 'আমি' নহি। "জ্ঞাতা জ্ঞাতৈব ন জ্ঞেয়ং ভবতি"—শঙ্করাচার্য্য (গীতাভাষ্য, ১৩,৩)।

বর্গের 'সাক্ষী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। বিকার-মাত্রেই যে নির্ব্বিকার সত্তার সূচনা করে, একথা শঙ্করাচার্য্য গীতার "নির্গুণং গুণভোক্তৃচ" (গীতা, ১৩।১৩-১৪)—ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়া দিয়াছেন। "ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি, উহাদের অন্তরালবর্ত্তী নির্ব্বিকার কর্ত্তার (শক্তির) অস্তিত্ব প্রমাণিত করে" †। "উপাধির্ভিদ্যতে, ন তদ্বান্"—সাংখ্যের এই সূত্রটীরও ইহাই তাৎপর্য্য। উপাধি-গুলির সঙ্গে সঙ্গে উপাধিবানের জ্ঞানও আসিয়া পড়ে। উভয়ে অত্যন্ত জড়িত, অথচ পৃথক্ : উহারা স্বতন্ত্র হইয়াও, একেবারে নিরপেক্ষ নহে। এই ভাবে দেখিতে গেলেও প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথামাত্র হইয়া পড়ে। প্রকৃতি—পুরুষেরই 'ভোগ ও অপবর্গের জন্য' এবং পুরুষেরই 'স্বরূপোপলব্ধির জন্য' (ব্যাসভাষ্য, ২।২৩)। তবেই দাঁড়াইতেছে যে—পুরুষেরই শক্তি, পুরুষেরই স্বরূপবিকাশের জন্য, জগৎ-সৃষ্টিতে নিযুক্ত। সাংখ্যকার মহাবৈজ্ঞানিক। তিনি আমাদের জ্ঞানের যাহা অনিবার্য্য স্বরূপ, তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানের সেই অনিবার্য্য স্বরূপ কি প্রকার? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার, কারণ ও কার্য্যের—একত্র সূচনা। একটী না হইলে, অন্যটীকে বুঝা যায় না; একটী

* এ সম্বন্ধে 'উপনিষদের উপদেশ', দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা ২৮পৃঃ হইতে ৩৫পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† "পাণি-পাদাদয়ো জ্ঞেয়-শক্তিসদ্ভাব-নিমিত্ত-স্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়-সদ্ভাবে লিঙ্গানি"।

থাকিলেই অন্যটী সূচিত হয়। পরস্পর সম্পর্ক-সূত্রে জড়িত, অথচ স্বতন্ত্র—এই যে বোধ, ইহাই আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি। পরমার্থ-দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নাই; কিন্তু আমাদের জ্ঞানে এই বিভেদ অনিবার্য্য। পাতঞ্জল-দর্শনে, এই প্রকার ভেদ ও অভেদ তত্ত্ব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"তস্মাদ্বস্তু-জ্ঞানয়োঃ গ্রাহ্য-গ্রহণ-ভেদভিন্নয়োঃ বিভক্তঃ পন্থাঃ" (ব্যাসভাষ্য, ৪।১৫)। *

শঙ্করাচার্য্যও এই ভেদ ও অভেদ তত্ত্ব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে" (বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪)। †

এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ, এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, সাংখ্যে ও বেদান্তে প্রকৃত-পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

আমরা এই সকল আলোচনা দ্বারা কি বুঝিলাম?

এই সকল আলোচনা দ্বারা কি বুঝা গেল?

ব্রহ্ম—তাঁহার জগৎ-রচনায় নিযুক্ত শক্তি হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই শক্তি—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিদ্ধান্ত। পাঠক, এতদূরে

---

* "গ্রাহ্য (জ্ঞেয়) ও গ্রহণ (জ্ঞান) রূপ স্বভাবে ভিন্ন—বস্তু ও জ্ঞানের স্বরূপ এক নহে; এ উভয়ের অভেদের আশঙ্কাও হইতে পারে না"।—পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চুকৃত অনুবাদ।

† নামরূপ—ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত ভিন্ন ও নহে; আবার অভিন্নও নহে।

তাহা আমরা দেখিলাম। শক্তি নানা আকারে ব্যক্ত হইয়া, ব্রহ্মেরই স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছে—তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। নতুবা শক্তির পরিণামের কোনই অর্থ থাকে না। এই প্রকৃতি-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি, ক্রম-বিকাশের প্রণালীতে, তাঁহারই অনন্ত জ্ঞান, মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের আভাস প্রদান করিতেছে। আরো উন্নত-তর অভিব্যক্তিতে, আরো উন্নত-তর লোকে, তাঁহারই স্বরূপ উন্নত-তররূপে প্রকটিত হইবে। যাঁহারা উন্নততর লোকে বাস করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের সেই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও মহিমার বিকাশ অনুভব করিয়া মহানন্দে বিমুগ্ধ হন। প্রাণ-শক্তি—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হওয়াতেই, মনুষ্য সেই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিশ্বে তাঁহারই অপার ঐশ্বর্য্যের মহিমা অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তির ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য; ইহা অপেক্ষা অন্য কোন 'স্বতন্ত্র' উদ্দেশ্য * নাই। এই জন্যই তত্ত্বদর্শীর নিকটে প্রকৃতি 'স্বাধীনা' হইতে পারে না, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে প্রাণ-শক্তির 'স্বতন্ত্র' সত্তা থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম-চৈতন্য—এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র †। কেন না, প্রাণ-শক্তি

---

* "নহি স্বতন্ত্র-কল্পায় বল্পতে" ইত্যাদি দেখ।—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪। ব্যাস-ভাষ্য, ২।২৩ প্রভৃতি দেখ।

† "কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎভেদেঽপি, অধিষ্ঠানস্য ততো ভেদঃ"—রত্নপ্রভা ১।১।১৭। "নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী, ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্"—তৈত্তিরীয়, ২।৬২

তাঁহার অনন্ত-শক্তি-সত্তার ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই শক্তি সীমাবদ্ধ *; কিন্তু ব্রহ্ম—অসীম, অনন্ত। এই জন্যই তিনি, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই ত বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে; ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—বিষয়কে বিষয়ীর নিকটে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আকারে উপস্থিত করে। এই সম্বন্ধ হইতেই আমাদের যত কিছু বিজ্ঞান লব্ধ। এই সম্বন্ধ হইতেই আমরা, বাহ্য-বিষয়কে শব্দ-স্পর্শাদির উৎপাদক-কারণরূপেও বুঝিতে পারি। এতদ্ব্যতীত অন্যকোন প্রকারে আমরা এই বিষয়কে বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া, বিষয়ের সত্তা উড়িয়া যায় না। বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধে আসিয়াছে। সম্বন্ধে আসিয়াছে বলিয়াই ত আমরা বিষয়ী ও বিষয়েরও কতকটা আভাস জানিতে পারি; কেন না, যাহা নিতান্তই নিঃসম্পর্কিত, তাহাই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। সুতরাং আমরা যে কেবলমাত্র শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিজ্ঞান-গুলিকেই জানিতে পারি তাহা নহে; শব্দ-স্পর্শাদির অন্তরালবর্ত্তী বাহ্যিক ও আন্তরক সত্তা-দ্বয়কেও জানিতে পারি †। বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই,

* কেন না, ইহা সৃষ্টিসময়ে দেশ-কাল বদ্ধ হইয়াই ব্যক্ত হয়।

† এই জন্যই হিন্দুদর্শনে ও শ্রুতিতে 'অজ্ঞেয়ত্ব-বাদ' স্থান পায় না। তবে যে কোন কোন স্থলে আত্মাকে অজ্ঞেয়ও বলা হইয়াছে

এই বিষয়ী ও বিষয়ের সত্তা এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা আমরা দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনের প্রণালী ইহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র।

বৌদ্ধ মতের বিবরণ ও আলোচনা।

এখন আমরা বৌদ্ধ-দর্শনের প্রণালীটী আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। বৌদ্ধ-দর্শন বলেন যে—তুমি যাহাকে বাহ্য "বিষয়" বলিতেছ, তাহা শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানমাত্র। এই সকল বিজ্ঞান ছাড়া, বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদের নিকটে শব্দ-স্পর্শাদি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের ত জ্ঞান হয় না। আমরা নিয়ত এই শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি লইয়াই ত সমুদয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। সুতরাং শব্দ-স্পর্শাদি অনুভূতি বা বিজ্ঞান ব্যতীত, বিষয়ী ও বিষয় এতদুভয়ের পৃথক্ সত্তা স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিজ্ঞান-গুলি লইয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান পর্য্যবসিত। বিষয়কে যে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, উহা ভ্রম মাত্র। বাহিরে কাহারই অস্তিত্ব নাই। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি আমাদের অনুভূতি মাত্র; উহারা বাহিরে থাকে না; বাহিরে থাকা বলিয়া

তাহার অর্থ এই যে যাহারা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত, কেবল তাহারাই আত্মাকে জানিতে পারে না। ঐন্দ্রিয়িক শব্দ-স্পর্শাদাত্মক জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। বিশুদ্ধ মননাত্মক চিত্তে তাঁহাকে জানা যায়; সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিতে শিখিলে তাঁহাকে জানা যায়।

বোধ হয় মাত্র ; কিন্তু সে বোধটী ভ্রমাত্মক। এইরূপ যুক্তি-বলে বৌদ্ধ-দর্শন, বাহ্য বিষয় ও আন্তর বিষয়ীর সত্তা অস্বীকার করিয়া, কেবল পরস্পর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অনুভূতি বা বিজ্ঞান-গুলিকেই (States of consciousness) একমাত্র পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব বাস্তবিকই কি বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছেন ?—উহাদিগকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ? তাঁহার উপদেশে 'আত্মার' কোন উল্লেখ নাই, 'প্রকৃতি'র কোন কথা নাই। কর্ম্ম-শৃঙ্খলা দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ অনুভূতি-সকলের কার্য্য-কারণ-তত্ত্বই কেবল উপদিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি মানব-মনের অন্তস্তলদর্শী মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ বোধি-সত্ত্ব, জগতের সত্তা ও আত্মার সত্তা উড়াইয়া দিয়াছেন ? স্থূল-ভাবে দেখিতে গেলে, সে সন্দেহ আইসে বৈ কি ? কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবে সমালোচনা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বৌদ্ধ, বেদান্ত ও সাংখ্য-মতের মধ্যে বিশেষ যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না।

বৌদ্ধ মতে, 'সম্বন্ধই' সকল জ্ঞানের মূল।

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেই * 'বেদনা' বা জ্ঞান (Sensation) জন্মিয়া থাকে। যখন চক্ষুঃ ও রূপ এই দুই-এতে সম্বন্ধ হয়, তখনই দর্শন-বেদনা বা দৃষ্টি-

* আমরা এই বিবরণ নাগার্জ্জুন প্রণীত 'মাধ্যমিকদর্শন' হইতে গ্রহণ করিলাম।

জ্ঞান উপস্থিত হয়; কর্ণ ও শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেই শব্দ-বেদনা বা শব্দ-জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইরূপে, সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়, ইহাদের কাহারই স্বাধীন-সত্তা নাই। ইন্দ্রিয় না হইলে বিষয়ের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না, বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়ের দর্শনাদি-বিজ্ঞান হইতে পারে না। ইহারা পরস্পর দৃঢ়-সম্বন্ধ। একে অপরের অধীন। কোন প্রাণীরই যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিত, তাহা হইলে জগতে যে রূপাদি আছে, তাহা বুঝা যাইত না। আবার যদি রূপাদি না থাকিত, তবে রূপ-দর্শনও থাকিত না। তবেই, রূপাদি বিষয়;—দর্শনাদি-ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে পারে না। আবার, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ও রূপাদি বিষয় হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং রূপ-রসাদি যে বাহ্য-জগতেই আছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিবে? চক্ষুঃ তুলিয়া লও, রূপ অন্তর্হিত হইবে; কর্ণ উঠাইয়া দাও, শব্দ বলিয়া কিছুই জগতে থাকিবে না। এইরূপ প্রণালীতে, বাহ্য-বিষয়ের সত্তা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেবল কতকগুলি "সম্বন্ধ" বশতঃই রূপ-রসাদির বা বাহ্য-জগতের বাহ্য-প্রতীতি উপলব্ধ হয় মাত্র। রূপ-রসাদি-বিষয় এবং তাহাদের গ্রাহক চক্ষুঃ—কর্ণাদি ইন্দ্রিয়,—এই উভয়ের পরস্পর "সম্বন্ধ" উঠাইয়া লও, দেখিবে রূপ-রসাদি বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই জগতে থাকিবে না এবং দর্শন-স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় বলিয়াও কিছুই থাকিবে না। অতএব এই

'সম্বন্ধ-জ্ঞানই' বিষয়-বিজ্ঞানের ভিত্তি। আমাদের নিজের অস্তিত্বও কতকগুলি সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে; আমরা এই সম্বন্ধের দ্বারাই অন্য পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হই। এই ভাবে, গুণরাশি ব্যতীত, গুণীর পৃথক্ সত্তা থাকিতে পারে না; আবার গুণীব্যতীত গুণেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। গুণ ও গুণীর মধ্যে এই যে পরস্পর 'সম্বন্ধ' এই সম্বন্ধের উপরেই উহাদের সত্তা স্থাপিত আছে। এইরূপ, কারণ ছাড়া কার্য্যের স্বাধীন-অস্তিত্ব নাই; আবার কার্য্যমাত্রই উহার কারণের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। উভয়ের অস্তিত্ব, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের উপরেই একান্ত নির্ভর করে। ঘট তুলিয়া লও, মৃত্তিকা অন্তর্হিত হইবে; আবার মৃত্তিকা তুলিয়া লও, ঘট অন্তর্হিত হইবে। ঘটরূপ 'কার্য্যের' সম্বন্ধেই মৃত্তিকারূপ 'কারণ' অবস্থিত এবং মৃত্তিকা-রূপ কারণের সম্বন্ধেই ঘটরূপ কার্য্য অবস্থিত। এই 'সম্বন্ধ' তুলিয়া লও, দেখিবে কার্য্য ও কারণ উভয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন এইরূপে এক সম্বন্ধ জ্ঞানেরই উপরে সকল পদার্থ ও সকল জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

সাংখ্য ও বৌদ্ধ-মতের তুলনা।

বেদান্ত ও সাংখ্যও,—এই "সম্বন্ধ-জ্ঞানকে' অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতেই, যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভূত হয়। বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই জাগতিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, একথা কে

অস্বীকার করিতে পারে? বৌদ্ধ-দর্শন পুরুষের ও প্রকৃতির কথা উল্লেখ না করিয়া,—বিষয়ী ও বিষয়ের কথা না বলিয়া, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের 'সম্বন্ধ' হইতে আরম্ভ করিয়াই জগৎ গড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের পদার্থ-প্রক্রিয়া নিম্নে তুলিয়া দিতেছি:—

ইন্দ্রিয় + (সম্বন্ধ) + বিষয়
(Sense-organs) (objects of senses)

বেদনা
(Sensation)

বিজ্ঞান
(Self-consciousness)
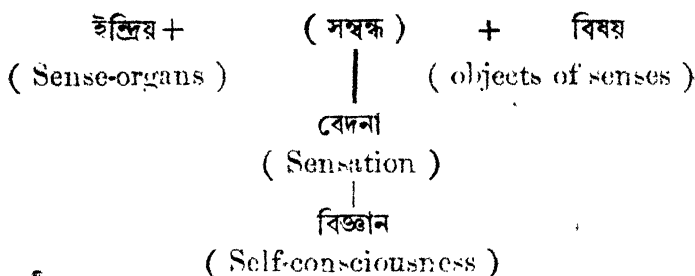
এই প্রক্রিয়ার সহিত পাঠক সাংখ্যের প্রক্রিয়ার তুলনা করুন। সাংখ্য-প্রক্রিয়া এইরূপ:—

বৌদ্ধের পঞ্চস্কন্ধ।
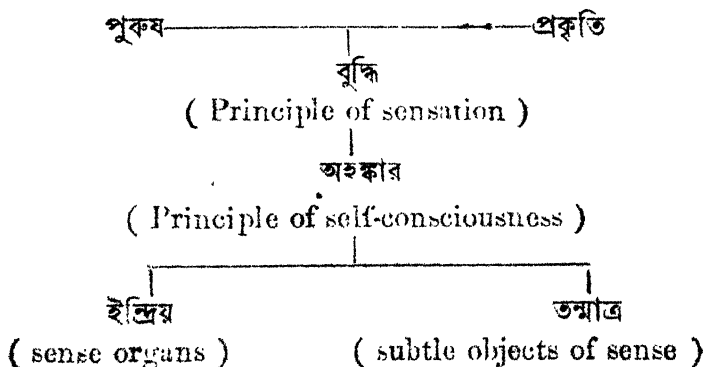
পাঠক দেখিবেন, বুদ্ধ-দেব সাংখ্যোক্ত প্রক্রিয়াই অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল সাংখ্যের প্রকৃতির স্থানে বিষয়কে, এবং পুরুষের স্থানে ইন্দ্রিয়কে স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। যাহা অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, বুদ্ধদেব ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই উৎপত্তি-প্রণালীর কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের "সম্বন্ধ" হইতেই 'বেদনা' (Sensation) প্রাদুর্ভূত হয়। বেদনা হইতে 'বিজ্ঞানের' প্রাদুর্ভাব। বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের 'সংজ্ঞা' (Consciousness of External objects) প্রাদুর্ভূত হয় এবং সংজ্ঞা হইতেই 'সংস্কার' জন্মে। পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে দৃঢ়বদ্ধ, পর-পর-জায়মান সংস্কার-গুলির সমষ্টিই "আত্মা"। এই সংস্কার-সমষ্টিকে আত্মা বলিতে হয়, বলিতে পার। এগুলি ছাড়া আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। বুদ্ধের বিজ্ঞান-স্কন্ধকে, সাংখ্য ও বেদান্তের অন্তঃকরণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ বলেন, মৃত্যুর পর এই বিজ্ঞানই নূতন দেহসৃষ্টির বীজভূত হয়। গর্ভে এই বিজ্ঞানই শরীর-গঠন করিয়া থাকে। এই বিজ্ঞানকে আকার-গ্রহণের বীজ বা Formative power বলা যায়। এই বিজ্ঞান গর্ভে যে উপাদান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আকার প্রদান করিয়া দেহ-রূপে পরিণত করে। এইরূপ হইলেই ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়ই বৌদ্ধের 'রূপস্কন্ধ'। ইন্দ্রিয়, বিষয় সংস্পর্শে উপরঞ্জিত হইলেই, বৈষয়িক-উপলব্ধি

(Sensation) জন্মে। কিন্তু, বিজ্ঞানই এই সংস্পর্শ বা সম্বন্ধের হেতু। এইরূপে, বিজ্ঞান-বলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই, 'বাসনা' দেখা দেয়। এই বাসনাই যাবতীয় দুঃখের নিদান। বাসনা-বশতঃই জীবনে এত আসক্তি। যতদিন দাহ্য বস্তু আছে ততদিন এ বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। এই অগ্নি, জন্ম হইতে জন্মান্তর,—দূরে, বহুদূরে—বাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত করাই "নির্ব্বাণ" লাভ। এখন আমরা দেখিব যে, এই 'বিজ্ঞান' কোথা হইতে আসিল?

বৌদ্ধ-মতে 'আত্মার' বিবরণ।

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে যে, 'সংস্কার' হইতেই বিজ্ঞান আইসে। কিন্তু এই সংস্কারই বা কোথা হইতে আসিল? আমরা এই কথাটা একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যাহাকে তুমি "রাম" বলিতেছ, এই রাম তাহার পূর্ব্বজন্মে ও তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল; এজন্মেও রাম, সেই সংস্কার-গুলিই লইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-রাশিই বিজ্ঞানাকারে এজন্মে আসিয়াছে। আবার বর্ত্তমান জন্মে রাম যে যে কর্ম্ম করিবে, সেই সকল কর্ম্ম-বশতঃ যে প্রকার সংস্কার জন্মিবে, মৃত্যুর পরেও রাম, সেই সংস্কার-গুলি লইয়া যাইবে। সুতরাং তুমি 'রাম' বলিয়া যাহাকে একটী বিশেষ ব্যক্তি (Individual) মনে করিতেছ, বাস্তবিক-পক্ষে রামের

সেরূপ কোন ব্যক্তিত্ব (Entity) নাই। কেবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহমাত্র। "রাম" অর্থ এই যে, উহা একটা নির্দ্দিষ্ট কালের (ইহজীবনের) কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র। পূর্ব্বজন্মে সেই সংস্কার-সমষ্টি এক প্রকারে ছিল, বর্ত্তমান জন্মে অন্যপ্রকারে দেখা দিয়াছে। এইরূপে যতদিন না নির্ব্বাণ হয়, ততদিন এ প্রবাহ চলিতেই থাকিবে। সুতরাং, বৌদ্ধমতে, নিত্য স্থির 'আত্মা' সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। বৌদ্ধমতে, প্রত্যেক সত্তাই কেবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ মাত্র। "The "made" has existence only in the *process* of being made". "Whatever is, is not so much a something which is as the process rather of a being, self-generating and self-again-consuming being." (*Oldenbury's Budhism*)। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই, কর্ম্মের ফল-সমষ্টি-মাত্র। মনুষ্যের আত্মা ও শরীর উভয়ই মনুষ্যের অতীত-কর্ম্মফল-সমষ্টির সমবায় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব, সংস্কার-সমষ্টি ভিন্ন আত্মা অন্য কিছুই নহে। বৌদ্ধের 'আত্মা', এইরূপ। বুদ্ধ এই অর্থেই "আত্মা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। একটী মাত্র জন্মের একটীমাত্র লোককে 'ব্যক্তি' বলা যায় না। কেননা, যাহাকে তুমি 'ব্যক্তি' বলিতেছ, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও সে কতবার ছিল এবং পরজন্মেও সে অন্য-আকারে কতবার থাকিবে। এই সমুদয়-গুলি জন্ম মিলিয়া বরং তাহার ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। অতএব

যখন এভাবে কাহারই ব্যক্তিত্ব থাকিতেছে না, তখন আত্মাও থাকিতেছে না। বুদ্ধমতে, জাগতিক-জ্ঞানমাত্রই, কেবল সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র, ইহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। কোন পদার্থেরই স্বাধীন সত্তা বা 'ব্যক্তিত্ব' নাই। সমস্ত পদার্থই, অন্য পদার্থের সহিত,—কার্য্য-কারণ, গুণ-গুণী প্রভৃতি সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত। তোমার দর্শনাদি শক্তির সম্বন্ধেই, বর্ণ-রূপাদি বিষয়গুলি বুঝিতে পারিতেছ। এইরূপ, দর্শন-স্পর্শনাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-সমষ্টি ভিন্ন, 'আত্মার' কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সম্বন্ধ-বর্জ্জিতরূপে কাহাকেও বুঝিতে পারা যায় না। এই সম্বন্ধগুলি আছে বলিয়াই বস্তুকে সত্তাবান বলিয়া মনে হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞান লোপ কর, বিশ্ব থাকিবে না; আত্মা থাকিবে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিধৃত, গুণ-গুণী সম্বন্ধে গ্রথিত, পর-পর-জাত সংস্কার-রাশিই তবে বুদ্ধের 'আত্মা'—ইহা আমরা দেখিলাম।

বৌদ্ধ-মতে প্রকৃতই কি 'আত্মা' (বিষয়ী) স্বীকৃত হয় নাই?

এই যে আমরা বৌদ্ধ-মতের প্রণালীর বিবরণ দিলাম, তাহাতে জাগতিক পরিবর্ত্তন-প্রবাহের অন্তরাল-বর্ত্তী নিত্য সত্তা যে একেবারেই প্রকৃত-পক্ষে উড়িয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এক্ষণে, আমরা তৎসম্বন্ধেই সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। বুদ্ধ-দেব জাগতিক পরিবর্ত্তন-প্রবাহেরই বিবরণ দিয়াছেন; ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই তিনি বিবরণ ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়াছেন। যে নিত্য-সত্তার উপরে এই

বিশাল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা নিত্য স্থির রহিয়া যায়, সেরূপ "আত্মা" বুদ্ধ-দেব অস্বীকার করিতেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তিনি জগৎকে কেবল পরিবর্ত্তনের দিক দিয়াই দেখিয়াছেন; পরিবর্ত্তনের অপর অংশের কথা তোলেন নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে কত শত চিন্তার স্রোত নিয়ত চলিয়া যাইতেছে, কত সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কিন্তু সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটী বস্তু অপরিবর্ত্তিত থাকিতেছে; নতুবা এই পরিবর্ত্তন-গুলি বুঝিতে পারা যাইত না। বহির্জগতে এই নিত্য-সত্তাকে বিষয় বা জড় বলিতে পার। অন্তর্জগতে ইহাকে বিষয়ী বা আত্মা বলিতে পার। বেদান্ত এই দুই সত্তাকে একরূপ একই সত্তা * ধরিয়া লইয়া, পরিবর্ত্তন-প্রবাহের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য এই দুই নিত্য সত্তাকে পাশাপাশি রাখিয়া † জাগতিক পরিবর্ত্তন বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ-দেব, এই নিত্য বস্তু-দ্বয়ের কোন কথা

* একটী কূটস্থ নিত্য; অপরটী পরিণামি নিত্য। বিষয়ীর (আত্মার) সত্তাতেই বিষয়ের (প্রাণ-শক্তির) সত্তা; বিষয়ের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং জগতে এক সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই;—ইহাই বেদান্ত-মত।

† সাংখ্যমতে যদিও বিষয়কে (প্রকৃতিকে) স্বাধীন বলা হইয়াছে; কিন্তু পাঠক দেখিয়াছেন যে প্রকৃত-পক্ষে প্রকৃতি স্বাধীন নহে;—প্রকৃতি পুরুষেরই অধীন।

উত্থাপন করেন নাই। তিনি কেবল মাত্র পরিবর্ত্তন-প্রবাহেরই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। কি নিয়মে ও কি প্রণালীতে জগতে এই বিশাল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ আসিতেছে, যাইতেছে ও আবার আসিতেছে,—ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার উক্তিতে কাজেই সেই অতীন্দ্রিয় নিত্য-বস্তু-দ্বয়ের কোন আশা করা যায় না। এই জন্যই বৌদ্ধ-দর্শনে নিত্য-আত্মার কোন কথা নাই। এই জন্যই, কিরূপে সংস্কার-রাশি একজন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই বিবরণ বৌদ্ধ-দর্শনে পাওয়া যায়। এই জন্যই, সংস্কার-সমষ্টিই "আত্মা" শব্দ-বাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, বুদ্ধ-দেব যে সেই নিত্য-পদার্থটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি সে ইন্দ্রিয়াতীত কথা উত্থাপন করেন নাই, এইমাত্র। বুদ্ধকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই ভাবে বুঝিয়া দেখিলে, প্রকৃত-পক্ষে, সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ-দর্শনে বিশেষ কোন মৌলিক প্রভেদ লক্ষিত হইবে না।

আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বৌদ্ধ-মতের আলোচনা।

আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বৌদ্ধ-দর্শনে স্পষ্টতঃ নিত্য আত্মার ও পরকালের কোন কথা না থাকিলেও, বৌদ্ধ-দর্শন নিত্য-সত্তার বিরোধী নহে। আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ না থাকার বিশেষ কারণ আছে, তাহা আমরা পরে বলিব। আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন আত্মাকে, পর-পর-জাত (Successive) কতক-

গুলি সংস্কার বা ভাব-লহরীর সমষ্টি-রূপেই ধরিয়া লইয়াছেন কিন্তু এই ভাবগুলি কি? পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতপ্রবর Max Muller তাঁহার Hibbert Lectures নামক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন,—

"Faculties are inherent in substance, quite as much as forces or powers are. We generally speak of the *faculties* of conscious and of *forces* of unconscious. We know there is no force without substance and no substance without force."

বাস্তবিকই, ভাব বা বৃত্তি-গুলিকে স্বীকার করিলেই, তাহারা যে একটা কোন কিছুর ভাব বা বৃত্তি, তাহা স্পষ্টতঃ না বলিলেও বুঝা যায়। জড়-রাজ্যে যেমন অণু-ব্যতীত শক্তির ধারণা হয় না, মনো-রাজ্যেও আত্মা ব্যতীত বৃত্তির ধারণা হয় না। যে মুহূর্ত্তে বৌদ্ধ-দর্শন মানসিক ভাব বা বৃত্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্গে সঙ্গে 'আত্মা' আসিয়া পড়িয়াছে। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সমস্তই যদি কেবল পর-পর-জাত ভাব-লহরী মাত্রই হয়, তাহা হইলে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যে দেখিয়াছিল;—দুই ঘণ্টা পরে সেই-ই এখন তাহা স্পর্শ করিতেছে;—এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা ও স্পর্শ-কর্ত্তা যে একই তাহা, কেবল ভাব-লহরীমাত্র বলিলে, কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? কথাটা এই যে, ক্রিয়া-দ্বয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা (Connecting Link) থাকা আবশ্যক।

১। বৌদ্ধের জন্মান্তর-বাদ।

বুদ্ধ-দেব জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন। এই জন্মান্তর-বাদ হইতেই শঙ্করাচার্য্যের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এবং এই জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করাতেই বুদ্ধ প্রকারান্তরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছেন। বুদ্ধ বলেন যে জীব এক জন্ম পরে, অন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এখন প্রশ্ন এই যে, সমস্তই যদি কেবল সম্বন্ধ-মাত্রই হয়, তবে পূর্ব্ব ও পর জন্ম এই উভয়ের মধ্যে Connecting link কে হইবে? কেবল "কর্ম্ম" স্বীকার করিলেই ত সেই linkটী পাওয়া যায় না। কর্ম্মও ত সম্বন্ধাত্মক; তাহা ত পূর্ব্ব-জন্মেই ফুরাইয়া গিয়াছে। পর-জন্মেও যে সেই কর্ম্মই আসিবে তাহার নিয়ামক কে হইবে? কে সেই কর্ম্মকে ধরিয়া রাখে? বিখ্যাত বৌদ্ধ সূত্রানু-বাদক অধ্যাপক *Rhys David* তাঁহার *Budhism* নামক গ্রন্থে এই জন্যই বলিয়াছেন,—

"As Budhism does not acknowledge a soul, it has to find a *link of connection*, the bridge between one life and another, somewhere else. In order to do this, it resorts to the doctrine of *karma*. But this very key-stone itself (*i. e. this karma*)—this link between one life and another is a mere word."

এই জন্যই নিত্য 'আত্মা' স্বীকার না করিলে, জন্মান্তর-বাদ কেবল কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে;—জন্মান্তর-বাদ ভিত্তিশূন্য

হইয়া যায়। সুতরাং আমরা দৃঢ়রূপে এ কথা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ যখন জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তখন ইহা বুঝাই যাইতেছে যে, তাঁহারা নিত্য আত্মার অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। আরও একটী কথা আছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে যে ভাবে, 'নির্ব্বাণাবস্থার' বর্ণনা আছে, তাহাতেও নিত্য আত্মা স্বীকৃত না হইয়া পারে না।

২। বৌদ্ধের নির্ব্বাণাবস্থা।

বৌদ্ধ-মতে ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞান মাত্রই এবং এই জগৎই "সাংবৃতিক" (Illusory) মাত্র। নির্ব্বাণাবস্থাই "পারমার্থিক" অবস্থা। নির্ব্বাণাবস্থায় এই সাংবৃতিক জগৎ থাকিবে না। তখন সমুদয় সম্বন্ধ-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে। মাধ্যমিক-দর্শনে দুই প্রকার সত্যতার কথা আছে। এক, বাস্তবিক-সত্যতা (Absolutely real);—ইহাই বৌদ্ধের নির্ব্বাণাবস্থা বা শূন্যাবস্থা। অপর, প্রতীয়মান-সত্যতা (Phenomenally real);—যেমন জাগতিক-জ্ঞান। ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান মাত্রই সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত; জগতের কোন বস্তুরই সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, স্বাধীন সত্তা নাই। যখন নির্ব্বাণাবস্থা লাভ ঘটিবে, তখন সকল সম্বন্ধ-জ্ঞানই তিরোহিত হইবে। বৌদ্ধদিগের এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি? নির্ব্বাণাবস্থা কি একেবারেই সর্ব্ব-শূন্য অবস্থা? এই নির্ব্বাণাবস্থা যে ভাবে বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আত্মা যে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উত্তম

রূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ-দর্শনের 'নির্ব্বাণ' বা 'শূন্যতা',—সাংখ্য ও বেদান্তের 'মুক্তির'ই ঠিক অনুরূপ। সে অবস্থায় ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ-জ্ঞানের একান্ত উচ্ছেদ হইয়া যায়, ইহা প্রদর্শন করাই বুদ্ধ-দেবের উদ্দেশ্য। এ জগৎকে 'সাংবৃতিক' বলাতেই, এ জগতের অন্তরালে যে এক নিত্য 'পারমার্থিক' সত্তা আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকৃত না হইয়া পারে না। সমস্ত জগৎই সম্বন্ধ-সূত্রে বিধৃত। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি সম্বন্ধের উপরেই সকল পদার্থ প্রতিষ্ঠিত। সকল পদার্থেরই প্রতীয়মান-সত্তা আছে; কোন বস্তুরই পারমার্থিক-সত্তা নাই; সুতরাং সকলই কেবল শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত। এইরূপ মহাশূন্যতার বোধ হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি। যখন সমস্ত বস্তুর এবং বিশ্বের এইরূপ শূন্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আর বিষয়ের জন্য বাসনা জন্মিবে না; তখন আর এই দুঃখ-বহুল বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রত্যাশায় লালায়িত হইতে হইবে না। এই সম্বন্ধ—জ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞানের প্রকৃতি মানব-মনে উত্তমরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি জগৎকে ও জগতের পদার্থ মাত্রকেই কেবল সম্বন্ধ-জ্ঞানেই পর্য্যবসিত করিয়া দিয়া, বিশ্বের শূন্যতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আত্মার উচ্ছেদ করা তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নহে। বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহ এই ভ্রম-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথায় পরিপূর্ণ।

বৌদ্ধ যে ভাবে এই ভ্রম-জ্ঞানের উপদেশ দিয়া, বিশ্বের

পদার্থরাশি যে কেবল সম্বন্ধ-সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে—এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। তাঁহার উপদিষ্ট প্রণালী দ্বারা অতি সহজে ভ্রম-জ্ঞান বা শূন্যতার উপলব্ধি হয়। ভ্রম-জ্ঞানের ধারণা দৃঢ়ীভূত হইলে, এক মহাশূন্য—সম্বন্ধ-বর্জ্জিত—অবস্থা আসিয়া পড়িবে। ইহাই বুদ্ধের শূন্যতা প্রাপ্তি। ইহাই বৈদান্তিক ব্রহ্ম-লাভ। ইহাই সাংখ্য-কথিত বিবেক-জ্ঞান-লাভ। সাংখ্যের—

"নাস্মি নমে নাহ মিত্যপরিশেষং
কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্"।

এবং বেদান্তের—

"নেতি নেতি জ্ঞান"

এবং বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট—

"মহাশূন্যতা" বা "নির্ব্বাণ"

ঐগুলি সকলই একই তত্ত্ব নহে কি? জগতের সর্ব্ববিধ ভোগ-বিকার-ময়ও সম্বন্ধ বর্জ্জিত অবস্থাই—এই শূন্যতার অপর নাম।

"প্রপঞ্চবিগমাৎ বিকল্প-নিবৃত্তিঃ। বিকল্প-নিবৃত্ত্যা চ
অশেষ-কর্ম্ম-ক্লেশনিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ 'শূন্যৈব'
সর্ব্বপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তি-লক্ষণত্বাৎ "নির্ব্বাণ" মিত্যুচ্যতে"।
(মাধ্যমিক-বৃত্তি)।

অতএব, অশেষ প্রকার কর্ম্ম ও ক্লেশের নিবৃত্তি এবং বিষয়বোধ-নিবৃত্তিই—শূন্যতা; ইহাই নির্ব্বাণ।—

"শূন্যতায়াং তিষ্ঠতা বোধি-সত্ত্বেন প্রজ্ঞাপারমিতায়াং স্থাতব্যম্"।

পারমার্থিক জ্ঞানে নিয়ত অবস্থানের নামই শূন্যতা ; বোধিসত্ত্ব পুরুষেরা সর্ব্বদা এই শূন্যতায় অবস্থান করিবেন।

"সিঞ্চ ভিক্খু! ইমংনাবং, সিত্তাতে লহুমেস্সতি।
ছেত্বারাগঞ্চ দোষঞ্চ ততো নির্ব্বানমেহিসি"।

(ধম্মপদ, ভিক্ষুবর্গ, ১০)।

অর্থাৎ অন্তঃকরণের পঙ্কিলতা অপনয়ন করিতে পারিলে এবং অনর্থকর রাগ-দ্বেষাদির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই, নির্ব্বাণ-পদবীতে আরোহণ করিতে পারা যায়।

"চিত্তাবরণ-নাস্তিত্বাদত্রস্তো বিপর্য্যাসাতিক্রান্তো নিষ্ঠনির্ব্বাণঃ"।

(প্রজ্ঞাপারমিতা, হৃদয়-সূত্র)।

চিত্তের যে সকল আবরণ আছে, তাহার অপগমের নামই নির্ব্বাণ। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণ—আত্মার ধ্বংস নহে। শঙ্করাচার্য্য-বর্ণিত "মুক্তির" অবস্থাও অবিকল এই প্রকার—

"স চ মোক্ষঃ ইহৈব প্রলয়ঃ, প্রদীপনির্ব্বাণবৎ"

(বৃহং ভাষ্য, ৫।২।২২)।

"ন তু অকার্য্যে নিত্যেঽনামরূপাত্মকে ক্রিয়াকারক-ফলস্বভাব-বর্জ্জিতে (মোক্ষে) কর্ম্মণো ব্যাপারোঽস্তি" ৫।৩।১)।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুদ্ধদেবকে যদি 'সর্ব্ব-শূন্য-বাদী' বলিতে হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যকেই বা 'সর্ব্ব-শূন্য-বাদী' না বলা যাইবে কেন?

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বৌদ্ধমতে, কেবল যে মৃত্যুর পরেই নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিবে তাহা নহে ; জীব এই বর্ত্তমান জীবনেও, তাহা লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধের এই কথা হইতেই আত্মার অস্তিত্ব আসিয়া পড়িতেছে। যদি সমুদয়ই কেবলমাত্র সম্বন্ধ-জ্ঞানই হয়, এবং এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের ধ্বংস যদি ইহজীবনেই করিতে পারা যায়, তবেত আত্মার অস্তিত্ব-স্বীকার ভিন্ন তাহা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। আত্মা যদি কেবলমাত্র কতকগুলি সম্বন্ধের সমষ্টিমাত্রই হয়,—সম্বন্ধ-সমষ্টি বা ভাব-সমষ্টি ব্যতীত যদি আত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্বই না থাকে ; তবে নির্ব্বাণাবস্থায় যখন সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ ধ্বংস হইয়া যাইবে,—তখন ত তবে কিছুই থাকিবে না। তখন কে তবে সেই নির্ব্বাণাবস্থা লাভ করিবে? সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না। যখন ইহজীবনেই নির্ব্বাণ লাভ ঘটিতে পারে এবং সে অবস্থায় বোধি-সত্ত্বরূপে মনুষ্য থাকিতে পারিবে, তখন,—যদি নিত্য আত্মা না থাকে এবং সমস্তই কেবল সম্বন্ধমাত্রই হয়,তাহা হইলে, সর্ব্ব-সম্বন্ধ-ধ্বংসাত্মক নির্ব্বাণাবস্থা হইবে কাহার? তখন থাকিবে কে? আরও একটী তত্ত্ব এ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।—

৩। ইহজীবনেই বোধি-সত্ত্ব পদবী-লাভ।

বুদ্ধ-দেবকে যখনই কেহ আত্মা বা পরকাল প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিত, তখনই তিনি মৌনাবলম্বন করিতেন; কোন স্পষ্ট

৪। বুদ্ধের মৌনাবলম্বন।

উত্তরই দিতেন না। এতদ্দ্বারা, তিনি যে আত্মা ও পরলোকের সত্তাই স্বীকার করিতেন না, একথা আইসে না। সুতরাং আত্মার নিত্যতা স্বীকারে যে গৌতম-বুদ্ধের অসম্মতি ছিল, একথা ভ্রম-বিজৃম্ভিত।

'শূন্যত' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

এই শূন্যতাই তাঁহার সেই নিত্য সত্তা। ইহার শূন্যতা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি পাণ্ডিত্য ও মহাজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। জাগতিক বিষয়-সমূহের খণ্ড খণ্ড, এক একটা স্বাধীন সত্তা আছে, মানবজাতির এই যে একটা মহাভ্রম ও প্রকাণ্ড অপসংস্কার আছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইলে, "শূন্যতা" সংজ্ঞাই অধিক সঙ্গত। জগতের ও নিজের যে স্বাধীন-সত্তা নাই; জগৎ ও আত্মা উভয়েই যে পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে চির-সূত্রিত;—এই তত্ত্ব চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইলে,—জগৎ ও আত্মার স্বাধীন-সত্তা যে শূন্য বা একান্ত মিথ্যা. ইহাই ত প্রকৃত তত্ত্ব। সাধারণ লোকে যাহাকে সুখ-দুঃখাদি বিবিধ-অনুভূতিময় 'আত্মা' বলিয়া থাকে, সে আত্মা যে কেবল কয়েকটীমাত্র বৎসর-পরিমিত কালেই আবদ্ধ নহে—এ আত্মা যে চির-ঘূর্ণায়মান—এ আত্মা যে কত জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহা বুঝিতে হইলে অর্থাৎ আত্মার ব্যক্তি-নিষ্ঠস্বরূপ স্বাধীন-সত্তার মিথ্যাত্ব বুঝাইতে হইলে;—এই মহা-শূন্য-বাদই ত প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। এই গম্ভীর সর্ব্বশূন্যতার উপলব্ধিই ত মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। ইহা শূন্যতা নহে, ইহা ব্রহ্ম-পদবীলাভ।

বুদ্ধ-মতে আত্মার সুস্পষ্ট উক্তি নাই কেন?

বুদ্ধ-দেব জানিতেন যে, সাধারণ মানুষ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান দ্বারাই শাসিত; ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত। যাহা ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানের অতীত, ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানে যাহার স্বরূপ বুঝা যাইবে না; তদ্বিষয়ে মানুষকে উপদেশ দিলে কিছুই বুঝিবে না। মনুষ্য এই ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানগুলির মার্জ্জনা করুক, 'সত্য-শীলাদি'র অনুষ্ঠানাদি করিতে থাকুক এবং তদ্দ্বারা স্বভাব-নৈর্ম্মল্য জন্মিলে, মনুষ্য আপনিই তখন তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। আরও কথা আছে। যাহা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অতীত পদার্থ, তাহাকে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের 'শব্দ' দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবেই বা কিরূপে? ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নাই। কিন্তু এরূপ শব্দ ঐন্দ্রিয়িক বোধ দ্বারা লব্ধ। এই জন্যই, বৌদ্ধ-গ্রন্থে অনেক স্থলে 'নির্ব্বাণ'কে,—'উহা ভাবও নহে, অভাবও নহে' * এই বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, ভাব পদার্থ-মাত্রই গুণাদি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ও বিনাশী, এবং ভাব পদার্থ-মাত্রই সগুণ, সাবয়ব, পরিণামী। ভাবের ন্যায়, অভাবও অনিত্য পদার্থ। অভাব-জ্ঞানের মধ্যেও সূক্ষ্ম-ভাবে একটা সম্বন্ধ-জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে। আবার, ভাব ও অভাব এই শব্দদ্বয় পরস্পর আপেক্ষিক শব্দমাত্র। সুতরাং এই শূন্যতা এবং বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মবাদ একই কথা। যদ্দ্বারা কোন সগুণ, সাবয়ব পদার্থ ব্যঞ্জিত হয় না, তাহাই নির্গুণ,

* "নচাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্ত ভাবতা"—রত্নকূটসূত্র।

নিরাকার পদার্থ।. বুদ্ধের শূন্যতা দ্বারাও জাতি-গুণাত্মক কোন সাবয়ব পদার্থ বা দেশ-কাল-বদ্ধ ক্রিয়াও প্রকাশ পায় না। এই জন্য ইহা কেবল অভাবও নহে। অতএব বুদ্ধকে যে লোকে নাস্তিক বলে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বুদ্ধ-দেব শূন্যতা-লাভের জন্য সমাধি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন (প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে)। জগতের স্বাধীন-সত্তা লোপ করিতে গিয়া, জগতের সমস্ত পদার্থের সম্বন্ধাত্মকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া, বুদ্ধ যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একরূপ সর্ব্বাভাবরূপে প্রতীয়মান হওয়াতেই, লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া মনে করিয়া লয়। যদি আত্মার পৃথক, স্বাধীন-সত্তা ঘোষিত করিতে যান, তবে ত জগতের সকলই যে সম্বন্ধ জ্ঞানেই সত্তাবিশিষ্ট তাহা বুদ্ধ বুঝাইতে পারেন না। আত্মার স্বাধীন-সত্তা ঘোষণা করিলেই লোকে আত্মার জন্য বাসনা-কামনাদি বিবিধ ভোগের সেবা করিবে। আমাদের দৃঢ়-ধারণা, এই ভাবে উপদেশ দেওয়াতে, বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড অন্তস্তলদর্শিতার ও কার্য্য-কারণ-সূত্রাভিজ্ঞতারই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, মূলতঃ বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত, সাংখ্য ও বেদান্তের কোন বিরোধ নাই*।

বৌদ্ধদর্শন, হিন্দু-দর্শনেরই অংশ। উপনিষদই, সকল দার্শনিক মতের মূল ভিত্তি।

বৌদ্ধ-দর্শন হিন্দুদর্শনেরই একটী অংশ এবং তাহা হইতেই সংগৃহীত। উপনিষদই, ভারতীয় দার্শনিক-মতগুলির মূল ভিত্তি। সেই মূল প্রস্রবণ হইতেই তিনটী ধারা বহির্গত হইয়া

* তবে যে শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে বৌদ্ধ-মতের উপরে আক্রমণ

বিশাল স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে। মূলতঃ অনৈক্য হইবে কেন?

৩। আমরা এতক্ষণ যে সকল আলোচনা করিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারাই, বিষয়ী এবং বিষয়ের সহিত সংসর্গ হইয়া, উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতে—বিষয়ীর সম্মুখে এই জগৎ, শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানাদির আকারে অনুভূত হইতে থাকে। ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশের জন্য, বাহ্য বিষয় ও আন্তর ইন্দ্রিয়াদির আকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছে। যিনি এই ভাবে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে এবং ব্রহ্মশক্তিকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভ্যাস করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। সাধারণ মনুষ্য কিন্তু তাহা করে না। ইন্দ্রিয়গণ এই জগৎকে যেমন দেখায়, তাহাকে পরমার্থতঃ তাহাই বলিয়া ইহারা ভাবে। ইহাই অবিদ্যা বা অবিবেক। এই অবিদ্যার প্রভাবে মনুষ্য, পদার্থ-গুলির স্বাধীন-সত্তা আছে বলিয়া মনে করে এবং এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। অবিদ্যা, বাহ্য বিষয়কে এক একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন শব্দ-স্পর্শাদিময় বলিয়াই দেখাইয়া থাকে। এবং তৎপ্রাপ্তির উদ্দেশে, মনুষ্য

ব্রহ্ম-সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে উপনিষদের মত।

করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, কালক্রমে বুদ্ধ-দেবের উপদেশের গভীর-তত্ত্বগুলি ভুলিয়া লোকে উহার বিকৃত অর্থ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের আক্রমণ, সেই বিকৃত মত লক্ষ্য করিয়াই।

রাগ-দ্বেষ-চালিত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। এইরূপে 'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম' দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। সংসারী জীবের অবস্থা এইরূপ *। এখন আমরা ব্রহ্ম-সাধনা বিষয়ে, ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ে, উপনিষদের মত কিরূপ তাহা দেখিতে অগ্রসর হইব।

ব্রহ্মোপাসনার বিঘ্ন।

শ্রুতিতে প্রথমে ব্রহ্ম-দর্শনের ও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির বিঘ্ন-স্বরূপে—'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম'—এই ত্রিবিধ বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাই।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্" (কঠোপনিষদ, ৪।১) এবং "পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্" (কঠোপনিষদ, ৪।২)। †

* ইহারাই সকাম-কর্ম্মী। এইরূপ ব্যক্তিরাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারার্থ চালিত হইয়া, স্বর্গাদি প্রাপ্তিকামনায়, বা পুত্র-পশু-বিত্তাদি লাভ কামনায়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ইহাদের জন্যই সকাম-কর্ম্মকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বৈদিক উপদেশগুলিও নিরর্থক নহে। আপন বুদ্ধির বৈচিত্র্যানুসারে সাধকের সাধনায় প্রবৃত্তি হয়। যাহার যেরূপ মতি, তাহাকে তদ্রূপ উপদেশ দিতে হয়। "যস্য যথাবভাসঃ স তথারূপং পুরুষার্থং পশ্যতি, তদনুরূপাণি সাধনানি উপাদিৎসতি" (শঙ্কর-ভাষ্য ২।১।২০ বৃহ০)।

† অর্থ এই যে, "পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়বর্গকে বহির্মুখ করিয়াছেন। সেই জন্যই লোকে অন্তরাত্মাকে না দেখিয়া, শব্দ-স্পর্শাদিময় বিষয়-বর্গকে দেখিয়া থাকে"। "যাহাদের বহির্বিষয়ক কামনা আছে; যাহারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনা না করিয়া বাহ্যবিষয়ের কামনা করে, তাহারা সংসার-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে"।

অবিদ্যা বা ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিই এইরূপ যে, উহা বিষয়-গুলিকে শব্দ-স্পর্শাদি-রূপে, স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থরূপে,—আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এইরূপে পদার্থ উপস্থিত হইলে, রাগ-দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আমরা সেই পদার্থ-প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকি। এই কামনা হইতেই * সেই সকল পদার্থ-প্রাপ্তির উদ্দেশে আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, শ্রুতিতে সাধনা ও উপাসনার প্রয়োজন ও প্রণালী কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতি যে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। বিষয়-মদাচ্ছন্ন জীবকে ধীরে ধীরে, এই বিষয়ের মধ্য দিয়াই, কিরূপে ব্রহ্ম-পথের পথিক করিয়া দেওয়া যায়, শ্রুতিতে তাহারই প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতি, কোন বস্তুর উচ্ছেদ বা ধ্বংস-সাধনের পরামর্শ দেন

---

* কামনাই (Motive) সকল ক্রিয়ার মূল। শ্রুতি বলেন,—"নাসুখং লব্ধা করোতি"—সুখ-প্রাপ্তিই সমুদয়-কর্ম্মের চালক। কিন্তু,—পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সুখ দিতে পারে না। "ভূমা ত্বেব সুখম্"—যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই পরম-সুখ দিতে পারে। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ,"—আত্মাই নিরতিশয় প্রিয় ও পরম-সুখকর। অতএব, শ্রুতি-মতে, পরম-সুখকর আত্ম-প্রাপ্তিকামনাতেই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্ত্য "সুখ-বাদ" অপেক্ষা, শ্রুতির এই "পরম-সুখবাদ" কত উন্নত,—পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

ব্রহ্ম-সাধনের প্রণালী।

নাই। বিষয়ের একান্ত ধ্বংস এবং বৈষয়িক কর্ম্মের একান্ত বিনাশ করিয়া দিতে শ্রুতি চেষ্টা করেন নাই। ইহাই উপনিষদের বিশেষত্ব। কিরূপে বিষয়-দর্শনের স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত করা যায়; কিরূপে বিষয়-কামনার স্থলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনা * প্রতিষ্ঠিত করা যায়; কিরূপে বিষয়-প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মের স্থলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা যায়;—শ্রুতি তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। আমরা মূলগ্রন্থে যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে যাহা বিশেষ বলিতে আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

সাধকের শ্রেণী বিভাগ।

আমরা দেখিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদির প্রকৃতিই এইরূপ যে, উহারা বিষয়বর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থরূপে উপস্থিত করে। সকল পদার্থ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপের পরিচায়ক মাত্র, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য এই অবিদ্যাকে "আবরণ-শক্তি"† বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান—ব্রহ্মের স্বরূপকে

* শ্রুতির নানাস্থানে এইরূপ কামনার প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। "তইমে সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ"—ইত্যাদি। "স যদি পিতৃলোক-কামোভবতি···তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে"—ইত্যাদি। "বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্"—ইত্যাদি।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে শঙ্করঃ—"চক্ষুরাদি ব্যাপারাসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বোলোকো ব্রহ্ম নোপলভতে।" এই জন্যই সে স্থলে চক্ষুরাদিকে "গিরি" বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মণো গিরণাৎ গিরিঃ'।

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। শ্রুতিতে সংসারাচ্ছন্ন ও ইহলোক-সর্ব্বস্ব জীব-সকলকে "কেবল-কর্ম্মী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা বাপী-কূপাদির খনন ও দানাদি দ্বারা যে সকল সৎকর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে, তদ্দারা ইহাদের "পিতৃযান-মার্গে" চন্দ্র-লোকে গমন বর্ণিত আছে*। কিন্তু এই সকল বিষয়াচ্ছন্ন জীবকে ধীরে ধীরে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানে লইয়া যাইবার জন্য শ্রুতিতে কর্ম্মের সঙ্গে দেবতা-জ্ঞানের সংযোগ বিহিত হইয়াছে†। প্রথমতঃ,—সকাম-ভাবে, নিজেরই সুখাদি লাভার্থ এবং পর-লোকে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ও দেব-লোকে সুখ-প্রাপ্ত্যর্থ, এই সকল লোকের প্রতি সকাম-ভাবে, দেবতোদ্দেশে যজ্ঞাদির বিধি দেওয়া হইয়াছে। ইহারাও "পিতৃযান-মার্গ" অবলম্বন করিয়া চন্দ্রালোক দ্বারা শাসিত দেব-লোকে গমন করে। এই উভয় প্রকারের লোকেরই পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু, সকল-ক্রিয়ায় ও সকল-পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সকাম দেবোপাসনায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, তখনও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্তরূপে,—স্বতন্ত্র পদার্থ বোধেই,—দেবতার

* যাহারা কেবলই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবলে চালিত হইয়া কেবলই বিষয়াচ্ছন্ন হইয়া কালযাপন করে, তাহাদের অন্ধতমসাবৃত লোকে গতি হয়।" স্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ"—শঙ্কর।

† "বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" (ঈশোপনিষদ্, ১২)।

উপাসনা করা হয় *। এই জন্য শ্রুতিতে, নিষ্কাম-ভাবে এবং কেবল ব্রহ্মোদ্দেশে যজ্ঞাচরণ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। নিষ্কাম-ভাবে ব্রহ্মোদ্দেশে যজ্ঞাচরণ করিলে, ক্রমে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। পরে, এরূপ সাধকের আর দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রয়োজন থাকে না; তখন সাধক ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিবার অধিকারী হইয়া উঠেন। এই দুই শ্রেণীর সাধকের, সূর্য্যালোক দ্বারা শাসিত "দেবযান-মার্গে" উৎকৃষ্ট লোকে গতি বর্ণিত আছে এবং ইহাঁদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এইরূপ প্রণালীতে, সাধকের ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-পদার্থে ও সর্ব্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

প্রথমতঃ, কিরূপে সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বলা যাইতেছে। ইহাই বেদান্ত-দর্শনে "প্রতীকোপাসনা" ও "সম্পদুপাসনা" নামে খ্যাত। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, এক বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রাণ-শক্তি, তিন আকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। উহা প্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে; উহাই আবার বৃক্ষ-লতাদি বিবিধ বাহ্য আধিভৌতিক পদার্থাকারে বিকাশিত হইয়াছে; উহাই আবার প্রাণি-দেহে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মূলে একই শক্তিমাত্র। ইহারা সকলেই

১। সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন।

* "সোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে, অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ"—ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

এক প্রাণ-স্পন্দনেরই রূপান্তরমাত্র—সংস্থান-ভেদমাত্র। সাধক যদি এই তত্ত্ব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারেন, তবে তাঁহার চক্ষে সমুদয় পদার্থই ব্রহ্ম-শক্তি রূপে অনুভূত হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে এক ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা তাঁহার নিকটে অনুভূত হয় না। এই উদ্দেশ্যেই শ্রুতির নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গকে আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদিরই অভিব্যক্তি রূপে ভাবনার উপদেশ আছে। আবার, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ-গুলিকে, এক প্রাণ-শক্তিরূপে ভাবনারও ব্যবস্থা দেওয়া হই-য়াছে: এইরূপে সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তা-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তখন এই প্রকার অনুভূতি হয় যে—কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাই সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং কোন পদার্থই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে পারে না। অভ্যাস দৃঢ় হইলে, এইরূপে পদার্থগুলির স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া যায়; সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে, পদার্থ-মাত্রেই ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি 'আধিদৈবিক' পদার্থ এবং চক্ষুঃ, বাক্য, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি 'আধ্যাত্মিক' বস্তু বলিয়া শ্রুতিতে পরিচিত। কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক,—সকল পদার্থই যে এক মূল প্রাণ-স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং প্রাণ-স্পন্দনকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে, এই তত্ত্ব

শ্রুতির সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই মহাতত্ত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ে যে 'প্রাণ-ব্রতের' বিবরণ (১।৫।২১-২৩) আছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে—বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যেকে প্রত্যেকের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলিও কেহই কাহারও সাহায্য না লইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণ-শক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ বস্তু। প্রাণ-শক্তিই সকল প্রকার ক্রিয়ার মূল। প্রাণ-শক্তি আছে বলিয়াই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং সূর্য্যাদি পদার্থ আপন আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেছে। প্রাণ-শক্তির কদাপি ক্ষয় হয় না, নাশ হয় না; উহার ক্লান্তি নাই। কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, কি সূর্য্য-চন্দ্রাদির ক্রিয়া, সকলই সেই প্রাণ-শক্তির আশ্রয়েই স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যেই সেই মূল প্রাণ-শক্তি অনুগত—অনুস্যূত—হইয়া আছে। * বৃহদারণ্যকের 'সপ্তান্ন-বিদ্যার' এক স্থলেও (১।৪।৩—২০) আমরা প্রকারান্তরে এই

* "সর্ব্বভূতেষু বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ মদাত্মকাঃ—অয়ং প্রাণ আত্মা সর্ব্বপরিস্পন্দকৃৎ তেনানেন ব্রতধারণেন একাত্মত্বং···প্রাপ্নোতীতি—শঙ্কর।

তত্ত্বই দেখিতে পাই। মূল প্রাণ-স্পন্দন, বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রাদি পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে। আবার, সেই প্রাণ-স্পন্দনই, দেহ মধ্যে প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান নামক পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া দৈহিক সকল প্রকার ক্রিয়া চালাইতেছে এবং উহাই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আকার ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বাহিরে যাহা সূর্য্য, উহাই দেহমধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাহিরে যাহা অগ্নি, উহাই দেহে বাগিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাহিরে যাহা চন্দ্র (বা পর্জ্জন্য), তাহাই দেহে মন-নামে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতির এই সকল কথার অর্থই এই যে, একই মৌলিক প্রাণ-স্পন্দন, যেমন সূর্য্য-চন্দ্রাদির আকারে অভিব্যক্ত, উহাই আবার প্রাণি-দেহের বিকাশ-সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক প্রাণ-স্পন্দনই—এই সকল পদার্থের মূল 'কারণ'। কার্য্য পদার্থমাত্রেই কারণেরই রূপান্তর। সুতরাং কোন পদার্থেরই কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অতএব এক প্রাণ-স্পন্দনই সকল পদার্থের মূলে অবস্থিত *। বৃহদারণ্যকের 'মধু-বিদ্যাতেও' আমরা প্রকারান্তরে এই তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ

* যস্য চ যস্মাদাত্মলাভো স তেন অবিভক্তো দৃষ্টা যথা ঘটাদীনাং মৃদা। কার্য্যঞ্চ কারণেন অব্যতিরিক্তম্''—শঙ্করঃ। "যৎ কার্য্যং, তত্ততো (কারণাৎ) নভিদ্যতে"—আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা। "প্রাণঃ ··সর্ব্বপরিস্পন্দকৃৎ"। "মননদর্শনাত্মকানাং, চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়াসামান্যমাত্রে (i. e, প্রাণে) অন্তর্ভাবঃ"—শঙ্কর।

দেখিতে পাই। তথায় এইরূপ উপদেশ আছে যে—যে সত্তা সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই সত্তাই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই জন্যই সূর্য্য ও চক্ষুঃ পরস্পর পরস্পরের উপকারক। যে সত্তা অগ্নির মধ্যে অবস্থিত, সেই সত্তাই বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত। এই জন্যই অগ্নি ও বাগিন্দ্রিয় পরস্পর পরস্পরের উপকারক। যে সত্তা দিক্ সকলের মধ্যে অবস্থিত সেই সত্তাই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই জন্যই শ্রবণেন্দ্রিয় ও দিক্ সকল (Spaces) পরস্পর পরস্পরের উপকারক *।—ইত্যাদি প্রকারে আমরা 'মধুবিদ্যায়', আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলের মৌলিক একত্ব পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদেরও নানাস্থানে এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সংবর্গ বিদ্যায়' (৪।৩ খণ্ড) আমরা দেখিতে পাই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলি 'বায়ু' (প্রাণ-স্পন্দন) † হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহারা, বায়ুর

* "নচ লোকে পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং জগদেককারণপূর্ব্বকৈক-সামান্যাত্মকানেকপ্রলয়ঞ্চ দৃষ্টং"।—শঙ্কর। যে সকল বস্তু পরস্পর পরস্পরের উপকারক বা সহায়ক উহারা একই মূলকারণ হইতে উৎপন্ন। পাঠক শঙ্করের এই যুক্তিটী ভুলিবেন না।

† শ্রুতি-কথিত এই 'বায়ু' আমাদের পরিচিত স্থূল বায়ু নহে। এই বায়ুকে (Motion) বলা যাইতে পারে। ভিতরে (দেহমধ্যে) যাহা প্রাণ-স্পন্দন, বাহিরে তাহাই 'বায়ু'। এই বায়ুই পরে অগ্ন্যাদির সহিত অনুগতরূপে স্থূল বায়ুরূপে দেখা দেয়।

আশ্রয়েই অবস্থিত রহিয়াছে এবং প্রলয়ে উহারা বায়ুতেই লীন হইয়া যাইবে। আবার, বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তুগুলিও প্রাণ-স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে; উহারা প্রাণ-স্পন্দনকে অবলম্বন করিয়াই আপন আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেছে; এবং গাঢ়নিদ্রার সময়ে বা প্রলয়কালে উহারা সেই প্রাণ-স্পন্দন রূপেই বিলীন হইয়া যাইবে। প্রিয় পাঠক, আমরা এস্থলে, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক পদার্থগুলি যে একই মূল-কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পাইতেছি। প্রাণ-সত্তাই যে সকল পদার্থের মূলে অবস্থিত, তাহা অন্য প্রকারেও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় প্রপাঠকের ত্রয়োদশ খণ্ডে আমরা দেখি যে—এই দেহে পাঁচটী দ্বারপাল আছেন। প্রাণ-স্পন্দনই আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া দৈহিক সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—মূল প্রাণ-শক্তির এই পাঁচ প্রকার অবান্তর ভেদ। এই স্থলে এইরূপ কথা আছে যে, মূল প্রাণ-স্পন্দনই—প্রাণ, চক্ষুঃ ও সূর্য্য এই তিন আকারে অবস্থিত। আবার উহাই—ব্যান, শ্রবণেন্দ্রিয় ও চন্দ্র এই আকারে অবস্থিত। আবার উহাই—অপান, বাগিন্দ্রিয় ও অগ্নিরূপে অবস্থিত। উহাই আবার, সমান, মন ও পর্জ্জন্যরূপে এবং উদান, বায়ু ও আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে। শ্রুতির এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থের মূলে যে প্রাণ-শক্তি, বাক্য, চক্ষুঃ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক

পদার্থের মূলেও সেই প্রাণ-শক্তি। ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকের অষ্টাদশ ও উনবিংশ খণ্ডে, এই মৌলিক কারণ-সত্তার তত্ত্ব অন্য প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে স্থলে—অধ্যাত্ম 'মন' এবং আধিদৈবিক 'আকাশে' ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সেই মনের চারিপাদরূপে এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও দিক্‌কে সেই আকাশের চারিপাদরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল বস্তু যে পরস্পর পরস্পরের উপকারক তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রিয় পাঠক, আমরা এই সকল কথা দ্বারাও বুঝিতে পারিতেছি যে, একই মূল-সত্তা হইতে যখন সূর্য্য-অগ্ন্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ এবং চক্ষুঃ-বাক্ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই সূর্য্য (আলোক) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, এবং অগ্নি (তেজঃ-শক্তি) বাগিন্দ্রিয়ের উপকার করিয়া থাকে। কেন না, যাহা যাহার উপকারক, তাহারা একই মূল-কারণ হইতে অভিব্যক্ত *। ছান্দোগ্যের 'সত্যকাম' এবং 'উপকোশলের' উপাখ্যানেও (চতুর্থ প্রপাঠকের ৩য় হইতে ১৫শ খণ্ড) আমরা এই তত্ত্বই দেখিতে পাই। এস্থলে ব্রহ্মকে 'ষোড়শকলা-বিশিষ্ট' বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চারি কলা ; পৃথিবী, দ্যৌঃ, আকাশ, সমুদ্র—এই চারিকলা ; অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ—এই চারিকলা ; মন, ঘ্রাণ,

* "যচ্চ লোকে পরস্পরোকার্য্যোপকারকভূতং—তদেককারণ-পূর্ব্বকং ······দৃষ্টম"—শঙ্কর।

চক্ষুঃ, শ্রোত্র—এই চারিকলা। ব্রহ্মের এই ষোড়শ-কলা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের সঙ্গে যে প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থরূপে অনুভব না করিয়া, এগুলিকে এক ব্রহ্মেরই পাদরূপে—অংশরূপে—অনুভব করিতে অভ্যাস করিলে, সকল পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল উপদেশের ইহাই উদ্দেশ্য। উপকোশলের উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় যে, আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে যে "পুরুষ" অবস্থিত, আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়েও সেই 'পুরুষ' অবস্থিত। এতদ্দারা ইহাই আমরা পাই যে, সকল পদার্থই এক ব্রহ্ম-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত, এক ব্রহ্ম সত্তাই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল পদার্থের মূলে অবস্থিত। এবং সকল পদার্থই এই ব্রহ্ম-সত্তারই পাদ বা অংশ। কেহই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু নহে। এই জন্য আবার এই উপাখ্যানেই—পৃথিবী, অগ্নি, সূর্য্য, অন্ন, জল, দিক্, নক্ষত্র, চন্দ্র ; প্রাণ, আকাশ, দ্যৌঃ বিদ্যুৎ ; —এই গুলিকে ব্রহ্মেরই 'বিভূতি' বা ঐশ্বর্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেরও প্রায় সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রকার কথাই দৃষ্ট হয় ; হৃদয়, মন, বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি, বাক্য, জল—এই সকল প্রাণ-শক্তির বিকাশ এবং এই সকলের মধ্যে একই 'পুরুষ' অবস্থিত আছেন। প্রাণ-শক্তি অন্নের আশ্রয়ে ক্রিয়া করে। সকল পদার্থের মূলে যে এক ব্রহ্ম-সত্তা অবস্থিত এবং এই মূল ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন পদার্থেরই যে 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন সত্তা

নাই,—এই মহাতত্ত্বই এই সকল উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য। ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম-ব্রাহ্মণে—প্রাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও প্রাণ-শক্তিই যে সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে অবস্থিত—এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। গর্ভস্থভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ-স্পন্দন উদ্ভূত হয় এবং এই প্রাণ-স্পন্দনই, উহার জড়ীয় আধার 'অন্নের' (Matter) সহিত একত্র ক্রিয়া করিতে থাকে। অন্ন হইতেই দেহ ও দেহাবয়বগুলি নির্ম্মিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পন্দন—চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। সুতরাং আমরা এই তত্ত্বই পাইতেছি যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের মূলে প্রাণ-শক্তিই অবস্থিত এবং এই প্রাণ-স্পন্দন হইতে কোন ইন্দ্রিয়েরই 'স্বতন্ত্র' স্বাধীন সত্তা নাই।

২। সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্ম শক্তির অনুভব।

এখন, কি প্রকারে সর্ব্ব-কর্ম্মে ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। কামনাই (Motive) সকল কর্ম্মের মূল *। বিষয়-কামনাই সকাম কর্ম্ম; আর

* কামনাই সকল ক্রিয়ার মূল, শ্রুতি ইহা জানিতেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাসুখংলব্ধ্বা করোতি" এবং "আশেক্ষো কর্ম্মাণি কুরুতে"। সুখপ্রাপ্তিই সমুদয় কর্ম্মের চালক; আশা বা কামনা দ্বারা চালিত হইয়াই লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি বলেন যে, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সুখ দিতে পারে না; পুত্র-বিত্তাদি বস্তু চঞ্চল, ক্ষয়িষ্ণু। ১১৩……পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনাই নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ম্মে ব্রহ্ম-দর্শন কিরূপে করিতে হয়? এজন্য, শ্রুতিতে দুই প্রকার প্রণালীর নির্দ্দেশ আছে।

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ।

এক—যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম-গুলিকে নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ ঐ সকলের উদ্দেশ্য পুত্রবিত্ত-স্বর্গাদি না হইয়া, কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই যদি উদ্দেশ্য হয় এবং যজ্ঞীয় অগ্নি এবং যজ্ঞের উপকরণ ও মন্ত্রাদিতে যদি কেবল ব্রহ্ম-শক্তিই অনুভূত হইতে থাকে, তবে তাহাই নিষ্কাম যজ্ঞ। অপর—বাহিরে যে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ আচরিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে অন্তরে ভাবনাময় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ আছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ইহার বিবরণ আছে। উদ্গাতা নামক পুরোহিত যজ্ঞে সাম-গান উচ্চারণ করিয়া থাকেন; পদ্য ও গদ্যাত্মক মন্ত্র গানে বাঁধিলেই তাহা 'সাম' হয়। উদ্গীথ-প্রণবাদি এই সামগানেরই অংশ বিশেষ। সাম-গান ও যজ্ঞীয় স্তোত্রাদি, স্বর বা বাক্যযোগেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। স্বর বা বাক্য—প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি; কেননা, প্রাণ-বায়ুই কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বর্ণরূপে ব্যক্ত হয় *। এই প্রকারে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে যে উদ্গীথ-প্রণবাদি

* "কোষ্ঠাগ্নিপ্রেরিত-মারুত-নির্ব্বর্ত্ত্যাহি ঋক্; পালনাৎ বাচঃপতিঃ, প্রাণেন হি পাল্যতে বাক্; অপ্রাণস্য শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ"।—শঙ্কর (বৃহৎ ভাং, ১।৩।২০)। এইজন্য প্রাণকে 'বৃহস্পতি'ও বলা যায়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বৃহস্পতি' বা 'ব্রহ্মণস্পতি' দেবতা, এই প্রাণ-শক্তিকে

মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই মন্ত্রে প্রাণ-শক্তিদর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে (প্রথম প্রপাঠক, প্রথম খণ্ড)। দ্বিতীয় খণ্ডে যে 'দেবাসুর-সংগ্রামের' বিবরণ আছে, তাহাতে সমুদায় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া যে প্রাণ-শক্তিরই অধীন এবং ইন্দ্রিয়-বর্গের মধ্যে প্রাণই যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণেও এই একই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দেবাসুরের বিবরণের তাৎপর্য্য এইভাবে প্রদর্শিত হইয়াছেঃ—আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি সর্ব্বদাই বিষয়-প্রবণ। ইন্দ্রিয়বর্গ, স্বার্থ-সুখের উদ্দেশ্যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ স্বাভাবিক বিষয়-প্রবণতাই 'আসুরভাব' বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে শিক্ষাদ্বারা সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করিলে বিষয়-প্রবণতা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয়বর্গ যে অপরিচ্ছিন্ন প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি এই বোধ দৃঢ়তা লাভ করে। ইহাই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গের 'দেব-ভাব' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞীয় মন্ত্রের উচ্চারণ সময়ে, বাক্, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যে সর্ব্বব্যাপক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি,—এই তত্ত্ব যেন সাধকের চিত্তে প্রস্ফুটিত হয়,—এই বিবরণের ইহাই তাৎ-পর্য্য। প্রাণশক্তিই, সকল ইন্দ্রিয়ে অনুগত, অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং প্রাণশক্তি ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও ক্রিয়া থাকিতে পারে না। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ

লক্ষ্য করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। "উপনিষদের উপদেশ," তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় ঋগ্বেদের দেবতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সকলই প্রাণাত্মক।* এই মৌলিক একত্বের কথা শ্রুতি প্রকারান্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাণশক্তি সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে; উহারাই পরে প্রাণি-দেহে যথাক্রমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আকারে বিকাশিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সূর্য্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'দেবতা'; সূর্য্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা; চন্দ্র মনের দেবতা; দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা;—ইত্যাদি। সাধক এই প্রকার ভাবনা করিবেন যে, দেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি পরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছে এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল পরিচ্ছিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব-ব্যাপক সূর্য্য-চন্দ্র-বিদ্যুদাদি ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে; কেননা ইহারা সূর্য্য-চন্দ্রাদিরই অভিব্যক্তি—সূর্য্য-চন্দ্রাদিরই আকার-ভেদ, রূপান্তর মাত্র। ইহাই ইন্দ্রিয়গণের 'দেব-ভাব'-প্রাপ্তি। আবার, সূর্য্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলিও, প্রাণ-

* "যৎস্বরূপ-ব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মত্বমেব লোকে দৃষ্টম্।"—শঙ্কর (মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান)। প্রাণেরই অংশ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে অনুপ্রবিষ্ট আছে। প্রাণকে তুলিয়া লও, দেখিবে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিতে পারিবে না—উহাদের অস্তিত্বই থাকিবে না। "যঃ প্রাণঃ তচ্চক্ষুঃ, যোঽপানঃ সা বাক্; যো ব্যানঃ তচ্ছ্রোত্রং; যঃ সমানস্তন্মনঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরে। একই প্রাণশক্তির ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অতএব প্রাণশক্তি ব্যতীত ইন্দ্রিয়বর্গের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

শক্তিরই অভিব্যক্তি; প্রাণ-শক্তিই সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে; উহারা প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি,—আকার-ভেদ, রূপান্তর মাত্র। সুতরাং সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থগুলি প্রাণ-শক্তি ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। এই প্রকার ভাবনার ফলে সর্ব্বত্র একত্ব-বোধ ফুটিয়া উঠিবে। জগতের প্রত্যেক পদার্থে কেবল এক প্রাণ-শক্তিরই সত্তা ও ক্রিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। কোন পদার্থকেই প্রাণশক্তি ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ করিতে পারা যাইবে না। 'দেবাসুর-সংগ্রামে' শ্রুতি এই প্রকারে প্রাণোপাসনার বিধান দিয়াছেন। ছান্দোগ্যের তৃতীয় হইতে সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত অংশে, যজ্ঞে যে সকল ঋক্ ও সাম মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই ঋক্ ও সাম মন্ত্রে পৃথিব্যাদি-দৃষ্টি ও চক্ষুরাদি-দৃষ্টির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞীয় মন্ত্রে, আধিদৈবিক পদার্থের ও আধ্যাত্মিক পদার্থের ভাবনা করিতে হয়। ইহার ফলে, ইহাদের মূলকারণ প্রাণ-শক্তির ভাবনা আসিয়া পড়িবে। তাহা হইলেই, যজ্ঞীয় মন্ত্রে প্রাণ-শক্তির অনুভব সিদ্ধ হইবে। এই উপদেশের ইহাই লক্ষ্য। ঋক্‌মন্ত্রই গানে বাঁধিলে সাম হয়; সুতরাং সাম—ঋক্-মন্ত্রেরই আশ্রিত। আবার, আকাশে সূর্য্য; অন্তরীক্ষে বায়ু এবং পৃথিবীতে অগ্নি—অনুপ্রবিষ্ট বা আশ্রিত রহিয়াছে। এই সাদৃশ্য-বলে, ঋক্-মন্ত্রগুলিকে আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী বলিয়া ভাবিতে হয়, এবং সাম-মন্ত্রগুলিকে সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নিরূপে ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবে যজ্ঞীয় মন্ত্রে আধিদৈবিক পদার্থের আরোপ করিয়া লইয়া

চিন্তা করিতে হয়। আবার, যজ্ঞীয় মন্ত্রে আধ্যাত্মিক বস্তুর আরোপ করাও কর্ত্তব্য। ঋক্-মন্ত্র ও সাম-মন্ত্র যেমন পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত; তেমনি বাক্য ও প্রাণ; চক্ষুঃ ও চক্ষুঃমধ্যস্থ প্রতিবিম্ব; শ্রবণেন্দ্রিয় ও মন,—এ সকলও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। সুতরাং ঋক্-মন্ত্রগুলিকে বাক্য, চক্ষুঃ ও শ্রোত্ররূপে ভাবনা করিবে এবং সাম-মন্ত্রগুলিকে প্রাণ, চক্ষুঃস্থ প্রতিবিম্ব ও মনরূপে ভাবনা করিবে। এই প্রকারে আরোপ করিয়া লওয়ার পরে, মন্ত্রে প্রাণ-শক্তির অনুভব সহজ হইয়া যাইবে। আধিদৈবিক পদার্থ-গুলির মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির মধ্যে চক্ষুঃই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সূর্য্যমণ্ডলে অনুস্যূত পুরুষ-সত্তা (প্রাণ-স্পন্দন) * এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অনুস্যূত পুরুষ-সত্তা (প্রাণ-স্পন্দন) —উভয়ে স্বতন্ত্র নহে; উভয় সত্তাই এক। এক প্রাণ-স্পন্দনই সূর্য্যে ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। যজ্ঞীয় ঋক্-সামাদি মন্ত্রও প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি; কেননা প্রাণ-বায়ুই কণ্ঠাদি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং এই প্রণালীতে, যজ্ঞে সামমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্রই, বাহিরের সূর্য্যাদি ও ভিতরের ইন্দ্রিয়াদি ও উচ্চারিত মন্ত্র এই সকলে-রই মূলে যে একমাত্র প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, এই মহাতত্ত্ব সাধকের চিত্তে সহজে ফুটিয়া উঠিবে। এই প্রকারে,

* শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অচেতনেও 'পুরুষ' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। "আদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষৌ একস্থ সত্যস্থ ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষৌ (সত্যস্থ = হিরণ্যগর্ভস্থ স্থত্রাত্মনঃ)"॥

যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্রে ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট আছে। ঐতরেয় উপনিষদে, দুই বর্ণে মিলিত হইয়া যে 'সন্ধি' হয়, তাহা-তেও প্রাণ-শক্তির অনুভবের তত্ত্ব আমরা দেখিতে পাই। পূর্ব্বের 'ঈকার' ও পরবর্ত্তী 'উকারে' মিলন হইয়া 'য়ু' হইল। এস্থলে ঈকারকে আকাশরূপে, উকারকে পৃথিবীরূপে ভাবনা করিবে। বায়ু,—এই আকাশ ও পৃথিবীকে সম্মিলিত করিয়া দেয়; সুতরাং 'য়ু' অক্ষরকে বায়ুরূপে ভাবনা করিবে। আবার, ঈকারকে মনরূপে, উকারকে বাক্যরূপে এবং 'য়ু' অক্ষরকে প্রাণরূপে ভাবনা করিবে। কেননা প্রাণেরই অভিব্যক্তি বাক্য এবং মনও বাক্যোচ্চারণে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং প্রাণই, বাক্য ও মনের মিলন করিয়া দেয়। এই জন্যই উভয় বর্ণের সন্ধিতে প্রাণ-দর্শন বিহিত হইয়াছে। এই প্রকারে গ্রন্থাধ্যয়ন-কালে, সন্ধিযুক্ত বর্ণগুলির প্রত্যেক অংশে আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক পদার্থের আরোপ করিয়া লইয়া, ভাবনার উপদেশ আছে। এসকলেরই উদ্দেশ্য, উচ্চারিত বর্ণে ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব এবং কি বাহিরের কি ভিতরের, সকল বস্তুরই মূলে ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব। ছান্দোগ্যের অষ্টম হইতে একাদশ খণ্ডে শিলক ও উষস্তির উপাখ্যানে প্রকারান্তরে যজ্ঞীয়মন্ত্রে প্রাণ-শক্তির অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে। সামাদিমন্ত্র, স্বর বা বায়ুদ্বারা উচ্চারিত হয়; বাক্য—প্রাণ-শক্তিরই ক্রিয়ামাত্র। আবার প্রাণ-শক্তি অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া থাকে; অন্ন-গ্রহণজনিত সামর্থ্যই, প্রাণের পোষণ করে। কিন্তু অন্ন—জলেরই পরিণতি।

জলের আশ্রয়—আকাশ এবং আকাশ (প্রাণ-স্পন্দনবিশিষ্ট) ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। এইরূপে সামমন্ত্র, ব্রহ্ম-সত্তার কথা চিত্তে ফুটাইয়া তোলে। উষস্তি বলিয়াছেন যে, আদিত্য, প্রাণ ও অন্ন—ইহারাই যজ্ঞীয়মন্ত্রের প্রকৃত দেবতা। প্রাণ-শক্তিই প্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদি উৎপন্ন করিয়াছে এবং প্রাণই দেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে ক্রিয়া করে। বাগিন্দ্রিয়ও প্রাণেরই অভিব্যক্তি। সর্ব্বত্রই প্রাণ-স্পন্দন, অন্নের (Matter) আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং প্রাণই মূলতঃ যজ্ঞীয়মন্ত্রের উপাস্য দেবতা। ছান্দোগ্যের সমগ্র দ্বিতীয় প্রপাঠকে 'সাপ্তভক্তিক' ও 'পাঞ্চভক্তিক'* সামোপাসনা বিহিত হইয়াছে। সামগানের পাঁচ বা সাত প্রকার অবয়বের সহিত পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থগুলিকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়া লইয়া ভাবনা করিবে। এ সকলের তাৎপর্য্য এই যে—প্রাণ-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি-স্বরূপ পৃথিবী, অন্তরীক্ষাদি লোক সকল ও সূর্য্য-অগ্ন্যাদি পদার্থ সকল যেন সকলেই সামগানে নিমগ্ন রহিয়াছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তাদি ঋতু-নিচয় যেন সতত সামগানেই মগ্ন। মেঘের গর্জ্জনে, বৃষ্টির

---

* যজ্ঞীয় সাম গানের পাঁচটী বা সাতটী অবয়ব আছে। হিংকার (সকল উদ্গাতৃ-পুরুষ একত্র মিলিয়া যে হুংকারধ্বনি করিয়া থাকেন), প্রস্তাব (প্রস্তোতা যে অংশ গান করেন), উদ্গীথ (যাহা উদ্গাতৃপুরুষ গান করেন, ইহাই প্রধান অংশ), প্রতিহার (যাহা প্রতিহর্ত্তা কর্ত্তৃক গেয়) এবং নিধন (যাহা পাঁচজনে একত্রে মিলিয়া গেয়)—এই পাঁচ অবয়ব এবং আদি ও উপদ্রব—এই সাত প্রকার অবয়ব।

বর্ষণনাদে, বিদ্যুতের নির্ঘোষে—সর্ব্বত্র যেন প্রাণ-শক্তিদ্বারা উদ্ভূত সাম-গান গীত হইতেছে। পশু পক্ষ্যাদির কণ্ঠ-স্বরেও যেন সেই সাম-গানেরই ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সমুদয় পদার্থ প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া, এইরূপে সমুদায় পদার্থ হইতেই যেন নিয়ত সর্ব্বাবস্থায় সাম-গান উত্থিত হইতেছে;—এই উপদেশ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত, যজ্ঞীয় মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। মধুমক্ষিকা যেমন নানাবিধ পুষ্পের রসকে মধুরূপে পরিণত করে, তদ্রূপ চতুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্ম ও প্রণব—এই পাঁচ প্রকার কুসুমের রস, সেই সকল কর্ম্ম ও মন্ত্র দ্বারা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাদি পাঁচ প্রকার অমৃতে পরিণত হইয়া, সূর্য্য-মণ্ডলরূপ মধু-চক্র নির্ম্মিত হয়। এই মধুচক্র—অমৃত ব্রহ্মেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত। অতএব যজ্ঞীয় কর্ম্ম ও মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মামৃতেরই লাভ হয়, এই মহোপদেশ নিবদ্ধ আছে। সাধক এই প্রকারে মধুচক্র-রূপে সূর্য্য-মণ্ডলের ভাবনা করিতে পারিলে, প্রাণ-শক্তির বিকাশ-স্বরূপ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়শক্তি, বীর্য্য ও অন্নলাভে সমর্থ হন। ছান্দোগ্যের দ্বাদশ খণ্ডে নিত্য উপাস্য গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মশক্তির অনুভব কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ৫।১৪ ব্রাহ্মণেও গায়ত্রীতে ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট আছে।* যত প্রকার ছন্দঃ আছে, তন্মধ্যে

* ছান্দোগ্যে ছয়টী করিয়া অক্ষর গণনায় গায়ত্রীর চারি পাদ কথিত হইয়াছে। গায়ত্রীতে ব্রহ্ম-দর্শন ছান্দোগ্যে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ (ভূত), শব্দদ্বারা (বাক্যদ্বারা) বুদ্ধির

গায়ত্রীই সর্ব্বপ্রধান ছন্দঃ। ছন্দমাত্রই বাক্যময়। বাক্যমাত্রই প্রাণেরই অভিব্যক্তি। অতএব প্রাণ-শক্তিই গায়ত্রী ছন্দের আত্মা বা সার *। প্রত্যেক পাদে আটটী অক্ষর করিয়া গণনা করিলে, গায়ত্রীর তিন পাদ হয়। ভূমি (ভূঃ), অন্তরীক্ষ (ভুবঃ) আকাশ (স্বঃ)—এই তিন লোক গায়ত্রীর প্রথম পাদরূপে কল্পিত হইতে পারে। এই তিনলোক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং গায়ত্রীর প্রথম পাদে প্রাণ-শক্তির অনুভব কথিত হইল।

গোচরীভূত হয়। গায়ত্রীও অক্ষর-স্বরূপিণী। সুতরাং গায়ত্রী ভূতাত্মক। পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল ভূত প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবী আবার প্রাণি-দেহরূপে অবস্থিত। সুতরাং ভূতাত্মক গায়ত্রীও পৃথিবী-রূপিণী এবং দেহ-রূপিণী। দেহে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত এবং হৃদয়ে সকল প্রাণ (ইন্দ্রিয়বর্গ) প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেহ-রূপিণী গায়ত্রীও হৃদয়-রূপিণী এবং প্রাণ-রূপিণী। অতএব এইপ্রকারে—গায়ত্রী, ভূত-বাক্য-পৃথিবী-দেহ-প্রাণাদি বিকারাত্মক। ইহাই প্রাণাদি (ইন্দ্রিয়)-বিশিষ্ট পুরুষের বিকারময় রূপ। এতদ্ব্যতীত পুরুষের একটী অমৃত, নির্ব্বিকার, ত্রিপাদময় রূপ আছে। ভূতাত্মক বিকারবর্গই বিরাট্ পুরুষের একপাদ। এতদ্ব্যতীত পুরুষের অমৃত 'ত্রিপাদ' সকলবিকারের অতীত। জীবের বহিঃস্থ আকাশ এবং জীব-হৃদয়ের মধ্যস্থ আকাশ—উভয়ই বিকারবিশিষ্ট। বাহিরের আকাশে বিবিধ বিকার অবস্থান করিতেছে। হৃদয়াকাশেও বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞান প্রকাশিত রহিয়াছে। বাহিরে ও ভিতরে অপর একটী অব্যক্ত-আকাশ আছে। ইহাকে পরম 'ব্যোম' বা প্রাণ-গুহা বলে। এই অব্যক্ত প্রাণই সকল বিকারে অনুস্যূত রহিয়াছে।

* প্রাণই কণ্ঠাদিস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাক্যরূপে ব্যক্ত হয়।

গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ—ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদাত্মক। ঋক্, যজুঃ, সাম—এইগুলি মন্ত্রাত্মক; মন্ত্রমাত্রই বাক্যদ্বারা উচ্চারিত হয়; বাক্যমাত্রই প্রাণেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদে প্রাণ-শক্তির অনুভব কথিত হইল। গায়ত্রীর অবশিষ্ট তৃতীয় পাদটী প্রাণ, অপান ও ব্যান স্বরূপে কল্পিত হইতে পারে। মূল প্রাণ-শক্তিই দেহে প্রাণ, অপান ও ব্যান এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। অতএব প্রাণ, অপান ও ব্যান—ইহারা প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং, শব্দ-স্বরূপিনা গায়ত্রীর তৃতীয় পাদেও প্রাণ-শক্তির অনুভব কথিত হইল। এই পরিদৃশ্যমান্ তিনটীপাদ ব্যতীত, গায়ত্রীর একটী অদৃশ্য চতুর্থ পাদ আছে। এই চতুর্থ পাদটী সকল লোকের অতীত, সকলের শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সত্তা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যগত সত্তা, * উভয় সত্তা স্বতন্ত্র নহে; উভয় সত্তাই এক। যে প্রাণ-স্পন্দন সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থিত, সেই প্রাণ-স্পন্দনই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সূর্য্য-মণ্ডলস্থ প্রাণ-সত্তাই, গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ। কেননা, ইহাই সর্ব্বপ্রকার স্থূল সৃষ্টপদার্থের সার। কিন্তু সূর্য্য, চক্ষুতেই প্রতিষ্ঠিত। কেননা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই ত সূর্য্যকে প্রকাশিত

* "তাবেতা বাদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষৌ একস্য "সত্যস্য" ব্রহ্মণঃ সংস্থান-বিশেষৌ"—৫।৫।২ { 'সত্যস্য' = হিরণ্যগর্ভস্য সূত্রাত্মনঃ —৫।৫।১ }।

"গায়ত্র্যাখ্য-বিকারেঽনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং"—ইত্যাদি বেদান্তদর্শন দেখ।

করিয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে, সূর্য্য-মণ্ডলের অস্তিত্ব বুঝা যাইত না। এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ-স্পন্দনেরই বিকাশ। সুতরাং প্রাণ-স্পন্দনই,—শব্দময়ী গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ। ইহাতেই অপর তিন পাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এইরূপে গায়ত্রীতে প্রাণ-দর্শন বা ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে। গায়ত্রীর এই চারিপাদের তত্ত্ব, জনক বুড়িলনামক এক ব্যক্তিকে বলিয়া দিয়াছিলেন। আবার, বৈদিক মন্ত্রে 'ব্যাহৃতি' উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটীই ব্যাহৃতি নামে পরিচিত। যে প্রাণ-স্পন্দন সূর্য্য-মণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট, তাহারই অবয়বরূপে—অঙ্গরূপে—এই ব্যাহৃতিকে ভাবনা করিবে। ভূঃ তাহার মস্তক; ভুবঃ উহার বাহু এবং স্বঃ উহার পাদরূপে কল্পিত হইয়াছে।

এই প্রকারে শ্রুতি, যজ্ঞীয়মন্ত্রে ও দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে প্রাণ-শক্তির অনুভব বা ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। ঐহিক পুত্র-বিত্তাদি এবং পারত্রিক স্বর্গসুখাদির কামনা না করিয়া, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনায় ও ব্রহ্ম-সত্তানুভবার্থই যজ্ঞ আচরিত হয় এবং যদি যজ্ঞের উপকরণগুলিকে ও যজ্ঞীয় মন্ত্রকে ব্রহ্ম-শক্তিরূপেই (প্রাণশক্তি) ভাবনা করা যায়, তখন তদ্দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইতে থাকে এবং চিত্ত ব্রহ্ম-ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে। ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্ম। এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, কেবল-ভাবনাত্মক যজ্ঞের আচরণের যোগ্যতা জন্মে।

এখন কেবল-ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। উপনিষদে নানাভাবে এই প্রণালীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক কার্য্যগুলিদ্বারা যেন সর্ব্বদা আত্ম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এইরূপ ভাবনা করিবে। ইন্দ্রিয়বর্গ যখন বিষয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতেও যেন আত্ম-হোম সম্পাদিত হইতেছে—এইরূপ ভাবনাদ্বারা অন্তরে যজ্ঞ নির্ব্বাহিত করা যাইতে পারে। এই ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে আত্মা যেন বহ্নি-স্বরূপ; বিষয়বর্গ যেন তাহার ইন্ধন। এই ইন্ধন-যোগে প্রদীপ্ত ইন্দ্রিয়-বর্গ যেন আত্মাগ্নিতে নিয়ত হোম করিতেছে।* আবার, প্রাণ-বায়ুর নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে—জাগরিতাবস্থায় ও নিদ্রাবস্থায় ও সুষুপ্তিতে—যেন নিয়ত আত্ম-হোম সম্পাদিত হইতেছে। নিদ্রায় দেহাভ্যন্তরে প্রাণাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিয়া যেন হোমক্রিয়ায় নিযুক্ত রহিয়াছে—এইরূপ ভাবনার বিধান আছে।† আবার, পুরুষের

(খ)। ভাবনাত্মক-যজ্ঞ।

---

* এইরূপ ভাবনার ফলে বিষয়াসক্তি কমিতে থাকে; সর্ব্বাবস্থায় কেবলমাত্র ব্রহ্মশক্তিরই অনুভব হইতে থাকে। "সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ, সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ"—মুণ্ডক, ২।১।৮॥ উপনিষদের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ হইতে ৩২৭ পৃঃ দেখ।

† "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি⋯যদুচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি সমানঃ। মনো বাব যজমানঃ"—ইত্যাদি, প্রশ্নোপনিষদ, ৪।৩—৪॥ উপনিষদের উপদেশ, তৃতীয় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ হইতে ১২৮ পৃঃ দেখ।

বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থায় যেন ত্রৈকালিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে। জীবন-কালকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া* এই তিনকালেই যেন প্রাণাগ্নিহোত্র আচরিত হইতেছে, এইরূপ ভাবনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। দৈনিক ভোজনাদি ব্যাপারেও যজ্ঞ-ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। যে অন্ন গৃহীত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রাণের তৃপ্তি হয়; প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়; এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে সূর্য্যাদি যাবতীয় পদার্থের তৃপ্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকারে 'প্রাণাগ্নিহোত্র' উপদিষ্ট হইয়াছে†। এইপ্রকার ভাবনার ফলে প্রত্যেক

---

* "পুরুষো বাব যজ্ঞঃ"—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-উপনিষদের ৩।১৬—১৭ খণ্ডে এই পুরুষ যজ্ঞের বিবরণ আছে। ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রথম, ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় এবং ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয়;—জীবন-কালকে এই তিনভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। যজ্ঞও, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই তিন কালে সম্পাদিত হয়। প্রাতঃকালীন যজ্ঞে ২৪ অক্ষরাত্মক গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহৃত হয়; মধ্যাহ্নযজ্ঞে ৪৪ অক্ষরাত্মক ত্রিষ্টুপ্‌মন্ত্র এবং সায়াহ্ন-কালীন যজ্ঞে ৮৪ অক্ষরাত্মক জগতীমন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই সকল সাদৃশ্য-বলেই পুরুষজীবনকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঘোর নামক ঋষির নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ এই পুরুষ যজ্ঞের উপদেশ পাইয়াছিলেন।

† "তৎ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ ... প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি; চক্ষুষিতৃপ্যতি আদিত্যস্তৃপ্যতি"—ইত্যাদি। ছান্দোগ্য, ৫।১৮—২৪। এইরূপ আমরা, বৃহদারণ্যকের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমেই ভাবনাত্মক "অশ্বমেধ-যজ্ঞ" দেখিতে পাই। ভাবনাশীল সাধক, বিরাট পুরুষকেই অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া লইবেন। অথবা আপনাকেই অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া লইবেন।

প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় ও ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ায় এবং সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মশক্তির অনুভব হইতে হইতে, কোন ক্রিয়ারই আর ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না;—ব্রহ্মশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' ভাবে আর কোন ক্রিয়ারই বোধ থাকে না। সকল ক্রিয়াতেই ব্রহ্মশক্তি অনুস্যূত এবং সকল ক্রিয়াই ব্রহ্মার্থ—এই রূপ ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করাই এই সকল উপদেশের লক্ষ্য।

মূলগ্রন্থে কেন এই যজ্ঞাত্মক অংশগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে?

বর্ত্তমান-কালে, ভারতবর্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যজ্ঞে ব্রহ্মদর্শন বা দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যজ্ঞ-ভাবনা—বর্ত্তমানকালে সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হইতে এই সকল যজ্ঞাত্মক-অংশ আমরা মূল-গ্রন্থে পরিত্যাগ করিয়াছি। এই অবতরণিকাতেই ঐ সকল অংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১। অধ্যাত্ম-যোগ বা দহর-বিদ্যা।

এইরূপে, সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বকর্ম্মে সাধক যেমন ব্রহ্মদর্শন করিতে অভ্যাস করিবেন; তখন সাধক সঙ্গে সঙ্গে "অধ্যাত্ম-যোগের" অবলম্বন করিবেন। ইহাকে 'অহংগ্রহোপাসনা'ও বলা যাইতে পারে। ইহাই মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে, শব্দ-স্পর্শাদি-রূপে মনের স্পন্দন হইয়া

সূর্য্য, অগ্নি, দিক্ প্রভৃতিকে যথাক্রমে সেই অশ্বের চক্ষুঃ, বাক্য প্রভৃতি অঙ্গ রূপে কল্পনা করিবেন। এই কল্পনার ফলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনা সিদ্ধ হইবে।

থাকে, সেই স্পন্দনই সংস্কারের আকারে মনে নিবদ্ধ থাকে এবং পরে মনে তদ্বিষয়ক স্মৃতি * উদিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ-দর্শন শিক্ষা করিতে করিতে, তখন আর মনের শব্দ-স্পর্শাদিরূপে স্পন্দন হয় না এবং তাদৃশ স্মৃতিরও উদ্ভব হয় না। তখন বিষয় ও কর্ম্ম-মাত্রকে—ব্রহ্মশক্তির, ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের, বিকাশরূপে মনের স্পন্দন হইতে থাকে এবং তদনুরূপ স্মৃতিরও উদয় হইতে থাকে। ইহারই নাম মনকে বিষয় হইতে নিরোধ করা এবং মনকে ব্রহ্মাভিমুখী করা। এই ভাবে একাগ্র হইয়া চিন্তা বা ধ্যান করিতে থাকিবে। ইন্দ্রিয়বর্গকে এইরূপে বিষয় হইতে সংযত করিয়া লইয়া বুদ্ধিতে স্থির করিতে হয়। বুদ্ধি,—আত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই, বিবিধ বিজ্ঞানাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বুদ্ধির প্রকাশক ও প্রেরক এই আত্ম-জ্যোতিতে মনকে দৃঢ়রূপে ধারণা করিবে। †

---

* "জাগ্রৎ-প্রজ্ঞাঽনেকসাধনা বহির্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃ-স্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে।— ··দর্শন-স্মরণে এব হি মনঃস্পন্দিতে"।—মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যঃ। "ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞাভিরবিদ্যারূপাভিঃ গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপেণ মনঃস্পন্দতে।" আনন্দগিরি।

† "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্"। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি"।—কঠোপনিষদ্ ২।১২। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে" ইত্যাদি এবং "ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত" (মুণ্ডক, ২।২।৩)—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এইরূপ করিতে করিতে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি-রূপে ও সঙ্কল্প-বিকল্পাদি এবং বৈষয়িক কামনারূপে আর মনের স্পন্দন হয় না; তখন কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কামনাতে এবং ব্রহ্মাত্ম-বোধেই নিরন্তর মনের স্পন্দন হইতে থাকে *। ইহাকেই 'অধ্যাত্ম-যোগ' বলে।

নৈতিক চরিত্র গঠনের সাধন।

সত্য-পরায়ণতা, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, চিত্তের একাগ্রতারূপ তপঃ, সর্ব্বভূতে দয়া, কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনা এবং শ্রদ্ধা সহকারে হিরণ্যগর্ভ, বিরাটের সর্ব্বত্র ভাবনা,—এইগুলিকে এই অধ্যাত্ম-যোগের 'সহায়' রূপে কথিত হইয়াছে †। এইরূপে সর্ব্বপদার্থে, সর্ব্ব-

* "(অবিদ্যোপরমে) চৈতন্যাতিরিক্তস্য গ্রাহ্যগ্রাহকভেদস্য মনঃস্পন্দিতস্য অসত্ত্বং সাধয়তি।... তদা আত্মাতিরিক্তার্থাভাবে নিশ্চিতে... মনসো মনস্ত্বং ন বর্ত্ততে; তথাপি স্ফুরতি চেৎ, আত্মৈবেতি বিবেকিদৃষ্ট্যা ন মনো নামাস্তীতি"।—গৌড়পাদ কারিকার ভাষ্য-ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি, ৩।৩০—৩১॥

† "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যকজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" (মুণ্ডক, ৩।১।৫) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। সত্য-পরায়ণতার প্রশংসা মুণ্ডকে উল্লিখিত আছে:—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং," সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা, যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্" (৩।১।৬)। ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা ছান্দোগ্যে নিবদ্ধ আছে;—"তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (৮।৩,—৪) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। সর্ব্ব ভূতে দয়ার

ক্রিয়ায় এবং আত্ম-হৃদয়ে সর্ব্বদা ব্রহ্মদর্শনের ও ব্রহ্ম-ভাবনার অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের চিত্তে পূর্ণ অদ্বৈতবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আর সাধকের কোন কামনা থাকে না *। তিনি নিত্য-তৃপ্ত হইয়া যান। মৃত্যুর পরও সাধক উন্নতলোকে নিয়ত ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে করিতে মহানন্দে পূর্ণ হইয়া বিমুক্ত হইয়া যান।

আমরা ব্রহ্ম-সাধনের যে প্রণালীর বিবরণ প্রদর্শন করিলাম,

কথা বৃহদারণ্যক, ৫।২ ব্রাহ্মণে নিবদ্ধ আছে। "ক্রূরা যূয়ং হিংসাপরা অতো দয়ধ্বং প্রাণিষু দয়াং কুরুত" ইত্যাদি দেখ। ব্রহ্ম-কামনার প্রশংসা ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয় এবং মুণ্ডকে উল্লিখিত আছে;—"বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্, তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। তপ ও শ্রদ্ধার প্রশংসা মুণ্ডকে আছে;—"তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্তি·····সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি, যত্রামৃতঃ পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা" (১।২।১১)। অতএব পাঠক দেখিতেছেন যে, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে শ্রুতিতে বা বেদান্তে 'নৈতিকচরিত্র'-(Ethical character)-গঠনের' কোন কথা নাই, তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। সত্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে যদি সাধু-জীবন গঠন না করে, তবে আর কে করিতে পারে?

* এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "বিবেক-চূড়ামণি" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলং। যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানাকার্য্যং জুগুপ্সিতং, পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত্তুমর্হতি"? (৪২৩ শ্লোক)।

স্তব এবং প্রার্থনা—ব্রহ্মসাধনের প্রধান অঙ্গ।

তাহা হইতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যপরায়ণতা, সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতিকে ধর্ম্মজীবন-গঠনের উপযোগী উপকরণরূপে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে, বুদ্ধদেব সর্ব্বভূতে দয়া ও নৈতিক চরিত্র লাভ করাকে ধর্ম্ম-সাধনের মুখ্য অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা শ্রুতিরই উপদেশ। এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি যেমন ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রুতিতে স্তব এবং প্রার্থনা এই দুইটীকেও ব্রহ্মোপাসনার বা অধ্যাত্ম যোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্" *—ইত্যাদি স্তব নির্গুণপ্রধান, এবং "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" †—

ইত্যাদি স্তব সগুণপ্রধান। জ্ঞান, সদ্বুদ্ধি, সদ্গুণাদিলাভের জন্য প্রার্থনা; অন্ন, প্রজা, পশু ও সমাজ রক্ষার জন্য প্রার্থনা—সগুণপ্রার্থনা, এবং অসৎমার্গ হইতে ও পাপ হইতে রক্ষার প্রার্থনা প্রভৃতি নির্গুণ-প্রার্থনার অন্তর্গত।

"রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"।—

---

* মূল গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

† মূল গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

(শ্বেতাশ্বতর উঃ)—এই ভাবের মন্ত্রগুলি সগুণপ্রার্থনার অন্তর্গত এবং

"মা নস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষিমানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ বীরান্ মা নো রুদ্র ! ভামিতোবধীঃ"—

এইগুলি নির্গুণপ্রার্থনার অন্তর্গত * ।

৪। এস্থলে একটী কথা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা ব্রহ্মসাধন সম্বন্ধে শ্রুতির যে প্রকার মতের কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতেই পাঠক দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধনে কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সংযোগ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম নিতান্ত বিরোধী বলিয়া, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের 'সমুচ্চয়' (সংযোগ বা একত্র অনুষ্ঠান) হইতে পারে না। অতএব বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী † । আমরা কিন্তু শঙ্করভাষ্য পড়িয়া এরূপ কথা বুঝি নাই। যাঁহারা সর্ব্বক্রিয়ায়

ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের স্থান আছে কি না ?

* "হে রুদ্র ! তুমি আমাদিগের অনুকূল হও, এবং আমাদিগকে অনুকূল-পথে সর্ব্বদা রক্ষা কর"।—ইত্যাদি। প্রতিদিন সহস্র-কণ্ঠে উচ্চারিত সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী-মন্ত্র এই সগুণ-প্রার্থনারই অন্তর্গত।

"হে রুদ্র ! আমাদের পুত্র-পশু প্রভৃতিকে বধ করিও না ; বীর-পুত্র-লাভের প্রতিকূল হইও না"—ইত্যাদি।

† পণ্ডিত Paul Deussen তাঁহার নব-প্রকাশিত Philosophy of the Upanisads নামক গ্রন্থেও, এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ও সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম-স্বরূপের ভাবনা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শঙ্করাচার্য্য কেবল সকাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে—ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশে—সম্পাদিত করিবার বিধি, শঙ্করাচার্য্য নিষেধ করেন নাই। এরূপ সাধকের পক্ষে, ব্রহ্মোদ্দেশে ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিত্যকর্ম্মের বিধি দেওয়া হইয়াছে। ভাবনাত্মক কর্ম্মও শঙ্করাচার্য্য নিষেধ করেন নাই, তাহা পাঠক উপর হইতেই বুঝিয়াছেন। যখন পূর্ণরূপে অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিয়া সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া যান, কেবল তখনই শঙ্করাচার্য্য তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কাম-কর্ম্মেরও স্থান রাখেন নাই। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের নিষেধ কেবল সেই প্রকার সাধকের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; ইহাই শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। কেবল যখন একেবারে অদ্বয়বোধ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞানের সঙ্গেই কেবল, শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বিধান করেন নাই। কিন্তু যখন সকল পদার্থে ও সকল ক্রিয়ায় এবং সর্ব্বকামনায় ব্রহ্মদর্শন করিতে সাধক অভ্যাস করিতেছেন এবং তদনুসারে ভাবনাময় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সমুচ্চয়েরই বিধান করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পরলোকে গতির যে তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দারাও আমরা একথা বুঝিতে পারি *।

* (১) "সমগ্র-কর্ম্মাশ্রয়ভূতস্য 'প্রাণস্য' উপাসনানি উক্তানি, 'কর্ম্মাঙ্গ-সাম-বিষয়ানিচ" (পাঙ্কভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ পৃথিব্যাদিদৃষ্ট্যা

যাঁহারা কেবল-কর্ম্মী (দেবতাজ্ঞান-বিহীন), তাঁহাদের "পিতৃযান" মার্গে চন্দ্রলোকে গতি হয়। যাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা দেবতার (ব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে) আরাধনা করেন তাঁহারাও পিতৃযান-মার্গাবলম্বনে দেব-লোকে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই পুনরাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা দেবতার পরিবর্ত্তে, ব্রহ্মোদ্দেশে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন, কিংবা যাঁহারা ব্রহ্মোদ্দেশে ভাবনাত্মক যজ্ঞাদি কর্ম্ম বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনাদি রূপ উপাসনা করেন, তাঁহারা "দেবযানমার্গ" দ্বারা উন্নততর দেব-লোকে প্রবেশ করেন। ইহাঁদের কাহারই পুনরাবৃত্তি নাই। সেই সকল উন্নত-লোকে যতই ব্রহ্মজ্ঞান পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ততই তদপেক্ষাও উন্নততর লোকে উন্নীত হইয়া, তাঁহাদের ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি ঘটে; তৎপরেই ইহাঁদের মুক্তি-লাভ। কিন্তু যে সকল পুরুষ ইহ-জীবনেই জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন লোক-বিশেষে

পিতৃযান ও দেবযান মার্গ।

উত্ক্রান্ত্যর্থঃ)। অনন্তরঞ্চ 'গায়ত্রীসাম' বিষয়দর্শনমুক্তম্। সর্ব্বমেতৎ কর্ম্মচ জ্ঞানঞ্চ নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি। (২) সকামস্য তু জ্ঞানরহিতস্য 'কেবলানি শ্রৌতানি স্মার্ত্তানি চ কর্ম্মাণি" দক্ষিণমার্গ প্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি। (৩) স্বাভাবিক্যা তু অশাস্ত্রীয়য়া 'প্রবৃত্ত্যা' পশ্বাদিস্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ"—শঙ্কর-ভাষ্য, (কেনোপনিষদুপক্রমণিকায়াম্)। (৪) "কিন্তু বিদ্বান্ ইহৈব ব্রহ্ম ভবতি, কর্ম্মাভাবে গমন-কারণাভাবাৎ প্রাণবাগাদয়ো নোৎক্রামন্তি" (বৃহদারণ্যক-ভাষ্য)।

গতি হয় না। মৃত্যুর পরই মুক্তি উপস্থিত হয়। এরূপ পুরুষেরই পক্ষে কোনও রূপ কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে, শঙ্কর-ভাষ্যের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিয়া লইব।

ব্রহ্মজ্ঞান ও নিষ্কামকর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে।

শঙ্করাচার্য্য যেখানেই কর্ম্মের নিন্দাবাদ * করিয়াছেন, সকাম-কর্ম্মই তাহার লক্ষ্য। যজ্ঞাদি-কর্ম্মের স্বর্গাদি কামনাই লক্ষ্য স্থল বলিয়া, তাহা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির হেতু। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অন্যতর পন্থা নাই। এই জন্যই তিনি মুক্তিতে বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন এবং মুক্তি যে কেবল জ্ঞানেরই ফল কর্ম্মের ফল নহে, তাহা প্রতিপাদন

* কাম্য-কর্ম্মের অনিষ্ট নিবারণ করাই শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কেন এরূপ হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। লোকে যজ্ঞের ধূম-জালে অন্ধ হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান একেবারে ভুলিতে বসিয়াছিল। নিষ্কামকর্ম্ম ভুলিয়া, ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া দিয়া, লোকে কেবল আত্ম-সুখার্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকাম-কর্ম্মের সহিত চরম ব্রহ্ম-জ্ঞানের পার্থক্য, মনুষ্যের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেবের উপদেশের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া লোকে 'শূন্যবাদী, হইয়া উঠিয়াছিল। সেই শূন্য-বাদের স্থলে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করাও শঙ্করাচার্য্যের অন্যতর লক্ষ্য ছিল।

করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা, ধ্যানাদি নিত্য-কর্ম্মকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চরম ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া গেলে, আর নিষ্কাম-কর্ম্মেরও আবশ্যকতা থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ বিচার আছে। আমরা পাঠককে সেই স্থলটী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মনের অভিপ্রায় এই স্থলটীতে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্থলটী বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ। প্রথমতঃ সকাম কর্ম্ম দ্বারা যে মোক্ষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম-লাভ হইতে পারে না, ইহা দেখাইয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, নিষ্কাম-কর্ম্ম দ্বারাও সেই চরম, অদ্বয়-ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান দ্বারাই এরূপ ব্রহ্ম বা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব। অর্থাৎ চরম ব্রহ্ম-জ্ঞানে সকাম ও নিষ্কাম কোন প্রকার কর্ম্মেরই প্রবেশ নাই। নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই কেন? শঙ্কর বলেন,—

"অনারভ্যত্বান্মোক্ষস্য"।

মোক্ষ ত আর 'কার্য্য' নহে যে কোনও সাধন দ্বারা তাহা লাভ করা যাইবে। মোক্ষকে একেবারে চরমব্রহ্ম-জ্ঞানরূপে ধরিয়া লইয়া, শঙ্কর বিচারের প্রথম অংশেই ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জ্ঞানেরই একমাত্র ফল মোক্ষ; নিষ্কাম-কর্ম্মের ফল মোক্ষ হইতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে "চিত্ত-শুদ্ধি" জন্মে। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে কি হয়? চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই জ্ঞান জন্মে। অতএব নিষ্কাম-কর্ম্ম শঙ্করের মতে মুক্তির

গৌণ কারণ হইতেছে। ইহার পরেই তিনি দেখাইতেছেন যে, নিষ্কাম-কর্ম্মের ফল চিত্ত-শুদ্ধি।—

"নিরভিসন্ধেঃ কর্ম্মণো বিদ্যাসংযুক্তস্য বিশিষ্ট-কার্য্যান্তরারম্ভে ন কশ্চিদ্বিরোধঃ"।

যে কর্ম্মে কোন অভিসন্ধি নাই, তাহার আচরণে যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি না হউক, তথাপি তদ্দ্বারা বিশিষ্ট একটী ফল পাওয়া যায়। সে ফলটি কি?

"আত্মসংস্কারার্থং নিত্যানি কর্ম্মাণি করোতি।"

আত্ম-সংস্কার বা চিত্ত-সংস্কারই উহার ফল। নিষ্কাম-কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে কি হয়? শঙ্কর বলেন—

"সংস্কৃতশ্চ স আত্মযাজী তৈঃ কর্ম্মভিঃ সমং দ্রষ্টুং সমর্থো ভবতি। তস্য ইহ বা জন্মান্তরে বা সমমাত্মদর্শন মুৎপদ্যতে" বৃহৎ ভাং, ৩।৩।১।*

নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, আত্ম-দর্শন উপস্থিত হয়।†

"জ্ঞানযুক্তানাং নিত্যকর্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তি-সাধনত্ব প্রদর্শনার্থম্"।

* আনন্দগিরি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যো হি নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানজনিতাপূর্ব্ববশাৎ পরিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সম্যক্‌ধীযুক্তো ভবতি"।

† ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্যে শঙ্কর বলেন—"সর্ব্বৈর্হি যজ্ঞদানতপোভিঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ যমনিয়মৈশ্চ আত্মজ্ঞানমুৎপাদ্যম্" (১।১।১)।

অতএব, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। সুতরাং, যদিও জ্ঞানই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মুক্তির হেতু, তথাপি নিষ্কাম-কর্ম্ম যে গৌণ-ভাবে মুক্তির হেতু, তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। আনন্দগিরিও এইস্থলে বলিয়াছেন যে—

"কর্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ শ্রবণাদিবশাদৈকাত্মজ্ঞানং মুক্তিফল মুদেতি।"

ইহারই কিছু পরে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"যেষাং পুনঃ নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি 'আত্মসংস্কারার্থানি' ক্রিয়ন্তে তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি। তেষামুপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধনান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে"।

অর্থাৎ, যাঁহারা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে করেন, তদ্দারা তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মকে মোক্ষের সাধন বলা যায়। পাঠক এইস্থলে একটী কথা লক্ষ্য-করিয়া দেখিবেন। শঙ্করাচার্য্য এই বিচারের প্রথমেই একটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, মোক্ষ 'সাধ্য' বা 'সংস্কারার্হ' নহে; সুতরাং মোক্ষের কোন প্রকার 'সাধন' নাই। আবার, এইস্থলে সেই শঙ্করই বলিতেছেন যে—"মোক্ষ-সাধনান্যপি হি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে"।—অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্মই মোক্ষের 'সাধন'। এ কিরূপ কথা হইল? কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই এই বিরোধের পরিহার হইবে। যে স্থলে শঙ্কর মোক্ষকে একেবারে চরম ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপে * লক্ষ্য

* বিদ্যায়াশ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্ব্বাত্মভাবো 'মোক্ষঃ'। যোঽসৌ সর্ব্বাত্ম-

করিয়াছেন, সেই স্থলেই মোক্ষের কোন 'সংস্কার' হইতে পারে না বা মোক্ষের কোন 'সাধন' নাই,—এই কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যখন চরম ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে, তখন নিষ্কাম কর্ম্মেরও স্থান নাই। তখন কোন কর্ম্মেরই প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু একথার ইহা অর্থ নহে যে, যদি ব্রহ্ম-জ্ঞানে কর্ম্ম-মাত্রেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, তবে বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনায়ও নিষ্কাম কর্ম্ম নিষিদ্ধ। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, নিষ্কাম-কর্ম্মের আচরণ মোক্ষের গৌণ সাধন; কেননা, উহাদ্বারা আত্মার বা চিত্তের 'সংস্কার' হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণের সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের কোনই বিরোধ নাই। অন্যস্থলেও শঙ্কর বলিয়াছেন যে—

"দ্রব্যযজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ 'সংস্কারার্থাঃ'"।

তবে একটী কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। নিষ্কাম-কর্ম্মের লক্ষ্য যদি কেবল ব্রহ্মই হন, তাহা হইলে তদ্দারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু নিত্য-কর্ম্মগুলি—সকাম-ভাবে, স্বর্গ-লোকাদি-প্রাপ্তির অভিসন্ধি করিয়াও, আচরিত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। শঙ্করের উক্তি এই—

"সাভিসন্ধীনাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং ব্রহ্মত্বাদীনি ফলানি। যেষাং পুনর্নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মনাং সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি"।

ভাবো মোক্ষো বিদ্যাফলং—ক্রিয়াকারকফলশূন্যং,যত্র অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি ন সন্তি"।—বৃহ° ভা°, ৪।৩,১৯—২০।

অতএব, যে নিষ্কাম-কর্ম্মের ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই লক্ষ্য, তাহার ফল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং নিষ্কাম যজ্ঞাদি-কর্ম্ম বিরোধী নহে, ইহা বুঝা যাইতেছে *।

মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয় এবং মুক্তি-সম্বন্ধে শ্রুতির মত।

৫। ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন পরিপক্ক হইলে, ইহজীবনেই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, ইহাই উপনিষদের মত। কেহ কেহ মনে করেন যে, পুরুষ মুক্তিলাভ করিলে যতদিন সংসারে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার কোনপ্রকার কার্য্যাদির আচরণ করিতে হয় না; এবং মৃত্যুর পরও তিনি লীন হইয়া যান। এই ভাবে কেহ কেহ মোক্ষাবস্থাকে একরূপ অভাবাত্মক ও সর্ব্বশূন্য অবস্থা বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপনিষদের ও ভাষ্য-কার শঙ্করাচার্য্যের মত সেরূপ নহে। মুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে

* বিষয়টী অতীব গুরুতর। অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন। এইজন্যই আমরা শঙ্করোক্তি দ্বারাই একটু বিস্তৃত ভাবে বিষয়টীর প্রকৃত মর্ম্ম আলোচনা করিলাম। সুপণ্ডিত Paul Deusen ও কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—"The Upanishads are radically *opposed* to the entire vedic sacrificial cult" এবং "*sacrifices* are later interpolations of interested Brahmans." পাঠক, উপনিষদের উপদেশ, তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকার প্রথম অংশ দেখিলেই ঋগ্বেদীয় যজ্ঞাদির সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রুতির অভিপ্রায় দেখাইয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। জীবন্মুক্তাবস্থায় এই সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে না; কিন্তু মুক্ত-পুরুষের অনুভবে, সংসারের ও সাংসারিক পদার্থের কাহারই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তা প্রতীত হইবে না। কেননা, যাবজ্জীবন তিনি কি অভ্যাস করিয়াছেন? সকল পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব এবং সকল ক্রিয়ার ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব করিতে করিতে তিনি, কোন পদার্থকেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া এবং কোন ক্রিয়াকেই ব্রহ্ম-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে পারেন না *। এইরূপ অভ্যাস দৃঢ়তা লাভ করিলে, জগতের সকল পদার্থে ও সকল ক্রিয়ায়—সর্ব্বত্র—কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই তখন তাঁহার চিত্তে অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে অদ্বৈত-তত্ত্ব পরিপক্কতা লাভ করে। মৃত্যুর পরেও মুক্ত-পুরুষ বিবিধ-লোকে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্ব্বত্র

* "ন কেবলং স্থিত্যুৎপত্তিকালয়োরেব প্রজ্ঞানঘনব্যতিরেকেণ অভাবাৎ জগতো ব্রহ্মত্বং প্রলয়কালেচ"—বৃহং ভা০, ২।৪।১১॥ "সর্ব্বাত্মভাবো মোক্ষঃ। বিদ্যয়া শুদ্ধয়া সর্ব্বাত্মা ভবতি। অবিদ্যয়া চ অসর্ব্বো ভবতি, অন্যতঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি।" (৪।৩।২০)॥ "স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া...নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং 'বস্তন্তরাস্তিত্ব'-ব্যবহারোঽস্তি। অয়ং বস্তন্তরাভিনিবেশস্তু বিবেকিনাং নাস্তি" (২।৪।১৩-১৪)। "অবিদ্যা আত্মনোঽন্যৎ বস্তন্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি, ততস্তদ্বিষয়ঃ কামোভবতি যতোভিদ্যতে" (৪।৩।২০-২১)।

ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে করিতে, কোন পদার্থকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বলিয়া বোধ না করিয়া—সকল পদার্থকেই ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন-রূপে অনুভব করিয়া—মহানন্দে নিমগ্ন রহিবেন। মুক্তির অবস্থায় যে সমুদয় ধ্বংস হইয়া, শূন্য হইয়া যায়, তাহা নহে। তখন সাংসারিক ব্যবহারের পারমার্থিক সত্যতা-বোধ থাকে না; সেগুলি ব্যবহারিক ভাবে সত্য; কিন্তু পরমার্থতঃ সত্য নহে.—এইরূপ প্রতীতি হইতে থাকে। ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে, কাহারই—কোন ব্যবহারেরই—সত্তা নাই, ঈদৃশ বোধ দৃঢ় হয়। কেন না, কারণ-সত্তা ব্যতীত কোন কার্য্যেরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই; এক ব্রহ্ম-সত্তাই সকল পদার্থে অনুস্যূত—অনুপ্রবিষ্ট—রহিয়াছে। সুতরাং জগতে এক অদ্বয়-সত্তা বিরাজিত *।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'ভৃগু-বল্লী'তে, মৃত্যুর পরে মুক্ত পুরুষের অবস্থা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই পাঠক আমাদের মীমাংসার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।—

"যোঽয়মন্নান্নাদি-সংব্যবহারঃ কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রঃ; ন পরমার্থবস্তু—ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অসন্নিতি কৃত্বা...ভূরাদিলোকান্ সঞ্চরন্... সর্ব্বাত্মনা ইমান্ লোকান্ আত্মত্বেন অনুভবন্" (ভাষ্য)।

গ্রাহ্য শব্দ-স্পর্শাদি এবং উহাদের গ্রাহক মন-ইন্দ্রিয়াদি এই উভয়ভাবে—গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে—মনের যে স্পন্দন, তদ্দ্বারাই

* মুক্তি সম্বন্ধে "উপনিষদের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ডের, সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতবোধ হইয়া থাকে। এই প্রকার স্পন্দন যতদিন আছে ততদিন, সকল পদার্থই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন,—প্রত্যেক পদার্থেরই যে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে—এই প্রকার প্রতীতি হইতে থাকে। এই প্রকার বোধই 'অবিদ্যা'। এই ভাবে চিত্ত-স্পন্দনের নিরোধ বা নিবৃত্তি আবশ্যক *। গ্রাহ্য' গ্রাহকাকারে মন যদি স্পন্দিত না হয়, যদি মনের স্পন্দন কেবল আত্মাকারেই হইতে থাকে;—তবেই সর্ব্বত্র 'অদ্বৈত-বোধ' প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে।—

"স্বপ্নে ন গ্রাহ্যং গ্রাহকং বিজ্ঞান-ব্যতিরেকেণ অস্তি; জাগ্রদপি তথৈব;—পরমার্থ-সদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ" (শঙ্করভাষ্য)।

আনন্দগিরিও বলিয়াছেন—

"সংকল্পো হি মনসো ব্যবহারিকং রূপম্। তত্ত্বজ্ঞানেন আত্মব্যতিরিক্তার্থাভাবে নিশ্চিতে সংকল্পবিষয়াভাবনির্দ্ধারণয়া সংকল্পাভাবে, ন বিবেক-দৃষ্ট্যা মনো নাম অস্তীতি।"

আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ অনুভূত না হওয়ায়, মনের সংকল্পও থাকে না। সংকল্প না থাকায়, খণ্ড খণ্ড বস্তু-বিষয়ক কাম-ভোগ ও রাগ-দ্বেষাদিও থাকে না। সুতরাং সর্ব্বত্র আত্ম-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব মনকে গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারে স্পন্দিত হইতে না দিয়া, কেবল আত্মাকারে—সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনাকারে স্পন্দিত করাইতে অভ্যাস করিতে হয়। মনের নিরোধ অর্থ এই যে, কোন পদার্থেরই, কোন স্পন্দনেরই, কোন

* 'চিত্তনিরোধ' অর্থ চিত্তের উচ্ছেদ নহে।

দ্বৈতেরই—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তাও নাই, স্বতন্ত্র ক্রিয়াও নাই। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তে এক অদ্বৈত-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তে এইরূপ বোধের সংস্কারও অঙ্কিত হয় এবং তাহার স্মৃতিও তদ্রূপ হয়। এইপ্রকারে, বিষয়-বোধের স্থলে অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই পরিপক্কাবস্থার নাম—'মুক্তি'। তখনকার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান হয়। অতএব, মুক্তি—সর্ব্ব-ধ্বংসের অবস্থা নহে। মুক্তি—সম্যক্-দর্শনের অবস্থা। তখন সাধক—

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং,
গুহা-গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি"।

কোচবিহার।
২৫ অগ্রহায়ণ।
সন ১৩১৭ সাল।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদের উপদেশ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(শ্বেতকেতুর উপাখ্যান)

পূর্ব্বকালে উদ্দালক * নামে একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁহার একটী দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র ছিল †। উদ্দালক একদিন শ্বেতকেতুকে নিকটে ডাকিয়া, সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সৌম্য! আমাদের এই কুলে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ;

---

* ইনি অরুণের পুত্র। এইজন্য ইহাঁকে লোকে আরুণি বলিত। ইনি গোতম-গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া, ইহাঁকে গৌতমও বলিত।

† কঠোপনিষদে উল্লিখিত বালক নচিকেতা বোধ হয় এই উদ্দালকেরই অপর পুত্র।

সুতরাং তোমারও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সেই বিদ্যাশিক্ষা করিবার বয়স তোমার উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমাদের কুলের যোগ্য কোন আচার্য্যের নিকট কিছুকাল বাস করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন কর"। শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিল এবং চতুর্বিংশতি-বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সমস্ত বিদ্যাধ্যয়ন সমাপন করিয়া, পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্বেতকেতু সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এতকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু পিতা দেখিতে পাইলেন যে, শ্বেতকেতু বড় অভিমানী ও অবিনীত হইয়া আসিয়াছে। সে সমগ্র বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিয়া যে একজন মহাপণ্ডিত হইয়াছে, এইরূপ একটা দারুণ অভিমান তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ;—পুত্রের এই ভাব আরুণি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দুঃখিত-চিত্তে একদিন পুত্রকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "পুত্র! তোমাকে অধীত-বিদ্যার গৌরবে অতিবড় গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে। আচার্য্যদিগের নিকট হইতে কি কি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছ, আমার নিকটে তাহার একটী পরীক্ষা দাও। আমি তোমায় একটীমাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর। যাহার বিষয় একবার শুনিলে, জগতের কোন বিষয়ই শুনিবার আর বাকী থাকে না ;—যে বিষয়টী একবার তর্কদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, জগতের

যাবতীয় বিষয়ই বোধগম্য হইয়া পড়ে; যাহা জানিতে পারিলে, আর কিছুই জানিবার ইচ্ছা থাকে না, অবশেষও থাকে না;— জিজ্ঞাসা করি, এরূপ বস্তু বিশ্বে কি আছে, তাহা আমায় বলিয়া দাও"। শ্বেতকেতু, পিতার মুখে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া, বিস্মিত-চিত্তে উত্তর করিল,—"পিতঃ! এ কিরূপ বলিতেছেন? কৈ, আমিত এরূপ কোন বস্তুর শিক্ষালাভ করি নাই"? পিতা হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বৎস! তুমি যে ইহা বলিতে পারিবে না, আমি তোমার অভিমান দেখিয়া তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমি সামান্য লৌকিক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছ মাত্র, কিন্তু যাহা সকল বিদ্যার সার, সে বিদ্যার জ্ঞান-লাভ তোমার ঘটে নাই। এক্ষণে, আমি যাহা বলিতে যাই-তেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

কারণ * ও কার্য্য †—এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা যদি উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই, আমি তোমাকে যে বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে। মৃত্তিকারূপ উপাদান-কারণ হইতে, ঘট-শরাবাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। এস্থলে কারণ ও কার্য্যের প্রকৃত স্বরূপ ও সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই সকল কথা সুস্পষ্ট হইবে। কারণ-সত্তাই কার্য্যের আকারে দেখা দেয়; সুতরাং কার্য্য কখনই উহার

* কারণ—Cause.

† কার্য্য—Effect.

কারণ হইতে 'স্বতন্ত্র' বা ভিন্ন হইতে পারে না *। তথাপি লোকে ভ্রমবশতঃ; কার্য্য-গুলিকে উহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কারণ-সত্তাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, কার্য্যগুলিকে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে ধরিয়া লয়। কারণ অপেক্ষা, উহার কার্য্য-গুলির আকার বা সংস্থান ভিন্ন প্রকারের বলিয়াই, লোকে কার্য্যকে কারণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কার্য্যগুলি উহাদের কারণ হইতে ভিন্ন নহে; ভিন্নতা কেবল আকারে ও নামে। কিন্তু ঘটকে ঘট-নামেই ব্যবহার কর, বা অন্য যে কোন নামেই অভি-হিত কর; ঘটটী মৃত্তিকা ভিন্ন স্বরূপতঃ অন্য কিছুই নহে;—উহা মৃত্তিকাই। এই ভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, 'বিকার' বলিয়া 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নাই। যাহাকে ঘটাদি বিকার বলি-তেছ, উহা মৃত্তিকাদি কারণেরই রূপান্তরমাত্র। ঘটাদি বিকা-রের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; মৃত্তিকারই সত্তা ঘটাদিতে অনুস্যূত রহিয়াছে; উহারা সেই মৃত্তিকারই আকার-বিশেষ,

---

* "ন ত্বেবনন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্"—ভাষ্য। "কার্য্যমাকাশাদিকং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরে-কেণ অভাবঃ কার্য্যস্য"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪॥ "ন সন্নিবেশমাত্রেণ পৃথক্-দ্রব্যত্বসম্ভবঃ। শয়নোত্থানগমনৈ র্ন পুত্রে বহুপুত্রতা"—অনুভূতিপ্রকাশ। শঙ্করও বলিয়াছেন—"ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। নহি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ···বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" (বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮)।

অবস্থান্তর-মাত্র। এই জন্য মৃত্তিকাকেই 'সত্য' বলা যায়; ঘট-শরাবাদি বিকার-বর্গকে 'মিথ্যা', 'অসত্য' বলা যায় *।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এক কারণের স্বরূপটী উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিলেই, কার্য্য-বর্গের জ্ঞানও আপনি আসিয়া পড়িবে। কেন না, কার্য্য-বর্গ কারণেরই রূপান্তরমাত্র; উহারা কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। অতএব, একমাত্র সুবর্ণের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলেই, তাহার বিকার—হার, বলয়, মুকুট প্রভৃতি দ্রব্যের স্বরূপও যে সেই সুবর্ণমাত্র, ইহা বুঝা যাইবে। লৌহপিণ্ড বুঝিলে, লৌহ হইতে উৎপন্ন অস্ত্রাদি বস্তুরও স্বরূপ বুঝা যাইবে। হে পুত্র! তুমি তদ্রূপ কোন বস্তুর বিষয়ে কি কোন উপদেশ পাও নাই? আমি এইপ্রকার বস্তুর বিষয়েই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম"।

পিতার বাক্য শুনিয়া শ্বেতকেতু, পুনরায় গুরুকুলে প্রেরিত হইবার ভয়ে, পিতাকে বলিল যে—"নিশ্চয়ই আমার আচার্য্যেরা এরূপ কোন বস্তুর তথ্য অবগত নহেন; নতুবা তাঁহারা আমাকে

---

* "ন মৃদং বিনা, কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে। ঘটে মৃদঃপৃথগ্ভূতে কীদৃক্ তত্ত্বমুদীর্য্যতাম্। বাহৈবারভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্যাৎ খপুষ্পবৎ"—অনুভূতিপ্রকাশ। "বিকারো বস্তুতঃ কারণাদ্ভিন্নো নাস্তি, তস্মাৎ মৃষৈব সঃ—"রত্নপ্রভা ১।১।৮॥ "তস্মাৎ কার্য্যং ন বস্তুত্বাৎ কারণ-ব্যতিরেকতঃ……অনৃতং ভাসতে মৃষা"—অনুভূতিপ্রকাশ। "সর্ব্বেষ্বনুগতং ব্রহ্ম—সত্যত্বং তত্র সুস্থিতম্। ভাতি সর্ব্বেষু সত্যত্বমেকং যৎ ব্রহ্মগং হি তৎ" অনুঃ প্রঃ।

তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই কেন? অতএব পিতঃ! আপনিই আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন্। এ উপদেশ পাইলে আমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিব"। পিতা বলিতে লাগিলেন,—

"এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে, পশু-পক্ষী তরুলতা নদনদী প্রভৃতি বহুবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেরই কোন না কোন নাম আছে, কোন না কোন রূপ আছে। এই নাম-রূপ লইয়াই সংসার। এই নাম-রূপময় বিকারবর্গ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম-পদার্থ *

---

* শ্রুতিতে 'সদ্ব্রহ্ম' কাহাকে বলে? "শশবিষাণাদেরসতঃ সমুৎপত্ত্য-দর্শনাৎ অস্তি সদ্রূপং ব্রহ্ম জগতো মূলম্" (কঠভাষ্যে, ৬।৩)। মাণ্ডুক্য-কারিকাভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন —"সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ···সর্ব্ব শ্রুতিষু চ কারণত্ব-ব্যপদেশঃ"। অতএব 'বীজযুক্ত' ব্রহ্মই সদ্ব্রহ্ম। এই বীজটাই বা কি? শঙ্কর বলেন—"ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়াং···বীজ-শক্ত্যবস্থম্" (বেদান্তভাষ্য, ১।৪।২)। এই বীজশক্তিই জগতের পূর্ব্বা-বস্থা; ইহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। নাম-রূপের পূর্ব্বাবস্থা স্বরূপ এই বীজশক্তি ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। "সৈব দৈবী শক্তিঃ ···নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা···ন স্বতন্ত্রা" (১।৪।৯)। ইহা ব্রহ্ম-সত্তারই অভিব্যক্তির উন্মুখ-অবস্থা মাত্র; সুতরাং ইহা ব্রহ্ম-সত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। "কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্" (২।১।১৮)। এই কারণ—শক্তিই—সদ্ব্রহ্ম। "সৎকার্য্যোপাধিকৃতাস্তিত্ব প্রত্যয়েন উপ-লব্ধস্যাত্মনঃ, পশ্চাৎ প্রত্যস্তমিত সর্ব্বোপাধিরূপআত্মনস্তত্ত্বভাবঃ প্রসী-দতি"—কঠভাষ্য॥

বর্ত্তমান ছিলেন। উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনও বস্তু, কোনও রূপে বা নামে পরিচিত ছিল না। উৎপত্তির পরেই, নানাবিধ নাম, রূপ ও গুণাদি-বিশিষ্ট হইয়াই পদার্থ সকল, আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া দেখা দেয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে (অভিব্যক্তির পূর্ব্বে), নাম-রূপাদি ছিল না। তখন কেবলমাত্র পরম-কারণ, সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন *। বর্ত্তমানেও, সেই ব্রহ্ম-সত্তা এবং ব্রহ্ম-সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ নাম ও রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে †। কোন কুম্ভকার, ঘটাদি নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে, প্রাতঃকালে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া, অন্য কোন

* "প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতম্ অনিস্পন্দম্ অসদিব সৎকার্য্যাভিমুখম ঈষদুপজাত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ"— ছান্দোগ্য শঙ্করাচার্য্য, ৩।১৯।১।

† সৃষ্টির অর্থ কি? সৃষ্টির অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র 'সৎ' ছিলেন। সৃষ্টির পরে সেই সৎ + আরো কিছু, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মসত্তা + নাম-রূপ। "প্রকর্ষেণ জনিঃ (সৃষ্টিঃ) স্মৃতা। প্রকর্ষো-নাম পূর্ব্বস্মাদাধিক্যম্,—অধিকা তু যা, সা 'মায়া'।"—অনুভূতিপ্রকাশ। শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তভাষ্যে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন (২।১।২০)॥ নাম-রূপ-গুলি ব্রহ্ম-সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়া করিতেছে; ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং'ন ব্যভিচরতি, একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্" (বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৬)। বৈশেষিকেরাও দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের 'সত্তা' স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে, উৎপত্তির পূর্ব্বে দ্রব্যগুণাদির সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং বৈশেষিকোক্ত সত্তা ও বেদান্তের কারণ-সত্তা এক বস্তু নহে।

কার্য্যের জন্য গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়া, সেই কার্য্য সমাপনান্তে সন্ধ্যার সময়ে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রাতঃকালের সংগৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি প্রস্তুত করিলে,—তখন যেমন সে মনে করে যে এই ঘটাদি প্রাতঃকালে কেবল মৃত্তিকামাত্র ছিল, এখন সেই মৃত্তিকা হইতেই ঘটাদি-আকার-বিশিষ্ট সামগ্রী উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ, এই নাম-রূপাদি বিকারবর্গ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র অবস্থিত ছিলেন। সৃষ্টির পরে, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই বিবিধ নাম-রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই যে কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহাতে ও বিশ্ব-সৃষ্টিতে একটা মহৎ পার্থক্য আছে। কুম্ভ-নির্ম্মাণকালে যেমন মৃত্তিকা ছাড়াও, কুম্ভকার ও দণ্ড-চক্রাদি নানাবিধ সহকারী কারণ বর্ত্তমান থাকে, বিশ্ব-সৃষ্টিতে কিন্তু ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। অপর কোন সহকারী কারণ ছিল না বলিয়াই, ব্রহ্ম-সত্তাকে 'অদ্বিতীয়' বলা হইয়াছে *।

বৎস! কেহ কেহ মনে করেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, অর্থাৎ অভাবাত্মক শূন্য, অসৎ, ছিল। অস্তিত্বহীন, একান্ত অভাবাত্মক যাহা,—তাহাকেই "অসৎ" বলে। অসৎ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত। কিন্তু অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত হইতে

* মূলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আছে। এই তিনটী বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্ম-বস্তুকে স্বজাতীয়ভেদশূন্য, স্বগতভেদশূন্য ও বিজাতীয়ভেদশূন্য বলা হইয়াছে।

পারে না। বিষয়টী অতি গম্ভীর ও কঠিন। মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাও। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে একটী কারণ থাকা আবশ্যক। মৃত্তিকা না থাকিলে, তাহা হইতে ঘট উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকা আছে বলিয়াই ত ঘট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবে কোথা হইতে? সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, অভাব হইতেই ত কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়। বীজ ও অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, দেখিবে যে—বীজ হইতে যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তখন দেখা যায় বীজটী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার পর, অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বীজের নাশ বা অভাবই ত অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ হইতেছে। অতএব অভাব বা অসৎ হইতেই ত বস্তুর উৎপত্তি হয়,—ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। কুম্ভকার যখন মৃত্তিকা দিয়া ঘট প্রস্তুত করে, তখন আমরা কি দেখিতে পাই? কুম্ভকার প্রথমতঃ মৃৎ-পিণ্ড বা মাটীর একটী 'ডেলা' প্রস্তুত করে; তৎপরে এই ডেলাটী ভাঙ্গিয়া, তাহা হইতে ঘট প্রস্তুত করে। এ ক্ষেত্রেও, অবশ্যই মৃৎ-পিণ্ডের নাশ হইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৃৎ-পিণ্ডের ধ্বংস না হইলে যখন ঘটটী উৎপন্ন হয় না, তখন মৃৎ-পিণ্ডের ধ্বংস বা অভাবই ত ঘটোৎপত্তির কারণ। কেহ কেহ এই প্রকার যুক্তির বলে, অসৎ হইতেই যে সতের উৎপত্তি

হয়, এই কথা বলিয়া থাকেন এবং এই যুক্তির দ্বারা তাঁহারা কারণের সত্তা স্বীকার করিতে চান না। সৌম্য! অসদ্বাদী পণ্ডিতগণের যুক্তি শুনিলে ও দৃষ্টান্তও শুনিলে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখাইব যে তাঁহাদের এই প্রকার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

তুমি ভাবিয়া দেখ, যদিও বীজটী বিনষ্ট হইবার পরে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি এ ক্ষেত্রে বীজের অবয়ব-গুলির একান্ত ধ্বংস হয় না। যে উপাদানে বীজদেহ গঠিত হইয়াছে, সেই উপাদান-গুলিই অঙ্কুরাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব বীজ-ধ্বংসই অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ নহে; বীজের উপাদান অবয়ব-গুলিই, অঙ্কুরোৎপত্তির প্রকৃত কারণ *। ঘটের দৃষ্টান্তেও ইহা বুঝা যায়। মৃৎপিণ্ডটী বিনষ্ট হইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয়

* অবয়ব=Constituent parts। বীজটী বীজের অবয়ব সমূহ দ্বারাই গঠিত। অতএব অবয়ব-সমষ্টি ব্যতীত বীজটী স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। 'অবয়বী' বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু স্বীকারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। অবয়বী—অবয়ব-সমষ্টিমাত্র। বীজটাকে বা বীজাকারটাকে যদি বীজাবয়ব ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং অঙ্কুরোৎপত্তির সময়ে সেই বীজাকার বস্তুটী বা অবয়বীটাই বিনষ্ট হইয়াছে মনে করা যায়;—তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয়। কেন না, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বীজের অবয়বগুলিই অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া থাকে, বীজের কোন 'আকার' অঙ্কুরোৎপত্তি করে না, বা কোন 'আকার' বিনষ্ট হয় না।

বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ,—মৃৎ-পিণ্ডটী বিনষ্ট হইলেও উহাতে যে মৃত্তিকা অনুস্যূত ছিল, সে মৃত্তিকার ত নাশ হয় নাই। পিণ্ডটী ত মৃত্তিকারই একটা আকার বা সংস্থান-বিশেষ মাত্র। মৃত্তিকারই অবয়ব পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছিল। এই পিণ্ডাকারটীই ত ঘটের প্রকৃত কারণ নহে; মৃত্তিকাই ঘটের প্রকৃত কারণ *। সুতরাং পিণ্ডাকারটী বিনষ্ট হইয়া যাইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে, "ধ্বংস"কেই ঘটের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা ত কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পর পর কতকগুলি কার্য্য উৎপন্ন হইতে গেলেই, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একটা কার্য্যের ধ্বংস হইয়া, তাহার পরবর্ত্তী অপর একটা কার্য্য উৎপন্ন হয়—এ নিয়ম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী একটা কার্য্যের নাশ হয় বলিয়াই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কারণটীরও নাশ হইয়া যায়,—ইহা কুত্রাপি সম্ভব নহে। কেননা পরবর্ত্তী কার্য্যেও সেই কারণটীকেই অনুস্যূত থাকিতে দেখা যায়। পিণ্ড-ধ্বংসের পর ঘটের উৎপত্তি হইলেও, মৃত্তিকা বিদ্যমানই রহিয়া যাইতেছে; —মৃত্তিকার তাহাতে নাশ হইতেছে না। সুতরাং অসৎ হইতেই যে ঘটাদি সৎপদার্থ জন্মে, একথা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। যদি তুমি বল যে—ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকা ত কেবল মৃত্তিকার আকারে স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, উহা পিণ্ডাকারের সহিত

---

* "অন্বয়ি দ্রব্যমেব সর্ব্বত্র কারণং, ন পিণ্ডাদিবিশেষোঽনন্বয়াৎ অব্যবস্থানাচ্চ"—আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক, ১।৪।১ ॥

মিলিতভাবেই থাকে; তবে আমি বলিব যে—পিণ্ডের আকারেই থাকুক্ আর যে কোন আকারে থাকুক্ না কেন, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে মৃত্তিকা পিণ্ডাকারে থাকে, সেই মৃত্তিকাই ত পিণ্ডটীর নাশের পরও ঘটাকারে উৎপন্ন হয়। পিণ্ডনাশের সঙ্গে মৃত্তিকার স্বরূপের নাশ হয় নাই; যে মৃত্তিকার সত্তা পিণ্ডের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, সেই মৃত্তিকার সত্তাই পরে ঘটে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং মৃত্তিকার সত্তার ত ধ্বংস হয় নাই *। যদি পিণ্ডধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকারও ধ্বংস হইত, তাহা হইলে

---

* শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, বিবিধ কার্য্যাকার ধারণ করিলেও, কারণ-সত্তার স্বরূপটা নষ্ট হইয়া যায় না,—কারণ-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না। বৃহদারণ্যকে শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে—"ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিঃ।...আত্মনা ব্যবস্থিতস্যৈব বিরাজঃ.....শরীরান্তরং বভূব" (১।৪।৩)। আবার "অগ্নিবায়্বাদিরূপেণ স্বেনৈব চ মৃত্যাত্মনা (হিরণ্যগর্ভাত্মনা) ত্রেধা বিভক্তঃ, ন বিরাট্‌স্বরূপোপমর্দ্দেন" (১।২।৩)॥ ইহাই শঙ্করাবলম্বিত "বিবর্ত্তবাদের" ভিত্তি। পাঠক একথাটী ভুলিবেন না। কারণ-সত্তা যত প্রকার কার্য্যাকার ধারণ করুক্ না কেন, উহার নিজের স্বরূপের তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হানি হয় না। স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই কারণ-সত্তাটী কার্য্যাকারে পরিণত হয়। শঙ্করের ইহাই সিদ্ধান্ত। আনন্দগিরিও এইজন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—"তন্তুবস্থাংস্বনুপমর্দ্দেন পটো জায়তে" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্কর পরিণামবাদকেও একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। পরিণামবাদকে প্রত্যাখ্যান না করিয়াই, বিবর্ত্তবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন।

পিণ্ডধ্বংসের পরে যখন ঘট উৎপন্ন হইল, তখন আর আমরা মৃত্তিকাকে ঘটের মধ্যে অনুস্যূত দেখিতে পাইতাম না *।

অতএব দেখিতে পাইতেছি যে, অসদ্বাদী পণ্ডিতগণের যুক্তির সারবত্তা নাই। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সত্তা সিদ্ধ হইতেছে। এই কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গে অনুস্যূত থাকে। যতপ্রকার কার্য্য উৎপন্ন হউক্ না কেন, সকলের মধ্যেই কারণ-

---

* এই যুক্তির উপরে আপত্তি করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানবাদীরা বলিবেন যে, মৃত্তিকা ও ঘট বলিয়া ত কোন বস্তুই নাই। মৃত্তিকাবুদ্ধিই ঘটবুদ্ধির কারণ। কিন্তু ইহার উত্তর এই যে, মৃত্তিকাবুদ্ধির 'সত্তা' ত স্বীকার করিতেই হইবে। সত্তা স্বীকার করিলে, অসদ্বাদ ত টিকিল না। অপর একটা আপত্তি করা যাইতে পারে। তুমি বলিবে যে—পিণ্ড ও ঘট উভয় কার্য্যেই, এক মৃত্তিকাই অনুস্যূত হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে মৃত্তিকাই যে ঐ দুই কার্য্যে অনুস্যূত হয় তাহা নহে। ঘটটা পিণ্ডের সদৃশ;—এই সাদৃশ্যজ্ঞান হইতেই মনে হয় বুঝি মৃত্তিকাই পিণ্ডে ও ঘটে অনুস্যূত রহিয়াছে। বস্তুতঃ কার্য্য মাত্রই ক্ষণিক। তবে যে একটা কার্য্যকে অন্যটার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, সাদৃশ্যজ্ঞানই উহার হেতু। কিন্তু এই আপত্তিটাও সঙ্গত আপত্তি নহে। পিণ্ড ও ঘট উভয়ে যে মৃত্তিকাই অনুস্যূত হইয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কিন্তু তোমার কথিত সাদৃশ্যজ্ঞান আনুমানিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষে ও অনুমানে ত বিরোধ থাকিতে পারে না; প্রত্যক্ষের উপরেই অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রাগুক্ত আপত্তিতে প্রত্যক্ষে ও অনুমানে বিরোধ ঘটিতেছে। সুতরাং আপত্তিটী সঙ্গত নহে।

সত্তা অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কারণ-সত্তার কোথাও নিবৃত্তি হয় না *।

উৎপত্তির পূর্ব্বে, কার্য্যটীও কারণে বিদ্যমান থাকে। † কার্য্যটী অভিব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, উহা কারণ-সত্তারূপেই কারণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যের অভিব্যক্তির জন্য ক্রিয়া আবশ্যক, নতুবা কার্য্য কাহার বলে প্রকাশিত হইবে? ঘট অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বে মৃত্তিকার অবয়ব পিণ্ডাকার ধারণ করে। এই পিণ্ডাকার-ধারণই ঘটের আবরক। পিণ্ডাকার দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়াই ঘটের উপলব্ধি হয় না। অতএব ঘট পূর্ব্বাবধিই মৃত্তিকায় বিদ্যমান ছিল, কেবল পিণ্ডাকার দ্বারা আবৃত থাকাতেই উহার উপলব্ধি হয় নাই। ঐ পিণ্ডটী বিনষ্ট করিয়া দিলে, তবে ঘটের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী কার্য্যটী (ঘট) যে ছিলনা তাহা নহে; উহা পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যান্তর দ্বারা আবৃত ছিল,—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী কার্য্যের (পিণ্ড) আকারে ছিল

---

* "সদ্বুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ সত্তাহনিবৃত্তিশ্চেতি সতএব সদুৎপত্তিঃ সেৎস্যতি"।—ভাষ্য। যদি অসৎ বা শূন্য হইতেই কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে আমরা কার্য্যবর্গের মধ্যে শূন্যকেই অনুস্যূত দেখিতাম। শূন্যজন্মে নাম শূন্যং রূপং শূন্যমিতীদৃশং। শূন্যানুবেধো ভাসেত, সদ্বেধস্তব ভাসতে"।—অনু০প্র০।

† এই Paragraph এর কথাগুলি সমস্তই বৃহদারণ্যক-ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সুতরাং কারণের মধ্যে কার্য্যের সত্তা কোন না কোন আকারে সিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যটীর ধ্বংস এবং পরবর্ত্তী কার্য্য-উৎপাদন করিবার উপযুক্ত ক্রিয়া করিলেই, পরবর্ত্তী কার্য্যটী অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কারণের মধ্যে কার্য্যের সত্তা থাকিলেই যথেষ্ঠ হয় না, উহার অভিব্যক্তির জন্য যত্ন লওয়া আবশ্যক ; তাহা হইলেই উহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। অতএব, কারণের মধ্যে কার্য্যের সর্ব্বদাই বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইতেছে ; কেননা, কার্য্যের সত্তা না থাকিলে, সহস্র যত্ন করিলেও উহা অভিব্যক্ত হইতে পারিত না।

পুত্র ! এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সত্তা এবং কারণের মধ্যে কার্য্যেরও সত্তা সর্ব্বদাই থাকে। অতএব, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব। সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যাহাকে 'কার্য্য' বলা যায়, তাহা কারণ-সত্তারই সংস্থান-বিশেষ—আকার-বিশেষ—রূপান্তর মাত্র। সর্প কুণ্ডলীর আকার ধারণ করে, মৃত্তিকাচূর্ণ পিণ্ডাকার ও ঘট শরাবাদি-আকার ধারণ করে,—ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হইতেছে। কুণ্ডলী যেমন সর্পেরই অবস্থান্তরমাত্র, প্রকারভেদমাত্র ; এবং ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকারই প্রকারান্তর বা আকারভেদ মাত্র ; পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বও তদ্রূপ এক সদ্বস্তুরই বিবিধ আকার মাত্র। আকারগুলি পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন বটে ; পিণ্ডটী ঘট হইতে ভিন্ন, আবার ঘটটী পিণ্ড হইতে ভিন্ন বটে ; কিন্তু পিণ্ড ও ঘট উভয়ই

মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে। এক মৃত্তিকাই, পিণ্ড ও ঘট উভয়ের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। উহারা উভয়েই মৃত্তিকারই রূপান্তর; সুতরাং উহারা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। বিবিধ সৃষ্ট-পদার্থ-সঙ্কুল এই বিশ্বও তদ্রূপ সেই সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম ত নিরবয়ব, মূর্ত্তিবিহীন, এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার। এই নিরবয়ব বস্তু হইতে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আকার প্রাদুর্ভূত হইল? নিরবয়ব বস্তুর আবার অবস্থান্তর, আকার-বিশেষ, সংস্থান-ভেদ সম্ভব হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নটীর উত্তর এই—রজ্জুর অবয়বে যেমন সর্পের আকার বলিয়া বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মে মনুষ্য-বুদ্ধি-কল্পিত বিশ্বের রূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এক বস্তুতে অন্য একটী স্বতন্ত্র বস্তুর আরোপ করিয়া লইয়া লোকে যেমন সেই বস্তুকে অন্যবস্তুরূপেই মনে করিয়া লয়; যেমন লোকে বুদ্ধির দোষে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ধারণা করে;—ঘটকে মৃত্তিকা না বলিয়া, ঘট বলিয়াই ধরিয়া লয়; তদ্রূপ মনুষ্য-বুদ্ধি যাবতীয় বস্তুকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র, পৃথক্ বস্তুরূপে মনে করিয়া লয়। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অবস্থাই এইরূপ।* বাস্তবিক পক্ষে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তাই বিশ্বের কার্য্যবর্গে অনুস্যূত রহিয়াছে। কারণ-সত্তা ব্যতীত, কোন কার্য্যেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তা ছাড়া, কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়াই আমরা

* "...পৃথক্ত্বেন বিশেষ-দর্শনং।...করণাদিকৃতং হি তৎ, ন আত্ম-কৃতম্।"—বৃহৎ ভাঃ, ৪।৩।২৩।

মনে করি। এইটীই ভ্রম। কোন কার্য্যেরই নিজের কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তাতেই কার্য্য-বর্গের সত্তা। সুতরাং বিকারবর্গ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই। উহারা ব্রহ্ম-সত্তারই আকার-ভেদ, রূপান্তর মাত্র। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি অবিদ্যার দোষেই আমরা কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করি। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলেই যেমন পূর্ব্বের সর্প-বুদ্ধি তিরোহিত হয়; ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝিতে পারিলেই যেমন ঘট-বুদ্ধি তিরোহিত হয়; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই তদ্রূপ সৃষ্ট-পদার্থ-গুলির স্বতন্ত্রতার ও স্বাধীন-সত্তার বোধ থাকে না*।

কার্য্যবর্গের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট; সুতরাং কারণ-সত্তাতেই কার্য্যবর্গের সত্তা†। কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিলে, কার্য্যবর্গ "মিথ্যা" বা "অসত্য" হইয়া যায়। ঘট-

---

* "ন অস্মাভিঃ কদাচিদপি সতোঽন্যৎ অভিধানমভিধেয়ং বা বস্তু পরিকল্প্যতে। সদেব তু সর্ব্বমভিধানম্, অভিধীয়তে চ যদন্যবুদ্ধ্যা। যথা রজ্জুরেব সর্পবুদ্ধ্যা সর্প ইত্যভিধীয়তে, যথা বা পিণ্ডঘটাদি মৃদোঽন্যবুদ্ধ্যা পিণ্ডঘটাদিশব্দেন অভিধীয়তে লোকে। রজ্জুবিবেকদর্শিনা তু সর্পাভিধান-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে ..... তদ্বৎ সদ্বিবেকদর্শিনাং অন্যবিকারশব্দবুদ্ধী নিবর্ত্তেতে"।—ভাষ্য।

† "সর্ব্বেষ্বনুগতং ব্রহ্ম, সত্যত্বং তস্য সুস্থিতম্।...রজ্জুদৈর্ঘ্যং যথা সর্পধারাদিষ্বনুগচ্ছতি। ব্রহ্মসত্ত্বং তথা ব্যোমবায়্বাদিষ্বনুগচ্ছতি।—অনুভূতি-প্রকাশ।

শরাবাদি বিকারগুলি মিথ্যা, অসত্য। কেন না, উহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। উহারা কারণ-সত্তারই আকার মাত্র। এই আকারগুলি, উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না; ধ্বংসের পরেও থাকিবে না; বর্ত্তমানেও উহাদের নিজের কোন স্বরূপ নাই—উহারা চঞ্চল, অস্থির, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, উৎপত্তি-বিনাশগ্রস্ত *। অতএব যেটী কারণ-সত্তা, তাহাই প্রকৃত "সত্য"। কার্য্যবর্গ প্রকৃতপ্রস্তাবে "অসত্য", "মিথ্যা" †। কারণ-সত্তারূপেই কেবল কার্য্যমাত্রই সত্য; কিন্তু কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' ভাবে কার্য্য-মাত্রই মিথ্যা।

কারণ-সত্তা যখন কার্য্যের আকারে দেখা দেয়, তখনও কারণের সত্তা নষ্ট হইয়া যায় না; সেই কারণ-সত্তার উপরেই কার্য্যবর্গের সত্তা নির্ভর করে। একই সদ্বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের দ্বারা লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সদ্বস্তু-কেই লোকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করে; প্রকৃত-পক্ষে অন্য বস্তুগুলি সেই এক সদ্বস্তুই। 'অতএব ইহাও বুঝা

* বিকারবর্গ কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র" বস্তু হইতে পারে না। কেন পারে না? যেহেতু (১) দৃষ্ট নষ্ট স্বরূপত্বাৎ, (২) স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্বাৎ। বিকার মাত্রই 'দৃষ্টনষ্ট-স্বরূপ',—চঞ্চল, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। আবার ইহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। কারণের সত্তা ও স্ফূর্ত্তিতেই ইহাদের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি (বেদান্ত ভাষ্য, ২।১।১৪)।

† "বিশেষাকারমাত্রস্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তং। স্বতঃ সন্মাত্র-রূপতয়া তু তাং"—ছাং, ভাং, ৮।৪।৩

যাইতেছে যে, প্রকৃত-পক্ষে জগতের কোন বস্তুই অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না *। কেন না, ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত জগতের কোন বস্তুরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা নাই †।

---

* "সত এব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমাণত্বাৎ নাসত্যং কস্যচিৎ ক্বচিদিতি ক্রমঃ"—ভাষ্য।

† পাঠক ভাষ্যকারের যুক্তিগুলি হইতে, তাঁহার "মায়াবাদের" প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। এতদ্দ্বারা প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 'ঘট' এই বুদ্ধিটী ও 'ঘট' এই নামটী উভয়ই অসত্য; কেন না, ঘট মৃত্তিকা-ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঘটকে, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ভাবে অন্য একটা পদার্থান্তর-রূপে ধরিয়া লইয়া, তার্কিকেরা মনে করেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ত 'ঘট' ছিল না, উহা পরে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈদান্তিকেরা এভাবে বস্তু নির্ণয় করেন নাই। যাহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, তাহা যদি রূপান্তর গ্রহণ করে, তবে বস্তুটী ভিন্ন হইয়া উঠে না। মৃত্তিকা ঘট-শরাবাদির আকারে পরিণত হইলেও, মৃত্তিকার ত স্বরূপ একভাবেই থাকে। অতএব, মৃত্তিকাই 'সত্য'; ঘটশরাবাদি আকারই 'মিথ্যা'। ঘটকে যদি মৃত্তিকা ছাড়া পৃথক্ একটী পদার্থান্তর-রূপে ধরিয়া লও, তবে সেইটীই মিথ্যা। পদার্থান্তর-রূপে এই যে ভিন্নভাবোধ, ইহাই ভ্রম-জ্ঞান। আর যদি ঘটকে পৃথক্ একটী পদার্থান্তর বলিয়া ধরিয়া না লইয়া, উহাকে মৃত্তিকা বলিয়াই—মৃত্তিকারই অবস্থান্তর-মাত্র বলিয়া—মনে কর, তবে তাহাই হইল যথার্থজ্ঞান। রজ্জুকে সর্প-রূপে ধরিয়া লওয়াই ভ্রম-জ্ঞান; কেন না তুমি রজ্জুকে পৃথক্ একটী পদার্থান্তর-রূপে মনে করিয়া লইলে।

হে শ্বেতকেতো! এই যে এক, অদ্বিতীয়, পরম-কারণ, সৎ ব্রহ্ম-পদার্থের কথা বলিলাম ;—তিনি সিসৃক্ষু হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্ব-প্রলয়ে যে সকল বস্তু তাঁহাতে সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে বিলীন আছে, তাঁহার জ্ঞানে সেই গুলির আলোচনার নাম ব্রহ্মের 'ইচ্ছা' বা 'সঙ্কল্প' বা 'ঈক্ষা'। এই সিসৃক্ষু, অদ্বিতীয়, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের কামনা হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

বিকারী কার্য্য-মাত্রকেই যদি কারণ-সত্তারূপে—ব্রহ্মশক্তি-রূপে—ব্রহ্ম-শক্তিরই অবস্থান্তররূপে—ধরিয়া লইতে পারি, তবেই ঠিক হইল। অজ্ঞানী জীব কিন্তু তাহা করে না। বিবিধ পদার্থকে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ এক একটা পদার্থান্তর রূপেই গ্রহণ করে, ব্রহ্ম-শক্তিরূপে গ্রহণ করে না। এই-টাই ভ্রমজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই জগৎকে ও জগতের বিকার-বর্গকে মিথ্যা বলিয়াছেন ; তিনি জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই। ইহাই শঙ্করা-চার্য্যের "মায়া-বাদের" প্রকৃত অর্থ। এই তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া "Philosophy of the Upanishads" নামক গ্রন্থে পণ্ডিত Gough কি অপব্যাখ্যাই করিয়াছেন!!! Paul Duessen ও তাঁহার গ্রন্থে এই প্রকার ভ্রম করিয়াছেন!! "বিকারঃ বস্তুতঃ কারণাদ্ভিন্নো নাস্তি, তস্মান্মৃদেব সঃ। বিকারস্ত মিথ্যাত্বে তদভিন্নকারণস্যাপি মিথ্যাত্বমিতি, নেত্যাহ। কারণং কার্য্যাৎ ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাৎ ভিন্নম্ ; অতঃ কারণাতি-রিক্তস্য কার্য্যস্বরূপস্যাভাবাৎ, কারণজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি" ।—বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় রত্নপ্রভা (১।১।৮)। "পৃথক্‌দ্রব্যস্বরূপঃ সন্ সমবেতো ঘটো মৃদি। ইত্যাহ তার্কিকাস্তত্তু ন, দ্বৈগুণ্যপ্রসঙ্গতঃ। মৃদ্ভারাৎ ঘটভারাচ্চ গুরুত্বং দ্বিগুণং ভবেৎ। ন সন্নিবেশমাত্রেণ পৃথক্ দ্রব্যত্বসম্ভবঃ—অনুভূতি প্রকাশ ॥

ব্রহ্মের এই যে বহু হইবার কামনা *, এই কামনা হইতেই ব্রহ্ম যে চেতন পদার্থ, অচেতন কোন কারণ নহেন, তাহা বুঝা যাইবে। অচেতন পদার্থ কখন কামনা করিতে পারে না। যাবতীয় নাম-রূপ, যাহা তাঁহাতে প্রলয়ে লীন হইয়াছিল,—সূক্ষ্ম বীজাকারে অবস্থিত ছিল,—সেইগুলি সমস্তই তাঁহার জ্ঞানে যুগপৎ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, সে অবস্থায় তাঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা গিয়া থাকে। জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞানে নিয়তই বর্ত্তমান রহে। কামনা বাসনাদি যেমন সংসারী জীবকে বশীভূত করিয়া চালিত করে; ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত ও স্বাধীন বলিয়া, কামনা তাঁহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। ব্রহ্মই, প্রাণিবর্গের কর্ম্মানুসারে, সেই কামনাকে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকেন। জীবের পক্ষে যেমন কামনাদি, আত্মা হইতে ভিন্ন ও দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-সাপেক্ষ, এবং কামনাই জীবকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে;—ব্রহ্মের কামনা সেরূপ নহে। এই কামনা—ব্রহ্মেরই 'আত্মভূত',—কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে †। ব্রহ্মকামনা জীবের কামনার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরও পরতন্ত্র নহে। সুতরাং

---

* কামনা—Free Will. এই অংশগুলি ঐতরেয় উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই কামনা বা সংকল্প—পূর্ণজ্ঞানেরই 'আগন্তুক' একটা বিকার; অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে, পূর্ণজ্ঞানে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা বা ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হইল। ইহা যখন পূর্ণজ্ঞানেরই একটা অবস্থান্তর, বিশেষ-আকার,—তখন ইহা পূর্ণজ্ঞান হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। এই জন্য ইহাকে পর-ব্রহ্মেরই "আত্মভূত" বলা হইয়াছে।

† "কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তাঃ ন; কিং তর্হি? স্বাত্মনোঽনন্যাঃ"—

তাঁহারই আত্মভূত বলিয়া, কামনা তাঁহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। বীজরূপে অবস্থিত, নিজেরই আত্মভূত,—যাবতীয় নাম-রূপ যখন অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা ধারণ করিবার উন্মুখ হয় * তাহাই ব্রহ্মের 'বহুভবন'। নতুবা নিরবয়ব পদার্থ বহু হইবেন কিপ্রকারে? আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, বিশ্ব সেই সদ্বস্তুরই অবস্থান্তর মাত্র।

ব্রহ্মের সেই সংকল্প-বলে, সর্ব্বপ্রথমে, মহাকাশে স্পন্দন-শক্তি † উৎপন্ন হইল। এবং ইহা করণাকারে ও কার্য্যাকারে ক্রিয়া করিবার সময়ে ‡ সর্ব্বপ্রথমে স্থূলভাবে 'তেজঃ' অভিব্যক্ত হইল। এই তেজঃ—দাহকারী, পাকক্রিয়া-সম্পাদক, প্রকাশ ও রক্তবর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই তেজোগত ব্রহ্ম

ইত্যাদি তৈত্তিরীয় ভাষ্য দেখ। এই কামনা "মায়াশক্তিরই" একরূপ পরিণতি। "নামরূপশক্ত্যাত্মক-মায়াপরিণামদ্বারেণৈব আত্মা বহু ভবতি"।

* "প্রাগুৎপত্তেঃ...সংকার্য্যাভিমুখম্ ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি সদাসীৎ"—ছান্দোগ্যভাষ্য।

† "ততোঽপি লব্ধ-পরিস্পন্দং...অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্"—শঙ্কর। ইহাই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভনামে বিদিত।

‡ অব্যাকৃতনামরূপে আত্মস্থে ..ব্যাক্রিয়েতে। ব্যাকৃতে চ মূর্ত্তামূর্ত্ত-শব্দবাচ্যে তে"—তৈ০ ভা০, ব্রহ্মবল্লী, ৬। কার্য্যাংশ (Matter) হইতেই তেজঃ, জল, পৃথিবী উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে করণাংশ (Motion) বায়ু ও আকাশ (সূক্ষ্ম স্পর্শ ও শব্দতন্মাত্র) রূপে ক্রিয়া করে। "ইন্দ্রিয়জনিত সম্বন্ধি বিষয়াপেক্ষং ভূতত্রয়ং সদিত্যুচ্যতে। অসন্বিষয়ত্বাপেক্ষং ভূতদ্বয়ং ত্যদিতি ব্যবহ্রিয়তে। তথাচ ভূতপঞ্চকং সচ্চ ত্যচ্চ" (আনন্দগিরি, ছা০ ভা০, ৭।১৭)।

আরো বহু হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন সেই তেজঃ হইতে 'অপ' ব্যক্ত হইল। এই অপ্—দ্রবগুণাত্মক, স্নিগ্ধ ও শুক্লবর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই জলান্তর্গত ব্রহ্ম আরো বহু হইবার ইচ্ছা করিলে, জল হইতে 'অন্ন' বা পৃথিবী ব্যক্ত হইল। ব্রীহী, যবাদি এই পৃথিবীরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই পৃথিবী গুরুত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, স্থির ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে *।

'তেজঃ বহু হইবার ইচ্ছা করিল', 'অপ বহু হইবার ইচ্ছা করিল'—এই সকল স্থলে, তেজঃ, অপ্ প্রভৃতি অচেতন বলিয়া, তাহাদের নিজের মুখ্য কোন ইচ্ছা বা কামনা থাকিতে পারে না। তবে ইহারা এক চেতন সদ্বস্তুরই রূপান্তর বলিয়া এবং সেই চেতন সদ্বস্তু হইতেই ইহারা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, সেই সদ্বস্তুর ইচ্ছাই ইহাদের উপরে আরোপিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা কর যে—যেমন "নদীর কূল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে"—এই দৃষ্টান্তে, অচেতন নদীতে

---

* এই তেজঃ, অপ্, অন্ন—স্থূল ভূতাণুমাত্র। অর্থাৎ তৈজস স্থূল অণু, জলীয় স্থূল অণু এবং পার্থিব স্থূল অণু ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল। শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন—"পরমাণুর্নাম পৃথিব্যা গন্ধঘনায়াঃ পরমঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ গন্ধাত্মক এক এব, ন তস্য পুনর্গন্ধবত্ত্বং নাম শক্যতে কল্পয়িতুম্"—ইত্যাদি। [মহাকাশে সূক্ষ্ম স্পন্দনশক্তিই শ্রুতির 'বায়ু' বা স্পর্শতন্মাত্রা। স্পর্শতন্মাত্রার দুই আকার; উষ্ণস্পর্শ বা তেজঃ ও শীতস্পর্শ বা জল। সুতরাং তেজের মধ্যে বায়ু আছে। এই জন্যই শব্দ ও স্পর্শ এই সূক্ষ্মভূত-দ্বয়ের কথা ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে পৃথক্ বলা হয় নাই।]

চেতনের ক্রিয়া ও ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ জগতের মূল-কারণ সদ্বস্তুও বাস্তবিকপক্ষে অচেতন, তথাপি সেই অচেতনেই চেতনের ন্যায় 'ইচ্ছা' আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, এই সদ্বস্তুটীকে 'আত্মা' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সুতরাং অচেতনকে কখনই 'আত্মা' বলা যায় না বলিয়া,—জগতের মূল সদ্বস্তুটী নিশ্চয়ই চেতন।

এই ভূতত্রয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, যাবতীয় স্থূল ভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার নাম-রূপাত্মক পদার্থ ব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণী-মাত্রেই অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ —এই তিন প্রকারমাত্র বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষি-সর্পাদি জীব অণ্ড হইতে জন্মে। পশু-মনুষ্যাদি প্রাণী জরায়ু হইতে জন্মে। উদ্ভিজ্জ অর্থে স্থাবর পদার্থ। যাহা ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তাহাই উদ্ভিদের বীজ। এই ত্রিবিধ বীজ হইতে যাবতীয় জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুই 'জীবাত্মা' রূপে, পূর্ব্বোক্ত ভূতত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, সর্ব্বপ্রকার জীবদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই "জীব" পদবাচ্য। তেজঃ, অপ্ ও অন্ন এই ভূতত্রয়ের পরিণতির ফলে 'বুদ্ধি' উৎপন্ন হয়; সেই বুদ্ধির সহিত সংসর্গবশতঃ বিশেষ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া, জীব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি অবশ্যই একথা মনে করিতে পার যে, সর্ব্বজ্ঞ চেতন পরমাত্মা, বুদ্ধিপূর্ব্বক এই

শতসহস্র যাতনাময় ও অনর্থের আধার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, অশেষ ক্লেশ ও জন্ম-জরা-মরণাদি ভোগ করিবার জন্য কেন ইচ্ছা করিলেন? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই একথার উত্তর পাওয়া যাইবে। ব্রহ্ম, দুঃখ পাইবেন বলিয়া কাহারও মধ্যে প্রবেশ করেন না। জীব, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, দর্পণে যেমন পুরুষের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়,—সেইরূপ বুদ্ধি ও দেহাদির সংসর্গে, ব্রহ্মকে 'জীব' শব্দে ব্যবহার করা যায়। ব্রহ্মে নিত্যই যে 'মায়াশক্তি'* বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ, সেই মায়ার পরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতির সহিতও তাঁহার সংসর্গ সিদ্ধ হয়। তাঁহাদেরই সংসর্গে জীব, নিজকে সুখী দুঃখী প্রভৃতি রূপে বিবেচনা করে। নতুবা স্বরূপতঃ জীবাত্মার সুখ দুঃখাদি নাই। সূর্য্য যেমন কর্দ্দম-পঙ্কিল জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, বাস্তবিকপক্ষে মলিনতাদি দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথচ সূর্য্যকে আবিল ও মলিন দেখায়; বুদ্ধ্যাদির সংসর্গে জীবাত্মারও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাবতীয় বিকারই মিথ্যা, অসত্য। তবে কি জীবও মিথ্যা? এই জগৎই বল, আর জীবই বল,—ইহারা সেই সদ্বস্তুরই বিকাশ বলিয়া, ইহারাও সত্য পদার্থ; মিথ্যা বা অলীক পদার্থ নহে।

* "প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্য-করণশক্তীনামবস্থানমভ্যুপগন্তব্যম্, শক্তিস্থলক্ষণস্তু নিত্যত্বনির্ব্বাহায়। তাসাংশক্তীনাং সমাহারো—"মায়াতত্ত্বম্"—আনন্দগিরি, কঠভাষ্য।

নামরূপাত্মক যাবতীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া, ইহারা সত্য। সেই সদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে—ভিন্ন ও স্বতন্ত্র-রূপে—ইহারা মিথ্যা। ব্রহ্ম-সত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া, ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না *।

সুতরাং এখন বুঝা যাইতেছে যে, অনভিব্যক্ত নাম-রূপ-সকলের বীজশক্তি—ব্রহ্মেরই আত্ম-স্বরূপ মাত্র এবং ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। এই বীজ তাঁহাতেই শক্তিরূপে বিলীন ছিল। এই শক্তি তাঁহারই সংকল্প বা ইচ্ছাবশতঃ, স্থূলভাবে তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। আবার জীব-রূপে তাঁহারও অনুপ্রবেশ বশতঃ, এই তেজঃ, অপ্ ও অন্ন "ত্রিবৃৎ-কৃত" † হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় স্থূল দেহাদি পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে ‡। যত কিছু স্থূল নাম-রূপাত্মক পদার্থ

---

* "ননু বাচারম্ভনমাত্রঞ্চেৎজীবো নূনৈব প্রাপ্তঃ? নৈব দোষঃ। সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং, স্বতস্তু অনৃতমেব। অতঃ সদাত্মনা সর্ব্ববিকারাণাং সত্যত্বং; সতোঽন্যত্বে চ অনৃতত্বম্"।—ভাষ্যকার।

† ছান্দোগ্যেই ত্রিবৃৎ-কৃত শব্দটী প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী ভূতে অপর দুইটী ভূতের অংশ প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু নিজের অংশের প্রাধান্য থাকে। তিনের এই সম্মিলিত অবস্থার নাম "ত্রিবৃৎকৃত" অবস্থা।

‡ প্রাণ-প্রবেশই 'জীব'-প্রবেশ। আধিদৈবিক পদার্থে যাহা 'প্রাণ', আধ্যাত্মিক পদার্থে তাহাই 'বুদ্ধি'। কেননা, প্রাণ ও বুদ্ধি একই বস্তু।

আছে, সকলই এই ত্রিবৃৎ-করণের ফল। এই প্রকারে ত্রিবৃৎ-কৃত হইয়া, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিকাদি সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ আধিদৈবিক পদার্থ সকলের কথা বলা যাইতেছে। পরিদৃশ্যমান্ ত্রিবৃৎ-কৃত স্থূল অগ্নির যে লোহিত বর্ণ দেখিতেছ, উহা 'তেজেরই' * রূপ বলিয়া জানিবে। আবার উহার যে শুক্লতা দেখিতেছ, তাহা উহার অন্তর্ভূত 'অপেরই' রূপ বলিয়া জানিবে। ইহাতে যে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-চ্ছায়া দেখিতেছ, সেটী উহার অন্তর্ভূত 'অন্নের' রূপ বলিয়া জানিবে। অগ্নির উপাদান এই তিন ভূতের তিনটী রূপ ছাড়িয়া দিলে, অগ্নির আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই তিন রূপের স্বরূপটী জানিলে—অগ্নি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ এই যে 'বোধ' এবং অগ্নি বলিয়া এই যে একটী স্বতন্ত্র 'নাম'—ইহা আর থাকিতে পারে না। অগ্নির এই লোহিতাদি রূপ, ভূত-ত্রয়েরই সম্মিলন-জাত, জানিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে, ঐ ভূতত্রয়ই সত্য পদার্থ, অগ্নি বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা বস্তু। এইরূপ, পরিদৃশ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থেই যে অল্পাধিক পরিমাণে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যুগপৎ দেখিতেছ, উহারা উহাদের উপাদানভূত ভূতত্রয়েরই রূপ। উহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র রূপ নাই। রূপের কথা যাহা বলা

* অর্থাৎ ত্রিবৃৎকৃত হইবার পূর্ব্বাবস্থার তেজঃ, অপ্, পৃথিবী। ইহারা স্থূল ভূতাণু।

হইল, —তদ্রূপ প্রতি পদার্থেই যে অল্পাধিক পরিমাণে গন্ধ, রস, শব্দ, স্পর্শ আছে, তাহাও ঐ ত্রিবৃৎ-করণেরই ফল *। সমস্ত বিশ্বই যখন 'ত্রিবৃৎ-কৃত' হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তখন যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব বা স্বাধীন-সত্তা বাস্তবিক-পক্ষে মিথ্যা বলিয়া দেখান হইল, তেমনি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যা; কেবল উহাদের উপাদানভূত ভূতত্রয়কেই সত্য বলিয়া জানিবে। আবার এই কার্য্য-কারণের প্রক্রিয়ার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, আরও একটী বিষয় উপলব্ধ না হইয়া পারে না। সেই ভূতত্রয়ের মধ্যেও, পৃথিবী,—জলেরই পরিণতি এবং জল আবার তেজঃ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, পৃথিবীর পৃথিবীত্ব ও জলের জলত্ব বা স্বাধীন সত্তা কথার কথা দাঁড়াইতেছে; কেবল এক তেজই সত্য পদার্থ। কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, কার্য্যের,—নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নাই; উহার স্বাধীন সত্তা—নামে মাত্র।

আবার, আমরা দেখিয়াছি —তেজঃও সেই এক অদ্বিতীয়

---

* যেমন 'অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রাদি' 'তৈজস' পদার্থের ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত হইল; এইরূপ বাপী-কূপ-তড়াগাদি 'জলীয়' পদার্থের এবং ব্রীহী-যবাদি-'পার্থিব' পদার্থেরও ত্রিবৃৎ-করণ—সেই মূল ভূতত্রয়যোগেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মূল ভূতত্রয়ের শুক্লাদি 'রূপ'-ত্রয় যেমন উদাহরণগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ 'রস' ও 'গন্ধ' দ্বয়ও দেখান যায়; কেবল তাহা সুস্পষ্ট ভাগ করিয়া দেখান কঠিন বলিয়া প্রদর্শিত হয় নাই।

সদ্বস্তু হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে *। অতএব সেই সদ্বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তেজেরও পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং কেবলমাত্র সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই সত্য দাঁড়াইতেছেন †। তবেই দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে

---

* শ্রুতি এস্থলে, শব্দ ও স্পর্শ গুণস্বরূপ আকাশ ও বায়ুর কথা না বলিলেও, উহারা ইহাদের অন্তর্ভূত আছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এস্থলে শ্রুতি স্থূল ভূতাণুর কথা বলিয়াছেন বলিয়া, সূক্ষ্ম আকাশ ও বায়ুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। আকাশ ও বায়ু—অমূর্ত্ত শক্তিময় অবস্থা। তেজঃ, স্পর্শ-গুণাত্মক বায়ুরই (স্পর্শতন্মাত্রার) অভিব্যক্তি। আবার বায়ু বা স্পর্শ-তন্মাত্রা,—আকাশ বা শব্দতন্মাত্রারই (স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট আকাশ) অভিব্যক্তি। অর্থাৎ মহাকাশে স্পন্দনশক্তি বিকাশিত হইয়া, উহাই তেজরূপে ব্যক্ত হয়। শঙ্করও বলিয়াছেন যে, কোন তৈজস মূর্ত্তদ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া, শব্দ ও স্পর্শ একাকী থাকে না। "ন হি মূর্ত্তাং রূপবদ্দ্রব্যং প্রত্যাখ্যায় বায্বাকাশয়োঃ তদ্গুণয়োঃ স্পর্শশব্দয়োর্বা গ্রহণমস্তি" —ভাষ্যকার। সুতরাং তেজের যে রূপ, তাহাতে স্পর্শ ও শব্দগুণ গূঢ়ভাবে নিহিত আছেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের 'মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণ' দেখ। "রূপসহভাবী উষ্ণস্পর্শভাবঃ"।—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৩।১৩।৮।

† "তেজসোঽপি সৎকার্য্যত্বাৎ ততো ভেদেন অসত্ত্বং—সন্মাত্রমেব—পরিশিষ্টম্"—আনন্দগিরি। তেজঃ, সেই পরমকারণ সদ্বস্তুরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং উহা সদ্বস্তু হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে; উহা প্রকৃতপক্ষে সেই সদ্বস্তুই। অতএব সেই মূল সদ্বস্তু ব্যতীত বিশ্বের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

পারিলেই, আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, কারণের জ্ঞান হইলেই, কার্য্যবর্গের জ্ঞানও অনিবার্য্য। যেহেতু, কারণসত্তা হইতে কোন কার্য্যেরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নাই।

পূর্ব্বকালে গৃহস্থবর্গ এই সৎব্রহ্ম-বস্তুকে জানিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের কুলে কোন বস্তুই অশ্রুত, অজ্ঞাত, অবুদ্ধ নাই। আমরা পরমাত্মাকে জানিয়া, সকল বস্তুই জানিতে পারিয়াছি"। এই সকল ব্রহ্মবিদ্ গৃহস্থ বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে যা' কিছু শুক্লবর্ণ প্রতীত হয়, উহা অপ্-শক্তিরই বিকাশ, যা' কিছু কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় উহা পৃথ্বী-শক্তিরই ফল এবং জগতে যা' কিছু লোহিতবর্ণ, উহা তেজঃশক্তিরই অভিব্যক্তি। পদার্থমাত্রই, তাহা যত কেন দুর্বিজ্ঞেয় না হউক্, সমুদয়ই ঐ ত্রিবিধ উপাদান-সম্মিলনে উৎপন্ন। সুতরাং যাহা কিছু অজ্ঞাত, তাহাকেও ঐ ত্রিবিধ উপাদানের সম্মিলন-জাত বলিয়াই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। মনুষ্যও সেই ত্রিবিধ উপাদান যোগে উৎপন্ন ;—তেজঃ, অপ্, অন্নই ত্রিবৃৎকৃত হইয়া, মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জন্মাইয়াছে।

পুত্র ! আমি তোমায় এতক্ষণ বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, 'বাহ্যিক' বিষয়-সমূহ প্রত্যেকেই, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ত্রিবিধ উপাদান-মিলনে জাত। 'আধ্যাত্মিক' ইন্দ্রিয়াদিও সেই ত্রিবৃৎ-করণেরই পরিণাম মাত্র—এখন তোমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইব। একই উপাদান হইতে বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়বিধ পদার্থ জন্মিয়াছে এবং কেবলমাত্র অবস্থানভেদে উহাদের নাম ও

কার্য্যের ভেদ হইয়াছে, এখন সেই তত্ত্ব বলিব। বাহ্যিকই বল, আর আন্তরিকই বল, যাবতীয় পদার্থই যে সেই "ত্রিবৃৎ-করণেরই" ফল মাত্র, এখন তাহাই দেখাইব, শুনিয়া যাও।

প্রাণী যে ভোজ্য-দ্রব্য (অন্ন) গ্রহণ করে, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ব হইয়া, তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম অংশটী পুরীষরূপে পরিণত হয়; অন্নের যেটী মধ্যম অংশ, সেটী রসাদিক্রমে বিকৃত হইয়া পরিশেষে শরীরের মাংসরূপে পরিণত হয়; ভুক্তদ্রব্যের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা হৃদয়ে যাইয়া, বাগাদি ইন্দ্রিয়-নিবহের অবস্থানের হেতুভূত 'মনের' উপচয় বা পুষ্টি সাধন করে *। অন্ন-রসপুষ্ট বলিয়া মন ভৌতিক দ্রব্য; উহা নিত্য, নিরবয়ব পদার্থ নহে। এই মন —সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট যাবতীয় বস্তুকে ব্যাপ্ত করিতে

* এ সকল কথার তাৎপর্য্য, পরে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও (২।২।১-৪) এই তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় আছে যে অন্নের মধ্যম অংশ হইতে ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র —এই সপ্ত ধাতু গঠিত ও পুষ্ট হয়। দেহের হৃদয়দেশ হইতে অসংখ্য শিরাজাল দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। অন্ন-পানাদির সূক্ষ্ম অংশ—এই সকল শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া করণ-সংঘাতরূপ 'লিঙ্গদেহকে' পুষ্ট করে। অন্ন-পান-জনিত শক্তির নাম 'বল' ও 'প্রাণ'। অতএব অন্ন-পান—দেহ ও প্রাণ উভয়েরই স্থিতির হেতুভূত। এইজন্য অন্নকে 'প্রাণবন্ধন' রজ্জু বলে। এই অন্ন-পান গ্রহণ না করিলে দেহ ও প্রাণ উভয়ই ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যায়।

সমর্থ। এইরূপ, প্রাণী দ্বারা পীত জলও, শরীরের মধ্যে তিন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। স্থূলতম অংশ হইতে মূত্র, মধ্যম অংশ হইতে শোণিত, এবং সূক্ষ্মতম অংশ হইতে 'প্রাণের' উপচয় ও পুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে, তৈল-ঘৃতাদি তৈজস দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাও তিন অংশে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলভাগ দ্বারা অস্থি, মধ্যম অংশ দ্বারা মজ্জা * এবং সূক্ষ্মতম ভাগ দ্বারা 'বাক্যের' পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। তৈল-ঘৃতাদি তৈজস দ্রব্য ভক্ষিত হয় বলিয়াই, মনুষ্যাদি জীব বাক্য বলিতে পারে। অতএব বৎস! ইহা বুঝিয়া রাখ যে,—মন অন্নময়; প্রাণ জলময়; বাক্য তেজোময় দ্রব্য মাত্র †। সমুদ্রমধ্যস্থ মীন-মকরাদি প্রাণী ও ভূমধ্যবাসী ইন্দুরাদি প্রাণী,—ইহারাও যে কিছু পরিমাণে মন ও বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট এবং প্রাণবান্, তাহার হেতু এই যে, কোন প্রাণীই অবিমিশ্র অন্ন-জলাদি আহার করে না; সকলেই 'ত্রিবৃৎ-কৃত' অন্ন, জল ও তৈজসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল প্রাণীরাও

* মজ্জা.—Marrow

† আমরা এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারি যে—তেজঃ, অপ্ ও অন্ন—এই তিনটী, শক্তির 'কার্য্যাংশের (Matter)ই পরিণতি। আর, বাক্, মন, প্রাণাদি—শক্তির 'করণাংশের' (Motion)ই বিকাশ। কার্য্যাংশের আশ্রয় ব্যতীত, করণাংশ থাকিতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই ছান্দোগ্যে তেজঃ, অপ্, অন্নকে—মন, প্রাণ, বাক্যের 'আধার' বা স্থিতির হেতুভূত বলা হইয়াছে।

যে মন ও বাগাদিশক্তি-বিশিষ্ট হইবে, ইহাতে আর অসঙ্গতি কোথায়” ?

শ্বেতকেতু পিতার মুখে এই সকল উপদেশ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“পিতঃ ! অন্নাদি দ্রব্যগুলি ত একত্র মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে। সুতরাং মন, বাক্য প্রভৃতি—সকল-ভূতেরই সূক্ষ্মাংশ হইতে পুষ্টিলাভ করে, এই প্রকার অনুমান করাই ত সঙ্গত ; তবে আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে কেবল অন্নেরই সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মন গঠিত” ?

আরুণি উত্তর দিলেন,—“পুত্র ! কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি, মনোযোগ দাও। দধিকে মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত করিলে, যেমন তাহার সূক্ষ্মাংশ নবনীতরূপে উপরে উঠিয়া যায়, তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয় ; এইরূপ অন্নাদি দ্রব্য ভক্ষিত হইবার পর, বায়ুর সহায়তায় জঠরাগ্নি দ্বারা মথিত হইয়া, সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং মনের অবয়বের সহিত মিলিয়া মনের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই-রূপে, জল ও তেজের সূক্ষ্মাংশ হইতে যথাক্রমে প্রাণ ও বাক্যের পুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বৎস ! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্য তেজোময়। দেখ, মন যে অন্নময়, তাহা তোমাকে আমি অন্যরূপে বুঝাইয়া দিতেছি।

ভুক্ত অন্ন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া, মনের শক্তি উৎপাদন করে, সেই শক্তি সুতরাং অন্নরস হইতে লব্ধ। অন্ন-রস-জাত এই শক্তি ষোড়শ-অংশে পরিণত হয়। মনের এই ষোড়শ-

অংশ থাকাতেই, জীবকে "ষোড়শ-কলাত্মক" * বলা হইয়া থাকে। অন্ন-রস-জাত মানসিক শক্তি বিশিষ্ট পুরুষেরই বিবিধ সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। জীব যে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, জ্ঞাতা ও কর্ত্তা এবং সর্ব্ব-ক্রিয়া-সমর্থ অন্ন-রসই তাহার কারণ। কেন না অন্ন-রস (ভুক্তদ্রব্য) হইতেই পুরুষের মন পরিপুষ্ট হয়। এবং মনের পুষ্টিতেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির পুষ্টি। অতএব মনের বীর্য্য ও সামর্থ্য ভুক্তদ্রব্য হইতেই গৃহীত।

সৌম্য! পুরুষের মানসিক শক্তিনিচয় যে অন্নরস হইতেই গৃহীত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, যদি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও তবে আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত অন্নাহার করিও না; কেবলমাত্র, ইচ্ছা হইলে, কিঞ্চিৎ জল পান করিতে পার, কেননা প্রাণ জলময় বলিয়া, যদি জল পান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাও, তবে তোমার প্রাণ-ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যাইবে; যেহেতু কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী"।

শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশ পাইয়া, 'মন যে অন্নময়' ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে ইচ্ছুক হইল এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত অন্নগ্রহণ করিল না। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইলে, ষোড়শ দিবসে শ্বেতকেতু পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! তুমি আমার নিকটে যে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলে, তাহার

* কলাশব্দটী মনের "অবয়ব" সূচক। ষোড়শ দিবসে মনের একেবারে ক্ষয় হয় বলিয়া মনকে ষোড়শকলা বলা হইয়াছে।

কোন অংশ আমাকে শুনাও। পুত্র ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল,—"ভগবন্‌। ঋগ্বেদাদি কিছুই আজ আমার মনে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না; চেষ্টা করিয়াও আমি তাহার কিছুই মনে আনিতে পারিতেছি না।" পিতা, পুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বৎস! কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলে, যখন সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইয়া কিছুকাল পরে নিবিয়া যায়, এবং সবগুলি নিবিয়া গিয়া, কেবল একটী মাত্র খদ্যোত-প্রমাণ জ্বলদঙ্গার অবশিষ্ট থাকে; তখন যেমন তদ্দ্বারা আর দাহক্রিয়া সম্ভাবিত হইতে পারে না। আজ সেইরূপ অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার মনের, কেবলমাত্র একটী কলা অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই জন্যই তোমার মনে ঋগ্বেদের স্মৃতি উদিত হইতেছে না। এখন কিছু অন্ন গ্রহণ করিয়া আইস।" পুত্র অন্নগ্রহণ করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তখন তাহার মনে ঋগ্বেদের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল ও পিতাকে তখন তাহার অংশ-বিশেষ শুনাইয়া দিল। পিতা, তখন পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিতে লাগিলেন—

"পুত্র! পূর্ব্বে যে অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম, সেই খদ্যোত-প্রমাণ, স্ফুলিঙ্গমাত্রাবশিষ্ট অগ্নিকণার সহিত যদি কতকগুলি শুষ্কতৃণ সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা যেমন সেই অগ্নিকণার সহিত যুক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ পদার্থকেও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়; সেইরূপ পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত অন্নাহারের

অভাব বশতঃ তোমার মনের একটীমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল; সেই ক্ষীণ-কলাটী অদ্য আবার অন্নরস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে; সেইজন্যই আজ পঞ্চদশ দিবসের পরে, পুনরায় তোমার মনে বেদের লুপ্ত-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইলে যে, মন অন্নময়,—মন অন্নরসাত্মক। অন্নরস হইতেই মনের সমুদয়শক্তির পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রাণ ও বাক্যও যথাক্রমে জলময় ও তেজোময়, তাহাও দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবেই দেখ, বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পদার্থই, তেজঃ, অপ্ ও অন্ন এই ত্রিবিধ উপাদানের সম্মিলনেই জন্মিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে, সেই তিন প্রকার মূল উপাদানে উপস্থিত হওয়া যায় এবং ঐ ত্রিবিধ মূল তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে।”

একই উপাদান হইতে বাহ্য বিষয় ও আন্তর ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে, এই শ্রুতি-সিদ্ধান্তটীর বিশেষ তাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্যক। বিষয় ও ইন্দ্রিয়—ইহারা উভয়ই এক জাতীয়; কেননা উভয়ই জ্ঞেয় (Object)। আত্ম-চৈতন্যকে জ্ঞাতা (Subject) বলিলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়ই তাঁহার জ্ঞেয় হইয়া পড়ে *। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, দৃশ্য স্থূল পদার্থমাত্রকেই 'কার্য্যাত্মক' এবং 'করণাত্মক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক বিশ্ব-ব্যাপক শক্তিই সর্ব্বত্র, করণাকারে ও কার্য্যাকারে প্রকাশিত আছে বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচৈতন্যের জগৎ-রচনায় নিযুক্ত প্রাণ-

* (বিষয়)—(ইন্দ্রিয়)— “প্রকাশ্য-প্রকাশকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবঃ”—আনন্দগিরিঃ।

শক্তিই, করণাকারে ও কার্য্যাকারে বিকাশিত হইয়া, এবং এই উভয় অংশই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া, বাহ্য বিষয় ও আন্তর ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইয়াছে। শক্তি-সংসর্গ নিবন্ধন চৈতন্যের (জ্ঞানের) যে অবস্থান্তর প্রতীত হয়, তাহারই নাম শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-সমূহ এবং তাহাদের গ্রাহক চক্ষুঃ-কর্ণ-অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ। একই জ্ঞানের যে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা এই শক্তি-সংসর্গেরই ফল। * সুতরাং শক্তিই বিষয় ও ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে দেখিতে গেলে, শঙ্করাচার্য্যের কথার সঙ্গতি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এক শক্তিই,—বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ পদার্থেরই উপাদান। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্রুতির আরও নানা স্থানে নানা ভাবে এ তত্ত্বের কথা আছে। শ্রুতি-মতে, বিষয়মাত্রই তিন ভাগে বিভক্ত। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রুতির সর্ব্বত্র এই বিভাগ দৃষ্ট হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ—যাহারা প্রাণীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহায় ও 'অনুগ্রাহক' রূপে বর্ত্তমান আছে,—উহারা আধিদৈবিক পদার্থ নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতি সমুদয়ই আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত; ইহারা আত্মাকে অধিকার করিয়া—আশ্রয় করিয়া—অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহারা আধ্যাত্মিক। আর শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সমূহ আধিভৌতিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। একই বিষয় বা জ্ঞেয় বা শক্তি, অবস্থা-ভেদে, এই

* ন কেবল জড়বৃত্তি র্জ্ঞানশব্দার্থঃ, কিন্তু সাক্ষি-বোধ-বিশিষ্টাবৃত্তিঃ, বৃত্তিব্যক্তবোধো বা জ্ঞানম্"—রত্নপ্রভা (বেদান্তদর্শনভাষ্য, ১।১।৫)। "বুদ্ধের্জড়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বাযোগেঽপি চিদাভাসব্যাপ্ত-জ্ঞাতৃত্ব মারোপ্য জানামীতি ব্যবহারঃ—উপ০ সা০ ১৯।৬৮

ত্রিবিধ আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাই শ্রুতির মত। চেতন ও জড়, বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়,—এই দুইটী মাত্র তত্ত্ব স্থির করিয়া লইয়া,—জড় বা বিষয় বা জ্ঞেয় পদার্থটীর, অবস্থাভেদে, ত্রিবিধ ভেদ অভিহিত হইয়াছে। একই বিশ্বব্যাপ্ত, অপরিচ্ছিন্ন শক্তির এই তিন প্রকার অবান্তর ভেদ। শ্রুতির পদার্থ-বিভাগ-প্রক্রিয়া এইরূপ। এখন আমরা বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোক্ত স্থলটী আলোচনা করিয়া দেখিব। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের এই স্থলটীর ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারিলেই বিষয়টী সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। পাঠক, বিষয়টী অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ মন দিয়া প্রণিধানের যোগ্য। শ্রুতি যে বিষয়-বিভাগ-প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহাও বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মের অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত,—এই দুই প্রকার রূপ বা প্রকাশ। সূক্ষ্ম আকাশ ও বায়ু,—ব্রহ্মের অমূর্ত্তরূপ *। ইহারা অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী ও বিভাগ-যোগ্য নহে। সূর্য্যের মধ্যগত সত্তা বা প্রাণ-স্পন্দনই (করণাংশ)† এই অমূর্ত্তরূপের সারাংশ। এস্থলে, অগ্নি, বিদ্যুৎ, দিক্ প্রভৃতি অন্যান্য আধিদৈবিক পদার্থের মধ্যগত করণাংশ বা প্রাণস্পন্দনের

---

* এই বায়ু স্থূল বায়ু নহে। মহাকাশে প্রথমে স্পন্দন অভিব্যক্ত হয়। এই স্পন্দন-(Motion)-বিশিষ্ট আকাশই শ্রুত্যুক্ত ভৌতিক 'আকাশ' এবং স্পন্দনই (Motion) শ্রুত্যুক্ত 'বায়ু'। (বায়োঃ প্রাণস্থ চ পরিস্পন্দাত্মকত্বং)।

† মূলে এই করণাংশ বা প্রাণ-স্পন্দনকে 'পুরুষ'-সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, অচেতন বস্তুকেও 'পুরুষ' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কথা শ্রুতি বলেন নাই; কেন না, সূর্য্য প্রধান বলিয়া শ্রুতি এই একটী-মাত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন; অন্যান্য আধিদৈবিক পদার্থগুলির উল্লেখ না করিলেও, সে গুলিকেও ধরিয়া লইতে হইবে। তেজঃ, জল, পৃথিবী,—এই তিনটী ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। ইহারা পরিচ্ছিন্ন ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; ইহারা যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণগুণবিশিষ্ট। সূর্য্যের মধ্যগত করণাংশের বাহ্য আধার এই সূর্য্য-মণ্ডল,—এই মূর্ত্ত-রূপের সারাংশ। এই ভূতত্রয় যে সকল আধিদৈবিক বাহ্য স্থূল'কার্য্য' উৎপন্ন করিয়াছে, তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রধান বলিয়া এবং সূর্য্য-মণ্ডল দ্বারা শুক্ল,কৃষ্ণ, লোহিতাদি বর্ণের বিভাগ কৃত হয় বলিয়া শ্রুতি—স্থূল-অগ্নি, স্থূল-বিদ্যুৎ, স্থূল-বায়ু প্রভৃতি অন্যান্য আধারের কথা না বলিয়া, কেবল সূর্য্য-মণ্ডলের কথাই বলিয়াছেন।

আধিদৈবিক বিভাগের কথা বলিয়া, শ্রুতি এখন আধ্যাত্মিক অভি-ব্যক্তির কথা বলিতে যাইতেছেন। দেহস্থ হৃদয়াকাশ ও প্রাণ-বায়ু—ইহারাই ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অমূর্ত্তরূপ। চক্ষুরিন্দ্রিয়, এই আধ্যাত্মিক অমূর্ত্তরূপের সারাংশ। এস্থলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রধান বলিয়া * এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ই শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে; কর্ণ-ঘ্রাণাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। প্রাণি-দেহের উপাদান তেজঃ, জল পৃথিবী—ইহারাই আধ্যাত্মিক মূর্ত্তরূপ। ইহারাই শরীরাবয়ব নির্ম্মাণের হেতু। ইহারা ঘনীভূত হইয়া যে সকল অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, তন্মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আধার (গোলক) স্থূলচক্ষুই প্রথমাভিব্যক্ত ও সর্ব্ব-

* "লিঙ্গস্য (প্রাণস্য) হি দক্ষিণেঽক্ষি বিশেষতোঽধিষ্ঠানাৎ"—শঙ্করাচার্য্য।

প্রধান বলিয়া * শ্রুতি এই চক্ষুকেই উহাদের সারাংশ বলিয়াছেন। যেমন আধিদৈবিক স্থূল অভিব্যক্তিতে, সূর্য্য-মণ্ডলকেই সারাংশ বলা হইয়াছে; তদ্রূপ আধ্যাত্মিক স্থূল বিকাশেও চক্ষুকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের স্থূল গোলক-গুলিকেও ধরিয়া লইতে হইবে।

উপরে বৃহদারণ্যক হইতে † যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহার তাৎপর্য্য তবে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক স্থূল পদার্থ-মাত্রেরই একটী 'করণাত্মক' (শক্ত্যাত্মক) অমূর্ত্ত অংশ এবং অপরটী 'কার্য্যাত্মক' (জড়ীয়) মূর্ত্ত অংশ। প্রত্যেক স্থূলপদার্থই তবে করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। করণাত্মক অংশটী অমূর্ত্ত, অদৃশ্য। কার্য্যাত্মক অংশটী মূর্ত্ত, দৃশ্য। আমরা আধার ব্যতীত কেবল শক্তির কল্পনা করিতে পারি না। শক্তি, তাহার আধার ব্যতীত ক্রিয়া করিতে পারে না। এই আধারকেই কার্য্যাত্মক অংশ এবং শক্তিকেই করণাত্মক অংশ বলা যায় ‡। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায়, করণাত্মক অংশকে—Motion এবং কার্য্যাত্মক অংশকে Matter (জড়) বলিয়া অনুবাদ করা

---

* চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস। তেজই স্পন্দন-শক্তির প্রথম স্থূল অভিব্যক্তি। প্রাণি-দেহে ও সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তৈজস চক্ষুই প্রথমে ব্যক্ত হয়। "তেজো রূপোনিরবর্ত্তত অগ্নিরিতিলিঙ্গাৎ তৈজসং হি চক্ষুঃ। চক্ষুষী এব প্রথমে সম্ভবতঃ"—শঙ্করাচার্য্য। চক্ষুঃ-কর্ণাদির যাহা করণাংশ, তাহাই "ইন্দ্রিয়" নামে পরিচিত। এই ইন্দ্রিয়-গুলির যাহা স্থূল আধার, তাহাই গোলক (Sites of organs) নামে পরিচিত।

† বৃহদারণ্যক, ২।৩।১—৬ দেখ।

‡ "কার্য্যং শরীরং করণাধারঃ·····আধেয়ঃ কার্য্যানুপ্রবিষ্টঃ করণভূতঃ—বৃহ০ ভা০, ১।৫।১৩।

যাইতে পারে। অমূর্ত্ত সূক্ষ্মাবস্থা হইতে সকল পদার্থই, মূর্ত্ত স্থূলাকারে পরিণত হয়। অমূর্ত্তাবস্থায় যাহা কেবল সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে মাত্র অনুমিত, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া, মূর্ত্তাবস্থায় পরিদৃশ্যমান হয়। ঘনীভূত হইতে হইলেই, শক্তির করণাংশ ও শক্তির আধার কার্য্যাংশ উভয়ই একসঙ্গে ঘনীভূত হয় *। আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থায় যাহা কেবল ক্রিয়ারূপে অবস্থিত, সেই ক্রিয়া ঘনীভূত (Integrated) হইবার সময়ে, যতই তেজের আকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ততই (শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে) উহার আধার বা কার্য্যাত্মক অংশও ঘনীভূত হইয়া, প্রথমে জলীয় ভাবে, পরে পার্থিব কঠিন ভাবে দেখা দেয় †। সুতরাং তেজঃ, জল, পৃথিবী—এই ত্রিবিধ ভাবই দৃশ্য বা মূর্ত্তরূপ এবং আকাশ ও বায়ু ‡ এই দ্বিবিধ ভাবই শক্তির ক্রিয়াত্মক অদৃশ্য বা

---

* পাঠক, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক Herbert Spencer এর সিদ্ধান্ত শুনুন্—"Both the quantity of *Motion* and the quantity of *Matter* contained in it, increase or decrease: and increase or decrease of either is an advance towards greater diffusion or greater concentration."

† এই জন্যই মহামতি শঙ্করাচার্য্য অন্যস্থলে বলিয়াছেন যে—"আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য……অগ্নেঃ স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি"। আবার,—"অগ্নিনা বাহ্যান্তঃপচ্যমানো যোঽপাং শরঃ স সমহন্যত, সা পৃথিবী অভবৎ"।

‡ মহাকাশে প্রাণ-স্পন্দন অভিব্যক্ত হইলে,সেই স্পন্দন বিশিষ্ট আকাশকেই 'ভূতাকাশ' বলে এবং স্পন্দন-ক্রিয়াকেই 'বায়ু' বলা হয়। বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে স্থূল বায়ুর উল্লেখ করা হয় নাই। তেজই—স্পন্দনের প্রথম

অমূর্ত্তরূপ। তবেই আমরা এখন বুঝিতেছি যে, শ্রুতিমতে দৃশ্য স্থূল পদার্থমাত্রই—করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, আধিদৈবিক স্থূল সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের করণাংশই —তেজঃ ও আলোকের আকারে বিকীর্ণ হইতেছে; এবং কার্য্যাংশই— স্থূলাকারে প্রত্যক্ষ হইতেছে। আবার, আধ্যাত্মিক দেহের করণাংশ— চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতেছে; এবং কার্য্যাংশ—স্থূল দেহাবয়ব রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে। সুতরাং আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদির যাহা করণাংশ, তাহাই আধ্যাত্মিক দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদির করণাংশ *। এই জন্যই শ্রুতিতে সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে যে, সূর্য্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থই আধ্যাত্মিক দেহে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শক্তিই শক্তির উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই প্রাণি-দিগের জীবিতকালে, সূর্য্য-চন্দ্রাদিকে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহায় ও 'অনুগ্রাহক' বলিয়া কথিত হইয়াছে †।

অভিব্যক্তি। তেজের কথা বলাতেই বায়ুর কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কেননা, স্পর্শতন্মাত্রার দুই আকার; উষ্ণস্পর্শ (তেজঃ) ও শীতস্পর্শ (জল)। "বায়ুনা হি সংযুক্তং জ্যোতি দীপ্যতে, দীপ্তং হি জ্যোতি রন্নমত্তুং সমর্থো ভবতি"—শঙ্করাচার্য্য।

* তাবেতা বাদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষৌ একস্য সত্যস্য ব্রহ্মণঃ সংস্থান-বিশেষৌ...আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকয়োরন্যোন্যোপকার্য্যোপকারকত্বাৎ...সত্যস্য একস্য অংশৌ—বৃহ০ভা০, ৫।৫।২ [সত্যস্য—হিরণ্যগর্ভস্য সূত্রাত্মনঃ ৫।৫।১]

† শঙ্কর বলেন—যে যাহার উপকার করে, তাহারা একই মূলকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং সূর্য্য-চন্দ্রাদি ও চক্ষুঃ-কর্ণাদি—উভয়েরই একই উপাদান। "যচ্চ লোকে পরস্পরোপকার্য্যোপ-

আর একটী কথাও এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যাহাকে আমরা প্রত্যেক পদার্থের 'কার্য্যাত্মক' স্থূল অংশ বলিলাম, উহাও শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আমাদের নিকটে জড়ের অস্তিত্ব প্রতিরোধক-ক্রিয়ারূপেই প্রতিভাত। যাহা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরে বাধা দিতে পারে, তাহাই আমাদের কাছে জড়নামে পরিচিত। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য অন্যস্থলে বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়-গুলি স্থূল বিষয়ের সমান-জাতীয়। বিষয় গুলি গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য; ইন্দ্রিয়-গুলি গ্রাহক বা প্রকাশক রূপে বর্ত্তমান—এইমাত্র ভেদ। নতুবা উহারা এক জাতীয়। প্রদীপ যেমন নিজে রূপবিশেষ হইয়াও সকল রূপের প্রকাশক (করণ) রূপে বর্ত্তমান; তদ্রূপ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সকল, স্বাত্মপ্রকাশের নিমিত্ত, সংস্থানান্তর গ্রহণ করিয়া করণ বা ইন্দ্রিয়-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবেই সংস্থান-ভেদে একই বস্তু দুই প্রকার অবস্থা ধারণ করিয়াছে, নতুবা উভয়ই একজাতীয়" *। অতএব, এখন আমরা দেখিতেছি যে, একই বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তি—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে।

প্রশ্নোপনিষদে এই তত্ত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে আমরা

কারকভূতং তদেক-কারণপূর্ব্বকমেক-সামান্যাত্মকমেক-প্রলয়ঞ্চ দৃষ্টম্। তস্মা-দিদমপি পৃথিব্যাদিলক্ষণং জগৎ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকত্বাৎ তথাবিধং ভবিতুমর্হতি—বৃহ০ ভা০, ২।৫।১।

* "বিষয়সমানজাতীয়ং করণং মন্যতে শ্রুতি র্নতু জাত্যন্তরম্। বিষয়স্যৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণং নাম। যথা রূপবিশেষস্যৈব সংস্থানং প্রদীপঃ করণং সর্ব্বরূপ-প্রকাশনে। এবং সর্ব্ববিষয়-বিশেষাণামেব স্বাত্মবিশেষ—প্রকাশকত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি প্রদীপবৎ"।—বৃহ০ ভা০, ২।৪।১১॥

দেখিতে পাই, প্রজাপতি—প্রাণ ও রয়িনামক এক মিথুনের সৃষ্টি করিলেন। এই মিথুনই ক্রমশঃ পরিণত হইয়া এই বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। 'প্রাণ' নামক এক অংশ হইতে ক্রমে প্রাণি-বর্গের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এবং 'রয়ি' নামক অপরাংশ হইতে স্থূল দেহাবয়ব রচিত হইয়াছে। 'প্রাণ' ও 'রয়ি' সকল পদার্থের মূল। আকাশীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম অবস্থাই 'প্রাণ' এবং তৈজস, জলীয় ও পার্থিব স্থূল অবস্থাই 'রয়ি' *।

এই প্রাণ ও রয়ি উভয়ই সংহত হইয়া (Integrated), সকল পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে' —এই প্রাণকে 'বল' এবং রয়িকে 'অন্ন' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। শক্তিমাত্রই (Motion) স্থূল উপাদানকে (Matter) আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। উভয়ই একত্র থাকে; কাহাকে ছাড়িয়া কেহ একাকী থাকিতে পারে না †। এই প্রাণ বা বলই—ভূতাত্মক রয়ি বা অন্নকে শরীরাদির আকারে গড়িয়া তোলে এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হয়। অতএব প্রাণ ও রয়ি একত্রে, এ জগতের মূল উপাদান

---

* প্রাণই (করণাংশ) ঘনীভূত হইবার সময়ে, শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র-রূপে সূক্ষ্মভাবে বিকাশিত হয়। আবার, রয়িই (কার্য্যাংশ) ঘনীভূত হইবার সময়ে, ক্রমে স্থূলভাবে তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপে বিকাশিত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য।

† পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ...তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতে অন্নাৎ। এতে হতুএব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতঃ"। "অত্তা হি প্রাণঃ, অতোঽন্নেন বিনা ন শক্নোতি আত্মানং ধারয়িতুম্"। —বৃহঃ ভাঃ ।১২৫।১।

হইতেছে। ইহাই ব্রহ্মশক্তি।* প্রাণ ও রয়িকে বিভাগ করিয়া দেখান যায় না; সর্ব্বদা উহারা একত্রে থাকে। এইজন্য শ্রুতির নানাস্থানে এই উভয়কে একত্রে "প্রাণ-শক্তি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম— জ্ঞাতা; এই প্রাণ-শক্তি তাঁহার জ্ঞেয়।

সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনকে শ্রুতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি † নামে সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১ অধ্যায়) আমরা প্রজাপতির এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই।—আদিপুরুষ প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয় হইতে অগ্নি ও অগ্নির আশ্রয় পৃথিবী সৃষ্ট হইল। অগ্নি ও বাগিন্দ্রিয় উভয়ে উভয়ের উপকারক। প্রজাপতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় ‡ হইতে বায়ু ও বায়ুর আশ্রয় অন্তরীক্ষ সৃষ্ট হইল। বায়ু ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় উভয়ে উভয়ের উপকারক। প্রজাপতির চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য ও সূর্য্যের আশ্রয় আকাশ সৃষ্ট হইল। সূর্য্যালোক ও চক্ষুরিন্দ্রিয় উভয়ে উভয়ের উপকারক। প্রজাপতির শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সকল ও চন্দ্র সৃষ্ট

---

* "সর্ব্বত্রৈব মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ ব্রহ্মরূপেণ বিবক্ষিতত্বাৎ।—বৃহং, ভাং, ২।৩।৩

† ভাষ্যকার আরো অনেক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মৃত্যুশ্চ অশনায়ালক্ষণঃ, বুদ্ধ্যাত্মা সমষ্টিঃ, প্রথমজঃ, বায়ুঃ, সূত্রং, সত্যং হিরণ্যগর্ভঃ।...যঃ সর্ব্বাভূতান্তরাত্মা লিঙ্গম্ অমূর্ত্তরসঃ"—বৃহং ভাং, ৩।৩।১। "ততোঽপি লব্ধ-পরিস্পন্দং তৎসদভবৎ...অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্"—ছান্দোগ্য ভাষ্য, ৩।১৯।১।

‡ মূলে 'প্রাণ' শব্দ আছে। নাসিকায় প্রাণের যে অংশ ক্রিয়া করে, তাহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

হইল। * দিক্ ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ে উভয়ের উপকারক। প্রজাপতির মন হইতে † জল ও বরুণ সৃষ্ট হইল। মন ও জল উভয়ে উভয়ের উপকারক। ‡ আবার, ঐতরেয় উপনিষদের প্রথমেও প্রায় এই প্রকারেই প্রজাপতির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আছে যে, আদিপুরুষ প্রজাপতির মুখ ফুটিয়া উঠিল। মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয়

---

* দিক্‌সকল (spaces) অবকাশ প্রদান না করিলে শব্দ-শ্রবণ সম্ভব হইত না। চন্দ্র—প্রতিপদাদি তিথির বৃদ্ধি-ক্ষয়কারী। বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি ক্রিয়া—স্পন্দনেরই রূপান্তর। সুতরাং চন্দ্রও স্পন্দনেরই রূপান্তর। অতএব স্পন্দন ব্যতীত শব্দ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। এইজন্য 'চন্দ্র' উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে যে—প্রজাপতির প্রাণ হইতে চন্দ্র ও চন্দ্রের আধার জল সৃষ্ট হইল। "প্রাণস্য আপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রঃ"। ভাষ্যকার অন্যত্র বলিয়াছেন—"বায়ুনিমিত্তৌ হি বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চন্দ্রমসঃ। প্রাণবায়ু-চন্দ্রমসামেকত্বাৎ চন্দ্রমসা বায়ুনা চ উপসংহারেণ ন কশ্চিদ্বিশেষঃ "(বায়ুঃ=সূত্রাত্মাঃ)।" সূত্রাধীনা হি চন্দ্রাদের্জগতশ্চ চেষ্টা ইত্যর্থঃ"—আনন্দগিরি।

† শ্রুতির অন্যত্র আছে যে—প্রজাপতির রেতঃ হইতে জল সৃষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ জলই আদিপুরুষ-প্রজাপতির রেতঃস্থানীয়।) এবং প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ চন্দ্রই প্রজাপতির মনঃস্থানীয়।) এসকল কথার তাৎপর্য্য এই যে—যে প্রাণ-স্পন্দন, সূর্য্যাদির অভ্যন্তরে, সেই প্রাণ-স্পন্দনই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল।

‡ যজ্ঞীয় আহুতিতে জল-ঘৃতাদি দ্রব দ্রব্য থাকে। যজ্ঞীয় আহুতি মনের শ্রদ্ধা দ্বারা প্রদত্ত হয়। এইজন্য, জল ও মন উভয়ে উভয়ের উপকারক বলা হইয়াছে।

ও বাগিন্দ্রিয় হইতে অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। প্রজাপতির নাসিকা ফুটিল। নাসিকা হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে বায়ু ব্যক্ত হইল। প্রজাপতির চক্ষুঃ ফুটিল। চক্ষুঃ হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য ব্যক্ত হইল। প্রজাপতির কর্ণ ফুটিল। কর্ণ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সকল ব্যক্ত হইল। প্রজাপতির হৃদয় ফুটিল। হৃদয়াকাশ হইতে মন ও মন হইতে চন্দ্র ব্যক্ত হইল।—ইত্যাদি বর্ণনা দৃষ্ট হয়। প্রজাপতির পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা ও এই বর্ণনা হইতে, আমরা প্রজাপতিকে 'পুরুষ' রূপে কল্পিত দেখিতে পাই এবং এই পুরুষের আধিদৈবিক মূর্ত্তি বর্ণিত দেখিতে পাই। এই জন্যই আধিদৈবিক সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃস্থানীয়, অগ্নি তাঁহার বাক্য-স্থানীয়, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ-স্থানীয়—ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে। কোন বস্তুই প্রাণ-স্পন্দন ছাড়া নহে; সকল বস্তুই প্রাণের (প্রজাপতির) অঙ্গ-স্থানীয়। ইহারই পরে, ঐ তরেয় উপনিষদে প্রজাপতির 'আধ্যাত্মিক' মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে; সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপে; বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে; দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয় রূপে; চন্দ্র মনরূপে'; জল রেতোরূপে—আধ্যাত্মিক দেহের মুখ, চক্ষুঃ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিল। অর্থাৎ প্রথমে প্রাণ-স্পন্দন হইতে অগ্নি-সূর্য্যাদি পদার্থই ব্যক্ত হইয়াছিল। পরে যখন প্রাণি-বর্গের অভিব্যক্তি হইল, তখন সেই প্রাণ-স্পন্দন হইতেই চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ব্যক্ত হইল। এই আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গও সেই প্রজাপতিরই অঙ্গ-স্থানীয় *। সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিসমূহই,

* বৃহদারণ্যকেও প্রজাপতির দুই মূর্ত্তি বর্ণিত আছে। "দ্বিরূপো হি প্রজাপতের্ব্বাক্। 'কার্য্য' মাধ্যাত্মিকপ্রকাশঃ, 'করণঞ্চ' আধেয়ঃ প্রকাশঃ। তদুভয়ং পৃথিব্যগ্নী বাগের প্রজাপতেঃ"—ইত্যাদি (২।৫।১১,১৩।)

প্রাণিদেহে পরিচ্ছিন্নভাবে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। উভয়ের মূল এক প্রাণ-স্পন্দন। টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন—

"যদ্যপি বাগভিমানী অগ্নি র্নতু বাগেব, তথাপি তস্য বাচং বিনা প্রত্যক্ষমনুপলব্ধেঃ তস্যা অপি দেবতাং (অগ্নিং) বিনা স্ববিষয়-গ্রহণ সামর্থ্যাভাবাৎ, তয়োরেকলোলীভাবে ন অভেদোক্তিঃ। করণৈ র্বিনা তাসাং দেবতানামদনাদিভোগাসম্ভবতঃ তাসাং প্রবেশ অর্থাৎ চোদিত এব"।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলির করণাংশ (শক্তিপুঞ্জ)—চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তির সহায়তা করিয়া থাকে এবং এইজন্যই ইন্দ্রিয়-গুলি স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুদাদিই, শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং ইহারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তির উপাদান। অর্থাৎ যে শক্তিগুলি আধিদৈবিক মুর্ত্তিতে বিশ্বব্যাপ্ত, উহারাই—পরিচ্ছিন্নভাবে শব্দ-স্পর্শাদি 'বিষয়' রূপে (কার্য্যাত্মক-ভাবে), এবং উহাদের গ্রাহক চক্ষুঃ-কর্ণাদি 'ইন্দ্রিয়' রূপে (করণাত্মক-ভাবে) অভিব্যক্ত হইয়াছে। এসকলেরই সুতরাং একই উপাদান। আবার, স্থূল চক্ষুরাদি অবয়বগুলি, সূক্ষ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোলক বা অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। টীকাকারও তাহাই বলেন—

"যদ্যপি বাগাদি-করণজাতমপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং, নতু মুখাদি-গোলক কার্য্যং তথাপি মুখাদ্যাশ্রয়ে তদভিব্যক্তেঃ, মুখাদ্বাগিত্যুক্তম্।"

চক্ষুরাদি দেহাবয়বের আশ্রয়ে দর্শনাদি ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হয়। অতএব "সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে, চক্ষুতে (ব্যষ্টিদেহে) প্রবেশ করিল— এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। এই প্রকারে এক প্রাণ-স্পন্দন হইতে—সূর্য্যাদি দেবতা, চক্ষুরাদি করণ এবং চক্ষুরাদির গোলক প্রাদুর্ভূত হইল। ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের বোধ অসম্ভব; শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ব্যতিরেকেও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অসম্ভব। উৎপত্তিকাল হইতেই করণ

বা ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়-তৃষ্ণা-বিশিষ্ট। যে নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের—যে নির্দ্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তাহা উহাদের উৎপত্তিকাল হইতেই সূচিত হয় *। রূপাদি বিষয় গ্রহণ হইলেই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইয়া থাকে। আবার সূর্য্যাদির আলোক না থাকিলে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, দর্শন-ক্রিয়ায় সমর্থ হইত না। অতএব, সূর্য্যাদি দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়বর্গ—ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারক। এই জন্যই ইহারা সকলেই একই মূল প্রাণ-স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে †। ইহারা একই প্রাণ-স্পন্দনের আকার-ভেদ মাত্র। তবেই দেখা যাইতেছে যে Subjective (আধ্যাত্মিক) ও Objective (আধিভৌতিক) বস্তুগুলি যে একই মূল উপাদান হইতে অভিব্যক্ত এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য ; কেবল স্থান ও অবস্থা-ভেদে নামের ভেদ ‡।

---

* এই জন্যই ঐতরেয় শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গকে 'অশনাপিপাসা-বিশিষ্ট' বলা হইয়াছে। সায়ন দীপিকায় আছে ··"অশনাপিপাসাশব্দেন ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়গোচরৌ তৃষ্ণা-কামা-বুচোতে"।

† 'যচ্চ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং তদেককারণপূর্ব্বকম্ এক-সামান্যাত্মকম্ একপ্রলয়ঞ্চ দৃষ্টম্'—শঙ্কর।

‡ "কার্য্য-করণ-বতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাম্ অধ্যাত্মা বিভূতাধিদৈবভেদ-কোটিবিকল্পানাং...নিয়ন্তা...হিরণ্যগর্ভঃ (প্রাণঃ) অভ্যুপ-গম্যতে'।—ছান্দোগ্যভাষ্য, শঙ্কর, ৫।১।১৫। আনন্দগিরিও ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ, সাচৈকা সমষ্টিরূপাদেবতা, তদবস্থা-ভেদানাং দেবতানাং নিয়ন্তা"। আধ্যাত্মিকাদি সকল পদার্থই সেই মূল প্রাণ-স্পন্দনেরই অবস্থাভেদমাত্র।—ইহাই সিদ্ধান্ত।

আমরা এই উপলক্ষে পাঠকবর্গের আর একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি। যখন ইন্দ্রিয় ও ভূত-সৃষ্টির কথা উঠিয়াছে, তখন এ বিষয়ে হিন্দু-দর্শনেরই বা সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। উপরে আমরা ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতির মত আলোচনা করিলাম; এখন দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা বলিব; নতুবা একটা অপসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পাঠক অবগত আছেন যে, হিন্দু-দর্শনে মহর্ষি কপিলের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। হিন্দুশাস্ত্রমাত্রেই, সাংখ্যদর্শনের প্রশংসা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির যে তত্ত্ব আছে, তাহাকে সাংখ্য-মতের সহিত অনুগত করিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি সাংখ্যমতের সহিত উপনিষদুক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বের মিল না থাকে, তবে সে তত্ত্বের যাথার্থ্যবিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। কেন না, হিন্দুশাস্ত্র নিজেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বত্র, কপিলকেই আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়াছেন। এখন আমরা দেখিব, উপনিষদের ইন্দ্রিয় ও বিষয়োৎপত্তির বিবরণ এবং সাংখ্যের বিবরণ এক, কি বিরোধী। আমরা দেখিয়াছি উপনিষদে বা বেদান্তে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র * হইতেই ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা

* পাঠক পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃত অর্থ উপরেই পাইয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম আকাশ ও বায়ু (প্রাণ-স্পন্দন) ক্রমশঃ পরিণত হইয়া প্রাণি-দেহে ইন্দ্রিয়াদি-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং পরিণত হইবার সময়ে যখন মহাকাশে প্রাণ-স্পন্দন তেজের আকারে বিকীর্ণ হইয়া শক্তির ক্ষয় হইয়া থাকে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে উহা জলীয় ও পরে কঠিন পার্থিব আকারে স্থূল ভাবে, শেষে প্রাণীর দেহাকারে সংহত হয়। শক্তি যখন উহার আধারের সহিত পরিণত হইয়া থাকে, তখন যে উহার পাঁচপ্রকারের অবস্থা হয়, সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াই "পঞ্চতন্মাত্র" নাম রাখা হইয়াছে। দেশ ও কালে

আছে। সাংখ্যদর্শন কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্বকেই,—ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের উপাদান-কারণ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে ইন্দ্রিয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, একথা সাংখ্যে পাওয়া যায় না। "সাত্ত্বিক-মেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ" এবং "ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ম্" (সাংখ্যকারিকা, ৩৫)। এক অহঙ্কার নামক সূক্ষ্ম উপাদান হইতে দুইদিকে দুইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব জন্মিয়াছে;—একটী পঞ্চভূত, অপরটী ইন্দ্রিয়-নিচয়। তবে ত দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদ্ ও সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত!! তবে কি উপনিষদ্ ভ্রান্ত?

ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দেখিলে, উপনিষদ্‌কে ভ্রান্ত বলা বিচিত্র নহে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুদর্শন বুঝিতে হইলে, কেবল উপরে উপরে দেখিলে চলিবে না; বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, উল্লিখিত উভয় মতের মধ্যে বাস্তবিক-পক্ষে কোন বিরোধই লক্ষিত হইবে না। আমরা এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রকৃত-পক্ষে বেদান্তমত, সাংখ্যাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট মাত্র; বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। পাঠক শুনিয়াছেন যে, উপনিষদ্ বা বেদান্তের মতে, পঞ্চতন্মাত্র হইতেই, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটী দ্রব্যই * জগতের আদিম উপাদান। ইহারাই নানাভাবে মিলিয়া

বদ্ধ বলিয়া ইহাকে জড়-শক্তি বলা যায়। এবং জড়শক্তি বলিয়া, শক্তিকে "ভূত" শব্দে অভিহিত করা হয়।

* দ্রব্য শব্দের অর্থ শক্তি।

মিশিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ ত্রিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য এই যে, একটী বেশী হইলে, অন্য দুইটী তদ্দ্বারা অভিভূত থাকে। একথাটী ভুলিলে চলিবে না। বেদান্ত বলেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র হইতেই ইন্দ্রিয়েরা ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়োৎপত্তির প্রণালীটী (process) কিরূপ, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। বেদান্তমতে, এই সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশ বৃদ্ধি পাইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রজোংশ বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। "গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি।...এতৈশ্চ সত্ত্বগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈঃ.....শ্রোত্রাদীনি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে।... ...এতৈরেব রজোগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈঃ......কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে। ......এতৈরেব সত্ত্বগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈঃ......মনোবুদ্ধ্যাদীনি জায়ন্তে" (বেদান্ত-পরিভাষা)। যখন একটী গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন অন্য গুণদ্বয় তাহার অনুগত ছিল। সুতরাং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে,—একথায় ইহা আসিতেছে না যে, তমোগুণাত্মক ভূত-পদার্থই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। এস্থলে তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইতেছে যে, সত্ত্ব এবং রজঃই, বাস্তবিক পক্ষে, যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপাদান; এবং তমোদ্রব্যই স্থূল ভূতগুলির উপাদান। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত উপাদান, বেদান্ত-মতে, সত্ত্ব এবং রজঃ দ্রব্য। এবং স্থূল ভূতের উপাদান তমঃ দ্রব্যই। সাংখ্যের সঙ্গে একথার বিরোধ থাকিতে পারে না। সাংখ্য মতেও, সাত্ত্বিক ও রাজসিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি; এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে স্থূল ভূতের সৃষ্টি। তবেই মনঃ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তির উপাদান হইতেছে—সত্ত্ব ও রজঃ; এবং স্থূল ভূতের উপাদান হইতেছে—তমঃ। ইন্দ্রিয়-গুলি শক্তিমাত্র; ইহারা স্থূল

ভূতের সঙ্গে মিলিত ভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, কেহ কেহ ইহাদিগকে ভৌতিক বলিয়া থাকেন। নতুবা ভূত কখনই ইন্দ্রিয়ের উপাদান (Material cause) হইতে পারে না। একই শক্তির অবস্থা-ভেদ হইতে ইন্দ্রিয় ও ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু, সাংখ্যদর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ের ১১০ সূত্রে একথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন। আমরা বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, প্রশ্ন এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে ইন্দ্রিয় ও বিষয় সৃষ্টির সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছি, তাহাকে সাংখ্যের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা হিন্দু-দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। ইন্দ্রিয়-গুলি শক্তিমাত্র, ইহারা স্থূল ভূত-সংযোগে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়। অতএব স্থূল ভূতগুলি, উহাদের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র; নতুবা ভূতগুলি,—ইন্দ্রিয়-শক্তির উপাদান-কারণ হইতে পারে না। ফলতঃ, সত্ত্ব ও রজোদ্রব্য প্রধান হইয়া ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে এবং তমোদ্রব্য প্রধান হইয়া স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কথা এই যে, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের স্থূলাভিব্যক্তি ব্যতীত, অর্থাৎ স্থূল ভূতাত্মক উপযুক্ত আধার ভিন্ন, ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না; একথাটী বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। যথোপযুক্ত স্থূল ভূতাত্মক অধিষ্ঠান পাইলেই, ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ হয়, নতুবা হয় না। তাই, উপনিষদে কোন কোন স্থলে—অন্নাদি স্থূল ভূত হইতে ইন্দ্রিয়-গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কথা বলা হইয়াছে। তেজঃ যেমন কাষ্ঠ-সংযোগে অগ্নিরূপে অভিব্যক্ত হয়; সত্ত্বদ্রব্য ও (অহঙ্কার-তত্ত্ব) তেমনি ভূত-সংযোগে (চক্ষুরাদি অধিষ্ঠানে) ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই উপনিষদের গূঢ় তাৎপর্য্য। সত্ত্বাদি দ্রব্য পরস্পরকে ছাড়িয়া একাকী থাকে না; একটী প্রবল হইলে অন্য দুইটী অপ্রধানভাবে তাহার সঙ্গে থাকে। সুতরাং যে সময়ে, তমোগুণ প্রধান

হইয়া স্থূলাকারে পরিণত হইতেছিল, সে সময়ে সত্ত্ব-শক্তিও রজঃশক্তির সহিত, ইন্দ্রিয়-শক্তির আকারে পরিণত (Integrated) হইতেছিল; কেবল পঞ্চ-ভূতের যথোপযুক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তনের অভাবে (অর্থাৎ যত-দিন না স্থূল প্রাণীদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত) তাহা তখন প্রকাশিত হয় নাই। পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে, পঞ্চভূত প্রাণীর দেহাকারে পরিণত হইতে লাগিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে, যথোপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া, তদন্তর্গত সুপ্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিও জাগিয়া উঠিল। "পঞ্চতন্মাত্র হইতে, সত্ত্ব ও রজঃ প্রধান হইয়া ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে"—বেদান্ত একথা বলিয়া, সেই তত্ত্বই পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন যে,—সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, বায়ু প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি বীজাকারে লুক্কায়িত ছিল; উহারাই পরে প্রাণি-দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে। * বোধ করি পাঠক এখন উপনিষদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

* প্রাণস্পন্দন—'করণ'রূপে (Motion) এবং 'কার্য্য'রূপে (Matter) ব্যক্ত হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। পাঠক তাহা অবতরণিকায় দেখিয়া-ছেন। বৃহদারণ্যকে আছে, প্রজাপতির আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার বিকাশেই এই করণাংশ ও কার্য্যাংশ আছে। কার্য্যাংশটী—করণাং-শের বাহ্য আধার। "পৃথিবী শরীরং বাহ্য আধারঃ অপ্রকাশঃ। জ্যোতী-রূপং করণং পৃথিব্যা আধেয়ভূতং। আধারত্বেন পৃথিবী ব্যবস্থিতা কার্য্য-ভূতা; অগ্নিরাধেয়ঃ করণরূপো...পৃথিবীমনু প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদি সর্ব্বত্র। এই আধার বা কার্য্যাংশ হইতেই নামরূপাত্মক স্থূলদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই আধেয় বা করণাংশই দেহের আশ্রয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

আমরা আর একটী কথা বলিয়া এই ইন্দ্রিয় ও বিষয় সৃষ্টির কথার উপসংহার করিব। পাঠক শুনিয়াছেন যে, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয়-শক্তি-সমূহের "অধিদেবতা" রূপে উপনিষদ্ নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে,—সমষ্টি ইন্দ্রিয়-গুলিই, ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়-গুলির "দেবতা"। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর এই মীমাংসা বড়ই চমৎকার। এটী বুঝিলে এই ইন্দ্রিয় সৃষ্টির কথাটা আরো পরিষ্কার হইবে বলিয়া, আমরা এ কথাটাও এ স্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। "সমষ্টি" শব্দের অর্থ কি? একটা দৃষ্টান্ত দিলে ইহার অর্থ সহজে বুঝা যাইবে। পত্র-শাখা-কাণ্ড-পুষ্পাদি-বিশিষ্ট বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহার বীজে, উৎপত্তির পূর্ব্বে, সমষ্টি-ভাবে লুক্কায়িত ছিল। অতএব একভাবে দেখিতে গেলে, বটের বীজকে, বটবৃক্ষের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর 'সমষ্টি' শব্দকে এই বীজরূপেই বুঝিতে হইবে। নতুবা, সমষ্টি অর্থে, "বৃক্ষের সমষ্টি যেমন বন"—এভাবে বুঝিলে চলিবে না। তবেই কথাটা দাঁড়াইতেছে যে, প্রাণী-সৃষ্টির পূর্ব্বে, যখন কেবল মাত্র সৌর-জগৎ সৃষ্ট হইয়া অগ্নি, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলিও বীজাকারে (শক্তিরূপে) উহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ইহাই অভিপ্রায় দাঁড়াইতেছে। পরে, যথোপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া সেই শক্তিগুলি ব্যষ্টি-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা "সমষ্টি" শব্দের যে অর্থ করিলাম, উহা আমাদের মনঃকল্পিত অর্থ নহে। পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। "অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যম্" (পাতঞ্জলদর্শন, ব্যাসভাষ্য ৩।৪৪)। উক্ত "সমূহ" দুই প্রকারের; যুতসিদ্ধাবয়ব এবং অযুতসিদ্ধাবয়ব। যে সমূহের অবয়বগুলি যুত-সিদ্ধ (পৃথক্‌ভাবে স্থিত, অর্থাৎ পরস্পর অসংশ্লিষ্ট-ভাবে অবস্থিত) তাহাকে যুতসিদ্ধাবয়ব বলে; যেমন বন, সংঘ প্রভৃতি। যাহার অবয়ব

গুলি পৃথক্‌ভাবে থাকে না, পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থান করে, তাহাকে অযুতসিদ্ধাবয়ব বলে; যেমন বৃক্ষ, পরমাণু, শরীর প্রভৃতি। পতঞ্জলি বলেন, "অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের অনুগতই 'দ্রব্য"। অতএব ব্যাসভাষ্যে যাহাকে 'অযুতসিদ্ধাবয়ব' বলা হইয়াছে, সেই অর্থেই বিজ্ঞান-ভিক্ষুর "সমষ্টি" শব্দকে বুঝিতে হইবে। তবেই এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে, আধিদৈবিক সূর্য্যাদিতে, ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলি সমষ্ট্যাকারে বা বীজ-ভাবে অবস্থিত ছিল; পরে, উহারাই যথোপযুক্ত ভূত-সংসর্গে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত এখন সুস্পষ্ট হইতেছে যে,—একই উপাদান-কারণ ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়া সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; উহাই আবার স্পর্শ-শব্দ রূপ-রসাত্মক বিষয়রূপে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব, বিষয় ও ইন্দ্রিয়, এক উপাদান হইতেই সঞ্জাত।

যাহাকে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি নামে ব্যবহার করিয়া থাকি, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকের নিকটে, তাহাদের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। দার্শনিকেরা জানেন যে, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ শক্তি (প্রাণ-শক্তি) জগতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, এবং এই শক্তিই, ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বরূপাভিব্যক্তির দ্বার বা ক্ষেত্রমাত্র। ক্রম-পরিণতির নিয়মে এই শক্তিগুলি যতই পরিণত হইয়া যাইতেছে, চৈতন্যেরও তাদৃশ অভিব্যক্তি প্রতীত হইতেছে। চৈতন্য,—নিত্য ও একরূপ বস্তু; ইঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিণতি নাই। কেবল শক্তি-সংসর্গে—ভৌতিক পদার্থ-সংযোগে—ইঁহার অভিব্যক্তির তারতম্য প্রতীত হইয়া থাকে। শক্তিগুলি ক্রমোন্নত প্রণালীক্রমে প্রকাশিত হইয়া, প্রথম পঞ্চতন্মাত্র রূপে, পরে চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপে; পরে উহাই ক্রমশঃ ধাতব-দ্রব্যরূপে; পরে উহাই আবার উদ্‌ভিদ রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার তাহাই প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত

হইয়া, মনুষ্য-দেহাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য (জ্ঞান) বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং শক্তির পরিণামের তারতম্যানুসারে, চেতনেরও স্বরূপাভিব্যক্তির তারতম্য প্রতীত হইয়া থাকে। প্রাণী-রাজ্যে, এই শক্তি পরিণত হইয়া, প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানেরও তদ্রূপ অভি-ব্যক্তি হইয়াছে *। জীব-রাজ্যে, মনুষ্যের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সমধিক উন্নত, সুতরাং তদ্দ্বারা চৈতন্যের স্বরূপাভিব্যক্তিও উন্নত-তর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি,—চৈতন্যের অভিব্যক্তির দ্বার। বস্তুতঃ, শব্দ-স্পর্শাদিনামে বাহিরে কোন বস্তু নাই। বাহিরে আছে কেবল শক্তিপুঞ্জ—আণবিক কম্পন মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে নানাজাতীয় কম্পন, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়া চলিয়া যাইতেছে; যে ইন্দ্রিয়, সেই কম্পন-গুলিকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত যতটা সামর্থ্য লইয়া জন্মিয়াছে, সে ইন্দ্রিয় ততটুকু মাত্র ধরিয়া লইতেছে, এবং তদনুসারেই আমাদের বিষয়-বোধ হইতেছে। কতপ্রকারের কম্পন অনবরত শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়া চলিয়া যাইতেছে; ঐ কম্পন গুলির যত-টুকু শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারিতেছে, তাহাই 'শব্দ' নামে পরিচিত হইতেছে। এইরূপ, চক্ষুরিন্দ্রিয় যে যে প্রকারের কম্পন আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে, তাহাই নীল, পীত, লোহিতাদি 'বর্ণ' বা 'রূপ' নামে আমাদের নিকট পরিচিত। অন্য প্রকারের কম্পন-গুলি কতক আলোক রূপে, কতক তাপরূপে, আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি।

---

* "যদিহি নাম-রূপে ন ব্যাক্রিয়েতে তদাঽস্যাত্মনো নিরুপাধিকং রূপং প্রজ্ঞান-ঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত। যদা পুনঃ কার্য্যকরণাত্মনা নামরূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ তদাস্য স্বরূপং প্রতিখ্যায়েত" (শঙ্করভাষ্য)।

আমাদের ইন্দ্রিয় যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, সেই কম্পন-গুলি আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিকাশ যতটুকু, বিষয়-বোধও ততটুকু। আবার, এই বিষয়-গুলির উপরেই আমাদের অন্তঃকরণ,—ছোট-বড়, নিকট-দূর, সুখকর-দুঃখকর—প্রভৃতি ভাবে বিচারশক্তির প্রয়োগ করিয়া, উহাদিগকে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া লয় *। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাহিরে আমরা যাহাকে 'বিষয়' বলি, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-শক্তির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে †। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা আর দুই-দশটী ইন্দ্রিয় অধিক থাকিলে, আমরা ঐ কম্পন-গুলিকে আরো অন্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিতাম। হয় ত, মনুষ্যলোক অপেক্ষা উর্দ্ধলোকের জীব-সকল অন্যরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে, ও তজ্জন্য তাহাদের বিষয়বোধের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। সুতরাং তাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ যতদূর বুঝিতে পারে, আমরা ততদূর পারি না; আবার ইতর প্রাণীরা আমাদের মতও পারে না,—অর্থাৎ তাহাদের বিষয়-বোধ আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। আবার উদ্ভিদ-রাজ্যে, চৈতন্যের বিকাশ নিতান্তই অবিকাশিত, কেন না সে রাজ্যে ইন্দ্রিয়াদি ব্যক্ত হয় নাই। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই যখন বোধের দ্বার, তখন ইহা সুনিশ্চিত কথা যে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিকাশ যত

---

* যদি হি বিবেককৃৎমনো নাম নাস্তীতি, ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেক-প্রতিপত্তিঃ ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্য।

† "লৌকিকী দৃষ্টিঃ' রূপোপরক্তা, রূপাভিব্যঞ্জিকা।" "মনো বা আশ্রয়-মিন্দ্রিয়াণাং বিষয়াণাঞ্চ। মন আশ্রিতা হি বিষয়া আত্মনো ভোগ্যত্বং প্রতিপদ্যন্তে। মনঃ সংকল্পবশানি চ ইন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে।"—বৃহ০ ভা০।

উন্নত হইবে, বিষয়-বোধও তত উন্নত হইবে।/ বাহিরের যে শক্তি-সমূহে আমরা শব্দ-স্পর্শাদি সংজ্ঞার আরোপ করি, সেই শক্তি-সমূহই ক্রম-পরিণতির নিয়মে জীবের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, শক্তি-সমূহের একমাত্র প্রধান লক্ষ্যই এই যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত হওয়া। সাংখ্যকার আচার্য্য কপিল এই জন্যই "পুরুষার্থের" জন্যই প্রকৃতি-শক্তির পরিণাম হয়,—এই কথা বলিয়াছেন। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-শক্তিই, চৈতন্যের (জ্ঞানের) অভিব্যক্তির করণ বা দ্বার। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ না থাকিলে, ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ কিছুই হইতে পারিত না। আমাদের মনুষ্য-লোকে, অন্যান্য প্রাণি-বর্গ অপেক্ষা, মনুষ্যের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি সমধিক উন্নত। শক্তিগুলিকে যদি ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধের—চৈতন্যাভিব্যক্তির *—দ্বার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইহা বলিতেই হইবে যে, শক্তিপুঞ্জ ক্রমোন্নত প্রণালীতে, মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই, ব্রহ্ম-স্বরূপাববোধের সুবিধা হইয়াছে; নতুবা ব্রহ্মের বা জ্ঞানের কোনরূপ স্বরূপই আমরা বুঝিতে পারিতাম না। মনুষ্য-লোকাপেক্ষা উন্নত লোকে, ইন্দ্রিয়-শক্তি আরও উন্নত পরিণাম পাইয়াছে; সেই উর্দ্ধতর লোকের জীবসকল, অধিকতর উন্নতভাবে, ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকে। এই মহাতাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্য, ইন্দ্রিয়-সকলকে ও অন্তঃকরণকে, বিষয়েরই সংস্থান-ভেদমাত্র রূপে—বিষয়েরই গ্রাহকরূপে—

* "করণসংসর্গাদেব দেহে চৈতন্যাভিব্যক্তি র্ন স্বতঃ অন্তঃকরণস্ত অব্যবধানেনৈব চৈতন্যাভিব্যঞ্জকং অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্"—জ্ঞানামৃতযতি (তৈত্তিরীয় ভাষ্যটিপ্পনী)।

মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বিষয়কে ও ইন্দ্রিয়কে একজাতীয় বলাতে শ্রুতিরও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। নির্ব্বিকার জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানের পরিচায়ক ক্রম-বিকাশ-শীল শক্তি,—এই দুই তত্ত্ব ব্যতীত * আর কোন বস্তুর সত্তা কুত্রাপি নাই।

মহর্ষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"পুত্র! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্তঃকরণের সংসর্গ-বশতঃই "জীব" সংজ্ঞা বা ব্যবহার। যতদিন এই অন্তঃকরণ আছে, ততদিন জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে। এই অন্তঃকরণ-শক্তি আত্মায় বিলীন হইলেই, জীবের সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হয়। এই সুষুপ্তি অবস্থা, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অবস্থার সঙ্গে প্রায় একরূপ। অন্তঃকরণ-সংসর্গই ব্রহ্ম-চৈতন্যের "জীবত্ব" প্রাপ্তির হেতু। অন্তঃকরণ-যোগেই, আত্মা,—দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। যখন এই অন্তঃকরণ লীন হয়, তখনই সুষুপ্ত-অবস্থা, তখন জীব ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের নিত্য সম্পাদিত এই সুষুপ্ত-অবস্থা অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্ম যে বিশ্বের মূল, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি।

---

* "কার্য্যেণ হি লিঙ্গেন কারণং ব্রহ্ম অদৃষ্টমপি "সৎ" ইত্যবগম্যতে। তচ্চেদসম্ভবেৎ ন তস্য কারণেন সম্বন্ধধী রিতি অসদেব কারণমপি স্যাৎ। প্রাণশব্দিতং বীজমজ্ঞাতং ব্রহ্ম সলক্ষণং তদাত্মনেতি যাবৎ। তদেতদচেতনং সর্ব্বং জগৎ প্রাগুৎপত্তে বীজাত্মনা স্থিতং প্রাণঃ।"—মাণ্ডুক্যে আনন্দগিরিঃ গৌড়পাদস্য।

পুত্র! দর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ার পরে, যদি সেই স্থান হইতে দর্পণটীকে সরাইয়া লওয়া যায়, তখন যেমন আর সে প্রতিবিম্ব থাকে না, প্রতিবিম্বটী যেমন তখন পুরুষকেই পুনঃ-প্রাপ্ত হইল বলিয়া বলা যাইতে পারে, সেইরূপ যখন অন্তঃকরণের উপরতি হয়, তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও জীব-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ, আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করে। জীব যখন নিদ্রা-বস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করে, তখন অন্তঃকরণ জাগরূক থাকে বলিয়া, তাহাতে সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে। সুখ-দুঃখাদি, আত্মকৃত কর্ম্মের ফলেরই সংস্কার মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের,—অবিদ্যার কার্য্যের সহিত বাসনাকারে সম্বন্ধ থাকে; তাই তখন শব্দ-স্পর্শাদির বিবিধ বাসনা ও সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি হইতে থাকে। অতএব এই স্বপ্নাবস্থাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে না। কেননা, স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণের প্রায় সমস্ত বৃত্তিই বাসনাকারে জাগরূক থাকিয়া যায়; সেই বাসনাত্মক বৃত্তি-গুলি; জাগ্রদবস্থায় বিষয়-সংস্পর্শে যাহা অনুভূত হইয়াছিল, তাহারই সংস্কার মাত্র। তখন, সেই সংস্কার-গুলি লইয়া অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয়। গাঢ় সুষুপ্তিকালে, এই সংস্কার-গুলি বিলীন হইয়া যায় এবং কাজেই সুখ-দুঃখাদিরও কোন অনুভূতি থাকে না। তখন জীব আত্ম-স্বরূপে একতা প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংসর্গ-কৃত যে জীবাবস্থা তাহা থাকে না। জাগ্রদবস্থায়, বিষয়েন্দ্রিয়-সংস্পর্শে বিবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম হেতু, সুখ-দুঃখাদি নানা বিষয়-বাসনাক্রান্ত

হওয়াতে, নানাবিধ বাহ্য বৈষয়িক-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে বলিয়া, যখন উহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়, তখন উহারা স্ব স্ব ব্যাপার হইতে উপরত হয়। তখন বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গ অন্তঃকরণে বিলীন হয়, এবং অন্তঃকরণের বিবিধ বৃত্তি-গুলিও পরিশ্রান্ত হইয়া, প্রাণে বিলীন হয়। তখন একমাত্র প্রাণ-শক্তি দেহে জাগরূক থাকে, আত্মার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলি * তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি ও অন্তঃকরণ শ্রান্ত হয়, তখনই কেবল জীব শ্রমাপনোদনের জন্য উপরত হইয়া, আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করে।

যেমন ব্যাধের হস্ত-ধৃত সূত্রের অগ্রভাগে একটী পক্ষী আবদ্ধ থাকিলে, সেই পক্ষীটী বন্ধন হইতে বিমোচিত হইবার আশায়, চারিদিকে নিয়ত উড়িতে থাকে, এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, সেই বন্ধন-স্থানেই বিশ্রামের জন্য পুনরাপতিত হয়;—সেইরূপ এই বিষয়-বাসনাক্রান্ত জীব,—এই অন্ন-রসাদি পরিপুষ্ট মনঃপ্রতিবিম্বিত জীব,—জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় নানা প্রকার বিষয়ে ও বৈষয়িক-সংস্কারে অবিরত ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইলে, নিজের বন্ধন-স্থান-স্বরূপ, প্রাণ-শক্তিরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে † আসিয়া পুনরাপতিত হয়।

* শব্দবিজ্ঞান, স্পর্শবিজ্ঞান, রূপবিজ্ঞান, প্রভৃতি (States of consciousness).

† প্রাণ-স্পন্দন—দৈহিক সকল প্রকার ক্রিয়ার মূল। ইহারই আশ্রয়ে সকল ইন্দ্রিয়, সকল বৃত্তি অবস্থিত। গাঢ় সুষুপ্তিতে করণ-বর্গ প্রাণেই

পুত্র! সুষুপ্তির কথা বলিলাম; এখন জীবের নিত্য-অনুভূত "ক্ষুধা" দ্বারা, ব্রহ্ম যে বিশ্বের মূল, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। সৌম্য! জীব ক্ষুধার সময়ে যে সকল ভোজ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা পীত জল-রসাদি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যায়। গো-পালক যেমন গাভী-গুলিকে চালিত করে, সেনাপতি যেমন আপন সেনাগণকে পরিচালিত করে; সেইরূপ জলও, অন্নকে চালিত ও রসাদিরূপে পরিণত করাইয়া দেয়। বট-কণিকা হইতে যেমন ক্রমে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই অন্ন-রসাদি হইতেই এই শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্ন, জল দ্বারা দ্রবীভূত হইলে, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া রসাদির আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র উদ্ভূত হয়। এইরূপে, স্ত্রীজাতি দ্বারা ভুক্ত অন্নও ক্রমে পরিণত হইয়া আর্ত্তবে * পরিণত হয়। অন্নাদির বিকার-স্বরূপ সেই শুক্র ও

লীন হয়; আবার পুনরায় প্রবোধ-কালে প্রাণ হইতে করণবর্গ ব্যক্ত হয়। আত্মাই—এই প্রাণের অধিষ্ঠান। এই জন্ত আত্মাকে 'প্রাণের-প্রাণ' বলে।

* প্রতি ঋতুর সময়ে স্ত্রীজাতির যে শোণিত ক্ষরণ হইয়া থাকে; সেই সময়ে তাহাদের ডিম্ব-কোষ হইতে একটী বা কচিৎ দুইটী ডিম্ব পরিপক্ক হইয়া জরায়ুতে আইসে, তথায় উহা শুক্রস্থ জীবের (Spermatazoa) সহিত মিলিয়া অনুপ্রাণিত হয় ও তাহাতেই গর্ভোৎপত্তি হয়,—ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত। এই মত স্থূলতঃ প্রাচীন মতের সহিত এক। আর্ত্তব—Ovule.

আর্ত্তব-শোণিত যোগে, এই দেহ উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিলোম-প্রণালীতে, যেমন দেহের মূল অন্ন; তদ্রূপ অন্নের মূল জল; জলের মূল তেজঃ, (তেজের মূল সূক্ষ্ম বায়ু এবং বায়ুর মূল আকাশ) *; এবং ইহার মূল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞান-স্বরূপ, একমাত্র সৎ ব্রহ্মবস্তু। এই সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য; আর সমুদয়ই বিকার বলিয়া মিথ্যা †। অতএব এই বিশ্বের মূলে সেই একমাত্র সৎ বিদ্যমান আছেন; বিশ্বের এই বিকার-ময় স্থিতিকালেও, সেই একমাত্র সৎকে অবলম্বন করিয়াই এ বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে। মৃৎ-ব্যতিরেকে যেমন ঘটের পৃথক্, স্বাধীন সত্তা অসম্ভব; সেইরূপ এই ব্রহ্ম-সত্তাকে বাদ দিয়া জগ-তের স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না ‡। প্রলয়-কালেও, এ জগৎ সেই সৎবস্তুতে বিলীন হইয়া অবস্থান করিবে।

পুত্র! এখন জীবের নিত্য-অনুভূত "তৃষ্ণা" দ্বারা, ব্রহ্ম যে বিশ্বের মূল, তাহা তোমাকে বুঝাইব। জীবের তৃষ্ণা উপস্থিত

* পঞ্চ-ভূতের প্রকৃত শ্রুতিসম্মত তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অবতরণিকাতেও আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি। এক শক্তির পরি-ণামের অবস্থা-ভেদে পাঁচ প্রকার ভূতের কথা উল্লিখিত আছে।

† অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার প্রকৃতি এই যে, ইহার প্রভাবে মনুষ্য নাম-রূপাদি বিকার-বর্গকে সদ্বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যবর্গ স্বতন্ত্র হইতে পারে না। সুতরাং এইভাবে বিকার বর্গ অসত্য।

‡ "নহি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্বা অস্তি"।—ভাষ্যকার।

হইলে, যে জল পান করে; সেই জল ভুক্ত অন্নকে রসাদির আকারে পরিণত করে এবং ঐ রসাদি, অগ্নি বা তাপ-দ্বারা শমতা প্রাপ্ত হইয়া, দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। এইরূপে, দেহ-মধ্যস্থ অগ্নি বা তাপ, জল বা রসকে শোণিত ও প্রাণরূপে পরিণত করে। অতএব অগ্নিও এই দেহের রস-পরিচালক বলিয়া অভিহিত হয়। সৌম্য! জল এই রূপে দেহের মূল হইতেছে। আবার জল দেহের মূল হওয়াতে, অগ্নিকেও শরীরের মূল বলা যায়। পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি যে অগ্নি বা তেজের মূল (বায়ু এবং বায়ুর মূল আকাশ; এবং আকাশের মূল) সেই সৎ ব্রহ্ম-পদার্থ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে,—অন্ন, জল ও তেজঃ—এই তিন স্থূল উপাদান যোগে উত্থিত দেহের সেই সৎ ব্রহ্ম-পদার্থই মূল কারণ হইতেছেন। ইহাই সত্য; অন্ন জলাদি বিকার নামমাত্র,—মিথ্যা।

সৌম্য! পূর্ব্বে তোমায় যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। অন্ন, জল ও তেজঃ, এই 'ত্রিবৃৎকৃত' তিন উপাদান মনুষ্য-দেহ উৎপন্ন করিয়াছে। অন্নাদি ভুক্ত-দ্রব্যের যাহা মধ্যমাংশ তাহাই শরীরের মাংস-শোণিতাদি সপ্ত-ধাতুতে পরিণত হয়, এবং যাহা অতি সূক্ষ্ম অংশ তাহা হইতে মন, প্রাণ ও বাক্‌শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই রূপে, ইহারাই প্রাণি-দেহের অন্তরিন্দ্রিয়াকারে অভিব্যক্ত হয়। যখন এই দেহ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন প্রাণাদি-শক্তিও কিরূপে অন্তর্হিত হয়, এখন তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। জীবের মৃত্যুর সময়ে, বাক্য মনে *

* এস্থলে 'বাক্য' অন্যান্য বাহ্য ইন্দ্রিয়-শক্তির উপলক্ষণমাত্র। তখন

বিলীন হয়, কেননা মনের ক্রিয়ার দ্বারাই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। তখন মুমূর্ষুর জ্ঞাতিরা বলিতে থাকে,—"হায়! এ আর কথা বলিতে পারিতেছে না"! এইরূপে বাক্য,—মনে উপসংহৃত হইয়া গেলে, কেবল মনের ক্রিয়ামাত্র * জাগরূক থাকে। এই মনের ক্রিয়াগুলিও পরে প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। তখন জ্ঞাতিবর্গ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে থাকে,—"হায়! এ আর কিছুই জানিতে পারিতেছে না; ইহার বোধ-শক্তি তিরোহিত হইল"। তৎপর, এই প্রাণ-শক্তি, হস্ত-পদাদির বিক্ষেপ জন্মাইয়া, সমুদয় মর্ম্মস্থান গুলিকে পরিত্যাগ করতঃ, তেজঃ-শক্তিতে † বিলীন হইয়া যায়। তখন মুমূর্ষুর বন্ধুবর্গ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে যে,—"এই যে ইহার স্পন্দন-শক্তিও রহিত হইল, কেবল দেহে উষ্ণতা মাত্র অনুভূত হইতেছে"। তৎপরে, এই তেজও উপসংহৃত হইয়া, আত্মায় বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও অন্তঃকরণ-শক্তি এবং ভূত-শক্তি সমন্বিত জীব, মৃত্যুর পরে অন্যলোকে অন্যদেহ গ্রহণ করে। যাহারা

চক্ষু-ঘ্রাণাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তিই বাহ্য-বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণে লীন হয়।

* মনের ক্রিয়া—অন্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-সমূহ। তখন অন্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ বোধ সকলও তিরোহিত হয়।

† এস্থলে, "তেজঃশক্তি'র অর্থ—প্রাণ-শক্তির আধার বা বাহ্যাংশ; বেদান্ত-দর্শনে এস্থলের এই "তেজঃশক্তিকে" পঞ্চভূতোপাদান বলা হইয়াছে। প্রাণ-শক্তির আশ্রয় না থাকিলে, প্রাণ-শক্তি থাকিবে কি প্রকারে?

অজ্ঞানী, যাহাদের বৈষয়িক-বাসনা যায় নাই,—যাহাদের পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে নাই*, এইরূপ জীবই মৃত্যুর পরে, তথা হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় দেহান্তর গ্রহণ করে। অতএব এই সদ্বস্তু,—যাহাতে সমুদয় শক্তি বিলীন হয়,—তাহাই একমাত্র সৎ ব্রহ্ম-চৈতন্য। ইহাই সমুদয় পদার্থের আত্মভূত †। ইনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা নাই। এই সদ্বস্তুই জগতের মূলকারণ। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম; এ জগৎ, সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেত-কেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ"।

শ্বেতকেতু, আরুণির উপদেশের শেষ-অংশটুকু ভালরূপে ধারণা করিতে পারিল না। শ্বেতকেতু শুনিল যে, মৃত্যুকালে জীবের সমুদয় বাহ্যক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া,—ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলি বুদ্ধিতে লীন হয়; বুদ্ধিও সংস্কারের সহিত প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে আত্মায় বিলীনভাবে স্থিত বুদ্ধি ও প্রাণ-শক্তি লইয়া, আত্মার দেহত্যাগ হয়। সূক্ষ্ম-কর্ম্মসংস্কার ও বুদ্ধি-প্রাণাদি শক্তি লইয়া "লিঙ্গদেহ" গঠিত। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-সংস্কার ও ঐন্দ্রিয়িক-সংস্কার এই সূক্ষ্মদেহে লীন থাকে, সেই সকল সংস্কার বশেই জীবকে টানিয়া লইয়া গিয়া যথোপযুক্ত

* দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের তত্ত্ব উল্লিখিত আছে।

† বৃহদারণ্যকে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন—"যৎ-স্বরূপব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যস্য তস্য 'তদাত্মত্ব' মেব লোকে দৃষ্টম্"। সকল পদার্থেই যখন সেই সদ্বস্তু অনুস্যূত, তখন কোন পদার্থেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

স্থানে উপস্থিত করে ও তথায় তাহার সংস্কারগুলি পুনরুদ্রিক্ত হয়। বাসনা ব্যতিরেকে কাহারও কোন কর্ম্মচেষ্টা হয় না; অনভ্যস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বানুভূত বাসনা বা প্রবৃত্তি দ্বারাই, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। এই জন্যই দেখা যায়, বিনা অভ্যাসেও কাহার কাহার কোন বিষয়-বিশেষে আপনা আপনি ক্রিয়া-কুশলতা প্রকাশ পায়; আবার অতি সহজ কার্য্যেও কাহার কাহার নিপুণতা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব-বাসনা বশতঃই এইরূপ হয়। অতএব মৃত্যুর সময়ে জীবের জ্ঞান-বাসনা-কর্ম্মপ্রবৃত্তি সঙ্গে যায়৷" শ্বেতকেতু, আরুণির মুখে এই সকল কথাও শুনিল; কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সেই জন্য পিতাকে, দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য, শ্বেতকেতু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। মহর্ষি আরুণি, শ্বেতকেতুর ঔৎসুক্য বুঝিয়া, বলিতে লাগিলেন,— "শ্বেতকেতো! যে সকল জীবের অজ্ঞানতা আছে, বিষয়-মোহাচ্ছন্নতা দূর হয় নাই,— যাহাদের একাত্মবোধ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় নাই, সেই সকল অজ্ঞানী জীবই, মৃত্যুর পরে পুনরায়, বিষয়-বাসনার প্রভাবে, দেহান্তর গ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি; মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

হে সৌম্য! মধুকর যেমন নানা দিগ্‌দেশস্থ বিবিধ প্রকার বৃক্ষ হইতে পুষ্পরস আহরণ করিয়া, সমুদয় রসকেই মধুরূপে পরিণত করিয়া ফেলে; সেই নানাশ্রেণীর রস-সকল যেমন এক মধুরূপে পরিণত হইয়া গেলে, সেই মধু কোন কোন্ বৃক্ষের

কোন্ কোন্ পুষ্পরসের পরিণাম, তাহার যেমন কোন পার্থক্য-বোধ থাকে না ; নানা শ্রেণীর বৃক্ষের অম্ল, মধুর, কটু, তিক্তাদি নানাবিধ পুষ্পরস যখন এক মধুতে পরিণত হইয়া যায় তখন যেমন তাহাদের অম্ল, মধুর, কটু, তিক্তাদির আর পার্থক্য বুঝা যায় না ;—সেইরূপ সুষুপ্তিকালে কিম্বা মরণ বা প্রলয়কালে, এই জীব-নিবহ ব্রহ্ম-চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহারা পূর্ব্বেও যে ব্রহ্ম-চৈতন্যেই বর্ত্তমান ছিল তাহা বুঝিতে পারে না। না বুঝিবার কারণ এই যে, উহারা ব্রহ্মের একাত্ম-ভাব না বুঝিয়াই, প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই, ব্রহ্ম-চৈতন্যে লীন হইয়াছিল। ব্যাঘ্র-সিংহাদি বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীব, যে যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলে, সেই সেই জাতীয় জীবদেহ পাইয়াছিল ;—তাহারা সুষুপ্তি ও মরণ সময়ে, সেই সকল কর্ম্ম-সংস্কারাদি দ্বারা অঙ্কিত হইয়াই ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রবিষ্ট হয় ; তাই তাহারা সেই সেই ভাবেই পুনরুত্থিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত হইয়া, সেই সকল সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-রূপেই উত্থিত হয়। এই সূক্ষ্ম, সদাত্মক ব্রহ্ম-চৈতন্য,—যাহাতে জীব-সকল লীন হয় ও যাহা হইতে পুনরুত্থিত হয়,—তাহাই বিশ্বের মূলকারণ। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম ; এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম, সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

হে সৌম্য ! যেমন নানা দিগ্বাহিনী গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী,—নানা দিক্‌দেশে বহিয়া, সাগরে পতিত হয় ; আবার

তাহারা সাগর হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘাকার ধারণ করে এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পুনরায় সাগরে নিপতিত হয়; এই সকল নদী সাগরে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন উহারা সমুদ্র-জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, এবং তখন কোন্ নদীটী গঙ্গা, কোনটী বা সিন্ধু তাহার নিশ্চয়তা থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত জীব-নিবহও বুঝিতে পারে না যে, উহারা সেই ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই পুনরাগত হইয়াছে। জল হইতে কেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ, বীচি উত্থিত হইয়া পুনরায় উহারা এক জলরূপেই পরিণত হইয়া যায়, এ ঘটনা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। জীবও প্রত্যহই উহার কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যে একাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াও, সুষুপ্তি, মরণ বা প্রলয়কালে ব্রহ্ম-চৈতন্যের সঙ্গে একেবারে একতাপ্রাপ্ত হয় না; কেননা তত্তৎজাতীয় কর্ম্ম-বাসনাদি লইয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যে লীন হয়। সুতরাং পুনরায় সেই সেই জাতীয় জীবরূপে উত্থিত হয়। এই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম-চৈতন্যই জগতের মূলকারণ। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম; এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

হে সৌম্য! তোমার সম্মুখবর্ত্তী এই সুবৃহৎ বৃক্ষটীর মূল-দেশে যদি কোন ব্যক্তি কুঠার দ্বারা একবার মাত্র আঘাত করে, তবে সেই আঘাতেই বৃক্ষটী একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় না। সেই আহত-স্থান হইতে কিছু রস ক্ষরিত হইয়া, সেই

কর্ত্তিত-স্থান জোড়া লাগিয়া যায় ও বৃক্ষটী বাঁচিয়া থাকে। মূলাদি দ্বারা ভূমির রসাদি আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করতঃ, এই বৃক্ষ জীবিত রহিয়াছে। যদি কেহ এই বৃক্ষটীর একটী শাখা একেবারে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়, তখন সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যাইবে। বাক্, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যেরই নাম জীব। এই জীব দ্বারা ভুক্ত বা গৃহীত পদার্থ রসাদি-রূপে পরিণত হইয়া, শরীর ও বৃক্ষাদির দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে। এই জীবের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে, সে অঙ্গ হইতে আত্মা উপসংহৃত হয়; অঙ্গটীও শুষ্ক হইয়া যায়। জীবন নাশ হইয়া গেলে, জীবের স্থিতির হেতু-ভূত রসাদিও বিনষ্ট হয়; রস চলিয়া গেলে শাখাও শুষ্ক হয়। এইরূপে যখন সমগ্র বৃক্ষ-দেহ হইতে উহার চৈতন্যাংশ ছাড়িয়া যায়, তখন সমগ্র বৃক্ষটীই পরিশুষ্ক হয়। রস-ক্ষরণ, রস-পরিচালনাদি দ্বারাই বৃক্ষাদিকে জীবিত বলা গিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই দেহ জীব-বিরহিত হইলেই, ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। এইরূপ জীব যে সুষুপ্তি প্রভৃতির পরে পুনরুত্থান করে, সে অবস্থায় জীবের একান্ত ধ্বংস হয় না; ইহার কারণ এই যে, জীবের তখনও কর্ম্ম-বাসনাদির ক্ষয় হয় নাই। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই, বালকে স্তন্যাভিলাষ ও ভয়াদি দৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, উহা পূর্ব্বেও স্তন্যপান ও সুখ-দুঃখ-ভয়াদির অনুভব করিয়াছিল। অতএব জন্মান্তরে সম্পাদিত ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির শেষ থাকে বলিয়াই, জীব পুনরুত্থিত হয়,

একান্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই সূক্ষ্ম চৈতন্যই ব্রহ্ম-বস্তু। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম; এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য; ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

সৌম্য! অতি সূক্ষ্ম নাম-রূপ-বিহীন, অদ্বিতীয় সৎ-পদার্থ হইতে কিরূপে এই নাম-রূপাত্মক বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইতে পারে, সেই কথা অদ্য তোমায় একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। এই তত্ত্ব যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে তোমার সম্মুখে এই যে সুবৃহৎ বট-বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা হইতে একটী ফল ছিঁড়িয়া আন, এবং সেই ফলটী দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল"। শ্বেতকেতু পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল। ফলটী দ্বিখণ্ডিত হইলে, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন তুমি এই কর্ত্তিত ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ"? পুত্র মনোযোগের সহিত দেখিয়া উত্তর করিল, "পিতঃ! আমি উহার মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম অণুবৎ কতিপয় বীজ রহিয়াছে, দেখিতেছি"। পিতা পুনরায় পুত্রকে, এই বীজ-গুলির মধ্য হইতে একটী বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং পুত্র তদনুরূপ কার্য্য করিলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি দেখিতে পাইতেছ"? পুত্র উত্তর দিল,—"কৈ, এখন ত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না"। পিতা বলিতে লাগিলেন,— "বৎস! এই বট-বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাতে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া যদিও তুমি আর উহার ভিতরে কি রহিয়াছে তাহা

দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য এই রূপ বীজ হইতেই উহার কার্য্য-স্বরূপ* এই প্রকাণ্ড শাখা-স্কন্ধ-ফল-পুষ্পাদি-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে জানিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না †। এইরূপ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম সৎ-পদার্থ হইতে, এই স্থূল নাম-রূপাত্মক বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই অতি সূক্ষ্ম সৎ-পদার্থই জগতের মূল। এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

হে সৌম্য! নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও, পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত নাও হইতে পারে; কিন্তু প্রকারান্তর অবলম্বন করিলে, তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। অদ্য সন্ধ্যাকালে একখণ্ড লবণ, একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখিও; কল্য প্রাতঃকালে উহা লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইও"। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। পিতা বলিতে লাগিলেন,—"তুমি গতকল্য সন্ধ্যাকালে যে পাত্রে লবণ নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া দিয়াছ, সেই পাত্রটী লইয়া আইস"। পুত্র সেই জলপূর্ণ পাত্রটী পিতার নিকটে আনিয়া রাখিয়া দিল; কিন্তু তাহাতে হাত দিয়া দেখিল যে, সে লবণখণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে। পিতা হাসিয়া বলি-লেন—"পুত্র! লবণ উহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; জলে মিশিয়া

* Effect.

† "স্বোপাদানে লীনকার্য্যরূপাশক্তিস্ত মহান্ ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি"। রত্নপ্রভা।

যাওয়াতে তুমি উহার অস্তিত্ব চক্ষুঃ ও স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু এ ভাবে বুঝিতে না পারিলেও, জানিবে যে উহা এই জলের মধ্যেই বিলীন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি এই পাত্র হইতে এই জলের যে কোন স্থান হইতে পান কর, বুঝিতে পারিবে যে, এই জলে লবণের স্বাদ রহিয়াছে। অতএব বৎস! যেরূপ, জলে বিলীন এই লবণের অস্তিত্ব তুমি দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, জিহ্বা দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলে; সেইরূপ এই দেহ-মধ্যস্থ এবং দেহের মূল-কারণ সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইয়াও, প্রকারান্তরে—অন্য উপায়ে—অনুভূত হইতে পারে। লবণ যেমন দর্শন ও স্পর্শের অগ্রাহ্য হইয়াও জিহ্বা দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছিল, তদ্রূপ তেজঃ, অপ্ ও অন্নের বিকার-ভূত এই দেহের মূল-কারণ সৎ-পদার্থকেও উপায়ান্তর দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সেই অতি সূক্ষ্ম সৎ-পদার্থই জগতের মূল। এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ"।

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো! কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, তাহা দয়া করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন্"। পিতা বলিতে লাগিলেন,—"সৌম্য! যেমন কোন দুষ্ট তস্কর, কোন পুরুষকে গান্ধার-দেশ হইতে চক্ষুঃ দুইটী বস্ত্রাবৃত ও হস্তাদি বন্ধন করিয়া অতি দূরে কোন জনশূন্য, হিংস্রজন্তু-সমাকুল ভয়ঙ্কর অরণ্যে

আনিয়া ছাড়িয়া দিলে,—সেই অসহায় পুরুষ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং যদি এই সময়ে হঠাৎ কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তি তাহার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার নিকটে যাইয়া, পরম যত্নে তাহারি বন্ধনাদি মোচন করতঃ তাহাকে গান্ধারের পথটী দেখাইয়া দেয়; তখন সেই পুরুষ সেই পথ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশে উপনীত হইলে, তাহার সকল দুঃখ দূরে যায় ও সে অত্যন্ত সুখী হয়। সেইরূপ, মোহ-বস্ত্র দ্বারা আবৃত-নয়ন এই জীবকে,—স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মরূপ তস্কর,—মাংস-শোণিত ও কৃমিকীট-মূত্র-পূরীষ-ময় ও শীত-বাতাদি দুঃখ-সঙ্কুল এই মহাঘোর দেহারণ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। মোহান্ধ জীব, ভার্য্যা-পুত্র ও রূপ-রসাদি বহুবিধ বিষয়ে তৃষ্ণা-পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া,—হায়! কিরূপে জীবন ধারণ করিব', 'হায়! আজ আমার ধননাশ হইল,' 'পুত্র প্রাণত্যাগ করিল'—ইত্যাদি বহু প্রকারে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়ায়। পুণ্য-প্রভাবে, কখনও কোন কারুণিক ব্রহ্মবিদ্‌ ও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলে, সেই মহাপুরুষ যদি দয়া করিয়া বিষয়-বাসনার দোষ দেখাইয়া দেন, তবে সে মোহজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়; আর তখন তাহার কোন দুঃখ-ক্লেশ থাকে না। যে কর্ম্ম-দ্বারা দেহ আরব্ধ হইয়াছে, প্রারব্ধ-কর্ম্মক্ষয়ে সে দেহ নাশ হইলে, সে তখন সেই পরম-সৎব্রহ্মপদার্থকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়। এই পরম-সৎব্রহ্ম-পদার্থই জগতের কারণ। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম। এ

জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাহার বান্ধবেরা আকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করে,—“আমি তোমার পিতা বা মাতা, আমায় চিনিতে পারিতেছ”? সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজেঃ, * এবং তেজঃ আত্ম-চৈতন্যে যে পর্য্যন্ত না ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি সকল-কেই চিনিতে পারে। কিন্তু ঐ গুলি বিলীন হইয়া গেলে, আর সে কাহাকেও চিনিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর গতি সমান। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলেরই তখন ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত হয়,—ভূতোপাদান উপসংহৃত হয়,—তখন সকলেরই বিষয়-বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়; তখন উহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। তৎপর, যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা পুনরায় সেই ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত হইয়া, স্ব স্ব বাসনা ও কর্ম্মানুরূপ দেহান্তর ধারণ করে। কিন্তু যাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে;—একাত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাঁহার বিষয়-বাসনাদি ক্ষয়িত হওয়ায়, তাঁহাকে আর ওরূপে পুনরুত্থিত হইতে হয় না। কেননা, জ্ঞানাগ্নি তাঁহার বাসনা-কর্ম্মাদির ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। যাঁহার অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান পরিপক্ব হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সমুদয় বাসনা ও কর্ম্মাদির ধ্বংস হইয়া

* ‘তেজঃ’ এ স্থলে সূক্ষ্ম-শরীরের আধার পঞ্চ ভূত-সূক্ষ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। শক্তি, সকল অবস্থাতেই উহার আধার ভিন্ন থাকিতে পারে না।

যায়। 'আমি এই কার্য্য করিতেছি', 'আমি এই কার্য্যের এইরূপ ফলভোগ করিব',—এরূপ বোধ দ্বৈত-রাজ্যের কথা। এরূপ ব্যক্তির সর্ব্ব-পদার্থে ও সর্ব্ব-ক্রিয়ায় অদ্বৈত-বোধ বা ব্রহ্মানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; কেননা, যাঁহার বস্ত্বন্তর-বোধ আছে তাঁহার ত দ্বৈতজ্ঞান—ভেদবুদ্ধি—রহিয়াছে। এখনও তাঁহার অদ্বৈত-বোধ দৃঢ়তা লাভ করে নাই। যাঁহারা প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ঞানী, তাঁহাদের —ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে পদার্থান্তরের স্বাধীন সত্তার বা স্বাধীন ক্রিয়ার বোধ থাকিতে পারে না। বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাঁহারা—ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মের শক্তিরই অনুভব করিয়া থাকেন। জগতের মূলকারণ এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম। এ জগৎ সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই সূক্ষ্ম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ *"।

* এ বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য আরও কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমরা এই স্থলেই দিলাম। আরুণি, শ্বেতকেতুকে পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যতদিন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি উপাধি সংসর্গ থাকে, ততদিন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। যখন তাহার অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন আর তাহার জ্ঞানে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য পদার্থের বোধ থাকে না ; তখন স্বরূপতঃ সে এবং ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়া যায়। এই বোধই শ্রুতিতে সোঽহং বোধ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তখন নিজের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বোধ তিরোহিত হয় ; কেননা তখন সকল ক্রিয়ায় ও সকল ভোগে ব্রহ্ম-শক্তির ও ব্রহ্মানন্দেরই দর্শন হইতে থাকে ; সেই শক্তি ও আনন্দ হইতে, অন্য ক্রিয়া ও সুখ-

মহর্ষি আরুণি এই বলিয়া বিরত হইলেন। শ্বেতকেতু উপদিষ্ট বিষয় সকল পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল।

এই শ্বেতকেতুর আখ্যায়িকা হইতে আমরা কি কি উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। ব্রহ্ম-চৈতন্য নিঃস্বরূপ নহেন ; ইনি সৎ-স্বরূপ। এই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ।

২। কার্য্য, উহার কারণ হইতে ভিন্ন নহে। কার্য্য, কারণেরই সংস্থান-ভেদ মাত্র। সুতরাং কারণের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলে, কার্য্যেরও জ্ঞান হয়। কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যের স্বাধীন সত্তা নাই। কারণ হইতে ভিন্ন-ভাবে,—স্বতন্ত্র, স্বাধীনরূপে—কার্য্য-মাত্রই অসত্য, মিথ্যা।

দুঃখাদির পার্থক্য-বোধ থাকে না। 'সূর্য্যই ব্রহ্ম', 'মনই ব্রহ্ম'—এই সকল স্থলে, 'সূর্য্য', 'মন' প্রভৃতি উপাধির ভিন্নতা-বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হন না ; এ সকল স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন গৌণ। কিন্তু সোঽহং—এ স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন মুখ্য। পরোক্ষ-ভাবে ও গুণাদির অবলম্বনে অভিন্নতা বোধ হইতে পারে ; যেমন 'এই পুরুষটী সিংহ' এরূপ স্থলে সাহসিকতা, বিক্রম প্রভৃতি গুণাবলম্বনে পুরুষকে সিংহের সহিত এক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু 'সোঽহং" স্থলে, সেরূপ পরোক্ষ-ভাবেও অভিন্নতা-বোধ উপদিষ্ট হয় নাই। আবার, জীবাত্মাকে ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপে ভাবনা বা ধ্যান করিবার উদ্দেশেই যে অভেদ-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না ; কেননা, 'সোঽহং" বোধ জন্মিবা-মাত্রই মুক্তি হয়, ধ্যানাদি ক্রিয়া করার বিলম্ব বা অবসর থাকে না। অতএব এই অভেদ-বোধ মুখ্যরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে।

৩। অসৎ পদার্থ বিশ্বের কারণ হইতে পারে না। নামে ও রূপে এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্ম 'সৎ' রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।

৪। এই সৎব্রহ্ম, চৈতন্য-স্বরূপ; নতুবা সৃষ্টির কামনা করিলেন কিরূপে?

৫। এই সৎব্রহ্ম হইতে প্রাণ-স্পন্দন বিকাশিত হয়। এই প্রাণ-স্পন্দনই তেজঃ, অপ্, অন্ন-রূপে যথাক্রমে ব্যক্ত হয়।

৬। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এই তেজঃ, অপ্, ও অন্নের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে।

৭। মন, প্রাণ, বাক্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গুলিও—সেই তেজঃ, অপ্, অন্নেরই আকার ভেদ মাত্র এবং তদ্দ্বারাই পুষ্ট।

৮। ইন্দ্রিয়াদির সংসর্গ-বশতঃই চৈতন্য, "জীব" নামে অভিহিত হয়।

৯। সুষুপ্তি-কালে জীব, ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রায় একতা প্রাপ্ত হয়।

১০। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময়ে জীব, অন্ন ও জল গ্রহণ করে; তদ্দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়। ইহারা দেহের মূল, ইহাদের মূল ব্রহ্ম।

১১। জীবের মৃত্যু-কালে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি-শক্তি আত্মায় বিলীন হয়; অবিদ্যার ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুনরুৎপত্তি অনিবার্য্য।

১২। মূল-কারণের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উপায়ান্তর যোগে তাহার উপলব্ধি হয়।

১৩। জীবের আত্ম-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য, এক ও অভিন্ন পদার্থ।

১৪। স্বরূপতঃ, জীব, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিশ্বও—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। অতএব সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-পদার্থ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ।)

একদা নারদ, মহর্ষি সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত শিষ্যের ন্যায়, আপনার বংশ-গৌরব, বিদ্যা ও আত্ম-শক্তির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি সনৎকুমার, নারদের কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে জানিতে চাহিলেন। নারদ নিবেদন করিলেন,—"মহর্ষে! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিতৃলোক-সম্পর্কীয় বিদ্যা, গণিতবিদ্যা, কালজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র *, শব্দবিদ্যা, শিক্ষা-কল্প ও ছন্দোবিদ্যা, পঞ্চভূত-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সর্পাদি-চিকিৎসা-বিজ্ঞান, নৃত্য-গীতাদি কলাবিদ্যা,—এই সকল অপরা বিদ্যার আলোচনা করিয়াছি। আমি আত্ম-তত্ত্বালোচনা করি নাই। আমি যে গুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেগুলি নামে মাত্র বিদ্যা, সেগুলি প্রকৃত বিদ্যা নহে" †।

* নীতিশাস্ত্র—Ethics and Politics.

† অপরা-বিদ্যার বিষয়—নাম-রূপাত্মক বিকার লইয়া। কিন্তু পরা-বিদ্যা—নাম-রূপাত্মক বিকার-বর্গের অতীত ব্রহ্মবস্তু লইয়া।

মহর্ষি সনৎকুমার, নারদের কথা শুনিয়া, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ দেখিতে পাইয়া, আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নারদ বৈষয়িক বিদ্যা লইয়াই পরিশ্রম করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনে করিলেন যে, এই স্থূল জড় বিষয় অবলম্বন করিয়াই নারদকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। নাম-রূপাত্মক বিকারময় জগৎ, ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত এবং ব্রহ্মেই স্থিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা; সুতরাং নাম-রূপাত্মক বিকার অবলম্বন করিয়াই সেই দুরূহ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিলে, তাহা সহজে বুঝা যায়। সনৎ-কুমার মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। আপনি অপরা বিদ্যারই আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদাদি যে সকল বিদ্যার কথা আপনি উল্লেখ করিলেন, যে সকল বিদ্যার অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করিয়াছেন, বাস্তবিক উহারা নাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নাম * বস্তুর পরিচায়ক মাত্র। যদি বস্তুর জ্ঞান না থাকে, তবে কেবল নাম জানিলেই যথেষ্ট হয় না। বাক্য † দ্বারাই বস্তু-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে; নাম সেই বাক্যের প্রতিনিধি স্বরূপ। এই নাম ব্রহ্ম নহেন; কেন না নামই বলুন, আর কোন বস্তুই বলুন, উহারা সকলেই বিকার মাত্র। কিন্তু

* নাম—Concept

† বাক্য—**Language,**

ব্রহ্ম কদাপি বিকারী হইতে পারেন না। কেননা ব্রহ্ম কারণ * এবং বিকার-মাত্রই কার্য্য †। ব্রহ্ম-পদার্থ, নাম-রূপাদি যাবতীয় বিকারের অতীত। নামকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করা কর্ত্তব্য; নামাদি অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্ম-পদার্থের ভাবনা সিদ্ধ হয়। বৃক্ষান্তরালে চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, যেমন বৃক্ষটীর কোন শাখা দেখাইয়া তাহার অবলম্বনে, বালককে চন্দ্রের নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায়; তদ্রূপ নামাদির সহায়তায়, ব্রহ্মের পরিচয় লাভ করা যায়। অসত্য বস্তুর অবলম্বনেও সত্য-বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। বিকারী স্থূল বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা, ক্রমে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম-পদার্থে আরোহণ করিতে পারা যায়। নাম-রূপাদির সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র; ব্রহ্মই পরম-সত্য; ব্রহ্মের সত্যতার উপরেই নাম-রূপাদির সত্যতা নির্ভর করে। ব্রহ্ম-সত্তাকে ছাড়িয়া, উহাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অতএব নাম-রূপাদি, ব্রহ্ম-স্বরূপাব-বোধের দ্বার মাত্র; এই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম-মার্গে প্রবেশ করা যায়। নতুবা নাম-রূপাদি বিকার সকলই মিথ্যা।

বাক্য ‡ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাক্য দ্বারাই অক্ষর-সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে। কার্য্য অপেক্ষা করণের শ্রেষ্ঠতা

---

* কারণ—Cause.

† কার্য্য—Effect.

‡ বাক্য—Language. ভাষ্যকার 'নামের' অর্থ 'অক্ষর' করিয়াছেন এবং 'বাক্যের' অর্থ 'বাগিন্দ্রিয়' করিয়াছেন। কোষ্ঠাগ্নি-প্রেরিত বায়ু—

সকলেরই বিদিত আছে, সুতরাং নাম হইতে বাক্যশ্রেষ্ঠ। বাক্য-দ্বারাই ঋগ্বেদাদি যাবতীয় শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। আকাশ, জল, বায়ু, প্রাণী, মনুষ্য, সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপ—প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ, বাক্য দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। বাক্য না থাকিলে কোন বস্তুরই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইত না। পদার্থ-মাত্রেরই বোধ, কেবল বাক্যের উপরেই নির্ভর করে। অতএব এই বাক্যকেই ব্রহ্ম-বোধে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা নাম ও বাক্যের উপাসক, তাঁহারা নাম ও বাক্যাত্মক লোককে জয় করিতে সমর্থ হন।

অন্তঃকরণের চিন্তা-বৃত্তি * বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার অন্তঃকরণের ইচ্ছা-বৃত্তি বা সংকল্প † চিন্তা-বৃত্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণই স্বীয় চিন্তা-বৃত্তি দ্বারা বাক্যের চালনা করিয়া থাকে ‡।

বক্ষঃ, কণ্ঠ, শিরঃ, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা ও তালু এই ৮ স্থানে আঘাত পাইয়া বর্ণরূপে ব্যক্ত হয়; বাগিন্দ্রিয়ই বর্ণ-সকলের প্রকাশক।

* চিন্তাবৃত্তি—Reflection. "মনসা বস্তুতত্ত্বং নির্দ্ধার্য্য বাচা বদতি"। "অধোষ্যামি ইমামিতি মনসা সংকল্পয়তি, অনন্তরং বাচা উচ্চারয়তি"—শ্রী০ ভা০।

† সংকল্প—Determination.

‡ পাঠক দেখিবেন, চিন্তা, সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান ও বিজ্ঞান—এ কয়েকটী এক অন্তঃকরণেরই ভিন্ন ভিন্ন 'বৃত্তি'। একই অন্তঃকরণের ক্রিয়া-ভেদে নামের ভেদ। এই অন্তঃকরণ থাকাতেই মনুষ্যের যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার 'কর্তৃত্ব' ও যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি-লোকের 'ভোক্তৃত্ব' সিদ্ধ হয়।

কিন্তু, এই কার্য্যটী করিব, কি করিব না—এইরূপ নিশ্চয় করিলে, তবে লোকে চিন্তা করিয়া থাকে। কোন কার্য্য করিব বলিয়া স্থির করিয়া না লইলে, লোক তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। এই প্রকারে চিন্তা করিয়া, তবে সেই বিষয়টীর নাম বাক্য-দ্বারা উচ্চারণ করা গিয়া থাকে। অতএব সংকল্পই, নামাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি এই পুস্তকখানি নিশ্চয়ই পড়িব,—মনে প্রথমতঃ এইরূপ স্থির করিয়া লইয়া, 'তবে পড়াই যাউক্,'—এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হয়; তৎপরে আমি বাক্য-দ্বারা এই পুস্তকের শব্দাদির উচ্চারণ করিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নাম প্রভৃতি সকলই,—মনের এই সংকল্প বা স্থির-নিশ্চয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সংকল্পকে আশ্রয় করিয়াই, উহারা স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এমন কি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থই সংকল্পাত্মক *; সংকল্প দ্বারাই, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, জল ও তেজঃ একত্রিত

---

* সং—ক্লৃপ্ ধাতুর এক অর্থ একত্রীকরণ বা নির্ম্মাণকরণ। ধাতুর এই শক্তিবলেই শ্রুতিতে এই দ্বিবিধ অর্থেই 'সংকল্প' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে;—কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। অন্য একরূপ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। ব্রহ্মের সংকল্প (will) হইতেই বিশ্ব-সৃষ্টি। ব্রহ্ম-হৃদয়োত্থ সিসৃক্ষা-সংকল্প যাবতীয় পদার্থে অনুস্যূত হইয়া, ভেদ-বুদ্ধির মূল স্বরূপে একেকে অনেক করিয়াছে। সিসৃক্ষু ব্রহ্ম-চৈতন্যের সৃষ্টি-সংকল্প যেন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

হইয়াছে এবং এই মিলন হইতেই বর্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে *। বর্ষ হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে। এই অন্ন হইতে (শুক্র-শোণিতযোগে) জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব হইতে মন্ত্র বা ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি বিবিধ লোক উৎপন্ন হইয়াছে †। অতএব সংকল্পই, সকল পদার্থের মূল-আয়তন। এই সংকল্পকে ব্রহ্ম-বোধে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ ধ্যান বা ভাবনা করেন, তাঁহাদের এই অস্থির পার্থিব লোক অপেক্ষা, স্থির, ধ্রুব-লোকে গতি হয়।

চিত্ত ‡, সংকল্প হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই চিত্ত দ্বারা লোকে পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয়। এই চিত্তই সকল প্রকার বোধের আশ্রয়। যাহার পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-সামর্থ্য

---

* 'বর্ষ' শব্দের অর্থ বৃষ্টি ও সংবৎসর দুই-ই হইতে পারে।

† এই স্থলে, জীবের গতি ও পুণ্য-কর্ম্ম-ক্ষয়ে স্বর্গাদি দেব-লোক হইতে মর্ত্ত্য-লোকে পুনরুদ্ভবের তত্ত্বও গূঢ়ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্বপদার্থেই নানাভাবে ব্রহ্ম-দর্শনের প্রণালী উপনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ লোক বৃষ্ট্যাদি প্রাকৃতিক কার্য্যে আর কিছুই দেখিতে পায় না; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সাধক, বৃষ্ট্যাদিতেও জীবের গতি প্রভৃতির তত্ত্বই দেখিতে পান। কিন্তু এ তত্ত্ব "পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার" অন্তর্গত। আমরা নানাকারণে এ গ্রন্থে "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা" পরিত্যাগ করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ চিত্ত—Intelligence, চিত্তং—প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্বং; অতীতানাগতবিষয়-প্রয়োজন-নিরূপণ-সামর্থ্যঞ্চ"—ভাষ্যকার।

নাই, তাহার সকল জ্ঞানই নিষ্ফল। অতএব, চিন্তা ও সংকল্পাদি সমুদায়ই এই চিত্তের আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। বহুজ্ঞ ব্যক্তি যদি চিত্তবান্ না হয়, তবে লোকে তাহার কথায় মনোযোগ দেয় না; কিন্তু চিত্তবান্ ব্যক্তি অল্পজ্ঞ হইলেও, লোকে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিয়া থাকে। চিন্তা এবং সংকল্প—এই চিত্তের উপরই নির্ভর করে। কেননা চিত্তই—সংকল্পাদির মূল। এই চিত্তকে, ব্রহ্মবোধে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা চিত্তোপাসক, তাঁহাদের এই পার্থিব-লোক অপেক্ষা, দুঃখ-বর্জ্জিত, অক্ষয়-লোক প্রাপ্তি ঘটে।

ধ্যান বা একাগ্রতা, এই চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা আছে, তিনি দৈবী-সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন। একাগ্রতাই মহত্ত্ব-লাভের হেতু। চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তিরাই ক্ষুদ্র; ইহারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ, কলহ ও অন্যের ঈর্ষা করিয়া থাকে। স্থির-চিত্ত পুরুষেরাই শান্ত, ধীর। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ যেন ধ্যান-গ্রস্ত হইয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ধ্যানকে ব্রহ্ম-বোধে ভাবনা করিবে। যাঁহারা একাগ্রতাকে ব্রহ্মশক্তি-বোধে * ভাবনা করেন,

---

* এ স্থলেও, শ্রুতি যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"পর্ব্বত, বৃক্ষ, দ্যৌঃ, পৃথিবী যেন ধ্যানগ্রস্ত হইয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে"—ইহারও অভিপ্রায় সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্মস্বরূপ-ভাবনা। সিসৃক্ষু ব্রহ্ম-চৈতন্যের সৃষ্টি-সংকল্পের একাগ্রতা যেন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহারা আপন ইচ্ছামত ধ্যায়ীদিগের লোকে গমনাগমন করতঃ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

এই একাগ্রতা হইতেও বিজ্ঞান * শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান না থাকিলে, চিত্তের একাগ্রতাদি কোন বৃত্তিই কার্য্যকর হইতে পারে না। জ্ঞান-শক্তি আছে বলিয়াই,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদাদি, পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ, কার্য্য-অকার্য্য প্রভৃতি সমুদায়ই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই ভাবে বিজ্ঞানের ভাবনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানবিদ্‌গণের লোকসকল জয় করিতে সমর্থ হন।

প্রাকৃতিক বল,—বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে শক্তির দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ বোধের সামর্থ্য † আমাদের আছে, মনের সেই শক্তি 'বল' নামে অভিহিত। আবার, এই 'বল' শারীরিক উত্থানাদি-সামর্থ্যকেও লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয়। আমরা যে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারাই এই উভয় প্রকারের বল উদ্ভূত হয়। প্রকৃতির শক্তির নিকটে জ্ঞানও পরাভব প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির আশ্রয় ভিন্ন জ্ঞানের বহির্বিকাশ হইতে পারে না। জগতে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য নাই। বিশ্ব,—চৈতন্য ও প্রকৃতি মিশ্রিত। এই প্রাকৃতিক শক্তির বলেই—অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ,

---

এই প্রকার ভাবনার নামই—বিশ্বে ব্রহ্ম-দর্শন-প্রণালী। "ধ্যানং নাম ভিন্নজাতীয়ৈরনন্তরিতঃ প্রত্যয়-সন্তানঃ"—ভাষ্যকার।

* বিজ্ঞান—Knowledge. "বিজ্ঞানং—শাস্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানম্"।

† অর্থাৎ জ্ঞেয়-বস্তুর দর্শন, শ্রবণ, মননাদি ক্রিয়া।

পৃথিবী, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ বিধৃত রহিয়াছে। আন্তরিক শক্তি ও বহিঃ শক্তি—উভয়ই এই বল-শব্দ বাচ্য। অতএব, এই বলের উপরেই জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া নির্ভর করে। সুতরাং ইহা শ্রেষ্ঠ। এই শক্তিকে ব্রহ্ম-বোধে ভাবনা করা কর্ত্তব্য।

অন্নই,—বলের কারণ, সুতরাং অন্ন,—বল হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাপ একটী বল, কিন্তু তাপ বর্দ্ধিত করিবার জন্য উপাদান,—অর্থাৎ কাষ্ঠাদি না দিলে, তাপ থাকে না। সমুদয় শক্তিই কোন না কোন অন্ন দ্বারা পুষ্ট। অন্তরে—মনঃ-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি অন্ন-জলাদি দ্বারা পুষ্ট ; বাহিরে প্রাকৃতিক-শক্তি,কোন না কোন উপাদান আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। অতএব অন্নই—শক্তির প্রকাশ ও পরিপুষ্টির কারণ *। মনুষ্য, অন্নাদি আহার ছাড়িয়া দিলে, কিছু পরেই তাহার দর্শন-শ্রবণাদি সামর্থ্য তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব এই অন্নকে, ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। যাঁহারা অন্ন ও অন্নাশ্রিত বলের উপাসনা করেন, তাঁহাদের

---

* বলকে—Motion, এবং অন্নকে—Matter বলা যাইতে পারে। শক্তি, তাহার আধার-ব্যতীত ক্রিয়া করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে' বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে। এই জড়-শক্তি যদি মনুষ্যাদির দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ না করিয়া দিত, তবে শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞানেরও অভিব্যক্তি হইতে পারিত না। এই জন্যই শ্রুতি, বিজ্ঞান অপেক্ষাও জড়ীয় বলকে শ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন।

স্ব-ইচ্ছানুসারে, সমুদয় অন্নাত্মক ও শক্ত্যাত্মক লোক বশীভূত হয়।

অন্ন হইতে জল শ্রেষ্ঠ। অপ্ শক্তিই, পার্থিব-শক্তির কারণ। শক্তি ও শক্তির আধার, উভয়ই যখন ঘনীভূত হইতে থাকে, তখনই প্রথমে স্থূল জলীয়-ভাবে ও পরে কঠিন পার্থিব-ভাবে ঘনীভূত হয়। এই জন্যই,—জল অন্নের কারণ বলিয়া,—সুবৃষ্টি না হইলে অন্নের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জলীয়-পরমাণুই আরো সংহত হইয়া, পৃথিবী-পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ, দেব, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতি,—সমুদয়ই জলীয়-পরমাণুরই বিকার। এই অপ্-শক্তিকে ব্রহ্ম-বোধে উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

জল হইতে তেজঃ-শক্তি শ্রেষ্ঠ। তেজঃ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু শ্রেষ্ঠ, এবং এই বায়ু হইতে আকাশ শ্রেষ্ঠ *। কার্য্য-কারণ-সূত্রে ইহারা পরস্পর বিধৃত আছে। আকাশ-শক্তি,—বায়ু-শক্তিতে পরিণত হয়। ইহারাই শক্তির অদৃশ্য রূপ। শক্তি মহাকাশের এক দেশে আত্ম-প্রকাশ করিতে গেলেই, স্পন্দন-

* মূলে 'বায়ুর' উল্লেখ নাই। তাহার কারণ এই যে, ছান্দোগ্যে কেবল স্থূল ভূতাণুর অভিব্যক্তির কথা আছে। তেজঃ বলাতেই তাহার সঙ্গে বায়ু (Motion) আছে বুঝিতে হইবে। এইজন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তেজসা সহোক্তো বায়ুরিতি পৃথগিহ নোক্তঃ। আকাশো বায়ু-সহিতস্তু তেজসঃ কারণম্"।

রূপে * অভিব্যক্ত না হইয়া পারে না। কম্পন হইলেই তাহা শব্দাকারে ও স্পর্শাকারে অভিব্যক্ত হইবে। আবার, আণবিক গতি (স্পর্শ) হইতেই তাপ (তেজঃ) এবং তাহারই অবস্থান্তর জল-নামে অভিব্যক্ত। যেখানে তাপের হ্রাস বা ক্ষয়, তাহারই ফলে জল †। জলেরই সংহত অবস্থা পৃথিবী ‡। এইরূপে এক সূক্ষ্ম আকাশ-শক্তিই § ক্রমে ঘনীভূত হইয়া স্থূল, কঠিন পৃথিবী (অন্ন) রূপে পরিণত হইয়াছে। এই আকাশাদি পঞ্চ-শক্তিকে, ব্রহ্ম-শক্তিরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই উপাসনার ফলে এই শক্তি-গুলি নিজের আয়ত্তীকৃত হয়"।

নারদ এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, মনে মনে উপদিষ্ট বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহর্ষি সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহর্ষে! এই আকাশ-শক্তি হইতে আর কি কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই? যদি থাকে, তবে তাহাও আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন"।

মহর্ষি সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ! আকাশ

* স্পন্দন—Vibration.

† জল—Liquid form.

‡ পৃথিবী—Solid form. শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছিলেন—'অগ্নেঃ পার্থিবং বা অপাং বা ধাতুমনাশ্রিত্য ইতরভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাত্মলাভো নাস্তি'। আবার,—"তেজসা বাহ্যান্তঃপচ্যমানঃ যোঽপাংশরঃ স সমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ"।।

§ আকাশশক্তি—অর্থাৎ স্পন্দন-শক্তি বিশিষ্ট আকাশ।

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবস্তু আছে। স্মৃতিশক্তি,—আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ *। স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়াই, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। অন্তর্জগতের উপরেই, বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। বিষয়ীর জ্ঞানেই,—জ্ঞেয়-বিষয়ের অস্তিত্ব। স্মৃতিশক্তি, সেই বিষয়ীর একটী প্রধান শক্তি। স্মৃতি না থাকিলে কেহই কোন কথা বুঝিতে পারিত না; কোন চিন্তা করিতে পারিত না; কোন বিষয়ের জ্ঞানও হইতে পারিত না। বৃক্ষ, পর্ব্বত, পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়বর্গ এবং উহাদের জ্ঞান, স্মৃতি-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। সমুদয় পদার্থই, স্মৃতি-শক্তির বলে, আমাদের পরিচিত হয়; নতুবা কে কাহাকে চিনিতে পারিত? তুমি বাহিরে একটী রূপ দেখিলে, বা একটী পুষ্পের গন্ধ পাইলে; এস্থলে বর্ত্তমান কালের অনুভূত এই রূপ বা গন্ধটী,—পূর্ব্বানুভূত রূপ বা গন্ধ হইতে বিভিন্ন, কিম্বা পূর্ব্বানুভূত রূপ বা গন্ধের অনুরূপ,—এইপ্রকার স্মৃতি না হইলে, আমাদের রূপ বা গন্ধের অনুভূতিই হইতে পারিত না। এই সাদৃশ্য ও বিসদৃশ-বোধের স্মৃতি মানস-পটে অঙ্কিত না থাকিলে,—কি

---

* পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, জড়-শক্তি যদি অন্তঃকরণাদি-রূপে পরিণত না হইত, তবে জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি হইতে পারিত না; এখন দেখান হইতেছে অন্তর্জগতের উপরেই বাহ্য জড়-জগৎ নির্ভর করে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে,—চৈতন্য ও শক্তি উভয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে; এককে ছাড়িয়া অন্যকে বুঝা যায় না।

বাহ্যিক কি আন্তরিক,—কোনও প্রকারের উপলব্ধি বা অনুভূতি হইতে পারিত না। এই স্মৃতি-শক্তি,—ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র; ব্রহ্মশক্তি রূপে ইহার ধ্যান বা ভাবনা করা কর্ত্তব্য।

এই স্মৃতি আবার, আশা বা কামনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতএব আশা,—স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আশা বা কামনাই, স্মৃতিশক্তির পোষণ করে; কোন বিষয়ের কামনা হইতেই, তাহার স্মৃতি উদিত হয়। কামনা না করিলে, স্মৃতির অভিব্যক্তি হয় না। এই কামনাকে ব্রহ্মবোধে * উপাসনা বা ভাবনা করিবে।

স্মৃতি কামনা প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ-শক্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে। অতএব প্রাণ-শক্তিই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। নাম হইতে কামনা পর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইয়াছে সমস্ত-গুলিই, পরস্পর কার্য্য-কারণ-সূত্রে বিধৃত। উহারা সকলেই স্মৃতিশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কামনার সূত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই কামনা-শক্তির মূল আবার—প্রাণ-শক্তি। এই বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণ-শক্তি দ্বারা, বাহ্যিক ও আন্তরিক যাবতীয় পদার্থই বিধৃত

---

* প্রজাসৃষ্টির কামনা করিয়াই, প্রজাপতি, পূর্ব্বকল্পীয়-সৃষ্টির অনুরূপ, প্রজাবর্গকে তাঁহার স্মৃতিতে প্রাদুর্ভূত করান; তাহাই অভিব্যক্ত হয়। কামনাই সৃষ্টির মূল; এই কামনাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্মৃতিপটে, নাম-রূপ অব্যক্ত-ভাবে নিহিত ছিল, তাহাই তাঁহার কামনা-বলে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রহিয়াছে *। রথ-চক্রের অরগুলি † যেমন, উহার মেরুদণ্ডে ‡ গ্রথিত থাকে; তদ্রূপ নামাদি যাবতীয় পদার্থই, এই প্রাণ-শক্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-চৈতন্যের সংকল্প, প্রাণ-স্পন্দন-রূপে প্রকাশিত হইয়া, §—সকল-শক্তির মূল হইয়াছে। ইহাই আকাশে শব্দ, জড়ে গতি ¶, উদ্ভিদে প্রাণ-ক্রিয়া; এবং প্রাণি-রাজ্যে জ্ঞান-শক্তি,—এই প্রাণ-শক্তিরই শেষ-অভি-ব্যক্তি ||। সৃষ্টির মূলে, জ্ঞানের যে কল্পনা হইয়াছিল এই

* "সর্ব্বএব দ্বিপ্রকারঃ, অন্তঃ প্রাণ উপষ্টম্ভকো (ইন্দ্রিয়াদিকরণ) গৃহস্যেব স্তম্ভাদি লক্ষণঃ, বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণোঽ (স্থূলদেহঃ) প্রকাশকঃ"—শঙ্করাচার্য

† অর—Spokes.

‡ মেরুদণ্ড—Nave.

§ প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতমনিস্পন্দমসদিবসৎকার্য্যাভিমুখং সৎ ঈষদুপজাত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ। ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎসদভবৎ অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্—ছা০ভা০।

¶ গতি—Motion.

|| প্রাণ-শক্তি,—ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত না হইলে, তদ্‌যোগে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনুন্—"শরীরদেশে ব্যূঢ়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে। শরীরে হি করণানি অধি-ষ্ঠিতানি প্রলব্ধাত্মকানি উপলব্ধিদ্বারং ভবন্তি"। "প্রাণস্য বৃত্তির্বাগা-দিভ্যঃ পূর্ব্বং ভবতি, চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ"। অন্যস্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন—"প্রাণরূপেণ হি রূপ-বন্তীতরাণি করণানি; (ক) চলনাত্মকেন, (খ) স্বেন চ প্রকাশাত্মনা। ন

সৃষ্টি-কল্পনাই অনুকম্পনরূপে— স্পন্দনরূপে—অভিব্যক্ত *। প্রাণ-শক্তিই, অনুকম্পনরূপে বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে †। জীবের সুষুপ্তি কালে, এই প্রাণ-শক্তিই

হি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ, ব্যাপার-পূর্ব্বকাণ্যেব হি সর্ব্বদা করণানি স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যন্তে ইতি প্রাণাত্মকতা সর্ব্বকরণস্য” (বৃঃ উঃ) ‘প্রকাশাত্মনা চ’—এই উক্তি দ্বারা আর একটী চমৎকার তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়মাত্রই প্রকাশাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। পদার্থ-প্রকাশও —ইন্দ্রিয়বর্গের এক সামর্থ্য। জগৎ যখন প্রাণময়,—প্রাণেরই অভিব্যক্তি, —তখন প্রাণের ক্রিয়াবত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাশকত্বও আছে। প্রাণীতে, বিশেষতঃ মনুষ্যে, এই প্রকাশকত্বটুকু বিশেষ অভিব্যক্ত। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে,—জ্ঞান (শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বোধ) এই প্রাণশক্তিরই শেষ অভিব্যক্তি। অতএব এ কথাও আসিতেছে যে সেই প্রাণ-শক্তি গোড়া হইতেই জ্ঞান (প্রকাশকত্ব) মিলিত। অর্থাৎ জ্ঞান+প্রাণ, অথবা ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তিই এ বিশ্বের মূল। এই জন্যই ঐতরেয় আরণ্যকের ২।২ প্রাণকে “প্রজ্ঞাময়” বলা হইয়াছে এবং ভাব্য এই—“প্রজ্ঞয়া আত্মভূতয়া নিত্যমবিযুক্তঃ প্রাণ ইত্যভিপ্রায়ঃ। “প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা”—ভাষ্যকার।

* “প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতং ··কার্য্যাভিমুখ মীষদুপজাত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ। ততোপি লব্ধপরিস্পন্দং······অঙ্কুরীভূতমিববীজম্—ছাং ভাং॥ “হৃদয়ং বিশ্বমস্য”—মুণ্ডক ২।১।৪ “যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা। “প্রাণশ্চ প্রজ্ঞানমাত্রম্”—মৈং উং॥

† “সর্ব্বাক্রিয়া নামরূপব্যঙ্গ্যা প্রাণাশ্রয়াচ”—বৃং ভাং। “প্রাণঃ সর্ব্বপরিস্পন্দবৃৎ”—বৃং ভাং॥

জাগরিত রহিয়া, দৈহিক-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করে *। এই প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া, জীবের আয়ত্ত নহে, ইহা প্রায় জীবের অজ্ঞাতসারেই, ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে †। জীবদেহে রস-শোণিতাদির পরিচালনা দ্বারা দেহের পোষণ, ধারণ, বর্দ্ধন এবং চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া এই প্রাণ-শক্তির কার্য্য। এই প্রাণ-শক্তি হইতেই, ইন্দ্রিয়াদির শক্তিও প্রাদুর্ভূত। এই প্রাণই, আদিত্য, ‡ অগ্ন্যাদি রূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। জড়ীয় ও জৈবিক সমুদয় ক্রিয়ার মূলে,—এই প্রাণের অনুকম্পন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রাণই সংহত হইয়া, বিবিধ পদার্থের আকার ধারণ করিয়া বিশ্বে রহিয়াছে §। এই প্রাণের উৎক্রমণ হইলে, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের

---

* "প্রাণাগ্নয় এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি"—প্রশ্ন, ৪।২।৩।

† এইজন্যই শ্রুতিতে প্রাণকে 'অবিজ্ঞাত' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপম্"—বৃঃ উঃ, ৩।৫।৪।

‡ "এষোঽগ্নিস্তপতি এষ সূর্য্যঃ" ইত্যাদি।—প্রশ্ন, ২।৫। "অগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রদিশঃ—বায়ুং প্রবিশন্তি বায়ৌ জায়ন্তে বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতা,—বায়োঃ পরিস্পন্দাত্মকত্বাৎ।...বায়োঃ প্রাণস্য চ অভেদঃ পরিস্পন্দাত্মকত্বাৎ এব"—শঙ্করভাষ্য। পাঠক তবেই দেখুন, অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্ম-পদার্থমাত্রই প্রাণ স্বরূপ হইতেছে; অতএব পরিস্পন্দাত্মক প্রাণ-শক্তিই বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে,—ইহাই শ্রুতির মত।

§ মূলে আরো কয়েকটী কথা আছে,তাহা এই—'প্রাণই পিতা,প্রাণই মাতা; প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য। যতদিন দেহে

ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। মৃত্যুকালে সমুদয় শক্তি, এই প্রাণ-শক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। এই প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি প্রাণ-শক্তিকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে "অতিবাদী" বলা যাইতে পারে"।

নারদ, এই প্রাণ-শক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। সনৎকুমার দেখিলেন যে, সর্ব্ব-বিকারাতীত ব্রহ্মের জ্ঞান, এখনও, নারদের হয় নাই। প্রাণ ত বিকারাত্মক,—পরিণামশীল। ব্রহ্ম-পদার্থ, বিকারের অতীত—অপরিণামী। যাহা সমুদয় বিকারের অতীত, যাহা পরম-সত্য ;—এরূপ পদার্থকে যিনি জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে "অতিবাদী"। যিনি প্রাণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্য নামাদি বস্তুর তুলনায় তাঁহাকে আপেক্ষিক ভাবে "অতিবাদী" বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতরূপে তাঁহাকে "অতিবাদী" বলা যায় না। নারদ, আপেক্ষিক ভাবে "অতিবাদীর" পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন মাত্র। কিন্তু, সনৎকুমার বুঝিলেন যে, পরম-সত্যকে জানিয়া নারদ এখনও প্রকৃত অতিবাদীর পদবী লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"যিনি সর্ব্ববিকারাতীত পরম-সত্য পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি আর বিকারী-পদার্থে সন্তোষলাভ করিতে

প্রাণ আছে ততদিনই পিতৃত্বাদি ব্যবহার ; ততদিনই যদি কেহ পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেলে, তখন যদি পিতামাতা প্রভৃতিকে কেহ অগ্নিতেও দগ্ধ করে, তখন আর কেহ তাহার নিন্দা করে না।

পারেন না। কেননা যাহা বিকারী, তাহা নামমাত্র,—তাহা অসত্য। পরম-কারণ হইতে পৃথক্‌ভাবে, এই কার্য্য-কারণাত্মক বিকারি-পদার্থগুলির স্বাধীন-সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। এই বিকার-সকল, ব্রহ্মের পরিচায়করূপে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায়রূপে, ব্রহ্ম-স্বরূপাববোধের দ্বার-রূপে,—সত্য*। নতুবা ইহারা মিথ্যা। অতএব ইহাদের সত্যতা, আপেক্ষিক মাত্র। সেই ব্রহ্মই একমাত্র পরম-সত্য। যাঁহার এইরূপ বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়। যাহাতে এইরূপ বোধ জন্মে, তজ্জন্য অভিলাষী হইতে হইবে। শ্রদ্ধা-সহকারে যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভের জন্য নিয়ত মনন করেন, তিনিই প্রকৃত অধিকারী। অতএব শ্রদ্ধার সহিত, এই পরম-সত্য পদার্থের বোধের জন্য মনন করা কর্ত্তব্য। যথাবিধি কর্ত্তব্য-ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ, একাগ্র হইয়া, আচার্য্যের নিকটে সমুপবিষ্ট হইয়া, শ্রদ্ধার সহিত, এই জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিবে। সুখ-প্রাপ্তির উদ্দেশেই লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের লাভোদ্দেশেই, শ্রদ্ধালু সাধক, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সচেষ্ট হইবেন। যাহা ভূমা, যাহা অপরিমিত পদার্থ, তাহাতেই সুখ আছে, পরিমিত পদার্থ সুখ দিতে পারে না। অতএব এই

---

* "সত্যত্বং বিকারস্য ন পরমার্থাপেক্ষং কিন্তর্হি ? ইন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষং সচ্চ ত্যচ্চ ইতি সত্যমুক্তং, তদ্দ্বারেণচ পরমার্থসত্যস্যোপলব্ধি র্বিবক্ষিতা"।

অপরিমিত আনন্দলাভের উদ্দেশেই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যাহা পরিমিত, তাহার লাভের জন্য, উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধিই হইতে থাকে; এই তৃষ্ণা-বৃদ্ধি দুঃখের নিদান। যাহা অপরিমিত, সেখানে সমুদয় তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে।

যেখানে (ব্রহ্ম ভিন্ন) পদার্থান্তরের পৃথক্‌ভাবে দর্শন ও শ্রবণ হয় না, তাহাই ভূমা,—তাহাই অনন্ত। সেখানে দর্শন ও শ্রবণ-কর্ত্তারও পার্থক্য-বোধ থাকে না। যেখানে পদার্থান্তরের দর্শন, শ্রবণ ও প্রতীতি হয়,—তাহা অল্প, তাহা পরিমিত *। যাহা ভূমা,—তাহা অমৃত; যাহা অল্প,—তাহা মর্ত্ত্য। সেই ভূমা, আত্ম-মহিমায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবিদ্যাবস্থায়, বস্বন্তরের জ্ঞান ও দর্শনাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থকেই এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে কোন পদার্থকেই স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। পদার্থ-মাত্রই, ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচায়করূপে তখন প্রতীত হইতে থাকে; সুতরাং এক ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ভিন্নভাবে তখন আর কোন নাম-রূপেরই অস্তিত্ব-বোধ থাকে না। মনুষ্যাদির মহিমা,—গো অশ্ব

* 'অল্প' এইজন্য বলা হইয়াছিল যে, যতদিন অবিদ্যা আছে, কেবল ততদিনই এইরূপ পার্থক্য বোধ, খণ্ড খণ্ড বস্তুর বোধ থাকে। যতপ্রকার পদার্থ আছে, সকলই নাম-রূপাত্মক। রূপের গ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় ও নামের গ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়। এইজন্যই মূলে অন্য ইন্দ্রিয়ের আর উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্মের মহিমা, কোন পদার্থান্তরের উপরে নির্ভর করে না। তাঁহার মহত্ত্ব, আপনাতেই নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। ইনি অনন্ত বলিয়া,—ইহাঁ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নাই। সুতরাং এই ভূমাই,—উর্দ্ধে-অধে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে বর্ত্তমান *। ইনিই সর্ব্বত্র, ইনিই সকল।

"আমি" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও সেই ভূমা ব্রহ্মপদার্থ। সুতরাং আমিই,—উর্দ্ধে-অধে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছি †।

এই ভূমা-চৈতন্যই "আত্মা"। সুতরাং আত্মাই—উর্দ্ধে, নিম্নে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে সদা বর্ত্তমান আছেন। ‡ আত্মাই সকল; আত্মা হইতে ভিন্ন-ভাবে, আত্ম-নিরপেক্ষ-ভাবে,—কাহারই পৃথক্ সত্তা বা পৃথক্ ক্রিয়া নাই। এই ভাবে যিনি আত্মাকে জানিতে পারেন; যিনি পদার্থান্তর না দেখিয়া, পদার্থ-মাত্রকে আত্মা-স্বরূপেই দর্শন করিতে পারেন; তাঁহার একমাত্র প্রীতি সেই আত্মাতেই স্থাপিত হয়। সাধারণ লোক পার্থিব 'কামিনী-কাঞ্চনে' অনুরক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত-জ্ঞানীর সেরূপ অনুরক্তি থাকে না। তাঁহার প্রীতি কেবল আত্মাতেই

* অর্থাৎ সেই সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুই যখন স্বতন্ত্র নহে, ভিন্ন নহে, তখন তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই নিম্নে, তিনিই সর্ব্বত্র।

† এতদ্দ্বারা, জীব যে সেই ভূমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, তাহাই কথিত হইল।

‡ এতদ্দ্বারা দেহাদি যে আত্মা নহে, তাহাই কথিত হইল।

কেন্দ্রীভূত হয়। সাধারণ লোক বৈষয়িক বিবিধ আনন্দে রত হয়। কিন্তু জ্ঞানীর আনন্দ কেবল আত্মা হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানী-ব্যক্তির যতদিন শরীর থাকে, ততদিন ইহলোকেই তাঁহার স্বর্গ-সুখ অনুভূত হয়। দেহ-ত্যাগের পরও তাঁহার সে আনন্দের বিচ্যুতি হয় না। তিনি তখন স্বাধীন ও মুক্ত হন। যাঁহাদের দ্বৈত-বোধ আছে, তাঁহারা এরূপ স্বাধীনতা পাইতে পারেন না। কোন লোকেই তাঁহার স্বাধীন স্বেচ্ছাচরণ হয় না। কেন না, তাঁহার আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে পদার্থান্তরের প্রতীতি তিরোহিত হয় নাই। সেই পদার্থান্তরই,— তাঁহার স্বাধীনতার প্রতিরোধক।

এইরূপে যাঁহার অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাঁহার জ্ঞানে, সমুদয় পদার্থই আত্মা হইতে উৎপন্ন ও আত্মাতেই বিলীন বলিয়া বোধ জন্মে। অজ্ঞানাবস্থাতেই কেবল, সমুদয় পদার্থ,— পদার্থান্তর হইতে উৎপন্ন ও পদার্থান্তরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞানী জানেন,—আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে। আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, তেজঃ ও জল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ও আত্মাতেই উহারা তিরোহিত হইয়া যাইবে। আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প ও মন, এবং আত্মা হইতেই বাক্য, নাম ও কর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহার চক্ষে, এই গুলির ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ বা আত্ম-নিরপেক্ষ সত্তা থাকে না।

এইরূপ জ্ঞানীর চক্ষে সুখ-দুঃখ, রোগ-তাপাদি কিছুই থাকে না। সমস্ত বস্তুকে তিনি আত্মাতেই দর্শন করেন। সুতরাং কোন বস্তুই তাঁহার অপ্রাপ্ত থাকে না। সৃষ্টির পরে সেই এক আত্মাই বহুবিধ আকারে দেখা দিয়াছেন; প্রলয়ে তাহাই আবার সেই একত্বে পরিণত হইয়া যাইবে।

বিষয়ের পার্থক্য-বোধ (অবিদ্যা) এবং বিষয়-কামনাই, আত্ম-জ্ঞানের—আত্ম-প্রাপ্তির মহাবিঘ্ন। অন্তঃকরণের এই অবিদ্যা ও বিষয়-কামনারূপ মলিনতা পরিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলে, এই বিঘ্ন অন্তর্হিত হয়। বিষয়-দর্শনের পরিবর্ত্তে, বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন এবং বিষয়-কামনার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই, অন্তঃকরণের মলিনতা দূর হইল। আমাদের বিষয়-কামনা রাগ-দ্বেষ-চালিত। রাগ-দ্বেষ-চালিত হইয়াই আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। এই কর্ম্ম, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনা দ্বারা পরিচালিত হওয়া বিধেয়। তাহা হইলেই, ব্রহ্মার্থ কর্ম্ম করা হয়। এই রূপে, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম,—এই তিনের মলিনতা দূর হয়। এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মকেই "হৃদয়-গ্রন্থি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই 'হৃদয়-গ্রন্থি' ভেদ হইলেই ব্রহ্মাত্ম-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, বিশ্বের মূর্ত্তি রূপান্তর গ্রহণ করে; তখন প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অনুভূতি এবং প্রত্যেক কর্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশেই সম্পাদিত হইতে থাকে। তখন আর শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়গুলিকে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, এক একটী নিরবচ্ছিন্ন বিষয়-রূপে অনুভব থাকে না;

তখন আর রাগ-দ্বেষ-কামনা-চালিত হইয়া কোন বিষয় প্রাপ্তির লোভ ও বিষয়-প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম থাকে না। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা এইরূপে অন্তঃকরণের রাগ-দ্বেষাত্মক ও অবিদ্যাত্মক পঙ্কিলতা মুছিয়া দিতে পারিলে, অন্তঃকরণ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। তখন সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে ব্রহ্মের যে ছবি পতিত হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। আপনি যে আত্ম-বিদ্যার উপদেশ চাহিয়াছিলেন, ইহাই সেই আত্ম-বিদ্যা। নিয়ত-অভ্যাস ও বৈরাগ্য ও ধ্যানাদি দ্বারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতে নিযুক্ত থাকুন; আপনার স্বতঃই সকল দুঃখ-তাপ দূর হইয়া যাইবে এবং আপনি অবিদ্যান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন"।

এইরূপে নারদ, মহর্ষি সনৎকুমারের নিকটে আত্ম-বিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। এই বিশ্বে,—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, মহিমা, শক্তি ও জ্ঞান কতকটা বিকশিত আছে। ব্রহ্মই, নাম-রূপে অভিব্যক্ত আছেন।

২। নাম-রূপাত্মক বস্তু-নিচয় অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম-স্বরূপের বোধ জন্মিয়া থাকে।

৩। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। অন্তর্জগতের উপরেই বহির্জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

৪। ব্রহ্মশক্তি, প্রাণ-শক্তিরূপে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল।

৫। ব্রহ্ম—প্রাণাদি সমুদয় বিকারের অতীত।

৬। কোন বিষয়েরই ব্রহ্ম সত্তা হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বা ক্রিয়া নাই। প্রতি পদার্থে ও প্রতিক্রিয়ায়, ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

৭। পরমার্থ-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্য স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন।

৮। ইন্দ্রিয়, বিশ্বের যে ছবি দেখাইয়া থাকে, উহা একান্ত সত্য নহে। আমাদের ক্রিয়া রাগ-দ্বেষ-চালিত এবং আমাদের কামনা বহির্বিষয়িণী। এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মই অন্তঃকরণের গ্রন্থি। জ্ঞান, বিষয়-বৈরাগ্য এবং অভ্যাস ও ধ্যানাদি দ্বারা এই গ্রন্থির উচ্ছেদ না করিলে, প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ঞান হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ)

পুরাকালে দেবাধিপতি ইন্দ্র ও অসুরদিগের অধীশ্বর বিরোচন, অতি বিনীতবেশে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ-প্রার্থী হইয়া, মহামতি প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করতঃ, প্রজাপতির নিকটে করযোড়ে আপনাপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্ম কি পদার্থ, আত্মার স্বরূপ কি, এই বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহারা প্রজাপতিকে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনি যে অনেকদিন হইল বলিয়াছিলেন যে, আত্মা—পাপরহিত, জরা-রহিত, মরণাতীত, শোকশূন্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিরহিত, সত্যকাম ও সত্য-সংকল্প; এই আত্মার—আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে। এবং তাঁহাকে আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে। আমরা সেই আত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া অদ্য উপস্থিত হইয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন্"।

প্রজাপতি উভয়কেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের জন্য সমুৎসুক

দেখিয়া বলিয়া দিলেন,—"এই যে চক্ষুর মধ্যে "অক্ষি-পুরুষ"কে* দেখিতেছ, ইনিই ব্রহ্মপদার্থ। যোগিগণ বিষয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বর্গকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সাংসারিক বিষয়-বাসনাকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া, এই পদার্থেরই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাকে পাইলে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের লাভ হয়। যিনি এই আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, সমুদয় কামনা ও সমুদয় লোক তাঁহার হস্তগত হইয়া থাকে। ইনি অমৃত, ইনি অভয়, ইনি ব্রহ্ম"। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে, প্রজাপতির উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, "অক্ষি-পুরুষ" অর্থে, চক্ষে যে মনুষ্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহাই মনে করিয়া,

* অক্ষি শব্দ এ স্থলে উপলক্ষণ মাত্র ; সমুদয় ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপে অক্ষি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। "অক্ষি-পুরুষ" অর্থ এই যে,—যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, চালক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যিনি দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সকল যাঁহার শক্তিতে চালিত হইয়া দর্শনাদি-ক্রিয়া-ক্ষম ও বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। তবেই "অক্ষি-পুরুষের" প্রকৃত অর্থ,—ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক, সেই শক্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য। প্রজাপতি "অক্ষি-পুরুষ" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন, প্রজাপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। চক্ষে যে পুরুষ-ছায়া পতিত হয় তাহাকেই, ইঁহারা "অক্ষি-পুরুষ" বলিয়া মনে করিয়া লইলেন। ইঁহারা বুঝিলেন যে, চক্ষুতে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, প্রজাপতি বুঝি সেই প্রতিবিম্ব-পুরুষকেই "অক্ষি-পুরুষ" বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই আখ্যায়িকার শেষ অংশে করা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রহ্মণ্! পরিষ্কৃত খড়্গে ও জলে যে আত্মার (শরীরের) প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, তাহাই কি তবে ব্রহ্ম"? প্রজাপতি উত্তর করিলেন,—"যিনি চক্ষুতে থাকিয়া দর্শন করেন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছি; ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়, ইনিই ব্রহ্ম"। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির কথার অর্থ না বুঝিয়া অন্যপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিলেন বুঝিয়াও, প্রজাপতি উঁহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না। একটা পাত্রে জল ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এই জলের মধ্যে কি দেখিতেছ"? তাঁহারা উত্তর দিলেন,—"ভগবন্! লোম, নখ, শ্মশ্রু প্রভৃতির সহিত নিজেরই প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়াছে দেখিতেছি; আমরা তবে আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি"।

ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্ব্ব হইতেই প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা জলে নিপতিত আপনার ছায়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদের আত্ম-প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রজাপতি দেখিলেন যে, ইঁহাদের ভ্রম এখনও দূর হইল না; তাই তিনি পুনরায় বলিলেন,—"তোমরা তোমাদের পরিধানের বল্কলাদি পরিত্যাগ কর; কেশ, লোম, নখ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ছেদন করিয়া আইস। উত্তম বসন, ভূষণ পরিধান করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, পুনরায় এই জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ"। প্রজাপতির হৃদ্গত ভাব এই হইয়াছিল যে, উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া জলে

ছায়া দেখিলে, ইহারা বুঝিতে পারিবে যে, শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়াই বসন-ভূষণের ছায়াও এখন জলে দেখিতে পাইবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ব্বে জলে যাহার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা সেই শরীরেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। নখ-লোমাদি কর্ত্তন করিতে বলারও তাৎপর্য্য এই ছিল যে, নখ-লোমাদি যতক্ষণ শরীরে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণই তাহার প্রতিবিম্ব দেখা গিয়াছিল; কর্ত্তিত হইবার পর, আর তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িবে না। সুতরাং ইহারা বুঝিতে পারিবে যে, নখ-লোমাদির ন্যায় শরীরও অস্থায়ী; কাজেই জলে পতিত প্রতিবিম্ব এবং প্রতিবিম্বের আশ্রয় শরীর,—ইহারা আত্মা নহে। কেবল ইহাই নহে;—সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি—যাহাদিগকে লোকে আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে—এগুলিও, বসন-ভূষণের ন্যায় অস্থায়ী; ইহারাও আত্মা নহে। প্রজাপতি এইরূপ মনে করিয়াই, উঁহাদিগকে বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া ও নখ-লোমাদি কর্ত্তন করিয়া, পুনরায় জলে প্রতিবিম্ব দেখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইন্দ্র ও বিরোচন, প্রজাপতির আদেশানুসারে নখ-লোমাদি ছেদন করিয়া এবং উত্তম বেশভূষা পরিয়া আসিলেন, ও কিয়ৎকাল জলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমরা নিজেরা যেমন সুপরিষ্কৃত, সুবসন-ধারী ও ছিন্ন-কেশলোম হইয়াছি, এখন জলের মধ্যেও তাহাই দেখিতেছি, এবার আমাদের আত্ম-দর্শন ঘটিয়াছে; ইহাই তবে অজর, অমর, অশোক, আত্মা-

পদার্থ"। প্রজাপতি বুঝিলেন যে, ইঁহাদের ভ্রম ত অপনোদিত হইল না। ইন্দ্র ও বিরোচনের তখনও, দেহে আত্মবোধ নষ্ট হইল না। প্রজাপতি মনে করিলেন যে, আমি যে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দিলাম, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে কালে ইহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে। সেই জন্যই শান্ত-চিত্তে গমনোন্মুখ ইন্দ্র ও বিরোচনকে, প্রজাপতি আর কিছু বলিলেন না। উঁহারা ফিরিয়া গেলেন।

বিরোচন স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, স্বজাতি মধ্যে দেহাত্মবাদ প্রচার করিল। জড়াতিরিক্ত আর চৈতন্য নাই, এই ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে লাগিল। শরীরেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য, দেহেরই পূজা করা বিধেয়; এই দেহের যত্ন করিলেই ইহ ও পরকালে শুভ হইবে। বিরোচন এইরূপ মত প্রচার করিয়া দিল। জড়াতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অনেকে এখনও বিশ্বাস করেন না; বর্ত্তমানেও এই দেহাত্মবাদের বহুল পরাক্রম দেখা যায়। যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারা এই আসুর-মতের অনুগামী।

এদিকে, ইন্দ্র ফিরিয়া যাইবার সময়ে, পথে প্রজাপতির কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে, ইন্দ্রের মনে প্রকৃত-সত্যের একাংশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ইন্দ্র মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যেমন এই শরীরে নানাবিধ বসন-ভূষণ পরিধান করিলে, জলে প্রতিবিম্বিত ছায়াত্মাকে বিবিধ বসন-ভূষণ-সমন্বিত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়; আবার শরীরস্থ বসনাদি

ও নখ-লোমাদি না থাকিলে, সরাবের জলে প্রতিবিম্বিত ছায়াকেও নখ-লোমাদি-শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপ দেহেরও যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়,—হস্ত-পদাদি ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে উহার প্রতিবিম্বও নিশ্চয় চক্ষুরাদিশূন্য ও হস্ত-পদাদি-বিহীন বলিয়া দেখা যাইবে। অতএব ছায়া বা প্রতিবিম্ব পদার্থ ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। তদ্রূপ এই দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে, উহার প্রতিবিম্বও নষ্ট হইবে,—আর ত সে প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে না! আমার বোধ হইতেছে যে, এই ছায়াত্মা-দর্শনে * আমি কোন ফল লাভ করিতে পারি নাই। ইন্দ্র, এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে, পুনরায় প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দ্র, ছায়াত্মাতে যে যে দোষ মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিতে

---

* প্রজাপতির প্রথম উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হইতে,—বিরোচন দেহকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তিনি বুঝিয়াছিলেন,—জলে যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সেই দেহই আত্মা,—ইহাই প্রজাপতির উপদেশ। কিন্তু ইন্দ্র, দেহকে না ভাবিয়া, প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বুঝিলেন,—প্রজাপতি, জলে যাহা দেখা যাইবে তাহাকেই আত্মা বলিয়াছেন, সুতরাং প্রতিবিম্বই আত্মা। একই উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা, দুইজন দুইরূপ বুঝিলেন। উপদিষ্ট বিষয়টী একই; কিন্তু বুদ্ধির-তারতম্য-বশতঃ, দুইজন দুই প্রকার অর্থ করিয়া লইলেন। প্রজাপতির উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম যাহা, তাহা কিন্তু দুইজনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

পারিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রজাপতিকে নিবেদন করিয়া, পুনরায় ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া আরও কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে, উপস্থিত হইলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন ;—"বৎস ! স্বপ্নে যাহাকে বুঝিতে পার, যে স্বপ্নে নানাবিধ ভোগ অনুভব করে, নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে,—তাহাই আত্মা ; তাহাই ব্রহ্ম ; তাহাই অমৃত, অভয়"। ইন্দ্র এই উপদেশ লাভে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া, গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে পথে পুনরায় তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল—'আমি বুঝিতেছি এই দেহ যদি চক্ষুঃ-শূন্য হয় তবে, যে পুরুষ স্বপ্নে ক্রিয়াদি করিয়া থাকে ও ভোগাদির অনুভব করে, সে ত অন্ধ হয় না ; তেমনই শরীরটার বধ করিলে, তাহার ত বধ হয় না। অতএব এই স্বপ্নাত্মা—'স্বপ্ন-পুরুষ' ত এ দেহের কোন দোষ বা অবস্থান্তরের সহিত লিপ্ত হয় না দেখিতেছি। দেহের বৃদ্ধত্ব, জরাত্ব, বিকলতা উপস্থিত হইলে, এই স্বপ্ন-পুরুষের ত জরাদি হইতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম যে এই দেহের নাশ হইলে, 'ছায়া-আত্মাও' বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু এই 'স্বপ্নাত্মাতে'ও আমি একটা গুরুতর দোষ দেখিতে পাইতেছি। শরীরের অবস্থান্তরে এ স্বপ্নাত্মার অবস্থান্তর ঘটে না বটে ; কিন্তু এ স্বপ্নাত্মাকে ক্রিয়াশীলের ন্যায় দেখিতেছি। পুত্রনাশ দেখিলে, এই স্বপ্নাত্মা ক্রন্দন করিয়া থাকে,—দুঃখানুভব করিয়া থাকে ; অথচ

প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে আত্মা 'অভয়'। ইহার ত শোক-দুঃখাদি আছে বুঝা যায়; কিন্তু প্রজাপতি ত বলিয়াছিলেন যে 'আত্মা, অজর, অশোক, অমর'। এ স্বপ্নাত্মা ত সেরূপ শোক-দুঃখাদি-শূন্য নহে; অতএব ইহাও ত প্রকৃত আত্মা নহে'। এই সকল ভাবিয়া, ইন্দ্র প্রকৃত আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য, পুনরায় প্রজাপতির নিকটে ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে আর কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য করিবার উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাই করিলে, প্রজাপতি বলিলেন, —"গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে যখন বৈষয়িক জ্ঞান (জন্য-জ্ঞান) কিছুই থাকে না, সেই যে আনন্দময় অবস্থা, তাহাই ব্রহ্মের প্রকৃত পূর্ণ-স্বরূপ। যাঁহাকে অক্ষিতে দেখিয়াছ, যাঁহাকে স্বপ্নে ক্রিয়া-শীল বলিয়া বুঝিয়াছ; তিনিই সুষুপ্তি-সময়ে সৎরূপে বিদ্যমান থাকেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই অভয়, তিনিই আত্মা"। ইন্দ্র ফিরিলেন বটে, কিন্তু এই উপদেশেও তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হইল না। তিনি দেখিলেন যে, ইহাতেও দোষ আছে। ইন্দ্রের মনে হইল—'যদি আত্মা সুষুপ্তি-কালে সৎ-রূপেই বিদ্যমান থাকেন, তবে 'আমি'-ভাবে সে আত্মার তখন বোধ থাকে না কেন? জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায়, এ অবস্থাতেও বস্তু-জ্ঞান থাকে না কেন? অতএব সে অবস্থায় আত্মা একেবারেই থাকে না,—একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, এই কথাই বা না বলি কেন? অথচ প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে, 'আত্মা অমৃত, ইঁহার বিনাশ নাই'। ইন্দ্র

চিত্তে এই সকলের আন্দোলন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি, ইন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন এবং বলিলেন;— "ইন্দ্র! তোমার চিত্ত-শুদ্ধি হইতে আর অল্পই বাকী আছে। তুমি আর কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য কর, সকল কথাই তোমাকে বুঝাইয়া দিব"।

ইন্দ্র পুনরায় কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ উপস্থিত হইলে প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দ্র! আত্মার বিনাশ নাই। এই শরীরই মরণ-ধর্ম্ম-শীল। শরীর সর্ব্বদাই মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। কেবল শরীর বলিয়া নহে; ইন্দ্রিয়-সকল এবং অন্তঃকরণও ধ্বংসশীল। আত্মা,—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির ন্যায় মরণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহেন। এই ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট শরীর সেই আত্মার ভোগাধিষ্ঠান-রূপে অবস্থিত আছে। আত্মারই ভোগের জন্য,—তেজঃ, অপ্, অন্নের দ্বারা এই শরীর রচিত হইয়াছে; আত্ম-চৈতন্য এই শরীরে জীবরূপে অবস্থিত আছেন। প্রকৃত-পক্ষে আত্মা অশরীরী, নিরবয়ব। অজ্ঞানতাবশতঃই আত্মাকে শরীরী ও শরীর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বাহ্য-বিষয়-সংযোগে উত্থিত সুখ-দুঃখাদি আত্মার প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও, ইহাকে সুখী-দুঃখী বলিয়া বোধ হয়। যাহাকে আমরা সুখ-দুঃখ বলি, তাহা আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মের ফলমাত্র; আত্মার কোন বিশেষ ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে, আত্মার সুখ-দুঃখ থাকিতে পারে

না। নির্ম্মল ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ; বৈষয়িক সুখ-দুঃখের সংস্পর্শবোধ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-বিয়োগ হইলেই, মনে সুখ ও দুঃখের উদ্রেক হয়; আত্ম-চৈতন্যের সেরূপ কোন সংযোগ-বিয়োগ না থাকায়, যে সময়ে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে, তখন আর তাদৃশ সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে না; তদবস্থায় প্রত্যেক পদার্থে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভূতি হইতে থাকে। যতদিন শরীর ও ইন্দ্রিয়, ততদিনই সুখ-দুঃখানুভূতি। শরীর ধ্বংস হইলে—স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ দেহ ধ্বংস হইলে,—আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তখন আর বৈষয়িক বিশেষ বিশেষ প্রকারের সুখ-দুঃখ থাকে না। সে অবস্থায় সুখ-দুঃখের বিশেষানুভূতি থাকে না বলিয়া, আত্মার ধ্বংস হয়,—একথা ভাবিও না। সুখ-দুঃখ থাকে না বলাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে, মনুষ্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে তাহার ফলস্বরূপ যে বিশেষ বিশেষ সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়, তাদৃশ বৈষয়িক সুখ-দুঃখ থাকে না; এইমাত্র বুঝিতে হইবে। এরূপ সুখ-দুঃখ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল; এ সুখ-দুঃখের উৎপত্তি-বিনাশ আছে; ইহাদের রূপান্তর আছে;—সুতরাং ইহারা আত্মার স্বরূপ নহে। অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য, একরূপ আনন্দই আত্মার স্বরূপ। বৈষয়িক সুখাদি,—সেই আনন্দেরই আংশিক ও পরিমিত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রকাশ করাই যেমন সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ; ইহা প্রকাশ করা, উহা প্রকাশ করা

প্রভৃতি যেমন উহার স্বরূপ নহে; তেমনিই আনন্দই আত্মার স্বরূপ; এই সুখ বা ঐ সুখ, বা এই দুঃখ বা ঐ দুঃখ ইত্যাদি তাহার স্বরূপ নহে। অর্থাৎ, যাবতীয় বিষয়জ সুখ-দুঃখগুলিকে সেই পরমানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি বৈষয়িক বিবিধ সুখ-দুঃখকে কেবল সেই সেই প্রকারের সুখ-দুঃখ মাত্র রূপে মনে করিয়া লয়, তাহারা অজ্ঞানী ব্যক্তি। যাহারা বৈষয়িক সুখ-দুঃখকে, সেই ব্রহ্মানন্দেরই অংশ ও পরিচায়ক রূপে,—সুতরাং ব্রহ্মানন্দরূপেই—সমুদয় সুখ-দুঃখের মধ্যে সেই আনন্দকেই দেখিতে পান; তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি*। তাঁহাদের চক্ষে আর বৈষয়িক সুখ-দুঃখের পৃথক্ ও স্বাধীন বোধ থাকে না। মৃত্তিকা ব্যতীত যেমন ঘটাদির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; ব্রহ্মানন্দ ব্যতীতও, বৈষয়িক সুখ-দুঃখাদির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, বৈষয়িক বিজ্ঞান-সমূহ (শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞান) এবং বৈষয়িক ক্রিয়া সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। বৈষয়িক খণ্ড, খণ্ড (বিশেষ বিশেষ প্রকারের) জ্ঞান-গুলিকে,—সেই নিত্য অখণ্ড জ্ঞানেরই অংশরূপে,—পরিচায়ক চিহ্নরূপে, বুঝিতে হয়। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিকে † সেই সেই প্রকারের বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি রূপেই দেখিয়া থাকে, তাহারা ভ্রান্ত

* "নন্বু সর্ব্বাত্মত্বে দুঃখসম্বন্ধোঽপি স্যাদিতিচেন্ন। দুঃখস্যাপি আত্মত্বোপগমাৎ"।

† বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান—States of Consciousness.

ও অজ্ঞানী। কথাটা এই যে, প্রত্যেক শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান ও ক্রিয়া ও সুখ-দুঃখের মধ্যে,—সেই অখণ্ড নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপানুভূতিই করিতে হইবে *। প্রত্যেক ক্রিয়ায়, সেই ব্রহ্ম-শক্তির বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এক অখণ্ড নিত্য ব্রহ্ম-শক্তি ও ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের পরিচয়—বৈষয়িক প্রত্যেক খণ্ড-জ্ঞানে, খণ্ড-ক্রিয়ায় ও খণ্ড-সুখ-দুঃখে—লইতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ পরিচয় লইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী। বিষয়-সংস্পর্শজ সুখ-দুঃখাদিকে, সেই সেই বিশেষ প্রকারের সুখ-দুঃখাদিরূপে ধরিয়া লওয়া অজ্ঞানীর লক্ষণ। প্রকৃত জ্ঞানীর চক্ষে, বিষয়ের ছবি রূপান্তর গ্রহণ করে; তাঁহার নিকটে বিষয়ের স্বাধীন-সত্তা তিরোহিত হয়; বিষয়ের পরিবর্ত্তে তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অনুভূতি পাইতে থাকেন। এরূপ জ্ঞানি-পুরুষের কোন কামনাই অলব্ধ ও অপূর্ণ থাকে না। কেন না, তিনি ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-ভাবে কোন বিষয়ের কামনা করেন না; তাঁহার সকল কামনা ব্রহ্ম-কামনারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে †। যিনি কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনাই করিয়া থাকেন, তাঁহার সকল কামনারই পরিতৃপ্তি হয়; যেহেতু, এরূপ ব্যক্তি ব্রহ্ম-ব্যতীত, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-ভাবে, কোন বিষয়ের কামনা

---

* স্বরূপানুভূতি করা—Realise.

† "সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বফল-সম্বন্ধোপপত্তেঃ। মৃদইব সর্ব্বঘটকরক-কুণ্ডাদ্যাপ্তিঃ"। "কামা...সদাত্মস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্তে ইতি সদাত্মনা সত্যাঃ"—ছা০ ভা০ ৮।৫।৪।

করেন না। অন্তঃকরণ অতীব নির্ম্মল না হইলে,—চিত্তের সত্ত্বগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধি না পাইলে, এরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনা করা সম্ভব নহে। যাঁহাদের চিত্ত নিতান্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই বিষয়-কামনার স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কামনাই করিয়া থাকেন। বিষয়ের ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ পৃথক্ অস্তিত্ব-বোধ তাঁহাদের থাকে না বলিয়া, তাঁহারা বিষয়-কামনা করিবেন কিরূপে? এইরূপে, তাঁহাদের সকল কামনার পরিতৃপ্তি ও সকল ফললাভ হইয়া থাকে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে,—একই আত্মা অবস্থিত থাকেন। জাগ্রদবস্থায়, বাহ্য-বিষয় ও ইন্দ্রিয়-গুলির যোগে শব্দ-স্পর্শাদির অনুভূতি হয়. স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য-ইন্দ্রিয় ও বিষয় শান্ত হইলেও, বাসনাযুক্ত অন্তঃকরণ জাগিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই বাসনাময় বিবিধ অনুভূতি হইতে থাকে। সুষুপ্তি-কালে এই অন্তঃকরণও শান্ত হয়; কেবল প্রাণ-শক্তি জাগিয়া থাকে। এ অবস্থায় আত্মার বিনাশ হয় না; কেবল অন্তঃকরণ উপশান্ত হওয়াতে, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানানুভূতি থাকে না। তৎকালে সাধারণ-জ্ঞান * মাত্র থাকিয়া যায়। আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, ক্রিয়া ও সুখের সাধারণ আধার; সমুদয় বিশেষ বিশেষ খণ্ড জ্ঞান, ক্রিয়া ও

* "তস্যামেবাবস্থায়াং সমস্ত-বিশেষ-বিজ্ঞানবিরহিতো ভবতি, তথাপি নিষ্পন্না যা জাগরিতে স্বপ্নে চ সর্ব্ববিষয়-জ্ঞাতৃত্বলক্ষণা গতিস্তয়া প্রকর্ষণে সর্ব্বমাসমন্তাৎ জানাতীতি 'প্রাজ্ঞ'-শব্দবাচ্যোভবতি"—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যে আনন্দগিরিঃ।

সুখাদি,—সেই অখণ্ড নিত্য জ্ঞানেরই অংশ বা পরিচায়ক মাত্র। সুষুপ্তি-কালে, সেই 'সাধারণ-আধার' মাত্র অবস্থিত থাকে; বিশেষ অনুভূতি অন্তর্হিত হয় বা তাহারই অন্তর্ভূক্ত হইয়া যায়। অতএব যতদিন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকে, ততদিনই বৈষয়িক সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি লাভ হয়; গাঢ়-সুষুপ্তির অবস্থায়, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিলীন ভাবে রহে বলিয়া, সেরূপ অনুভূতিও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ অবস্থায় একই আত্মা অবস্থিত থাকে। অজ্ঞানতা দ্বারাই আত্মার সংসার-দশা কল্পিত হইয়া থাকে; প্রকৃত-পক্ষে আত্মা অসংসারী। রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান; শুক্তিতে রজত-জ্ঞান এবং আকাশে মলিন-তার বুদ্ধি যেরূপ ভ্রম-জ্ঞানমাত্র; সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়-কল্পিত শব্দ-স্পর্শ-সুখ-দুঃখাদির অনুভূতিও অজ্ঞানতা-বিজৃম্ভিত। ইন্দ্রিয়-গুলির স্বভাবই এই যে, উহারা ব্রহ্ম-স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে * ও শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-বর্গকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ জন্মায়। প্রকৃতপক্ষে, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের এরূপ কোন পৃথক্, ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ, স্বাধীন সত্তা নাই।

বায়ুর,—আকাশ-স্বরূপাতিরিক্ত কোন অবয়ব নাই; মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিরও কোন বিশিষ্ট অবয়ব নাই। বর্ষণাদি

---

* "বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রযুক্তো ব্যবহারঃ 'সংবৃতি'-শব্দার্থঃ"—আনন্দগিরিঃ, গৌড়পাদীয় ভাষ্যটীকায়াম্।

প্রয়োজন সিদ্ধ হইবামাত্র, ইহাদের আর মেঘাদি-আকার থাকে না; ইহারা আকাশ-স্বরূপে লীন হইয়া যায়। বর্ষণাদি-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই, আকাশ হইতে উহারা মেঘাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। শীত-ঋতুর অবসানে, সূর্য্য-রশ্মির উত্তাপ বশতঃ বায়ু স্তিমিত ভাব পরিত্যাগ করতঃ, ঝটিকাদির আকার ধারণ করে *। মেঘ—পর্ব্বত বা হস্তির আকারে দেখা দেয়; বিদ্যুৎ জ্যোতি-র্লতার ন্যায় চাপল্য অবলম্বন করে;—এইরূপে বর্ষাকালে, ইহারা স্ব স্ব রূপ ধারণ করে। আবার বর্ষণ শেষ হইয়া গেলে, ইহারা একমাত্র আকাশ-স্বরূপে স্থিত হয়। জীবও সংসার-দশায়,—'আমি অমুকের পুত্র', 'আমি জন্মগ্রহণ করিলাম', 'এই আমার যৌবন উপস্থিত হইল',—ইত্যাদি প্রকারে নানা ভাব ধারণ করে। ইহা অবিদ্যার কার্য্য,—অজ্ঞানতার ফল। প্রকৃত 'অদ্বৈত-জ্ঞান' জন্মিলে, আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহেন এই জ্ঞান জন্মিলে,—মেঘাদি যেমন বর্ষাবসানে আকাশ-স্বরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবও স্ব-স্বরূপে উপনীত হয় এই আত্মাকে "উত্তম-পুরুষ" বলে। পূর্ব্বোক্ত "অক্ষি-পুরুষ", "স্বপ্ন-পুরুষ",—এমন কি "সুষুপ্ত-পুরুষ"ও—এই "উত্তম-পুরুষ" ইহারা সকলেই একই আত্মা

* বায়ু যে তেজেরই হ্রাস-বৃদ্ধির পরিণতিমাত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। এই জন্যই ছান্দোগ্যে সৃষ্টি প্রকরণে স্থূল বায়ু উল্লিখিত হয় নাই। তেজের কথা বলাতেই বায়ুর কথাও বলা হইয়াছে।

মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে, অবিদ্যার বিন্দুমাত্র সংস্রব থাকে না; জীব মুক্ত হইয়া যায়। এ অবস্থায় আত্মার, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন জীবের অন্তঃকরণ একেবারে বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আর তাহার দেহাদিতে আত্ম-বোধ থাকে না; বিষয়াদিরও পার্থক্য-বোধ তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত এইভাবে সংশ্রব-শূন্য হওয়ায়, তাঁহার বিশুদ্ধ-চিত্তে আর তাহাদের সেরূপ অজ্ঞানোচিত অনুভূতি হইতে পারে না। মদ্যপ ব্যক্তি উন্মত্তাবস্থায় যাহা বলিয়াছিল ও করিয়াছিল, তাহা যেমন উন্মত্তাবস্থা চলিয়া গেলে আর স্মৃতি-পথে উদিত হয় না; তেমনই অবিদ্যাবস্থায় জীবের বিষয়াদি-সম্পর্কে যেরূপ অনুভূতি ছিল; মুক্তাবস্থায় আর সেরূপ থাকে না। তখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়; ব্রহ্মানুভূতি ভিন্ন অন্যানুভূতি থাকে না। তখন পদার্থান্তরের বোধ,—পদার্থান্তরের দর্শন-শ্রবণ,—পদার্থান্তরের কামনা,—তিরোহিত হইয়া যায়। কেননা, তখনকার কামনাদি কেবল ব্রহ্ম বিষয়িনী মাত্র। তখন দ্বৈত-বোধ অন্তর্হিত; অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত। বিবিধ-লোকে বিবিধ-ঐশ্বর্য্যকে, তখন তিনি ব্রহ্মেরই বিভূতিরূপে, ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্যরূপে উপলব্ধি করিতে থাকেন *।

* দহর বিদ্যা প্রকরণে আছে যে,—এই মুক্ত পুরুষ নানাবিধ-লোকে ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করতঃ বিচরণ করেন। যদি তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা,

রথাদি আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য, যেমন অশ্বাদিকে রথাদিতে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়; তেমনই এই শরীররূপ রথে জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিযুক্ত রহিয়াছে। রাজা যেমন অমাত্যকে রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত করেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ জীবকে দর্শন-শ্রবণ, চেষ্টাদি ব্যাপারে নিযুক্ত করান *। জীবের ভোগার্থ, বিজ্ঞান-শক্তি (মন) এবং

ভগিনী, সুহৃৎ প্রভৃতিকে কামনা করেন এবং গন্ধ-মাল্যাদি গীত-বাদ্য স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থের কামনা করেন, তবে তাঁহারা কামনামাত্র তাঁহার সংকল্প-বলে উপস্থিত হয়। তিনি এই সকল বস্তুকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোগ্য-বস্তু বলিয়া বোধ করেন না; ইহাদিগকে তিনি ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বলিয়া বোধ করেন ও তজ্জনিত আনন্দ অনুভব করেন। কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্ররূপে তিনি দেখেন না। "নতু তদ্বিতীয়মস্তি, ততোহন্যৎ বিভক্তং যৎপশ্যেৎ"। /

* টীকাকার মহামতি আনন্দগিরি বলেন যে, এতদ্-দ্বারাই দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত যে আত্মা আছেন, তাহা প্রমাণিত হয়। রথাদি অচেতন পদার্থের ক্রিয়া যেমন চেতন সারথির দ্বারাই সম্পাদিত হয়; চক্ষুরাদি জড় ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়াও তদ্রূপ চেতনের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। অচেতন জড়ের নিজের ক্রিয়া করিবার কোন সামর্থ্য নাই; উহার চেতন-দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। আবার, সংহত-পদার্থমাত্রই (Aggregate) পরের প্রয়োজনোদ্দেশে সংহত হয়। যেমন শয্যাসনাদি কোন পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত; সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলন-জাত দেহও অবশ্য কোন চেতনের প্রয়োজনের জন্যই মিলিত।

ক্রিয়া-শক্তি (প্রাণ)—এই দুইটি আত্মার বা জীবের শক্তি রহিয়াছে। চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলি, সেই প্রাণ-শক্তিরই অংশ বা পরিণাম মাত্র। ব্রহ্ম-চৈতন্য তাঁহার উপাধি-ভূত চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-দর্শন করিয়া থাকেন; চক্ষুরিন্দ্রিয়টী জীবের রূপোপলব্ধির দ্বার। এইরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিষয়োপলব্ধির সাধন। সুতরাং যিনি এই দেহে থাকিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান-লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই জীব *। তাঁহারই গন্ধ বিজ্ঞানের জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাক্‌ক্রিয়াসম্পাদনার্থ বাগিন্দ্রিয়, শ্রবনার্থ শ্রবণেন্দ্রিয় ও চিন্তাদি-ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ মন। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়-গুলি জ্ঞানোপলব্ধির দ্বার মাত্র। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়-গুলি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি-বিশেষ। সেই অন্তঃকরণই তবে—এই অসঙ্গ, উদাসীন ব্রহ্ম-চৈতন্যের বিষয়-বোধের হেতু। এই বিষয়-বোধ নির্ব্বাহার্থই, বিবিধ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। সূর্য্য যেমন আলোক বিকীর্ণ করেন;—উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্ব্বত্র যিনি আলোক দেন, তিনি সূর্য্য;—একথা বলিলে যেমন আলোক-দানই সূর্য্যের স্বরূপ ইহা অনুমিত হয়,—তদ্রূপ 'যিনি জানেন যে আমি অন্তঃকরণ দ্বারা মননাদি জ্ঞান লাভ করি, যিনি জানেন যে আমি ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ জ্ঞান লাভ করি, যিনি জানেন যে আমি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ-

* "অক্ষি-পুরুষ" শব্দে প্রজাপতিও এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে, ইন্দ্র ও বিরোচন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন না।

জ্ঞান লাভ করি',—এরূপ বলিলে আত্মা যে জ্ঞান-স্বরূপ তাহা অনুমিত হয় *। আবার 'চক্ষুঃ আত্মার দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহের দ্বার,' 'ঘ্রাণ-শক্তি গন্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহের দ্বার', 'মন আত্মার মনন-ক্রিয়া (চিন্তাদি) নির্ব্বাহের সাধন,—এরূপ বলিলে, আত্মা যে শক্তি-স্বরূপ—সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার আশ্রয়, সাধারণ-সামর্থ্য-স্বরূপ, † তাহা অনুমিত না হইয়া পারে না। অতএব আত্মা (এই ইন্দ্রিয়-গুলির দ্বারাই) জ্ঞান-স্বরূপ ও শক্তি-স্বরূপ বলিয়া অনুমিত —প্রমাণিত হইতেছেন।

অন্তঃকরণ আত্মার দৈব চক্ষুরূপে কথিত হইয়া থাকে। কেননা, মুক্ত-পুরুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ-সত্ত্বময়—সর্ব্বপ্রকারের রাগ-দ্বেষাদি-মালিন্য-বিরহিত। এই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ত্রিকাল-ব্যাপ্ত, কেবল বর্ত্তমান-ব্যাপ্ত নহে। অন্তঃকরণ সত্ত্বপ্রধান হইলে, কোন বস্তুকেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ থাকে না। এরূপ অন্তঃকরণের সমুদয় কামনা ব্রহ্ম-পদার্থেই কেন্দ্রীভূত হয় ; ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কামনার বিষয়ান্তর থাকে না। এইরূপে যে পুরুষ মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সকল-লোকে সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতাত্মা হইয়া যান।

এই অজর, অমর অভয় আত্ম-বস্তুকে আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করা কর্ত্তব্য। কি প্রকারে আত্ম-হৃদয়ে আত্মার অনুভব করিতে হয় ও ইহার সাধনই বা কি, এইরূপ উপাসনার ফলই বা

* "…যো বেদ সর্ব্বত্র প্রয়োগাৎ বেদনমস্য স্বরূপ মিত্যবগম্যতে"।

† "…ইদঞ্চ অস্যাত্মনঃ সামর্থ্যাদবগম্যতে"।—ইত্যাদি।

কি, তাহাও সংক্ষেপে বলিয়া দিব *। ব্রহ্ম-বস্তু—দেশ ও কালের অতীত। যাঁহারা আত্মার এই সর্ব্বাতীত স্বরূপ সহজে ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহারা নিজের হৃদয়-দেশে আত্মার অনুভব করিবেন। হৃদয়াকাশে বুদ্ধির প্রেরক ও প্রকাশক-রূপে আত্মার অনুভব করা যায়। আত্মাই হৃদয়-নগরীর সম্রাট্। বুদ্ধি ও প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ—এই হৃদয়-নগরীর দ্বারপাল †। অনুসন্ধান

---

* শ্রুতিতে ইহাই "দহর-বিদ্যা" নামে পরিচিত। অবতরণিকায় ইহা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের এই অংশে এবং বৃহদারণ্যকের (৫।৩—৬ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত) পঞ্চমাধ্যায়ে এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে যে, অব্যক্ত বীজ (আপঃ) হইতে সর্ব্বপ্রথমে সূত্র বা প্রাণ-স্পন্দন ব্যক্ত হইয়াছিল। এই প্রাণ-স্পন্দনই প্রথমে গর্ভস্থ ভ্রূণেও ব্যক্ত হয়। প্রাণ স্পন্দন হইতেই সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থ ব্যক্ত হইয়াছে। দেহেও, প্রাণ-স্পন্দন হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব প্রাণ-স্পন্দনের দুই আকার—সূর্য্যাদি-করণবর্গে যে প্রাণ-স্পন্দন, চক্ষুরাদি-করণবর্গেও সেই প্রাণ-স্পন্দন। "সত্যস্থ ব্রহ্মণঃ (সূত্রাত্মনঃ) সংস্থানবিশেষৌ আদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষৌ যস্মাৎ, তস্মাদন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ"—ভাষ্য। এই প্রাণ-স্পন্দনের প্রেরকরূপে হৃদয়াকাশে আত্মার অনুভব করিবে।

† ছান্দোগ্যের অন্যত্র (৩।১৩।১—৮) বলা হইয়াছে যে—দেহমধ্যে প্রাণই প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রাণ-অপান-সমান প্রভৃতিরই অংশবিশেষ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। জীব—এই সকল চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়যোগেই

করিলে এবং এই দ্বারপাল-গুলিকে বশীভূত করিতে পারিলে, এই হৃদয়-নগরীতে সম্রাটের দর্শন মিলিতে পারে।

বাহিরের আকাশে যেমন—সূর্য্য-চন্দ্রাদি বিবিধ পদার্থ রহিয়াছে, হৃদয়াকাশেও তদ্রূপ—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু অন্তর্নিহিত রহিয়াছে *। হৃদয়াকাশে যে প্রাণ-শক্তি বা অন্তঃকরণ-শক্তি রহিয়াছে, তাহারই প্রকাশক ও প্রেরকরূপে আত্মা অবস্থিত। এই অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, অন্তঃকরণের রজঃ ও তমের মলিনতা নষ্ট করিতে পারিলে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান করিতে পারিলে—তাহাতে আত্ম-জ্যোতিঃ স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। তখন এই অন্তঃকরণের কোন কামনাই অপ্রাপ্য থাকে না। রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-সমূহ গ্রথিত থাকে, সমুদয় কামনা—সমস্ত পদার্থ—সমগ্র

বহির্মুখ হইয়া শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়বর্গে আসক্ত হইয়া পড়ে ও আত্ম-হৃদয়ে ব্রহ্মানুভব করে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, ইহারাই হৃদয় ব্রহ্মের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। এই দ্বারপাল-গুলিকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, অর্থাৎ বিষয়-প্রবণতা রুদ্ধ করিতে পারিলেই, হৃদয়ে ব্রহ্মানুভব সহজ হইয়া উঠে।

* হৃদয়স্থ প্রাণ-শক্তি (অন্তঃকরণ)ই—হৃদয়াকাশ নামে খ্যাত। এই প্রাণেই সকল ইন্দ্রিয় বিলীন হয়, আবার এই প্রাণ হইতেই সকল ইন্দ্রিয় বিষয়বর্গে ধাবিত হয় (জাগ্রৎ-কালে)। ব্রহ্মও—এই প্রাণ-গুহাতেই অনুভূত হন।

জগৎও তদ্রূপ এই হৃদয়াকাশে নিহিত আছে *। এই বিশুদ্ধ হৃদয়াকাশ বা অন্তঃকরণ—দৈহিক জরা-রোগাদি দ্বারা বা আন্তরিক ক্লেশাদি দ্বারা গ্রস্ত হয় না ; কোন ইন্দ্রিয়ের দোষেও লিপ্ত হয় না †। কোন প্রকার দুঃখ এই হৃদয়াকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই হৃদয়াকাশেই সর্ব্বপ্রকার কামনা ও সংকল্প নিহিত আছে। সুতরাং বাহ্য বিষয়-বর্গের কামনা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হওয়া কর্ত্তব্য। অন্তর্মুখ হইলেই সমুদয় কামনা লাভ করিতে পারা যাইবে। এই হৃদয়াকাশে অজর, অমর,শোক-দুঃখাদিবর্জ্জিত,সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প আত্ম-বস্তু অনুভব-গোচরে আইসেন। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণের রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইয়া যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থায়, অন্তঃকরণ যে বিষয়ের কামনা করে বা যে কামনার লাভার্থ সংকল্প করে, তাহা আর নিষ্ফল হয় না। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান হৃদয়াকাশে বা অন্তঃকরণে আত্মার প্রকৃত-স্বরূপকে অনুভব করিতে পারা যায়। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান অন্তঃকরণ লইয়া, মৃত্যুর পরে, জীব যে সকল উন্নত লোকে গমন করে,

* কেন না, বুদ্ধির উপরেই যাবতীয় বিজ্ঞান নির্ভর করে। বুদ্ধি আছে বলিয়াই ত জ্ঞেয় জগৎও আছে।

† কেন না, তখন অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে। সে অন্তঃকরণে কোন বস্তুই আর আত্ম-সত্তা হইতে 'ভিন্ন' বলিয়া অনুভূত হয় না। সুখ-দুঃখাদি সকলই তখন কেবল এক আত্ম-সত্তারূপেই অনুভূত হয়। বস্তুটী আমা হইতে স্বতন্ত্র হইলে, তবেত তাহা আমাতে দুঃখ-শোকাদি জন্মাইবে।

তথায় সে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। অন্তঃকরণ সত্ত্ব-প্রধান হওয়াতে এবং অন্তঃকরণ হইতে ভেদ-বোধের হেতুভূত রজঃ ও তমের কালুষ্য অপগত হওয়াতে, সেই মুক্ত জীব তখন যে বস্তুরই কামনা করুক্, সেই বস্তুই তৎক্ষণাৎ তাঁহার সংকল্প-বলে অন্তঃকরণে উদিত হয়। পিতৃ-পুরুষবর্গ, মাতৃবর্গ, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ, অথবা গন্ধ-মাল্য, গীত-বাদ্যাদি ভোগ্য পদার্থ-সকল,—তাঁহার সংকল্পমাত্রেই উপস্থিত হয়। এবং তিনি কোন পদার্থকেই আর পূর্ব্বের ন্যায়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন না; কিন্তু সকল পদার্থকেই ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্যের পরিচায়করূপে অনুভব করিতে থাকেন এবং মহানন্দে নিমগ্ন হন।

অজ্ঞানাবস্থায়, অন্তঃকরণের এই সকল সত্যকামনা ও সত্য-সংকল্প অনৃতদ্বারা, অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তখন অবিদ্যার দোষে, সকল পদার্থই স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থরূপে অন্তঃকরণে অনুভূত হইয়া থাকে; ব্রহ্ম-সত্তার কথা আর চিত্তে উদিত হয় না। কোন পদার্থই যে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে, তাহা আর মনে হয় না। সুখ-দুঃখ, স্ত্রী-অন্ন, সূর্য্য-চন্দ্র—যাবতীয় বস্তুই সেই অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তারই পরিচায়কমাত্র, ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্যমাত্র,—এই তত্ত্বটী তখন মলিন-অন্তঃকরণে উদিত হয় না। কিন্তু এই অবিদ্যার আবরণ চলিয়া গেলে, এই অসত্যের আচ্ছাদন খসিয়া পড়িলে, কোন বস্তুই আর 'ভিন্ন' বলিয়া অনুভূত হয় না; কোন কামনাই আর অলব্ধ থাকে না। মৃত্তিকার নিম্নে রত্ন থাকিলেও যেমন অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই মৃত্তিকার উপর বারংবার বিচরণ

করিলেও ভূগর্ভস্থ সেই রত্নের সংবাদ পায় না; অজ্ঞানী জীবও তদ্রূপ প্রত্যহ গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে আত্ম-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াও, তাঁহাকে পায় না। কেন না তাহা অসত্য-দ্বারা সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে;—অন্তঃকরণের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই। যখন দেহাদিতে আর আত্ম-বোধ থাকিবে না; যখন দেহাদিকে স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া আর বোধ করিতে পারা যাইবে না; যখন সকল-বস্তুই এক অদ্বিতীয় আত্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্যরূপে, পরিচায়ক চিহ্নরূপে, তাঁহারই স্বরূপ-প্রকাশক দ্বাররূপে—অনুভূত হইতে থাকিবে; কেবল তখনই আত্মার অজর, অমর, সত্যকাম ও সত্য-সংকল্প-স্বরূপটী প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই আত্মাই জগতের অসংখ্য নামরূপাত্মক বস্তু-নিবহের আশ্রয়-সেতু স্বরূপ। এই সেতুর আশ্রয় আছে বলিয়াই জগৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছে না। দিবা ও রাত্রি—এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, কালে ইহাঁর পরিচ্ছেদ হয় না; ইনি কালের অতীত, নির্ব্বিকার *। জরা, মৃত্যু, শোক, পাপ-পুণ্য,—ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। একবার এই সেতুতে পৌঁছিতে পারিলে, যে অন্ধ তাহার অন্ধতা অপগত হয়; যে আহত তাহার আঘাত আর থাকে না; সকল

* অন্যত্র আছে 'হিরণ্যগর্ভ হইতেই কালাত্মক সংবৎসর উৎপন্ন হইয়াছে'। অর্থাৎ প্রাণ-স্পন্দনই পরে দেশে ও কালে আবদ্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড রূপে ক্রিয়ার বিকাশ করে। সুতরাং কালেরও কারণ বলিয়া, তিনি নির্ব্বিকার। কার্য্য যাহা, তাহা কারণকে লঙ্ঘন করিতে পারে না।

দুঃখ দূরে যায়। তাহার সমুদয় অন্ধকার ঘুচিয়া যায়; ব্রহ্ম-লোকে সকল মলিনতা, সকল তমোন্ধকার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

সত্যপরায়ণতা ও ব্রহ্মচর্য্য,— ইহাই সেই আত্ম-বস্তুর সাধন। কর্ম্মিগণ যজ্ঞাচরণের দ্বারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে হইলে, আত্ম-বস্তুকে পাইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যপরায়ণতা রূপ যজ্ঞের আচরণ করিতে হয়। স্ত্রী, অন্ন, সুখ, প্রভৃতি বাহ্য বিষয়-বর্গের অনুধ্যান ও তৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কামনা ত্যাগ না করিলে কেহই এই ব্রহ্মলোকে যাইতে পারে না। যাঁহারা এই দুই সাধন-দ্বারা হৃদয়াকাশে ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা সংকল্পমাত্রই সমুদয় কামনার বস্তু লাভ করিয়া থাকেন *।

* ভাষ্যকার এস্থলে কামনার বিষয় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। তিনি বলিয়াছেন যে, মুক্ত-পুরুষ পিতা মাতা ভ্রাতা, সুহৃদ্, অন্ন-পানাদি যে সকল বস্তুর সংকল্প করেন এবং সংকল্প মাত্রই যে উহারা তাঁহার অন্তঃকরণে উপস্থিত হয়, ইহাদের কোন স্থূল রূপ বা আকার নাই। ইহাদের আকার সূক্ষ্ম, মানসিক আকার মাত্র। স্বপ্ন-দর্শনকালে আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সে গুলি স্থূল নহে। উহাদেরও সূক্ষ্ম আকার। জাগরিতকালে যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেই সকল বস্তুর সংস্কার মনে অঙ্কিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় উহারাই সংস্কারাকারে অনুভূত হয়। জাগ্রদবস্থাতেও আমরা স্থূল বস্তুর মানসিক আকারই ত উপলব্ধি করিয়া থাকি। শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি ত আমাদের মানসিক সংস্কার বা আকার মাত্র। এমন কি

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সাধন অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি সতত হৃদয়াকাশে ব্রহ্মানুধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহার মৃত্যুকালে 'সুষুম্না' নামক স্নায়ুছিদ্র দিয়া গতি হয়। হৃদয়দেশ হইতে বহির্গত হইয়া সহস্র সহস্র শিরাজাল, সমগ্র দেহটীকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি দেহের এই সকল

তেজঃ, অপ্, অন্ন—যাহা সকল স্থূল পদার্থের মূল—তাহারাও ত সৎব্রহ্ম বস্তুরই সংকল্প-জনিত মাত্র। সকল বস্তুই ত ব্রহ্মের সংকল্প হইতে জনিত। সুতরাং কি জাগরিত অবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা—সকলাবস্থাতেই ত আমাদের যাহা অনুভূতি হয়, তাহা মানসিক সূক্ষ্ম আকার ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বাহ্য ও আন্তর জগতের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে। ইহারা কেহই অসত্য বা মিথ্যা নহে। স্বরূপতঃ ইহারা মিথ্যা নহে, আপেক্ষিকভাবে মিথ্যা। জাগ্রদ-বস্থার উপলব্ধির তুলনায়, স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু-গুলি অসত্য; আবার স্বপ্নাবস্থার অনুভূত বস্তু-গুলির তুলনায়, জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুগুলি অসত্য, এইমাত্র। কিন্তু ব্রহ্ম-সত্তারূপে সকল বস্তুই সত্য। বিশেষ বিশেষ আকার-গুলিই কেবল মিথ্যা; কিন্তু যে সত্তার উপরে এই আকারগুলি প্রতীত হইয়া থাকে, সেই সত্তারূপে ইহারা সত্য। সত্তা হইতে অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র-রূপেই কেবল সকল বস্তুই অসত্য। কিন্তু সত্তারই রূপান্তর বা অবস্থাভেদ রূপে সকল বস্তুই সত্য। সুতরাং মুক্ত-পুরুষের কামনার বিষয়গুলি এবং সংকল্প,—ইহারাও সত্য। কেননা, তিনি ত আর ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোন কামনা করেন না। ইহারা আত্ম-স্বরূপ-রূপেই, আত্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য্য-রূপে সংকল্পিত হইয়া থাকে। পাঠক শঙ্করের এই মন্তব্যটী ভুলিবেন না। তিনি কি ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলিতেন, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

শিরায় প্রবেশ করিয়া, অন্ন-রসের পরিপাক দ্বারা আমাশয়ে পিত্তরস উৎপন্ন হইলে, বাত-কফাদির সহিত মিলনে, নীল-পীতাদি বর্ণ উৎপাদন করে এবং এই পিত্তরসের এই সকল বর্ণ যোগেই শিরাগুলিরও বর্ণের তারতম্য হয়। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে জীব, এই সকল পিত্ত-রসপূর্ণ শিরাপথ দিয়া হৃদয়াকাশে (প্রাণ-শক্তিতে) অবস্থান করে। শিরাছিদ্র-গুলি পিত্ত-রসে পূর্ণ হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বহির্বিষয়ে ধাবিত হইতে পারে না এবং তখন জীব, প্রকৃত নির্ব্বিকার আত্ম স্বরূপে অবস্থান করে। মৃত্যু সময়ে, এই সকল শিরাপথ দিয়াই জীবের প্রাণ উৎক্রান্ত হয়। একটা প্রধান সূক্ষ্ম শিরা হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রসৃত রহিয়াছে। উহাকে সুষুম্না-নাড়ী বলে। ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের এই নাড়ীপথ দিয়াই গতি হয়। এই নাড়ীপথ দিয়া প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশ করে। সূর্য্যই ব্রহ্মলোক-গমনের দ্বার।

হে ইন্দ্র! এই আমি তোমার নিকটে অজর, অমর, জরা-মরণ-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—আত্মার বিষয় উপদেশ দিলাম। তোমার মঙ্গল হউক্। দেবলোকে ফিরিয়া যাও"।

প্রজাপতির উপদেশ-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রজাপতি আত্মাকে জ্ঞান-স্বরূপ ও শক্তি-স্বরূপ * বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে ও হিন্দুদর্শনে ব্রহ্ম-চৈতন্যকে উদাসীন, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, দেখা যায়। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অথচ বিশ্বে

* "......'যো বেদ' সর্ব্বত্রপ্রয়োগাৎ বেদন মস্ত স্বরূপমিত্যবগম্যতে।......ইদঞ্চ অস্যাত্মনঃ সামর্থ্যাৎ অবগম্যতে"—ইত্যাদি।

প্রকাশিত বিবিধ বিকারী বিজ্ঞান-সমূহ হইতে তিনি দূরে অবস্থিত। তিনি শক্তি-স্বরূপ, অথচ তিনি জগতের সমুদয় বৈকারিক (Phenomenal) ক্রিয়ার অতীত। যিনি নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, তিনি ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক হইবেন কেমন করিয়া ? শ্রুতিতে নানাস্থানে আত্মাকে যেমন 'উদাসীন' বলা হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহাকে নানাস্থানে 'অন্তর্যামী' ও 'ইন্দ্রিয়ের প্রেরক' বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, ইহার সামঞ্জস্য কোথায় ? এ বিষয়ে ভাষ্যকার মহামতি শঙ্করাচার্য্যেরই বা সিদ্ধান্ত কিরূপ ? বিষয়টা বড়ই গুরুতর ; অনেকে এই তত্ত্বটা বুঝিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। এই বিষয়টার এতদ্দেশীয় প্রাচীন টীকাকারগণের প্রকৃত মীমাংসা কিরূপ, তাহা বুঝিতে ভুল করিয়া, এদেশের কয়েকজন পণ্ডিত এবং বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে "The philosophy of the upanisads" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা দার্শনিক A. E. Gough প্রভৃতি মনীষীগণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এইজন্য, আমরা এব বিষয়টার প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এ বিষয়ে ভাষ্যকারদিগের নিজের উক্তি-দ্বারাই আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিব। হিন্দু-দর্শনেরই বা এ সম্বন্ধে মীমাংসা কিরূপ, আমরা তাহারও আলোচনা করিব।

আমাদের ধারণা এই যে, বেদান্তের ব্রহ্ম ও সাংখ্যের পুরুষ * পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-শক্তি ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ। তবে যে ব্রহ্ম ও পুরুষকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন বলিয়াও কথিত হইয়াছে, ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। জড়-জগতে যে প্রাকৃতিক-ক্রিয়া ও জড়-সংসর্গে আত্মায় যে প্রাকৃতিক

* বিজ্ঞানভিক্ষুও, পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন—"অস্মচ্ছাস্ত্রে ব্রহ্ম-শব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদমালিন্যাদিরহিতপরিপূর্ণ-চেতনসামান্য বাচী" (সাংখ্যদর্শন, ৫:১১৬।

জ্ঞান (শব্দ-স্পর্শাদি) দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা প্রাতিস্বিক (pheno menal)) প্রতিমুহূর্ত্তে উহারা রূপান্তর পরিগ্রহ * করিতেছে; উহারা চঞ্চল, অস্থির পরিণামধর্ম্মী, উহারা অনিত্য ও বিকারী। ব্রহ্ম-জ্ঞানকে বা ব্রহ্ম-শক্তিকে ঐ সকল বিকারী ও অনিত্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন মনে করিলে, ব্রহ্মকেও বিকারী ও পরিণামী বলিতে হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি সমস্তই কার্য্য (Effect) মাত্র। যাহা কার্য্যের কারণশক্তি তাহা কার্য্য হইতে পৃথক্ ও ভিন্ন না হইলে, কারণটাই কার্য্য হইয়া পড়ে; কার্য্য ও কারণ এক হইয়া যায় †। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও বিশেষ কারণ আছে। আত্মার (জীবের) ক্রিয়া বলিতে আমরা কি বুঝি? কর্তৃত্ব শব্দের অর্থ কি? কর্তৃত্বের অর্থ এই যে,—যাহা করিবে তজ্জন্য প্রবৃত্তি আবশ্যক; প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া, সাধন-সহায়ে কোন বিশেষ ফলোদ্দেশে, লোকে ক্রিয়া করিয়া থাকে। জীবের এইরূপ কর্তৃত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি কর্তৃত্ব এরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্মের এরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নানাপ্রকার কামনা-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত ও

---

* বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। সর্ব্বোবিকারঃ কারণব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধেরসৎ, জন্মপ্রধ্বংসাভাবাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ অনুপলব্ধেঃ"।—গীতাভাষ্য, ২।১৬।

† "অত্যন্ত সাঙ্কর্য্যে চ প্রকৃতি-বিকার-ভাব এব প্রলীয়তে"—বেদান্ত ভাষ্য ২।১।১৬ "অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ, কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং নতু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং। কল্পিতস্য অধিষ্ঠান ধর্ম্মবত্ত্বং অভেদাৎ, ন তু অধিষ্ঠানস্য কল্পিতকার্য্য ধর্ম্মবত্ত্বং—তস্য কার্য্যাৎ পৃথক্ সত্ত্বাৎ"রত্নপ্রভা বেঃ ভাঃ ২।১।৯ "কারণং কার্য্যাদ্ভিন্ন সত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ ভিন্নং"—রত্ন-প্রভা, ১।১।৮

দোষ-দুষ্ট বলিতে হয়। আরো একটী কথা আছে। যাহা জীবে জীব-চৈতন্য, তাহাই বিশ্বে ব্রহ্ম-চৈতন্য। যদি বিশ্বের প্রতিক্ষণ-জাত বিবিধ ক্রিয়া ও পরিণামের সহিত অভিন্ন ভাবে ব্রহ্ম-চৈতন্যকে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ত ব্রহ্ম-চৈতন্যেরও অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। আর অস্তিত্ব থাকিলেও, প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার মুখ্য 'কর্ত্তা' বলিয়া ব্রহ্মকে স্বীকার করিতে হয় এবং যাহাকে Special creation বলে তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

বোধ করি সাংখ্য-দর্শন এইরূপ দোষ নিবারণের উদ্দেশেই সগুণ 'ঈশ্বর' স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই জন্যই, বেদান্তে নির্গুণ ব্রহ্ম, বা গুণ-গুলির সাধারণ-বীজরূপে ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রকৃতির বা মায়ার প্রথম-পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া-প্রবাহ যে ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত * একথা হিন্দু-দর্শনে অস্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বক্রিয়া ও সর্ব্বজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইয়াও, সেগুলি হইতে পৃথক্। প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মূল-প্রেরক পুরুষই। পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, সাংখ্য-দর্শনের এ তত্ত্ব অতীব সত্য। একটা নিয়ম বা প্রণালী-ক্রমে প্রকৃতি নিম্ন-স্তর হইতে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে; এই নিয়মের বিধান-কর্ত্তা বা মূল-প্রেরক—পুরুষ, একথা সাংখ্য প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্যও নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে মায়ার (প্রকৃতির) 'প্রবর্ত্তক' বলিয়াছেন। †

---

* আমরা এই গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় এই তত্ত্বটীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

† "প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং...সর্ব্বসাধারণা-ব্যাকৃতজগদ্বীজ (মায়া) প্রবর্ত্তকং"—ঐতরেয় ভাষ্যে শঙ্করঃ ৫।৩ "ন কেবলং প্রজ্ঞাসত্তয়ৈব সত্তাবত্বং কিন্তু প্রবৃত্তিরপি তদধীনৈব ইতি প্রজ্ঞা-

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের বা আত্মার সাধারণ ক্রিয়া-শক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান-শক্তি কোথাও অস্বীকৃত হয় নাই। অস্বীকৃত হইয়াছে কেবল তাঁহার বিশেষ বিশেষ পরিণামী ও বিকারী জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিকারী ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব। ইন্দ্রিয়াদি-ক্রিয়ার মূলে প্রেরক-রূপে আত্মাই বর্ত্তমান ;—তবে প্রত্যেক স্পর্শ-ক্রিয়া, প্রত্যেক দর্শন-ক্রিয়া স্বরূপতঃ তাঁহার নহে ; উহারা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে উৎপন্ন হয়। "চৈতন্যস্য গুণবিশেষবিশিষ্টত্বনিষ্টং নির্গুণত্বাৎ" (আনন্দগিরি, গীতা ৫।১৯)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুও সাংখ্য-দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের ১৪৬ সূত্রের টীকায়—"গুণ-শব্দোঽত্র বিশেষগুণবাচী"—এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম-চৈতন্যের এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াই সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি, আত্মার জ্ঞান ও শক্তির অভিব্যঞ্জক বা দ্বার *। ইন্দ্রিয়-গুলি,—সেই অখণ্ড নিত্য জ্ঞান ও শক্তিরই নানারূপে পরিচয় প্রদান

নেত্রং" (তত্রৈব জ্ঞানামৃত যতিঃ)। "অনাদি জড়স্য প্রবৃত্তিঃ চেতনাধীনা প্রবৃত্তিত্বাৎ রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ"—রত্নপ্রভা, ২।২।৩, আর এক কথা আছে। শঙ্কর ব্রহ্ম-চৈতন্যকে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ—উভয়ই বলিয়াছেন। "আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতিত্বঞ্চ (বেও ভাও ১।৪।২৩)। রত্নপ্রভা "মায়া-ব্রহ্মণোস্তাদাত্ম্যসম্বন্ধঃ" (২।২।৩৮) বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতি বা মায়ার প্রবৃত্তির কর্ত্তা চেতনই হইতেছেন। "স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি"—বেও ভাও ১।৪।২৪।

* যেন উপলভতে যশ্চ উপলভতে—দ্বে উপলব্ধি-কর্ত্তৃকরণে বস্তুনী উপলভ্যতে। যদনেকাত্মকং চক্ষুরাদিকরণসংঘাতাত্মকং তৎ সংহতত্বাৎ পরার্থং ইতি পরিশেষত্বেন করণং"—ঐতরেয় ভাষ্যব্যাখ্যায়াং জ্ঞানযতিঃ।

করে*। সেই জ্ঞান ও শক্তি,—নিত্য অবিকারী থাকিয়া, ঐন্দ্রিয়িক বিকারি-জ্ঞান ও বিকারি-ক্রিয়া সমূহের অধিষ্ঠানরূপে সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে†। হিন্দু-দর্শনের ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং সগুণ হইয়াও নির্গুণ। বিকারী, সদোষ, অনিত্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া-গুলির সহিত লোকে পাছে ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞান ও শক্তিকে,—অভিন্ন ও এক বলিয়া ধরিয়া লয়, এই আশঙ্কায় হিন্দু-দর্শন বারংবার ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন। ইচ্ছা, সুখাদি সমুদয়ই অনিত্য, বিকারী; ইহারা এখন একরূপ, আবার পরক্ষণেই অন্যরূপ; আবার, গ্রহণ-শক্তির (ইন্দ্রিয়-শক্তির) তারতম্যানুসারে—যাহার ইন্দ্রিয় যতটুকু বিকাশিত, তাহার নিকটে—ইহারা ততটুকুমাত্র প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি,—নিত্য; অখণ্ড: সুতরাং ইহা তাহাদের ন্যায় হইতে পারে না। ভৌতিক-প্রকৃতির অবস্থান্তর দ্বারা, জ্ঞান ও শক্তির বিকাশের তারতম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাতে আত্মার নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-শক্তির স্বরূপতঃ কোন অবস্থান্তর ঘটে না, বা কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তরালে, তৎ-সঙ্গে সঙ্গে,—সেই নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইহারা তাহারই পরিচায়ক চিহ্নমাত্র। কিন্তু যাহা পরিচায়ক চিহ্নমাত্র, সেই চিহ্ন ও চিহ্নী (তাহারা যাঁহার পরিচয় প্রদান করে তিনি) এক ও

* "তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়···যুক্তাঃ হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ"—মধুবিদ্যা। ভাষ্য দেখ।

† তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" (ঈশ,৪) নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিয়া মাতরিশ্বা বা প্রাণ-শক্তি—প্রাণিদিগের চেষ্টাত্মক ক্রিয়া ও সূর্য্যাদির জ্বলন-দহনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। (শঙ্করভাষ্য)

অভিন্ন হইতে পারে না। হিন্দু দর্শনের একথা বড়ই পরিষ্কার। এই মর্ম্ম না বুঝিয়া, ব্রহ্ম বা আত্মাকে নিতান্ত সর্ব্ব-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়রূপে—সুতরাং নিঃস্বরূপ বা শূন্যরূপে—লোকে মনে করিয়া লয়। "নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাঽসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ"—তাঁহার কর্তৃত্ব কেবল সন্নিধি-বলেই অর্থাৎ অবিকারী থাকিয়াই তিনি কর্ত্তা; কোন প্রবৃত্তির চালনায় নহে। ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্ব-ক্রিয়ার সাধারণ-কর্তৃত্ব-বাজই সূচিত হইতেছে। তবে যে প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ,—প্রকৃতি বিকারি-ক্রিয়ার (phenomenal) কর্ত্রী। * প্রতি মুহূর্ত্তে যে সকল ক্রিয়া হইয়া চলিতেছে, উহা প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত-শক্তি বলে। এই অন্তর্নিহিত ক্রিয়ার মূল-শক্তি কিন্তু প্রকৃতি, পুরুষ হইতেই পাইয়াছে। কেননা, মূলে, প্রকৃতি—পুরুষেরই শক্তিমাত্র †।

জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা বলা হইল, সুখ দুঃখাদি (Feelings) ভোগ সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। সুখ-দুঃখাদি,—প্রকৃতি সংসর্গে আত্মার অবস্থান্তর মাত্র। এই সুখ-দুঃখাদি ভাবগুলি,—সেই অখণ্ড আনন্দেরই অভিব্যঞ্জক ও পরিচায়ক

---

* এই জন্যই প্রকৃতির বিকার দ্বারা কর্ত্তা-পুরুষের কোন বিকার হয় না। শক্তি—শক্তিমান হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু শক্তিমান্—শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্যই শক্তির বিকার হইলেও, ব্রহ্মের নিরবয়বত্বের ব্যাঘাত হয়না;—এই তত্ত্ব শঙ্কর বেদান্তের ২।১।২৭ সূত্রে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

† "যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েত তদা প্রধানকারণবাদং, পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা।...অর্থবতী হি সা। ন তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি। শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"—বেঃ ভাঃ ১।৪।৩।

চিহ্নমাত্র। সমস্ত অনুভূতি বা ভোগের মূলবীজ ব্রহ্মই। জ্ঞান, শক্তি ও অনুভবের মূল কারণ-বীজ তিনিই। তবে যে জড়রাজ্যে খণ্ডজ্ঞান, খণ্ড-ক্রিয়া ও খণ্ড সুখাদি দেখা যাইতেছে,—সেগুলি প্রকৃতিরই পরিণাম-জাত ও প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত-শক্তিজাত।

আমরা সংক্ষেপে হিন্দু-দর্শনের যে মীমাংসার কথা উল্লেখ করিলাম, আমাদের বোধ হয় ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এখন আমরা সাংখ্য-দর্শন ও শাঙ্কর ভাষ্যের কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মীমাংসাটী আর একটু দৃঢ় করিয়া লইব। পাঠক, তাহা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে, ইহা আমাদের স্ব-কপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা নহে; কপিল ও শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই মর্ম্মেই নির্গুণাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রকৃতি বা জড়ের ক্রিয়ার প্রবৃত্তি যে পুরুষ হইতে প্রাপ্ত, একথা সাংখ্য একরূপ স্পষ্ট করিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যে দুইভাবে এ তত্ত্বটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক, প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই জন্মিয়াছিল।* অপর, পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সাক্ষীরূপে সমীপস্থিত পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) সাধন জন্যই, প্রকৃতির পরিণাম-প্রবাহ। "সাক্ষী" অর্থ কি? আনন্দগিরি "সাক্ষী" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"সর্ব্বেষু ভূতেষু সত্তা-স্ফূর্ত্তিদত্বেন সন্নিধির্বাহত্রোচ্যতে, ন কেবলং কর্ম্মণামেবায়মধ্যক্ষঃ অপিতু তত্ত্বতামপীত্যাহ সাক্ষীতি"। অর্থাৎ, চৈতন্যের সন্নিধির অর্থ এই যে, সর্ব্বভূতের সত্তা ও স্ফূর্ত্তির হেতুভূত বলিয়াই চৈতন্য, ভূতের সাক্ষী। এই অর্থ বেদান্ত-কথিত

* সামান্যাত্ম-ঘনাকাশ-সান্নিধ্যেরিত-শক্তিভিঃ। জায়তে লীয়তে ভূয়া ভূয়োহয়ং জগদঙ্কুরঃ।—সাংখ্যসারে বিজ্ঞান-ভিক্ষুঃ।

'সাক্ষী' ও সাংখ্যকথিত 'সাক্ষী'—উভয়ত্রই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন,—"ন হি দৃশা ব্যাপ্যত্বং বিনা জড়বর্গস্য ক্বাপি প্রবৃত্তিঃ" (গীতা, ১৩।১০)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর সাংখ্য-সারে আছে, "স্বামার্থে ভৃত্যাবৎ যস্মাৎ জড়বর্গঃ প্রবর্ত্ততে"—অর্থাৎ, পুরুষেরই জন্য প্রকৃতি ভৃত্যবৎ প্রবৃত্ত হয়; প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে তাহার নিজের কোনই প্রয়োজন নাই। পুরুষার্থই— জড়ের ক্রিয়ার হেতু-ভূত; এবং জড়,—পুরুষ হইতেই ক্রিয়ার প্রবৃত্তি পাইয়াছে। উপরি উদ্ধৃত স্থলগুলির ইহাই তাৎপর্য্য। "সংঘাতপরার্থত্বাৎ" এই সাংখ্য-কারিকোক্ত অংশেও এই তাৎপর্য্যই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যাহা সংহত পদার্থ—বহু উপাদান মিলনে উদ্ভূত—তাহা, সেই সংহত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র কোন অসংহত চেতন পদার্থের প্রয়োজন-সাধনার্থই মিলিত। শঙ্করাচার্য্যও নানাস্থানে এই যুক্তিরই অবধারণা করিয়াছেন*। চেতনেরই প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি। পাঠক তাহা হইলেই দেখুন্ যে, উপরি উক্ত যুক্তিগুলির তাৎপর্য্যই এই যে, জড়-প্রকৃতি প্রথমে চেতন হইতেই ক্রিয়া-প্রবৃত্তি পাইয়াছে; অথবা অন্য প্রকারে বলিতে গেলে, প্রকৃতি—পুরুষেরই শক্তিমাত্র। প্রকৃতি বা মায়া যে ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র, এ কথা বেদান্ত দর্শনে অতীব স্পষ্ট। মায়া ও ব্রহ্মে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার? শঙ্কর-ভাষ্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রত্নপ্রভা-কার আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "মায়া-ব্রহ্মণোস্তাদাত্ম্য-সম্বন্ধঃ"। (২।২।৩৮)।

---

* "অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতঃ,যৎ প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবদিতি সংহতানাং পরার্থত্বেন অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা। ...তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জন-সামর্থ্যং শ্রোত্রস্য চৈতন্যে হি...নিত্যেঽসংহতে সতি ভবতি, নাসতি"। কেনোপনিষদ্-ভাষ্য, ১।২।

মায়া ও ব্রহ্মের মধ্যে 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ। তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অর্থ কি? শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। "যৎ-স্বরূপ-ব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যস্য, তস্য 'তদাত্মত্ব' মেব লোকে দৃষ্টম্" (২।৪।৭)। মৃত্তিকার সত্তাকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটের সত্তা থাকে না। সুতরাং ঘট মৃত্তিকাত্মক। সুবর্ণের সত্তা ছাড়িয়া দিলে হার-বলয়াদির সত্তা থাকে না। সুতরাং হার-বলয়াদি সুবর্ণাত্মক। এইরূপ. ব্রহ্মের সত্তাকে ছাড়িয়া দিলে মায়ার সত্তা থাকে না। ব্রহ্মের সত্তাতেই মায়ার সত্তা; মায়ার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং মায়া ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মায়া বা প্রকৃতি, ব্রহ্মেরই শক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নহে। শঙ্করাচার্য্য অন্য প্রকারেও একথা বলিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টির প্রাক্কালের তিনি যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা একথা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মসত্তা—জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন এবং সেই সত্তায় ঈষৎ-ক্রিয়া-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল *, এই ক্রিয়াপ্রবৃত্তিই মায়া বা প্রকৃতি নামে পরিচিত। এই ক্রিয়া-প্রবৃত্তিই, পরে স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছিল †। এই স্পন্দনই ঘনীভূত হইয়া স্থূল বিশ্বাকারে ব্যক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের এই নির্দ্দেশানুসারে, মায়া বা প্রকৃতিকে আমরা ব্রহ্ম-সত্তারই প্রবৃত্ত্যুন্মুখ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং শঙ্কর-মতে মায়া বা প্রকৃতি—

---

* "প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতম্ অনিস্পন্দম্…সৎকার্য্যাভিমুখম্ ঈষদুপ-জাত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ"।—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৩।১৯।১।

† "ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দম্…অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্"। ছান্দোগ্য ভাষ্য, ৩।১৯।১।

ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র। এবং মায়া বা প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রবৃত্তি, ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ। এই জন্যই গীতাভাষ্যে শঙ্কর সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে—"নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-চৈতন্য নিজের চৈতন্য-শক্তি ও বলশক্তি দ্বারা এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন" *। এই জন্যই ঐতরেয়-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে—"নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই—জগতের বীজস্বরূপ 'অব্যক্ত-শক্তির' (মায়ার) প্রবর্ত্তক" †। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই,—মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র এবং প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রবৃত্তি ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে মায়া বা প্রকৃতির প্রথম ক্রিয়া-প্রবৃত্তি ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ। এই প্রকৃতির পরিণাম হইয়া যখন স্থূল বিশ্ব অভিব্যক্ত হইল, তখনও স্থূল জড় জগতের প্রত্যেক ক্রিয়া, আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই, এই তত্ত্বেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন আমরা তাহাই দেখিব। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, চেতন আত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই, অচেতন দেহও ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা, চেতন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চেতন আত্মা না থাকিলে, দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াই সম্ভব হইত না।

---

* "উত্তমঃ পুরুষঃ...অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাং...স্বকীয়য়া চৈতন্য-বল-শক্ত্যা আবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়ন্তি"। গীতাভাষ্য ১৫।১৭।

† "প্রত্যস্তমিত-সর্ব্বোপাধিবিশেষং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং...'অব্যাকৃত'-জগদ্বীজ প্রবর্ত্তকং'। ঐতঃ ভাষ্য; ৫।৩। আবার তিনি বলিয়াছেন যে—"যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তি-বীজং সর্ব্ববিশেষ-প্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্ব্রহ্ম ইতি বেদ চেৎ'। তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ব্রহ্মবল্লী।

সুতরাং আত্ম-চৈতন্যকেই দেহেন্দ্রিয়াদি জড়বর্গের মূল-প্রেরক বলা হইতেছে। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"পাণি-পাদাদয়ো জ্ঞেয়-শক্তি সদ্ভাব-নিমিত্ত-স্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবে লিঙ্গানি' (১৩।১৩)। আনন্দ-গিরি এই ভাষ্যের অর্থ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরো স্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্ম নিঃস্বরূপ বা শূন্য হইতে পারেন না। কি জানি কেহ যদি ব্রহ্মের সত্তাই অস্বীকার করে, এই জন্যই দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার মূল-প্রেরক রূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে' *। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-প্রবৃত্তি, আত্ম-চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। নির্ব্বিকার আত্ম-চৈতন্য, অবিকৃত থাকিয়া, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক এবং চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার অন্তরালে অবিকারি আত্ম-চৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশীল। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তজ্ জ্ঞেয়ং, ন তু সাক্ষাদেব জবনাদি-ক্রিয়াবত্ত্ব-প্রদর্শনার্থঃ' (গীতাভাষ্য, ১৩।১৪)। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে একস্থলে বলিয়া দিয়াছেন যে,—'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শনাদি-সামর্থ্য, ব্রহ্মশক্তির অধিষ্ঠান বশতঃই হইয়া থাকে'। "ব্রহ্মশক্ত্যাধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদি-সামর্থ্যম্" (বৃহ০, ভা০, ৪।৪।১৮)। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মূল-প্রেরক যে আত্ম-চৈতন্য—এসম্বন্ধে ঐতরেয়-উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যে এবং বৃহদা-রণ্যকের (৪।৩।২৩) ভাষ্যে উত্তম মীমাংসা আছে। এই সকল স্থলে, চক্ষু-

* 'সর্ব্ববিশেষ-রহিতস্য অবাঙ্মনসগোচরস্য ব্রহ্মণঃ শূন্যত্বে প্রাপ্তে, প্রত্যক্ত্বেন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্ত্যাদিহেতুত্বেন···সত্ত্বং দর্শয়ন্, দেহাদীনাং প্রবৃত্তি-মতাং প্রেক্ষাপূর্ব্বক-প্রবৃত্তিমত্ত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বম্'। শঙ্করাচার্য্যও বলেন—'চক্ষুরাদিব্যাপার দ্বারা অনুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানং ন বিষয়ভূতং যে বিদুঃ' (বৃহ০, ভা০, ৪।৪।১৮)॥

রাদি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-দর্শনাদি—ক্রিয়া অনিত্য ও বিকারী; কিন্তু আত্মার দর্শন-শক্তি নিত্য ও নির্ব্বিকার,—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে *। এই সকল স্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, চক্ষুরাদির দর্শনাদি ক্রিয়া, মূলতঃ আত্ম-চৈতন্ত দ্বারাই প্রেরিত এবং আত্ম-চৈতন্যেরই প্রয়োজন সাধনার্থ। এই জন্যই শ্রুতিতে আত্ম-চৈতন্যকে 'চক্ষুর চক্ষুঃ', শ্রোত্রের শ্রোত্র' "মনের মন"—প্রভৃতি ভাবে সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। "রূপ-প্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং তদাত্মচৈতন্যাধিষ্ঠিতমেব"—শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার উক্তির অর্থই এই যে, অনিত্য ও বিকারী সমুদয় ক্রিয়াই, তাহার অন্তরালবর্ত্তী নির্ব্বিকার শক্তি-দ্বারাই প্রেরিত। সাংখ্যকারিকার "পুরুষোঽস্তি... অধিষ্ঠানাৎ"—এই কথা এবং শঙ্করোক্তি,—উভয়ই সেই একই তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছে। লোকে না বুঝিয়া পুরুষ বা ব্রহ্মকে উদাসীন বলিয়া মনে করে!! ফলতঃ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আত্ম চৈতন্যই সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বর্গের প্রযোক্তা বা প্রেরক। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন—'সংঘাতব্যতিরিক্তস্য স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব মন-আদি-প্রেরয়িতৃত্বম্" (কেন ভাষ্য)। বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় রত্নপ্রভাও আমাদিগকে বলিয়াছেন "স্বাতন্ত্র্যং নাম স্বেতর-কারক-প্রযোক্তৃত্বে সতি

---

* দ্বে দৃষ্টী; এবংহ্যেব চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টিঃ নিত্যা চ আত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী; শ্রোত্রস্য অনিত্যা, নিত্যা আত্ম-স্বরূপস্য। আলোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুষ স্তিমিরাগমাপায়য়ো র্নষ্টা দৃষ্টি র্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষুর্দৃষ্টেরনিত্যত্বং. তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনাং। আত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে; বদতি হি উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট' ইতি॥ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'উষস্তের প্রশ্ন' দেখ।

কারকাপ্রের্য্যত্বম্'' (২।৩।৩৭)॥ শ্রীমৎবিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্য-দর্শনের ২।২৯ সূত্রের ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শঙ্করোক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি বলিয়াছেন—"কর্তৃত্বঞ্চাত্র কারক-চক্র-প্রযোক্তৃত্বং, করণত্বং ক্রিয়া-সাধকতমত্বং কুঠারাদিবৎ। কারকচক্র-প্রযোক্তৃতাশক্তে রাত্মস্বরূপতয়া দ্রষ্টৃত্বাদিক-মাত্মনো নিত্যমেব"। আত্মাই, কারকচক্রের (ইন্দ্রিয়-বর্গের) প্রযোক্তা। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, আত্মাই কর্ত্তা; ইন্দ্রিয়বর্গ করণমাত্র। যত কিছু জড়ীয় ক্রিয়ার সাধক, তৎসমস্তেরই মূল-প্রেরক আত্ম-চৈতন্য। জড়বর্গের ক্রিয়া—চেতনেরই প্রেরণা-সম্ভূত। ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর কি হইতে পারে? না বুঝিয়া লোকে বলে যে সাংখ্যে প্রকৃতি স্বাধীনা এবং সাংখ্যের পুরুষ নিতান্তই উদাসীন!! আমরা এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই পাইতেছি যে, প্রকৃতি যখন বিশ্বাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইয়াছিল, তখনকার প্রকৃতির সেই ক্রিয়াস্রোত ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ; আবার যখন এই স্থূল বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে, তখনও জড়ীয় সকল প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার অন্তরালে সেই নির্ব্বিকার ব্রহ্মশক্তিই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-পদার্থকে 'সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং সর্ব্বৈরভ্যুপ-গমাত্তে,...বাহ্যপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমানত্বাৎ" *। ব্রহ্মশক্তির স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া লোকে, জড়ীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলিকেই কেবল ধরিয়া লয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, জড়ীয় প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিকার ব্রহ্মশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জড়ীয় বিকারি ক্রিয়াগুলি, সেই নির্ব্বিকার শক্তিদ্বারাই প্রেরিত এবং ইহারা সেই শক্তিরই পরিচায়ক। এই জগৎ—ব্রহ্ম-স্বরূপেরই পরিচায়ক চিহ্নমাত্র; ব্রহ্ম-স্বরূপের

---

* গীতা-ভাষ্য, ১৮।৫০।

বিকাশ ও পরিচয় প্রদানের জন্যই এই সৃষ্ট জগৎ ক্রিয়া করিতেছে; নতুবা ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।*

এইরূপে, আমরা শত শত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে, জড়বর্গের ক্রিয়ার মূল-বীজ ব্রহ্মই। এইরূপ বুদ্ধ্যাদির যে জ্ঞান, তাহারও মূল বীজ ব্রহ্ম। প্রকৃতি জড়; বুদ্ধ্যাদি তাহারই বিকৃত অবস্থা। জড়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। জড়ের সংসর্গবশতঃ একই নিত্য অবিকারী জ্ঞানের নানারূপ অবস্থান্তর বা বিকাশের তারতম্য প্রতীত হয়,—ইহা বলাই সাংখ্য ও বেদান্তের অভিপ্রায়। এই জন্যই ভৌতিক-বিকারের শব্দ-স্পর্শাদি-সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; শব্দ-স্পর্শাদিজ্ঞান কদাপি জড়-প্রকৃতিতে থাকিতে পারে না; কেননা জ্ঞান ও জড় একান্ত ভিন্ন পদার্থ। অতএব, শব্দ স্পর্শ রূপ-রসাদি,—প্রকৃতি বা ভূতের সংসর্গে জ্ঞানেরই বিকাশের তারতম্য মাত্র †। সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্বন্ধেও একথা খাটে। জ্ঞান ও ভোগ,—উভয়ই চেতনের। জ্ঞান ও ভোগের যে বিবিধ

---

* "কার্য্যেণ লিঙ্গেন কারণ-ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বং সৃষ্টিশ্রুতীনামুক্তম্"। রত্নপ্রভা, ১।৪।১৪। "ব্রহ্মণো জগদাকার-পরিণামিত্বাদি ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে...নতু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে"।—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪॥ এ জগৎ—কার্য্য। ব্রহ্মই ইহার কারণ। কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তাই অনুস্যূত; কারণ সত্তাতেই কার্য্যের সত্তা। কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং এই কার্য্য জগৎ—ইহার কারণ-ব্রহ্মেরই তত্ত্ব প্রদান করে। "পরমাত্মৈকত্ব প্রত্যয় দ্রঢ়িম্নে উৎপত্তিস্থিতিলয়-প্রতিপাদকানি বাক্যানি"। বৃহঃ ভাঃ, ২।১।২০॥ "অজাতশত্রু ও বালাকির উপাখ্যান" দেখ।

† "ন কেবল জড়বৃত্তি র্জ্ঞান শব্দার্থঃ, কিন্তু সাক্ষিবোধবিশিষ্টা বৃত্তিঃ, বৃত্তি-ব্যক্ত-বোধো বা জ্ঞানম্"—রত্ন-প্রভা, ১।১।৫

রূপান্তর হয়, তাহা জড়ের সন্নিধা জন্যই।' জড় ও চেতনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বশতঃই জ্ঞান ও ভোগের অবস্থান্তর সাধিত হয়; হিন্দু-দর্শনের একথা বড়ই সুস্পষ্ট। তবেই প্রকৃতি-কৃত জ্ঞান ও ভোগের তারতম্য ব্রহ্ম-চৈতন্যেই মূলতঃ পর্য্যবসিত। "জ্ঞাত্মামীতাদিঅবগতিনিষ্ঠা অবগতিরবসানঃ" গীতা; শঙ্করভাষ্য, ৯।১০)। সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি সেই মূলজ্ঞানেই পর্যাবসিত হয়। সকল বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তিস্থান আত্মাই। আবার,—"সর্ব্বসাক্ষীভূত-চৈতন্যমাত্রত্বান্নচান্যো ভোক্তা চেতনান্তরাভাবাৎ"—চেতন ভিন্ন প্রকৃত ভোক্তা আর কে হইবে? সুতরাং সুখ-দুঃখাদির ভোগ আত্মাতেই পর্য্যবসিত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, খণ্ড খণ্ড যাবতীয় জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদির ভোগ, সেই আত্ম-চৈতন্যেরই *। "ভোগশ্চিদবসানঃ"—এই সাংখ্য-সূত্রও এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন। আবার দেখা যায়,—"ননু প্রবৃত্তীনাং "ফলাবসায়িতয়া" সুখদুঃখয়োরন্যতরার্থত্বান্ন স্বার্থং তত্রাহ;—প্রবৃত্তীনাং সুখ-দুঃখার্থত্বেঽপি তয়োঃ স্বার্থত্বাৎ সিদ্ধেরর্থিত্বেনাত্মা সিধ্যতি" (আনন্দগিরি, গীতা, ১৮।৫০)। সুখ-প্রাপ্তির জন্য বা দুঃখপরিহারার্থই, সমুদয় প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয়; অতএব প্রবৃত্তি-গুলি নিজেরই জন্য প্রবৃত্ত হয়, একথা বলা

* "শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাং ব্যাপারেণ॥ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়-লক্ষণেন "ফলাবসানলিঙ্গেন" অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা" (কেনোপনিষদ্, শাঙ্কর-ভাষ্য)। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারগুলি যে আত্মাতেই 'পর্য্যবসিত,' আত্ম-চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত, তাহা সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। "নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ...সর্ব্ববিষয়বিশেষাঃ চৈতন্যাত্মগ্রস্তাইব...বিভাব্যন্তে ইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে"। (গীতাভাষ্য, ১৩।২২)।

সঙ্গত হইতে পারে না ; অথবা তাহারা দেহাদি অচেতন-পদার্থের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, তাহারা আত্মার জন্যই প্রবৃত্ত হয় এবং উহারা আত্মাতেই পর্য্যবসিত। অতএব ভোগেরও মূল আত্ম-চৈতন্যই দাঁড়াইতেছেন। গীতার ১৩।১২ শ্লোকের ভাষ্যেও ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই স্বরূপতঃ ভোক্তারূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, জ্ঞান, শক্তি ও ভোগ, এই তিনই মূলতঃ ব্রহ্ম বা চৈতন্য হইতেই আসিয়াছে। অথবা অন্য প্রকারে বলিতে গেলে,—এক অখণ্ড নিত্য-জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই, সংসারে জড়-সংসর্গে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, ক্রিয়া ও সুখ দুঃখাদি দেখা যাইতেছে। প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নের তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য দীর্ঘ বিচার দ্বারা মূলতঃ ব্রহ্মকেই কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

তবে যে নানাস্থানে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং নানাস্থানে তাঁহাকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন বলা হইয়াছে,—তাহার কারণ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়া আসিয়াছি। এ নিষেধের তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, ব্রহ্ম শূন্য পদার্থ বা ব্রহ্ম নিঃস্বরূপ বা ব্রহ্ম শক্ত্যাদি-শূন্য। সে নিষেধের ইহা অভিপ্রায় নহে যে, তিনি শক্তি, জ্ঞান ও ভাবাদির মূল-বীজ নহেন। হিন্দু-দর্শনের সেরূপ তাৎপর্য্য নহে। ইহা না বুঝিয়া অনেকে ব্রহ্ম-চৈতন্যকে নিতান্ত নিষ্ক্রিয়, শূন্য স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং প্রকৃতির সহিত সর্ব্ব-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন *। আমরা ভাষ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া যেরূপ তাৎপর্য্য

* "নহি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতে (গীতাভাষ্য ৯।৪)।" "সদাস্পদং হি সর্ব্বং, সর্ব্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমাৎ ; ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্তি" (গীতাভাষ্য, ১৩।১৪)।

দেখাইলাম, তাহা হইতে সহৃদয় পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে,—ব্রহ্ম নিঃস্বরূপ, শূন্য পদার্থ নহেন। সমুদয় জ্ঞান, শক্তি, সুখাদির তিনিই মূল-কারণ; ইহারা তাঁহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-শক্তি পূর্ণানন্দ স্বরূপ। "সর্ব্বাত্মত্বাৎ তস্য পরিপূর্ণতা" এবং "ব্রহ্ম-সম্পত্তির্নাম পূর্ণত্বেনাভিব্যক্তিঃ অপূর্ণত্বহেতোঃ সর্ব্বস্যাত্মসাৎ কৃতত্বাৎ (আনন্দগিরিঃ, গীতা)। তবে ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্বাদি নিষিদ্ধ হইল কেন? ব্রহ্মে তবে কিরূপ কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে? ভাষ্যেই তাহার উত্তর আছে।

তুমি, আমি যেমন কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আত্ম-শক্তির স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, ক্রিয়া-ব্যাপৃত রূপে প্রবৃত্ত হই; পরম-কারণ ব্রহ্মের ক্রিয়া-শক্তি সেরূপ হইতে পারে না। কার্য্য-ব্যাপৃতত্তা নিবারণের উদ্দেশে ও বিকার নিষেধ করিবার জন্যই, ব্রহ্মের "কর্ত্তৃত্ব" অস্বীকৃত হইয়াছে। আত্ম-চৈতন্যই, বিশেষ বিশেষ জড়ীয় ক্রিয়ার মূল-প্রেরক এবং বিশেষ বিশেষ জড়ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-শক্তি নির্ব্বিকাররূপে বর্ত্তমান। আমরা ক্রিয়ার সময়ে আত্ম-শক্তির এই স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া যাই। ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি যে সেই নির্ব্বিকার আত্ম-শক্তিরই পরিচায়ক, উহারই প্রকাশক মাত্র, তাহা ভুলিয়া যাই। "যত্তু শাস্ত্রেষু পুরুষে দর্শনাদিকর্ত্তৃত্বং নিষিধ্যতে, তদনুকূলকৃতিমত্ত্বং তত্তৎক্রিয়া-বত্ত্বং বা" (বিজ্ঞান-ভিক্ষু, সাংখ্যদর্শন, ২।২৯)। আবার তিনি সেই স্থলেই বলিয়াছেন, "কারকচক্র-প্রযোক্তৃতাশক্তে রাত্ম-স্বরূপতয়া দ্রষ্টৃত্বাদিকমাত্মনো নিত্যমেব"। শঙ্করাচার্য্যও ঠিক্ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, "স্বব্যাপারাদৃতে সন্নিধিরেব কর্ত্তৃত্বম্"। শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই আছে;—"নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"। আনন্দগিরি ছান্দোগ্য-ভাষ্যটীকায় বলিয়াছেন,—"আত্মনঃ সত্তামাত্র এব জ্ঞানকর্ত্তৃত্বং, নতু ব্যাপৃততয়া"। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ ক্রিয়ার

সহিত ব্যাপৃত হইয়া কার্য্য করি, আত্ম-শক্তির স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যাই, ব্রহ্মে তাদৃশ মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা, কারণ-শক্তিরূপে তাঁহার যে মূল কর্ত্তৃত্ব তাহা কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই; সে কর্ত্তৃত্বকে সর্ব্বত্রই নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বক্রিয়ার কারণ-বীজ বলিয়া, সাধারণ-ভাবে তিনি সর্ব্ব-ক্রিয়ার প্রেরক; * বিশেষ বিশেষ (Phenomenal) ক্রিয়ার—পরিবর্ত্তনের—কর্ত্রী প্রকৃতিই। অর্থাৎ, মূলে প্রকৃতিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া ক্রিয়া করিয়া যাইবে। সেই মূল-শক্তির বীজ ব্রহ্মই †। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ বিচারটী বুঝিয়া দেখিলে, ইহা আরও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া যাইবে। সে স্থলের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, রাজা ও সেনাপতিগণ স্বয়ং যুদ্ধাদি ক্রিয়া না করিলেও, ধনদানাদি ও আদেশাদি দ্বারা ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন; ইহা গৌণক্রিয়া। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ায় আত্মার সেইরূপ গৌণ-কর্ত্তৃত্ব আছে; আত্মার এই গৌণকর্ত্তৃত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। কেবল ক্রিয়ার ব্যাপক-রূপে—সেই সেই ক্রিয়ার কারকরূপে—মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব মাত্র সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যখনই কোন কার্য্য করি, তখনই বাসনা-বশে চালিত হই; কার্য্যের ফলকামনা উদ্দেশ্য থাকে, এবং

---

* "সর্ব্ববিকার-কারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপপত্তেঃ"—শঙ্কর। 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' এই সকল শ্রুতিতেও নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। "আত্মনো নিত্যত্বমুপপদ্যতে বিক্রিয়াভাবে। বিক্রিয়াবচ্চ নিত্যমিতিচ বিপ্রতিষিদ্ধম্"। বৃ০ ভা০, উষস্ত-প্রশ্নোত্তর।

† "প্রকৃতি র্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা গর্ভাধানকর্ত্তা" (গীতা, শঙ্করভাষ্য, ১৪।৪)।

তৎসম্পাদনে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যের অপেক্ষা থাকে ; কেবল এইরূপ কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ব্রহ্মে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকেও বিকারী—পরিণামী—বলিতে হয়, ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। আনন্দগিরির কথা এই,—"মিথ্যা-জ্ঞানং নিমিত্তং কৃত্বা, কিঞ্চিদিষ্টং কিঞ্চিদনিষ্টমিত্যারোপ্য, তদ্দ্বারাঽনুভূতে প্রেপ্সা-জিহাসাভ্যাং ক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্যতয়া ইষ্টমনিষ্টঞ্চ ফলং ভুক্তং, তেন সংস্কারেণ তৎপূর্ব্বিকাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ স্বাত্মনি ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তীতি যুক্তং কর্ত্তৃত্বস্য মিথ্যাত্বম্"। আমরা এই প্রকারে বাসনা, সংস্কার ও কলচালিত হইয়া, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের আশায়, ক্রিয়া করিয়া থাকি ; এইরূপ কর্ত্তৃত্ব সুতরাং বিকারী ও অনিত্য। আবার,—"সংঘাতেঽহংমমাভিমানদ্বারা অহংকরোমীতি আত্মনো মিথ্যাধীপূর্ব্বিকা কর্ম্মণি প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, তেন অবিদ্যা-পূর্ব্বকত্বং তস্য যুক্তম্"। 'আমার', 'আমি,' এই অহং-মমাভিমান বশতঃই আমাদের ক্রিয়া চালিত ও সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃই শাস্ত্রে বারংবার আত্ম-কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। "নায়ং হন্তি ন হন্যতে ইত্যাদৌ আত্মাঽবিক্রিয়ত্বে তাৎপর্য্যম্"। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আত্মার সাধারণ কর্ত্তৃত্ব বা মূল-কর্ত্তৃত্ব কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। যদি মূল-কর্ত্তৃত্বই নিষিদ্ধ হইবে, তবে আর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া ব্রহ্মকে জগৎ-সৃষ্টির মূল-কারণ রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইত না *। কেবল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার পরিণামি-কর্ত্তৃত্বই তাঁহার

* রত্নপ্রভা—টীকাকারও শঙ্কর-ভাষ্যের এই গূঢ়ার্থই বলিয়া দিয়াছেন —"অস্মাকন্তু অপৌরুষেয়তয়া...শ্রুত্যা ভবত্যেব লৌকিককর্ত্তৃবিপরীতাদ্বিতীয় "কর্ত্ত্রুপাদানাত্মকসর্ব্বজ্ঞনির্দ্দোষেশ্বরনির্ণয়" বেঃ দঃ ২।২।৭৩। লৌকিক বিকারি কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে স্বীকৃত হয় নাই, এইমাত্র। "প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং...প্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণা-

নিষিদ্ধ হইয়াছে। শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্বন্ধেও এই কথাই বুঝিতে হইবে। তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রহ্মেরই আনন্দ, এ জগতে অনন্ত প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া সুখ-দুঃখাদি বিবিধ আকার ধারণ করিয়া ক্রমে উন্নততর বিকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; আবার তাঁহারই শক্তি, নানাভাবে ও বিবিধ আকারে বিকাশিত হইয়া সেই মহাশক্তিরই পরিচয় দিবার জন্য ধাবিত হইয়া চলিয়াছে; এবং তাঁহারই জ্ঞান,—এ বিশ্বে শব্দ-স্পর্শাদির আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে *। প্রকৃতি, সেই অভিব্যক্তির দ্বারমাত্র, সেই বিকাশের উপায় মাত্র। এই প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণত না হইলে, এবং বিষয়াকারে দেখা না দিলে,—আমরা ব্রহ্মের স্বরূপই বুঝিতে পারিতাম না। ("পরমানন্দস্যৈব বিষয়-বিষয়্যাকারেণ মাত্রাঃ প্রসৃতাঃ"—শঙ্কর)। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্যের কোন পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইতাম না †। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—"আত্মা-

---

ব্যাকৃত জগদ্বীজ-প্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামি-সংজ্ঞং ভবতি"—শঙ্কর ঐতরেয় ভাষ্য, ৫।৩ এস্থলে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই, জগদ্বীজের (প্রাণশক্তি, অব্যক্ত) প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে।

* আত্মনঃ কূটস্থ-নিত্যৈকরূপস্যাপি উত্তরোত্তরমাবিষ্কৃত তারতম্যোনাশ্চর্য্যশক্তি বিশেষাঃ শ্রূয়ন্তে—বেঃ ভাঃ ১।১।১১।

† "ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্ম-দর্শনাদেব ফল-সিদ্ধৌ (মোক্ষ-সিদ্ধৌ) সত্যাং, যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার পরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্ম-দর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে,—ফলবৎ সন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ, নতু স্বতন্ত্র-ফলায় কল্প্যতে। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্য ২।১।১৪ 'কার্য্যেণ লিঙ্গেন কারণ-ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বং সৃষ্টি-শ্রুতীনাং উক্তং" রত্নপ্রভা ১।৪।১৪। কার্য্য-

বগত্যবসানার্গাচ্ছ সর্ব্ববাবহারস্ত" (গীতা, ১৮।৫০)। হিন্দু-দর্শন এই মহাতাৎপর্য্য, আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দু-দর্শনের এই তাৎপর্য্য, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

সগুণভাব বিকারী ও ক্রমবিকাশশীল; * এই সগুণভাব নির্গুণভাবেরই স্বরূপ বিকাশের জন্য, পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মে কোন শক্তি ছিল না বা স্তম্ভিত আছে এবং শক্তি পরে আসিয়াছে,—শঙ্করাচার্য্যের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। সগুণে;—সেই নির্গুণেরই স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকের ভাষ্যে যে বৈশেষিক-মতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নির্গুণ—সগুণ—উভয়ই। নির্গুণভাব পূর্ণ ও অনন্ত; সগুণভাব অপূর্ণ ও ক্রম-পরিণামশীল। কিন্তু অপূর্ণভাব পূর্ণভাবে আরোহণ * করিবার সেতু; অথবা এই অপূর্ণভাব পূর্ণতার দিকেই ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

এই ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ হইতে আমরা এই সকল উপদেশ পাইয়াছি—

১। এই দেহেই আত্মা আছেন।

২। দেহের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা।

৩। এই তিন অবস্থার সহিত সংসর্গ বশতঃই আত্মাকে, দেহাদির সঙ্গে

বর্গ—কারণ-সত্তারই লিঙ্গ বা পরিচায়ক মাত্র। ইহারা তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

* "ব্রহ্মসংপত্তির্নাম পূর্ণত্বেনাভিব্যক্তিরপূর্ণত্বহেতোঃ সর্ব্বস্যাত্মসাৎ কৃতত্বাৎ"।—আনন্দগিরি।

লিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এই তিন অবস্থায়, একই আত্মা অবস্থিত থাকেন।

৪। এই তিন অবস্থার অতীত আত্মার আর একটী অবস্থা আছে; সে অবস্থায় আত্মা সর্ব্বাতীত, অসঙ্গ, উদাসীন।

৫। ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আত্মা—জ্ঞান-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ।

৬। ইন্দ্রিয়গুলি ও অন্তঃকরণ এই আত্মার জ্ঞান-প্রকাশক ও ক্রিয়া-নির্ব্বাহক যন্ত্র বা দ্বারমাত্র।

৭। এক অন্তঃকরণ-শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণশক্তি আবার আত্মারই সামর্থ্য-মাত্র।

৮। আত্ম-চৈতন্য ব্যতিরেকে,—ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহে।

৯। অন্তঃকরণ—আত্মার নিত্যজ্ঞান, নিত্যশক্তি ও নিত্যানন্দের অভিব্যঞ্জক। ইহা অপূর্ণ হইলেও, সেই পূর্ণেরই স্বরূপ-পরিচায়ক চিহ্ন-রূপে অবস্থিত আছে। বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণে সেই পূর্ণ-স্বরূপকে বুঝা যায়।
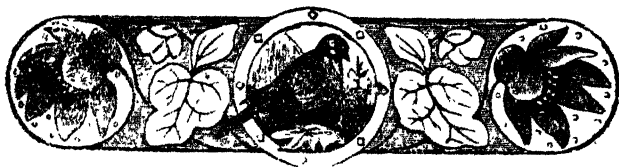
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সংবর্গ-বিদ্যা।)

পুরাকালে জানশ্রুতি নামক একজন দানশীল নরপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র বড় বড় পান্থশালা স্থাপন করিয়া, পথিকদিগের যাঁহাতে কোন ক্লেশ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল পান্থশালা সর্ব্বদা ভোজন-সামগ্রীতে পূর্ণ থাকিত এবং যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেই বিনা আয়াসে ভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া তৃপ্ত হইত। এইরূপে ইঁহার নাম ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বহির্ভাগেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কুসুমের সুরভি যেমন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তপনের প্রভা যেমন সকল বস্তু বিভাসিত করিয়া আপন গৌরবে প্রদীপ্ত থাকে, ইঁহারও কীর্ত্তি-রাশি তদ্রূপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

জানশ্রুতি একদা রজনীতে শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি একটী বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটী বিচিত্র সরোবরের তীরে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, দুগ্ধের ন্যায় অতি শুভ্রবর্ণ একদল হংস সেই সরোবরের জলে উড়িয়া পড়িল। তাঁহার বোধ হইল যেন, একটী হংস অপর একটী হংসকে বলিল,—"দেখ ভাই! আমাদের ভূপতি জানশ্রুতি নানাবিধ দানাদি কার্য্যে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন; তাঁহার রচিত বৃহৎ বৃহৎ পান্থ—নিবাস দেশে দেশে আকাশ-ভেদ করিয়া সগর্ব্বে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র রৈক্কের গুণ ও মহিমার কীর্ত্তি, এই প্রতাপশালী রাজার কীর্ত্তিকেও আচ্ছাদিত করিয়াছে"। অন্য হংসগুলিও, একথার অনুমোদন করিল।

রাজা, রজনীর এই বিচিত্র স্বপ্নের কথা, পরদিন প্রাতঃকালে, তাঁহার সভাসদ ও কর্ম্মচারী-বর্গের নিকটে প্রকাশ করিলেন, এবং কুতূহল-পরবশ হইয়া, তাঁহার রাজ্যে রৈক্ক নামক কোন ব্যক্তি বাস করেন কি না, তাহা জানিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার নিয়োজিত পুরুষেরা প্রথম কয়েকদিন কোন অনুসন্ধানেই রৈক্কের কোন সন্ধান পাইল না। হঠাৎ একদিন একটা নির্জ্জন পল্লীর প্রান্তদেশে কতকগুলি লোক শকট নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নিতান্ত কুৎসিত-দেহ পুরুষ রৈক্ক বলিয়া আপন পরিচয় দিল। রাজার লোকেরা এই রৈক্কের আকার-প্রকার এবং কোথায় তাহারা তাহাকে দেখিয়াছে তাহা

রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজা স্বয়ং নানাবিধ ধন, গাভী ও অন্যান্য উপহার সঙ্গে করিয়া, রৈক্ক যে স্থলে বাস করিতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎসমীপে উপহার-দ্রব্যাদি রাখিয়া তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলি-লেন—"মহাশয়! আপনারই নাম কি রৈক্ক? এই আমি বিবিধ রত্ন, মহামূল্য যান-বাহন ও দ্রব্য-সম্ভার আনিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এইগুলি গ্রহণ করুন্ ও মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করেন, তাহা আমাকে বলিয়া দিন্"।

রৈক্ক রাজাকে ধন-সমৃদ্ধির গৌরব করিতে দেখিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন * যে, তিনি বিত্ত-লোভে আকৃষ্ট নহেন; ইচ্ছা করিলে রাজা তাঁহার আনীত ধনাদি অনায়াসে ফিরিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

রাজা জানশ্রুতি বিষণ্ণ-চিত্তে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রৈক্ককে একজন মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা জন্মিল।

---

* এইস্থলে রৈক্ক,—রাজাকে "শূদ্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার এই শূদ্র-শব্দের অন্য কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু বোধ হয় যে, জানশ্রুতি শূদ্র-জাতীয় রাজা ছিলেন। বিশেষতঃ, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, বেদান্ত-দর্শনের একটী সূত্রে, সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের লোকেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তখন শূদ্র শব্দের অন্যার্থ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ হয় না।

তৎকালে, ভারতীয় লোকেরা সর্ব্বদা ব্রহ্ম-বিষয়ক চিন্তাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহারা তদ্বিষয়ক উপদেশ পাইবার জন্য উৎসুক থাকিতেন। জানশ্রুতি তাই রৈক্বের কথা ভুলিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়টী বাস্তবিকই সত্য হইল বলিয়া, রৈক্বকে তিনি একরূপ দৈব-প্রেরিত উপদেষ্টা বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলেন। তাই, আর একদিন আরও অধিকতর উপহারের দ্রব্য লইয়া এবং আপন দুহিতাটীকে সঙ্গে করিয়া, রৈক্বের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অতিশয় বিনীতভাবে আজ রাজা জানশ্রুতি রৈক্বের নিকটে উপস্থিত; আপন দুহিতাটীকে রৈক্বের সহিত বিবাহ দিবার জন্যও আজ লালায়িত। রৈক্ব দেখিলেন, জানশ্রুতির দুহিতার প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মে এমন একটু কমনীয় লজ্জা ও বিনয়ের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, যাহার তুলনা এ পৃথিবীর অতি অল্পস্থলেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, রৈক্ব দরিদ্র, রৈক্ব কুৎসিত; রৈক্ব কোন বিশেষ আশ্রম ভুক্ত নহেন। এ সকল কথা জানিয়াও জানশ্রুতির দুহিতা, পিতার আদেশে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এরূপ আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত নরলোকে, অতি অল্পই পাওয়া গিয়া থাকে। তাই, আজ রৈক্ব, সেই রাজ-কন্যার অভিমান-শূন্যতার জন্যই, আর রাজাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। রাজাকে, তিনি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। রৈক্ব বলিলেন,—

"মহারাজ! বাহিরে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই তিরোধান-স্থান একমাত্র বায়ু, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। এই জন্য বায়ুকে সংবর্গ বলা যাইতে পারে; কেননা বায়ুই ইহাদিগকে গ্রাস করে,—ইহাদিগকে আত্মসাৎ করে। অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, তখন অগ্নি বায়ুতেই গমন করে। চন্দ্র ও সূর্য্য যখন অস্তগমন করে, তখন তাহারা বায়ুতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। জল, যখন অগ্ন্যাদি-উত্তাপ-সংযোগে বাষ্পাকার ধারণ করে, তখন জলও সেই বায়ুতেই পরিণত হইয়া যায়। অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া, চন্দ্র সূর্য্যের অস্তগমন এবং জলের বাষ্পাকার-ধারণ,—এগুলি সমস্তই চলনাত্মক ক্রিয়ামাত্র। অথবা, প্রলয়কালে যখন চন্দ্র-সূর্য্যাদি পদার্থ তেজোরূপে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন সেই তেজঃও বায়ুতেই পরিণত হইয়া যাইবে। বায়ু স্পন্দনাত্মক। তেজঃ,—সেই স্পন্দনেরই অবস্থান্তর মাত্র। অতএব চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল,—এ সকলই স্পন্দনাত্মক বায়ুরই পরিণাম। এক স্পন্দন-ক্রিয়ারই তারতম্যে তেজঃ ও জলাদির আবির্ভাব।

আবার দেখুন, প্রাণ-শক্তিই,—আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তির একমাত্র তিরোধান-স্থান। প্রাণশক্তিই,—দেহের ক্রিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মনুষ্য যখন নিদ্রা যায়, তখন দর্শনশক্তি (চক্ষুরিন্দ্রিয়), শ্রবণশক্তি (কর্ণেন্দ্রিয়), মনঃশক্তি ও বাক্‌শক্তি,—এ সকলই সেই প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া অবস্থান করে। সকল ক্রিয়ার মূল এই প্রাণ-শক্তি। প্রাণ-শক্তি স্পন্দনা-

ত্মক। সেই স্পন্দনেরই তারতম্যে, চক্ষুরাদি-ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়,—সেই এক স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।

অতএব মহারাজ! * আধিদৈবিক বায়ু ও আধ্যাত্মিক প্রাণ,—এই দুইটীই 'সংবর্গ' *।

স্বরূপ বিচার করিলে, আধিদৈবিক সকল পদার্থই এক সাধারণ স্পন্দনক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং আধ্যাত্মিক সকল ঐন্দ্রিয়িক-ক্রিয়াই সেই এক সাধারণ স্পন্দন-ক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কেননা, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল বস্তুতেই সেই এক স্পন্দনই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সকল বস্তুই ক্রিয়াত্মক, স্পন্দনেরই ঘনীভূত অবস্থা। সুতরাং স্পন্দনশক্তি হইতে উহারা আত্মলাভ করিয়াছে। কোন বস্তু-কেই, স্পন্দন হইতে পৃথক্ করিয়া লইবার—স্পন্দন হইতে ব্যতিরিক্ত-ভাবে গ্রহণ করিবার—ক্ষমতা আমাদের নাই। যেমন ঘটটী মৃত্তিকাময়,—মৃদাত্মক; সুতরাং ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায় না। কার্য্যকে, উহার কারণ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। আবার দেখুন,—আধ্যা-ত্মিক প্রাণ এবং আধিদৈবিক বায়ু, এ উভয়ই এক; কেননা, উভয়ই স্পন্দনাত্মক। অতএব আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক

* বায়ুঃ স্থাবর-জঙ্গমানাং ভূতানামন্তরাত্মা বহিশ্চ সএব। তস্মাৎ অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈব-ভাবেন বিবিধা যা ব্যাপ্তিঃ স বায়ুরেব। তথা কেবলেন সূত্রাত্মনা বায়ুরেব"।—বৃহৎভা°, ৫।৩.২।

পদার্থ সমূহ, এক স্পন্দন হইতেই জন্মিয়াছে। এক স্পন্দন-শক্তিই—নানাভাবে ও নানা আকারে সকল পদার্থরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে *। ইহা ব্রহ্মশক্তি †। এইরূপে সকল পদার্থে ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। নতুবা আন্তর ও বাহ্য পদার্থ-গুলিকে পৃথক্ পৃথক্, এক একটী ভিন্ন বস্তুরূপে ধরিয়া লওয়া অবিদ্যার কার্য্য,—অজ্ঞানতার ফল। এইরূপে একাত্ম-

---

* Compare :..."We find a progressive reduction of differences ;...sound, light, heat, electricity transformed from mere qualitative distinctions into varieties of *Motion* ;...several kinds of force are capable of passing into each other, and in their apparent contrast are only modes of the same." "The scientific observer regards the *objects* as individualizations of the *powers* in the course of their history. The individual that presses upon sense is but the phenomenal meeting-point or the show-place of permanent and universal powers."—Martineau.

"বায়োঃ প্রাণস্যচ পরিস্পন্দাত্মকত্বং...আধ্যাত্মিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ অনুবর্ত্তামানম্"—বৃ০ভা০, ॥

† "তৎসর্ব্বং যৎ 'সূত্র' মাচক্ষতে, তৎসূত্রং......যদেতৎ ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকং জগৎ অব্যাকৃতাকাশে বর্ত্ততে উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়েচ"। বৃহ০ ভা০ ৫৮।৪ [নামরূপের বীজ-স্বরূপ অব্যক্ত-শক্তিকেই 'আকাশ' বলে। "কচিৎ আকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ···মায়াশক্তিরিতি"—ইত্যাদি—বেদান্ত-ভাষ্য দেখ]

বোধ জন্মিলে, তবে বিষয়-বৈরাগ্যবলে ক্রমে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষয়িক প্রবৃত্তি ও বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত কামনার পরিবর্ত্তে, ব্রহ্মবিষয়িণী কামনা না জন্মাইতে পারিলে, অবিদ্যা ও কামনার উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সমস্ত বাহ্য ও আন্তর বিষয়গুলিকে যিনি ব্রহ্ম-শক্তিরূপে ধারণা করিতে না পারেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মবিষয়িনী কামনা জন্মিতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা প্রতি পদার্থকে প্রাণ-শক্তির বিকাশ-রূপেই মনে করিয়া লইতে হইবে। এই ভাবে ভাবনা করিলে ভেদ-দৃষ্টি ঘুচিয়া যায় এবং অভেদ-দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্রিয়-গুলি সকলই,—ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার; পদার্থমাত্রই, তাঁহারই উপলব্ধির হেতু। সকল পদার্থে, সকল ইন্দ্রিয়ে, এইভাবে একত্ব-দর্শন করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! সংবর্গ-বিদ্যার উদ্দেশ্য এই।

মহারাজ! পুরাকালে, একজন অতিথি,—শৌনক ও অভি-প্রতারী নামক দুইটী ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"সকল ভুবনের পালক এমন কোন দেবতা আছেন কি, যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল এবং বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন—এই দেবতা-গুলিকে গ্রাস করেন? সেই এক-দেবতাই বিবিধ আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু হায়! লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না"!

শৌনক উত্তর দিয়াছিলেন—"মহাশয়! এমন এক দেবতা আছেন, যিনি সূর্য্যাদি চারি দেবতাকে বায়ু রূপে গ্রাস করেন এবং

পুনরায় উহাদিগকে তাহা হইতেই সৃষ্টি করেন। সেই দেবতাই প্রাণ-রূপে,—বাগাদি শক্তিকেও গ্রাস করিয়া, তাহা হইতেই উহাদিগকে পুনরায় অভিব্যক্ত করেন। এই দেবতাকে তত্ত্ব-দর্শীরা 'পরাক্রমী অভগ্ন-দংষ্ট্রা ও সকলের ভক্ষক' বলিয়া কহিয়া থাকেন। এ দেবতার মহিমার অন্ত নাই। সকল পদার্থই ইঁহার অন্ন-স্থানীয় * অথচ ইঁহার কেহ ভক্ষক (বিনাশক) নাই। আবার ইনিই অগ্ন্যাদি দেবতার আকারে অবস্থিত †, এবং এই অগ্ন্যাদি দেবতা হইতে জগতেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই বিরাট্ পুরুষই নিজে অন্ন ও অন্নাদ (অন্নের ভক্ষক) উভয়ই হইতেছেন। অন্য সকল দেবতা, এই এক পরম-দেবতা-রই অন্তর্ভুক্ত।

মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে প্রাচীন-আখ্যায়িকা সহ সংবর্গ-বিদ্যা বলিলাম। আমি সেই পরম দেবতাকে এই ভাবেই ভাবনা করিয়া থাকি"!

রাজা জানশ্রুতি এই উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রৈক্কের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া, একটী সমৃদ্ধ জনপদে উঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উত্তরকালে, এই জনপদটী রৈক্কপর্ণা নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

---

* কেন না, কার্য্যমাত্রই স্ব-কারণে বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম-শক্তি-হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্ম-শক্তিতেই উহারা লয় পাইবে।

† কেন না, তাঁহারই 'প্রাণ-শক্তি' হইতে ইহারা জন্মিয়াছে। এই বিষয়ে 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে' আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে—

১। সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি, স্পন্দনাত্মক বায়ুরই অভিব্যক্তি।

২। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি, স্পন্দনাত্মক প্রাণেরই অভিব্যক্তি।

৩। বায়ু ও প্রাণ,—উভয়ই স্পন্দনাত্মক শক্তিমাত্র।

৪। এক স্পন্দনাত্মক শক্তিই,—বাহ্য ও আন্তর সকল পদার্থের উৎপত্তির বীজ এবং লয়েরও আধার।

৫। এই শক্তি,—ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই শক্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

(বৈশ্বানর-বিদ্যা)

একদা প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল নামক পাঁচজন গৃহী, বিশ্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, অরুণপুত্র উদ্দালকের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদ্দালক সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী আত্মার সম্বন্ধে কেবল আলোচনা করিতেছিলেন; তদ্বিষয়ে তখনও তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিয়াছিল না। সুতরাং তিনি, সেই কয়েকজন অভ্যাগত সমৃদ্ধ গৃহীদিগকে উপদেশ দিতে পারিলেন না। কিন্তু উদ্দালক শুনিয়াছিলেন যে, কেকয়নামক জনপদের অধিপতি ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন রাজা অশ্বপতি, এই ব্রহ্ম-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তখন পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন গৃহী এবং উদ্দালক ইঁহারা সকলেই, সেই রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা ইঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া, ইঁহাদিগের জন্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

রাজা অশ্বপতি তৎকালে অতীব ধার্ম্মিক ও সুশাসক বলিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্যে প্রজাবৃন্দ সুখে কালযাপন করিতেছিল। প্রজাদিগের মধ্যে কেহই অধর্ম্মাচারী ছিল না; রাজ্যে দস্যু, তস্করাদির কোন উপদ্রব ছিল না। প্রজা-গণ আপন আপন ব্যবসায়ে ও স্বস্ব বর্ণানুরূপ আচারে নিরত ছিল।

রাজা অশ্বপতি, পরদিবস প্রাতঃকালে, অভ্যাগত ছয়টী অতিথিকে পরম যত্নে ডাকিয়া আনিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহাদের এই শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের আগমনের কারণ নিবেদন করিলে, রাজা অশ্বপতি, একে একে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

"মহাত্মন্! প্রাচীনশাল! আপনি কি ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, আমি অগ্রে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি"। প্রাচীনশাল উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! পরিদৃশ্যমান এই দ্যুলোককেই আমি ব্রহ্মবোধে নিরন্তর ভাবনা করিয়া থাকি; এই দ্যুলোকই বৈশ্বানরাত্মা"।

অশ্বপতি বুঝিলেন যে প্রাচীনশাল 'বৈশ্বানরের' স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। যিনি বিশ্বের প্রতি পদার্থে অভিব্যক্ত—ব্রহ্মের শক্তিই এই বিশ্বাকারে বিকাশিত—সেই ব্রহ্মই বৈশ্বানর নামে অভিহিত। এই স্থূল বিশ্ব ব্রহ্মের বিরাট রূপ। ব্রহ্মেরই সূক্ষ্মশক্তি, এই বিশ্বের তাবৎ স্থূল-পদার্থাকারে পরিণত হইয়া আছে। তাঁহাকে পুরুষ-রূপে কল্পনা করিলে, সূর্য্য-চন্দ্রাদি

তাবৎ পদার্থ তাঁহার অবয়ব-রূপে কল্পিত হইতে পারে। এই বিশ্বব্যাপ্ত পুরুষকেই বৈশ্বানর বলা যায়। অশ্বপতি বুঝিলেন, প্রাচীনশাল একটীমাত্র অবয়ব বা অংশকেই বৈশ্বানর বলিয়া মনে করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, সকল পদার্থ লইয়াই ব্রহ্মের বিরাট্ রূপ। কোন পদার্থ-বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। তিনি প্রত্যেক পদার্থের অতীত হইয়াও প্রতি পদার্থরূপে অভিব্যক্ত। এ বিশ্ব,—তাঁহার স্থূল রূপ।

অশ্বপতি বলিলেন,—"মহাশয়! এই দ্যুলোক বৈশ্বানর-ব্রহ্মের অংশমাত্র। সতত তেজঃ-দ্বারা প্রদীপ্ত রহে বলিয়া, এই দ্যুলোককে 'সুতেজাঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। পুরুষ-রূপে কল্পিত ব্রহ্মের, এই দ্যুলোকই মস্তক। সুতরাং দ্যুলোক সেই পুরুষের অংশ বা একটীমাত্র অবয়ব। যাহা আংশিক অভিব্যক্তি, তাহাকেই আপনি পূর্ণাভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, এই দ্যুলোক ব্রহ্মেরই অংশ, বৈশ্বানর-পুরুষেরই অবয়ব। যিনি এইভাবে দ্যুলোকের ভাবনা করেন, তাঁহার কুলে অন্নাভাব হয় না, তাঁহার কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে না"।

রাজা তৎপরে সত্যযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাহা আমাকে বলুন"। সত্যযজ্ঞ বলিলেন,—"রাজন্। আমি এই পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকেই বৈশ্বানর বলিয়া জ্ঞাত আছি, এবং তাঁহারই ভাবনা করিয়া থাকি"। রাজা উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আপনিও অবয়ব-বিশেষকেই পূর্ণ

অবয়বী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই সূর্য্যকে লোকে 'বহুরূপ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কেননা সূর্য্যই নীল-পীতাদি বর্ণ-বিভেদের কারণ। এই বহু-রূপাত্মক সূর্য্যকে, সেই বৈশ্বানর-পুরুষের চক্ষুঃ-রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। স্থূলরূপে অভি-ব্যক্ত ব্রহ্মের,—সূর্য্য আংশিক বিকাশ মাত্র;—ইহা তাঁহার একটী অবয়ব মাত্র।"

তৎপরে রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমি এই বায়ুকেই বৈশ্বানর ব্রহ্মবোধে ভাবনা করিয়া থাকি"। রাজা বলিলেন,—"মহাশয়! নানাদিকে সঞ্চরণশীল এই বায়ুকে বৈশ্বানর-পুরুষের প্রাণরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে; ইহাও ব্রহ্মের আংশিক স্থূল বিকাশ; ইহাও তাঁহার পূর্ণ-রূপ নহে"।

জন নামক ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"রাজন্! আমি আকাশকেই বৈশ্বানর বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকি"। রাজা বলিলেন,—"ব্যাপ্তি-গুণাত্মক এই আকাশকে বৈশ্বানর পুরুষের শরীররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। আপনারও অসমগ্রে সমগ্র-ভাবনা দেখিতেছি। যাহা, তাঁহার অংশ-বিশেষ—অবয়ব মাত্র,—তাহাকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন"।

তৎপরে, এইরূপে বুড়িলও বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! পরিদৃশ্যমান্ জলকেই আমি বৈশ্বানর-বোধে ধ্যান করিয়া থাকি"। রাজা বলিলেন,—"জল হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতেই ঐশ্বর্য্য জাত হয়; অতএব ঐশ্বর্য্য জলেরই গুণ-বিশেষ বলিয়া তত্ত্ব-

দর্শীরা অবগত আছেন। কিন্তু, যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের হেতুভূত এই জলও ত বৈশ্বানর হইতে পারেন না। ব্রহ্মকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলে, জলকে সেই পুরুষের মূত্রাশয় বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে; ইহাও তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র,—অবয়ব মাত্র"।

অরুণপুত্র আরুণি বলিলেন,—"রাজন্! আমি এই পৃথিবী-কেই বৈশ্বানর-রূপে ভাবনা করিয়া থাকি"। রাজা বলিলেন,—"আপনারও দেখিতেছি সম্যক্ দর্শন জন্মে নাই। এই পৃথিবী সকলেরই আশ্রয়-ভূমি; আশ্রয়-গুণ-বিশিষ্ট এই পৃথিবীকে, বৈশ্বানর-পুরুষের পাদ-রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে; ইহাও সেই বিরাট্-পুরুষের অবয়ব-বিশেষ মাত্র; পূর্ণরূপ নহে। আমি বুঝিলাম, আপনারা সকলেই সেই বিরাট্-পুরুষের পূর্ণ-স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। এক একটী অবয়বকেই আপনারা বিরাট্-পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। যাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তাহারই কয়েকটী মাত্র গ্রহণ করিয়া, অন্য অভিব্যক্তি-গুলিকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা বুঝেন যে, সেই অনন্ত-শক্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য এই স্থূল বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই,—তাঁহার অংশ, তাঁহারই রূপ, তাঁহারই অভিব্যক্তি। ইহারা তাঁহারই শক্তিতে শক্তি-বিশিষ্ট; তাঁহার সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। তিনি যেমন শক্তি-রূপে, স্থূল বিশ্বাকারে পরিণত; তেমনই তিনিই সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য-রূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব এই স্থূল

বিশ্ব,—সেই চৈতন্যের অবয়ব-রূপে কল্পিত হইতে পারে। জীব-চৈতন্যের দেহ যেমন অভিব্যক্তির স্থান; বিশ্বও তদ্রূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র। অতএব এই বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং বিশ্বের পদার্থ-সকল তাঁহার বহিরবয়ব। কিন্তু এই বিশ্ব কখনও তাঁহার সমগ্র-স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি করিতে পারে না; এই জন্যই এই বিশ্ব অপূর্ণ। তিনিই কেবল পূর্ণ-স্বরূপ। ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে,—এ বিশ্ব তাঁহার পূর্ণতার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না।

ব্রহ্মের এই পুরুষরূপ কল্পনা কেন? পুরুষরূপ কল্পনার বিশেষ কারণ আছে। অন্য প্রাণীতে জ্ঞানের বিশেষ-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; অন্য প্রাণীর জ্ঞান, পান-ভোজনেই পর্য্যবসিত। কিন্তু পুরুষের (মনুষ্যের) জ্ঞান এরূপ নহে। পুরুষের জ্ঞান, ব্রহ্ম-স্বরূপানুভবে সমর্থ। পুরুষে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের এরূপ বিকাশ হইয়াছে যে তদ্দারা ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য, ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান-শক্ত্যাদির বোধ করিতে পুরুষ সমর্থ। তাই, এই পুরুষ-রূপের শ্রেষ্ঠতা *। অতএব ব্রহ্ম-

---

* আমরা এই অংশটা তৈত্তিরীয়োপনিষদের (১।৩।৪) শঙ্করভাষ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছি। "সর্ব্বেষামেব অন্নরস-বিকারিত্বে ব্রহ্মাংশত্বেচ অবিশিষ্টে কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে? প্রাধান্যাৎ; কিংপুনঃ প্রাধান্যং?—কর্ম্ম-জ্ঞানাধিকারঃ পুরুষে এবহি শক্তত্বাৎ"—ইত্যাদি। "ইতশ্চ পুরুষ এব কর্ম্ম-বিজ্ঞানানুষ্ঠান-সমর্থঃ, সহি সর্ব্বান্ কামান্ উপায়ৈর্ব্যাপ্তুং বয়ন্তিশেতে

স্বরূপের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ বলিয়াই ব্রহ্মের পুরুষরূপ-কল্পনা। এইরূপ কল্পনার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। এই বিশ্ব-সৃষ্টি জ্ঞান-কৃত সংকল্প-মূলক *। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে আদি-জ্ঞাতারূপে ব্রহ্ম অভিব্যক্ত। এই আদি-জ্ঞাতাই পরম-পুরুষ † নামে কীর্ত্তিত। ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই বিরাট্। পুরুষের সেই সংকল্প, প্রাণ-রূপে—বাক্‌রূপে—অনুকম্পনরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে, এই বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই প্রাণ-শক্তি—আকাশে শব্দ, জড়ে গতি, উদ্ভিদে প্রাণ-ক্রিয়া এবং প্রাণি-রাজ্যে জ্ঞানরূপে অভিব্যক্ত ‡। এই আদি-জ্ঞাতা

"ঐ০ আ০ ।২।৩।১৫ (cf. Martince :—" The intelligent direction upon an *end* is not in *creatures*' consciousness and therefore it stops short of will."

* "তদৈক্ষত (Willed) বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি"। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। "যস্য জ্ঞান-ময়ং তপঃ", "স তপোঽতপ্যত" ইত্যাদি।

† "তং ত্বাং পৃচ্ছামি ক্বাসৌ 'পুরুষ' ইতি........এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" ইত্যাদি। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ" ইত্যাদি।

‡ বিজ্ঞান-গুলি প্রাণেরই শেষ অভিব্যক্তি। কেন না, প্রাণ-শক্তি যতদিন না ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থানগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যাদির জ্ঞানের বিকাশ হয় না। শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনুন—

বা পরম-পুরুষের জ্ঞানে বিশ্ব জ্ঞেয়রূপে * উদ্ভাসিত। সুতরাং এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব—এই পুরুষ-প্রকৃতি ভাব—ব্রহ্মের নিত্য-ভাব। এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্মের পুরুষরূপ কল্পনার আর একটী উদ্দেশ্য—উপাসনার সুবিধা। ইহাকে "সম্পদুপাসনা" † বলে। নিকৃষ্ট পদার্থে (আলম্বনে) উৎকৃষ্ট পদার্থের আরোপ করিয়া, যেখানে আলম্বনটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, আরোপ্য পদার্থটীরই প্রাধান্য থাকে, তাহাই সম্পদুপাসনা নামে বিদিত। বিশ্বাত্মা পুরুষের দ্যৌঃ মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, দিক্ তাঁহার শ্রোত্র, বায়ু তাঁহার প্রাণ, পৃথিবী তাঁহার পদ,—এই প্রকারে অবয়ব কল্পনা করিয়া লইয়া, বিরাট্-পুরুষের রূপ ধ্যান করিতে হয়। ইহা পুরুষের আধিদৈবিক রূপ। ব্যষ্টি পুরুষদেহ তাঁহার আধ্যাত্মিক রূপ। মূল প্রাণ-স্পন্দনের দুই

"শরীর-দেশে ব্যূঢ়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যমান উপলভ্যতে"। প্রাণই যে দেহে সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র তাহাও বলিয়াছেন,—"প্রাণস্য বৃত্তির্বাগাদিভ্যঃ পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি; চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তি-লাভঃ"।

* "এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম—সংস্থম্"।

† "অল্পালম্বন-তিরস্কারেণ উৎকৃষ্টবস্ত্বভেদধ্যানং সম্পৎ; সম্পদুপাস্তৌ সম্পাদ্যমানস্য প্রাধান্যেন ধ্যানম্"।—বেদান্ত-দর্শন ভাষ্য-টীকায়ামানন্দগিরিঃ।

আকার; সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র—প্রভৃতি প্রাণ-স্পন্দনের এক আকার। আবার, চক্ষুঃ, বাক্, মন, শ্রোত্র প্রভৃতি—প্রাণ-স্পন্দনের অপর আকার। সূর্য্যই প্রাণিদেহে চক্ষুঃ-রূপে অভিব্যক্ত; অগ্নিই প্রাণিদেহে বাক্ রূপে অভিব্যক্ত; চন্দ্রই প্রাণিদেহে মনরূপে অভিব্যক্ত। যে প্রাণ-স্পন্দন—সূর্য্যাদিরূপে বিকাশিত, সেই প্রাণ-স্পন্দনই—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-রূপে বিকাশিত। সুতরাং আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ-গুলি মূলে এক। এইজন্য আধ্যাত্মিক অবয়বে, আধিদৈবিক অবয়ব-গুলির আরোপ করিয়া লইয়া অভিন্ন-ভাবে ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবনার ফলে, নিজের ব্যষ্টিদেহ, তিরোহিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বরূপ জাগিতে থাকে *। এইরূপ ভাবনা, ব্রহ্ম-সত্তার একত্বের অনুভূতির বিশেষ সহায়। এইরূপ ভাবনায়, কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না এবং অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই পুরুষ-রূপের কল্পনা; এইজন্যই পুরুষ-রূপের শ্রেষ্ঠতা।”

যে প্রাণ-স্পন্দন (হিরণ্যগর্ভ) আধিদৈবিক মূর্ত্তিতে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি তেজোময় পদার্থ-রূপে অবস্থিত,—সেই প্রাণ-স্পন্দনই আধ্যাত্মিক মূর্ত্তিতে (প্রাণিদেহে) অবস্থিত। মনুষ্যদেহে “বৈশ্বা-

---

* “আধ্যাত্মিকস্য ব্যষ্ট্যাত্মনঃ ত্রৈলোক্যাত্মকেন আধিদৈবিকেন বিরাজা সহ একত্বং গৃহীত্বা অদ্বৈত-পর্যবসানং সিদ্ধম্” ।—মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য-টীকায় আনন্দগিরি।

নরাগ্নি” রূপে সেই প্রাণ-স্পন্দনই অবস্থিত। আমরা প্রত্যহ যে ভোজন করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা বৈশ্বানরাগ্নির তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির সঙ্গে, আধিদৈবিক বৈশ্বানর-পুরুষেরও তৃপ্তি হয়। ইহাই শ্রুতিতে "প্রাণাগ্নিহোত্র" নামে পরিচিত। এই প্রকারে দৈনিক ভোজন-ক্রিয়ায় যজ্ঞদৃষ্টি করা বিধেয়। এইরূপে, যজ্ঞ ভাবনা করিলে, বিষয়াসক্তি শিথিল হইয়া যায় এবং বাহিরে ও ভিতরে একত্বের অনুভব গাঢ় হইয়া উঠে।

শ্রুতিতে এইরূপে "প্রাণাগ্নিহোত্র" উপদিষ্ট হইয়াছে—

আমরা যে অন্ন-গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা প্রাণের তৃপ্তি হয়; প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে সূর্য্যের ও সূর্য্যের আধার আকাশের তৃপ্তি হয়।

আমরা যে অন্ন-গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা ব্যানের তৃপ্তি হয়; ব্যানের তৃপ্তিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে চন্দ্রের ও চন্দ্রের আধার দিক্-সকলের (আকাশের) তৃপ্তি হয়।

আমরা যে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা অপানের তৃপ্তি হয়; অপানের তৃপ্তিতে বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে অগ্নির ও অগ্নির আধার পৃথিবীর তৃপ্তি হয়।

আমরা যে অন্ন-গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সমানের তৃপ্তি হয়; সমানের তৃপ্তিতে মনের তৃপ্তি হয় এবং মনের তৃপ্তিতে বিদ্যুতের ও বিদ্যুতের আধার মেঘের তৃপ্তি হয়।

আমরা যে অন্ন-গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা উদানের তৃপ্তি হয়; উদানের তৃপ্তিতে বায়ুর ও বায়ুর আধার অন্তরীক্ষের তৃপ্তি হয় *।

* দেহে প্রাণ-স্পন্দন অভিব্যক্ত হইয়া—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান,

এই প্রকারে "প্রাণাগ্নিহোত্র" সম্পাদিত হইলে, দৈনিক ভোজন যে আত্ম-সুখের জন্য নহে, পরন্তু আত্ম তৃপ্তি ও স্বার্থপর বোধের স্থলে, বিশ্বরূপ পুরুষেরই তৃপ্তি হয়—এই প্রকার বোধই প্রতিষ্ঠালাভ করে। সকল পদার্থই যে মূলে এক প্রাণ-স্পন্দনেরই অবস্থাভেদ মাত্র—এই একত্ব-বোধও দৃঢ়ীভূত হয়। এই প্রকারে লালসার ক্ষয় হইয়া ও সমগ্র বিশ্বে আত্ম-বোধ জন্মিয়া, পরকে আপন করিতে পারা যায়।

ও উদান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া দৈহিক সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গুলিও, এই প্রাণ-অপান-সমানাদিরই অংশবিশেষ মাত্র। প্রাণ-স্পন্দনকে ছাড়িয়া দিলে, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে পারে না; দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। অন্ন-পানাদি গ্রহণ দ্বারা, যে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, সেই সামর্থ্যই প্রাণের মূল। অন্নাদি-দ্বারা প্রাণের সামর্থ্য রক্ষিত ও পুষ্ট হয় বলিয়াই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও তৃপ্তি ও ক্রিয়াকুশলতা দৃষ্ট হয়। বাহিরের সূর্য্য-অগ্নি প্রভৃতি যে ভিতরের চক্ষুঃ-বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির পরস্পর উপকার করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, এক প্রাণ-স্পন্দনেরই উহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। এই জন্য শ্রুতিতে চক্ষুঃ ও সূর্য্য, বাক্ ও অগ্নি, কর্ণ ও চন্দ্র, মন ও বিদ্যুৎ—এই গুলির পরস্পর সম্বন্ধ ও একাত্মভাব কথিত হইয়াছে। আবার অন্ন বা Matter ব্যতীত প্রাণ-স্পন্দন ক্রিয়া করিতে পারে না বলিয়া পৃথিবী, জল, মেঘ প্রভৃতিকে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির আধার বলা হইয়াছে (কেন না, পৃথিবী, জল, মেঘাদি সেই অন্ন বা Matter এরই বিকার)।

ছান্দোগ্যের অন্যস্থলেও (৩।১৩।১-৫) এইরূপ একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহে যাহা প্রাণ, তাহাই চক্ষুঃ, তাহাই সূর্য্য। দেহে যাহা

এই আখ্যায়িকায় উল্লিখিত উপদেশ-গুলির সারমর্ম্ম এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে—

১। ব্রহ্মেরই স্বরূপ-ভূত 'প্রাণ-শক্তি' জগৎ-সৃষ্টিতে নিযুক্ত।

২। এই শক্তি পরিণামিনী। ইহা পরিণত হইয়া সূর্য্য-চন্দ্রাদি 'আধি-দৈবিক' পদার্থের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৩। এই শক্তিই ক্রম-পরিণতির নিয়মে, প্রাণিদেহে আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়াকারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৪। আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ-গুলি পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া থাকে। ইহারা মূলতঃ একই প্রাণ-স্পন্দনের অবস্থা ভেদ।

ব্যান, তাহাই কর্ণ, তাহাই চন্দ্র। দেহে যাহা অপান, তাহাই বাক্, তাহাই অগ্নি। যাহা সমান, তাহাই মন, তাহাই মেঘ। যাহা উদান, তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ। আর এক স্থানে (৩।১৮।৩—৬) আছে—তৈল-ঘৃতাদি আগ্নেয় বস্তু ভোজন দ্বারা, বাগিন্দ্রিয় বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাত্মক বায়ু দ্বারা আপ্যায়িত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্যালোক-দ্বারা রূপ-দর্শনে সমর্থ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্ সকলের (আকাশের) সাহায্যে শব্দগ্রহণে সমর্থ হয়। সত্যকামের উপাখ্যানে (৪।৪-৯ পর্য্যন্ত) দেখা যায়, 'অন্ন ও 'অন্নাদ' রূপে বিভক্ত জগৎকে ১৬টী পদার্থ-রূপে বিভাগ করিয়া লইয়া ভাবনার উপদেশ আছে।—

দিক্‌সকল, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল—এই আট প্রকার 'অন্নের' (Matter) রূপ। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও চক্ষুঃ; কর্ণ, প্রাণ, মন—এই আটটী 'অন্নাদের' (Motion) রূপ।

৫। ব্রহ্মের অবয়ব-কল্পনা দ্বারা তাঁহার বিশ্ব-রূপাত্মক 'পুরুষ' সংজ্ঞা। সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থ তাঁহার চক্ষুরাদি-স্থানীয়। এই পুরুষের নাম "বৈশ্বানর"।

৬। এক একটী ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে বৈশ্বানর-দৃষ্টি বিধেয় নহে। সমুদয় অবয়ব লইয়া তাঁহার ভাবনা করিবে।

৭। আপনার মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্যাদিতে যথাক্রমে—আধিদৈবিক দ্যৌঃ, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির অভেদ-ভাবে আরোপ করিয়া, আপনাকে "বৈশ্বানর পুরুষ" রূপে ভাবনা করিবে।

৮। এই বৈশ্বানর ভাবনা দ্বারা, সর্ব্বত্র একাত্মভাব জন্মে। ক্রমে, বিশ্বের রূপ তিরোহিত হইয়া, ব্রহ্মাত্ম-দর্শন লাভ হয়।

৯। অন্নাদি দ্বারা আপনার তৃপ্তিতে, জগতের তৃপ্তি এবং বৈশ্বানর-পুরুষের তৃপ্তি হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ক। (ইন্দ্রিয়-বর্গের কলহ)

চক্ষুঃ, কর্ণাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গ, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকটী হইতে শ্রেষ্ঠ এই বলিয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চক্ষুঃ বলিতে লাগিল,—"আমি কম কিসে? আমি এক মুহূর্ত্ত শরীরে ক্রিয়া না করিলে, শরীর চলিবে না; শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে"। চক্ষুর ন্যায়, শ্রবণ, বাক্য, মন প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহারা এইরূপে আত্ম-কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, একদা, প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য, প্রজাপতির নিকটে বিচার-প্রার্থী হইল। প্রজাপতি উহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে,—"তোমাদের মধ্যে যে না থাকিলে, যাহার

অভাবে,—-এই শরীর মৃত-শরীরবৎ ঘৃণার্হ হইয়া উঠে ও পাপাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"।

ইহারা প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া, আত্মবল-পরীক্ষার্থ, একে একে শরীর ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয়, দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং বৎসরান্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি না থাকাতে, তোমাদের কিরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছিল? বোধ করি, তোমরা, আমার অভাবে, নিতান্ত মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলে"! অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বর্গ উত্তর দিল,—"না ভাই! আমরা তোমার অভাবে মরিয়া যাই নাই। যেমন বাক্যহীন, মূক ব্যক্তি,—কেবল কথা বলিতে পারে না; কিন্তু কথা কহিতে না পারিলেও যেমন সে ব্যক্তি দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় ও দেহধারণ করিয়া জীবিত রহে, এবং মন দ্বারা বিষয়-সকলও জানিতে পারে, আমরা তোমার অভাবে তদ্রূপ ভাবেই অবস্থিত ছিলাম"। বাগিন্দ্রিয়, এই কথা শুনিয়া দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, রেতঃ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বর্গও,—বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায়,—একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং বৎসরান্তে পুনরাগত হইয়া শুনিল যে, কাহারই অভাবে দেহ একেবারে জড়বৎ নিশ্চল-নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় নাই।

তৎপরে, দেহের প্রাণ-শক্তি, আত্ম-বল-পরীক্ষার্থ, দেহ পরিত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিল। কিন্তু তখন দেখা গেল যে,

প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিবা-মাত্রই—বাক্য, চক্ষুঃ, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গ সকলেই যুক্ত-করে নিবেদন করিল, —"না ভাই! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না। তুমি না থাকিলে ত আমরা স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারি না, দেখিতেছি! জানিলাম, তুমিই আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"।

তখন প্রাণ-শক্তি বলিল,—"আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব? কে আমার অন্ন হইবে? কোন্ অন্ন গ্রহণ করিয়া আমি পরিপুষ্ট হইব? আমার বস্ত্রই বা কি হইবে? আমি কোন্ বস্ত্র পরিধান করিব"? ইন্দ্রিয়েরা উত্তর করিল,—"ভাই! প্রাণীমাত্রই যে অন্ন-পান নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাঁহাই তোমার অন্ন-বস্ত্র। এই অন্ন-পান যোগে তুমি পরিপুষ্ট হইতে পারিবে এবং তোমার পুষ্টিতে আমরাও পুষ্টিলাভ করিব"।

ইন্দ্রিয়গণের এই বিবাদের উপাখ্যান ও প্রাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠতার কথা,—পুরাকালে জবালার পুত্র মহর্ষি সত্যকাম,—গোশ্রুতির নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শরীরে প্রাণ-শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলেরই জ্যেষ্ঠ *। স্ত্রী-গর্ভে শোণিতের সহিত শুক্রের সংযোগ-কাল হইতেই এই প্রাণ-শক্তি অবস্থিত থাকে। প্রাণশক্তি-শূন্য শুক্র কোনই কার্য্য করিতে সক্ষম

---

* এই অংশগুলি বৃহদারণ্যকের (৬।১) শঙ্কর-ভাষ্য হইতে গ্রহণ করিয়া, আমরা এই 'কলহের' তাৎপর্য্য বুঝাইলাম।

হয় না। এই জন্যই দেহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের উদ্ভব হইবার বহুপূর্ব্বে প্রাণ-শক্তি সর্ব্ব-প্রথমে বৃত্তিলাভ করে,—উদ্ভূত হয়। নিষেক-কাল হইতেই, প্রাণ-শক্তি গর্ভের পোষণ করিতে থাকে। এই জন্যই, বয়ঃ-ক্রমে, প্রাণ-শক্তি সকলের জ্যেষ্ঠ। এই প্রাণ-শক্তিই ক্রমে রস-রক্তাদির পরিচালনা করতঃ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি গড়িয়া তোলে। এই স্থান গুলি নির্ম্মিত হইবার পর, তবে সেই সকল স্থানের আশ্রয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তি স্ব-স্ব ক্রিয়া (Functions) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অতএব প্রাণ, সকল ইন্দ্রিয় হইতেই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ইন্দ্রিয়-শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি, এই সাধারণ প্রাণ-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। মন বা অন্তঃকরণ,—সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়; মনের উপরেই ইন্দ্রিয় ও বিষয়-বর্গের অস্তিত্ব নির্ভর করে; মনেরই সংকল্পানুসারে ইন্দ্রিয় সকল স্ব-স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মনও,—প্রাণ-শক্তির আশ্রয়েই ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রয়;—প্রাণ-শক্তি।

অন্ন ও অপ্,—এই প্রাণ-শক্তির পোষক। অন্ন-পান-জনিত শক্তিই,—প্রাণশক্তির পুষ্টিসাধক। আমরা অন্ন পানাদি নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই অন্ন-পানাদি দ্বারা দেহে যে শক্তি উদ্ভূত হয়, তাহাই প্রাণিদেহ গঠন ও পোষণ করে। অতএব প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া এই অন্ন পানাদির আশ্রয়েই অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রুতির অন্যস্থলেও কথিত আছে যে, ইন্দ্রিয়-গুলি অন্ন ব্যতিরেকে পুষ্টি লাভ করিতে পারে না এবং অন্ন দ্বারা প্রাণেরই তৃপ্তি ও পুষ্টি হয় বলিয়াই, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে *। এই জন্যই প্রাণকে,—'অঙ্গের রস' বলিয়াও কথিত

* "বাগাদীনামপি অন্ননিমিত্তোপকার-দর্শনাৎ; প্রাণদ্বারকত্বাৎ তদুপ-

হইয়াছে। শ্রুতির এই মহা সিদ্ধান্তটী যে আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত, আমরা এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব। বিখ্যাত Herbert Spencer এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—"Animals are also active absorbers of *motion* latent in *food* and active expenders of that motion. And there is always a differential progress towards either *integration* or disintegration" : "At the outset, it daily absorbs under the form of *food* an amount of latent force greater than it daily expends ; and the surplus is daily equilibrated by *growth*.

ইন্দ্রিয়-বর্গের কলহের উপাখ্যান হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাণ-শক্তিই পরিণত হইয়া দেহের গঠন করে ও তদাশ্রয়ে নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করে। আধিদৈবিক

কারস্থ"। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৩।১৭—১৮, "অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ"। "অতঃ কার্য্য-করণা-নামাত্মা প্রাণ ইতি সিধ্যতি" (শঙ্কর-ভাষ্য)। "অন্নং হি ভুক্তং ত্রেধা পরিণমতে। যস্তুণিষ্ঠোরসঃ স হৃদয়দেশ মাগত্য নাড়ীসহস্রেষু অনুপ্রবিশ্য করণ-সংঘাতরূপং লিঙ্গং ··তস্য বলমুপজনয়ৎ ..স্থিতি-নিবন্ধনং ভবতি" বৃঃ,ভাঃ, । "প্রাণাপান বৃত্তিভ্যাং লোকস্য জীবনং কুর্ব্বনাস্তে প্রাণঃ। অন্নেন হি দাম-স্থানীয়েন অস্মিন্ শরীরে বদ্ধঃ প্রাণঃ। অনেন প্রাণেন্ ইদং শরীরজাতং নযোনি। তৌ শরীর-প্রাণৌ নিত্যসহজাতত্বাৎ প্রাণেন শরীরং শশ্বদিব। তুল্য-প্রসবো বা শরীরেণ"—ঐঃআঃভাঃ ২।১।১০ ;

দেবতা বর্গেরও এইরূপ কলহের একটী উপাখ্যান আছে। তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এক বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণ-শক্তিই পরিণত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রাণ-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে, স্বাধীন-ভাবে, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্যাদির ক্রিয়া হইতে পারে না। এই দুই বিবাদ একত্র মিলাইয়া লইলে, আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের স্বরূপভূত প্রাণ-শক্তিই,—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বে এই প্রাণ শক্তি ব্যতিরিক্ত কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা বা ক্রিয়া নাই। আবার ইহাও বুঝা যায় যে, এই প্রাণশক্তি, ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই শক্তি; ইহা ব্রহ্মেতেই অধিষ্ঠিত। এইজন্যই আমরা সেই "দেবতাবর্গের কলহের উপাখ্যানটীও" এস্থলে সংযুক্ত করিয়া দিলাম—

খ। (দেবতাবর্গের কলহ।)

একদা অসুর-বর্গকে পরাজিত করিয়া, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গ অতীব গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল: তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে সমধিক প্রতাপশালী বলিয়া দর্প করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে, তাহাদের ন্যায় ক্ষমতা-বিশিষ্ট কেহই আর জগতে নাই। তাহাদের শক্তিতেই এ জগৎ চলিতেছে। তাহারা ছাড়িয়া গেলে, এজগৎ এক মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তাহারা যদি প্রাণি-বর্গের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা না করে—ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া না করে,—তবে কোন ইন্দ্রিয়ই রূপ-দর্শনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে পারিবে না। এইরূপে, ইহারা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে, চতুর্দ্দিক বিভাসিত করিয়া, একটী উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল *। দেবতারা এই জ্যোতির আকস্মিক অভ্যুদয় অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, আত্ম-কলহ ভুলিয়া, অগ্নিকে সেই জ্যোতির অভিমুখে পাঠাইয়া দিল। অগ্নি নিকটবর্ত্তী হইলে, সেই জ্যোতিঃ বলিলেন,—"তুমি কে? তোমাতে কি সামর্থ্য আছে, তোমার পরাক্রম কিরূপ"? অগ্নি সদর্পে উত্তর দিল,—"আমি জাতবেদা, আমি অগ্নি। এই দুই নামে আমি বিশ্বে বিখ্যাত। আমার সামর্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ;— আমি ইচ্ছা করিলে, এক মুহূর্ত্তে, সমস্ত বিশ্ব ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারি।" জ্যোতিঃ হাসিয়া বলিলেন,—"হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ত্রিভুবন-ভস্মকারিণ্! এই লও; আমি এই তৃণখণ্ড দিতেছি; আমি তোমার সামর্থ্য ও পরাক্রম দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি; তুমি এই তৃণ-খণ্ডকে ভস্ম করিয়া ফেল।" তখন অগ্নি আপনার সমুদয় সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেখিল যে, তৃণখণ্ড ত ভস্মীভূত হইল না!! অগ্নি বড় লজ্জিত হইল। ভাবিল,—"একি? আমার সেই ভুবন-বিদিত পরাক্রম আজ এ তৃণ-খণ্ডে কুণ্ঠিত হইল কেন?" বিস্ময়-বিপ্লুত-চিত্তে,—

---

* ব্রহ্মের প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই, শ্রুতিতে এই জ্যোতির কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম, মনুষ্য-হৃদয়ে বিদ্যুদ্বৎ সকৃৎ প্রকাশিত হইয়া তিরোভূত হন।

ভীত মনে,—অগ্নি, অন্যান্য দেবতার নিকটে ফিরিয়া গেল ও আত্ম-পরাজয়বার্ত্তা প্রদান করিল। তখন বায়ু, মহাদর্পে, সেই তেজের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিল,—"এই আমি বায়ু আসিয়াছি। জগতের লোকে আমাকে মাতরিশ্বা নামে বিদিত আছে। আমি মনে করিলে, এখনই এই বিশ্ব উড়াইয়া দিতে পারি।" জ্যোতিঃ কহিলেন,—"হে বায়ু! হে মাতরিশ্বা! ধর, এই তৃণ-খণ্ড গ্রহণ কর; এই তৃণ-খণ্ডকে উড়াইয়া লও ত দেখি।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বায়ু নিজের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও, সেই সামান্য তৃণ-খণ্ডটীরে উড়াইতে পারিল না!! তখন বায়ু অধোবদনে দেবতাদের নিকটে ফিরিল ও বলিল,—"না আমি এই তেজটীকে চিনিতে পারিলাম না"। তখন সকল দেবতার অধীশ্বর ইন্দ্র, সেই তেজের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু সেই তেজঃ সহসা অন্তর্হিত হইল, এবং সেই আকাশ-মণ্ডলে, বিবিধাভরণভূষিতা, দিব্য-তেজ-বিভাসিতা, একটী রমণী-মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে, বিস্মিত ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দ্র! বিস্মিত হইও না। এই যে তেজঃ-পদার্থটী এই মাত্র অন্তর্হিত হইলেন, ইঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিবে। আমি সেই ব্রহ্মের শক্তি। তোমরা যে অভিমানের বশে, আত্মসামর্থ্যে গর্ব্বিত হইয়াছিলে;—তোমাদের সে গর্ব্ব বৃথা। তোমাদের স্ব-স্ব সামর্থ্য,—ব্রহ্ম-শক্তি হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মশক্তির বলেই তোমরা বলীয়ান্। ব্রহ্ম-শক্তি হইতে পৃথক্‌ভাবে,—স্বাধীনরূপে—তোমাদের শক্তি কার্য্য-কারিণী হইতে পারে না।

আর কখনও এরূপ অভিমান করিও না।” এই বলিয়া সেই মহনীয়া মহিলা-মূর্ত্তিও আকাশে লীন হইয়া গেল।

—:০:—

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, এই রমণী-মূর্ত্তিকে “ব্রহ্মবিদ্যা” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইঁহাকে ‘প্রাণ-শক্তি’ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বিখ্যাত সপ্ত-শতী গ্রন্থে, এই শক্তিকে “মহামায়া” শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তথায়, সেই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে দেবতাদিগের একটী বিশ্ব-বিখ্যাত স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই শক্তিকেই, প্রাণী-দেহে অবস্থিত ক্ষুধা, লজ্জা, ক্রোধ, ভীতি, বুদ্ধি, চেতনা প্রভৃতিরূপে কথিত আছে। “যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধি-রূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ” ইত্যাদি। এই ইন্দ্রিয়-বর্গের কলহ এবং দেবতা-বর্গের কলহ হইতে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাণ-শক্তিই এ বিশ্বে প্রথমতঃ সূর্য্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থাকারে পরিণত হইয়াছে, পরে ইহাই আবার ক্রম-পরিণতির নিয়মে, প্রাণী-দেহে চক্ষুঃ, কর্ণ, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণ-শক্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, উহার আশ্রয় বা বাহ্যাংশও ঘনীভূত হইয়াছে এবং তাহাই প্রাণীর দেহ ও দেহাবয়বরূপে পরিণত হইয়া আছে। জগতের কোন বস্তুরই, কোন ক্রিয়ারই, প্রাণ-শক্তি-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা বা ক্রিয়া নাই। আমরা “শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে” এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

“সংবর্গ-বিদ্যায়” প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ-গুলি সকলই, এক প্রাণ-শক্তি হইতে উদ্ভূত এবং উহারা সেই প্রাণ-শক্তিতেই বিলীন হইয়া যাইবে। “বৈশ্বানর-বিদ্যায়” দেখান হইয়াছে যে, আধিদৈবিক সকল পদার্থই ব্রহ্মের অবয়ব; সুতরাং সেই পদার্থ-গুলি যে মূলশক্তি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণ-শক্তি ব্রহ্মেরই অবয়ব-

ভূত। উহা ব্রহ্মেরই স্বরূপাভিব্যক্তির ক্ষেত্র বা দ্বার। "ইন্দ্রিয় ও দেবতা-বর্গের বিবাদে" দেখান হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি সকলই এক প্রাণ-শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই পদার্থ-গুলির—প্রাণ-শক্তি হইতে ব্যতিরিক্ত-ভাবে, স্বতন্ত্ররূপে, কোন সত্তা বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না। সকল পদার্থের ক্রিয়া, প্রাণ শক্তির আশ্রয়েই সম্পাদিত। প্রাণ-শক্তিই,—সকল পদার্থের আকারে অভিব্যক্ত। প্রাণ-শক্তির যাহা বাহ্যাংশ বা আশ্রয় (অন্ন পান) তাহাও সেই প্রাণ-শক্তিরই রূপান্তর মাত্র *। অতএব আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সকল পদার্থই সেই প্রাণ-শক্তির বিকাশ। এই প্রাণ-শক্তি—ব্রহ্ম-শক্তিই। এই মহা-একত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

* অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।
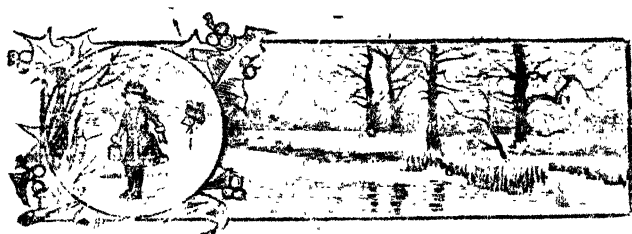
দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(অজাতশত্রু ও বালাকির উপাখ্যান।)

পুরাকালে বলাকার পুত্র বালাকি নামে একটী ব্রাহ্মণ আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ বলিয়া মনে করিত এবং তজ্জন্য অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালাকি সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবে সমর্থ হইলেও, তাহার পূর্ণ অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিয়াছিল না। সে জীবাত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা বলিয়া বুঝিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ভোক্তা পুরুষ যে সুখ-দুঃখাদি বিকার-বর্গের সম্পূর্ণ অতীত, তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি তাহার মনে হইত যে, তাহার ন্যায়

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালে আর নাই। একদা বালাকি বারাণসীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন অজাতশত্রু কাশীর রাজা ছিলেন। এই কাশীরাজ অজাতশত্রু ক্ষত্রিয়-কুলের ভূষণ-স্বরূপ মহাজ্ঞানী নরপতি ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যেও তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত শিষ্যের ন্যায়, ব্রহ্ম-বিদ্যার উপ-দেশ লইয়া নিজেরা কৃতার্থ হইত এবং তাহা নিজ জাতির মধ্যেও প্রচার করিত। বালাকি, এই নরপতির তাদৃশ খ্যাতির কথা নানাস্থানে ও নানা লোকের মুখে না শুনিয়াছিলেন এমন নহে; তথাপি অদম্য অভিমানে দৃপ্ত হইয়া, সেই রাজাকে উপদেশ-প্রদান-মানসে ও তাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান কতদূর ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে, কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিলম্বে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

বালাকি রাজাকে বলিতে লাগিল,—"রাজন্! আমার শরীর-মধ্যবর্ত্তী আত্মা সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা; এই পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যের ভিতরেও সেই আত্মা রহিয়াছেন। এই সূর্য্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'অনুগ্রাহক,' এবং সূর্য্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকারে দেহে অবস্থিত *। আমি

* 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য। বাহিরে যাহা সূর্য্যাদি-আধিদৈবিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত, তাহাই আবার দেহে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত,—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সেই স্থলেই আলোচিত হইয়াছে

নিরন্তর এই দেহান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মারই উপাসনা করিয়া থাকি। যাহা আধিদৈবিকরূপে বাহিরে, তাহাই অধ্যাত্মরূপে দেহে অবস্থিত। এই আত্মার উপাসনা করুন্। রাজা অজাতশক্র বুঝিলেন, বালাকির এখনও মুখ্য ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে নাই; এই ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম পদার্থকে এখনও উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করিতেছে; ইঁহার এখনও সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে নাই। তাই রাজা অজাতশক্র, বালাকির এই উপদেশে তত আনন্দিত না হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা আমি অবগত আছি। এই সূর্য্যকে সকলের মস্তক বলিয়া আমি জানি। আপনার কথিত আত্মা,—এই কার্য্য-করণ-সংঘাতরূপ দেহে * কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে অবস্থিত, তাহা আমি জানি। কেবল এই ভাবে মাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই যথেষ্ট হয় না। ইহা অপেক্ষা

সেইস্থলটী অগ্রে দেখিয়া লইয়া এই উপাখ্যান পড়িতে হইবে। প্রাণ-স্পন্দনই অভিব্যক্ত হইয়া সূর্য্য চন্দ্রাদি আকার ধারণ করিয়াছে; সেই প্রাণ-স্পন্দনই চক্ষুঃ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াকারে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণ-শক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্যই "জীবাত্মা"। দেহে প্রাণই বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে; এই বুদ্ধি-বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীবাত্মা বা 'বিজ্ঞানময়' পুরুষ বলে।

* করণ—চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ। কার্য্য—দেহাবয়ব সকল। ইন্দ্রিয়-বর্গ ও অবয়ব-গুলি—সংহত হইয়া, একত্র মিলিত হইয়া, শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এইজন্য দেহকে 'কার্য্য-করণ—সংঘাত' বলে।

অন্য ভাবে যদি ব্রহ্মকে জানিয়া থাকেন, তবে তাহাই বলুন্”।

বালাকি রাজার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—“রাজন্! যে শক্তি এই পরিদৃশ্যমান্ চন্দ্রে বর্ত্তমান, যে শক্তি চন্দ্রাকারে পরিণত,—তাহাই দেহে মন ও বুদ্ধির আকার ধারণ করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে পরিচিত হইয়া, অবস্থিত রহিয়াছে”। রাজা উত্তর করিলেন,—“জলই—চন্দ্রের শরীর বা আধার; অপ্-ধাতুই চন্দ্রের পরিধেয় বস্ত্র-স্থানীয়। এই জন্য চন্দ্রকে ‘পাণ্ডর-বাসাঃ’ (শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত) নামে লোকে বলিয়া থাকে *। ইহা আমি অবগত আছি”। বালাকি পুনরায় বলিতে লাগিল,—“রাজন্! যে পুরুষ এই দৃশ্যমান বিদ্যুতে অবস্থিত, তাহাই ত্বকে বর্ত্তমান আছেন। এই উভয় আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নিত্য ভাবনা করুন্। বহিঃস্থ আকাশে যে পুরুষ আছেন, তিনিই আবার দেহে হৃদয়াকাশরূপে বর্ত্তমান; এ উভয়কে অভিন্ন-বোধে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। বহিঃস্থ বায়ুতে যে পুরুষ অবস্থিত তাহাই প্রাণরূপে দেহে কর্ত্তা

* “আপো বাসঃ প্রাণস্য—ইতি চ শ্রুতি ইতি যুক্তং প্রাণস্য পাণ্ডরবাসস্ত্বম্”—আনন্দগিরি। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র (১৫।১৩) বলা হইয়াছে যে “আপঃ শরীরং কার্য্য করণাধারঃ। জ্যোতিঃ-রূপ মসৌ চন্দ্রঃ করণং আধেয়ঃ তাস্বপ্সু অনুপ্রবিষ্টঃ।” অর্থাৎ সর্ব্বত্রই কার্য্য (Matter) ব্যতীত করণ (Motion) থাকিতে পারে না। ইহা দেখানই উদ্দেশ্য।

ও ভোক্তা হইয়া রহিয়াছেন। এ উভয়ই এক। যিনি বাহিরে অগ্নিরূপে অবস্থিত, সেই আত্মাই দেহে জ্ঞানরূপ অগ্নির আকারে বাস করিতেছেন। অতএব এই উভয় আত্মাই অভিন্ন। এই ভাবে, মহারাজ! আত্মার ভাবনা করিবেন। যে পুরুষ বাহিরে জলের আকারে অবস্থিত, তাহাই দেহে শুক্র-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অতএব উভয়ই অভিন্ন। যে পুরুষ বাহিরে খড়্গ ও দর্পণাদি নির্ম্মল-পদার্থে বর্ত্তমান, তিনিই দেহের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান চিত্তের আকারে অবস্থিত আছেন। একই আত্মা, বাহিরে ও ভিতরে দুই প্রকার আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা বাহিরে গাঢ় অন্ধকাররূপে অবস্থিত; তাহাই শরীরে অজ্ঞানান্ধকাররূপে বর্ত্তমান। সুতরাং উভয়কে অভিন্ন-রূপে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। রাজন্! যাহা বাহিরে দিক্‌রূপে (আকাশরূপে) অবস্থিত, তাহাই দেহে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হওয়া রহিয়াছে। উভয়ই এক ও অভিন্ন। আত্মার স্বরূপই এই প্রকার। মহারাজ! যাহা বাহিরে আধিদৈবিক পদার্থরূপে অবস্থিত, তাহাই দেহে অধ্যাত্ম-শক্তির আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে *। ব্রহ্ম, নামরূপ-কর্ম্মাত্মক। বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণ-শক্তি, সূর্য্য-চন্দ্রাদি 'আধিদৈবিক' কার্য্য-করণরূপে অভিব্যক্ত

---

* অধ্যাত্ম-বস্তুগুলি, আধিদৈবিক বস্তুগুলিরই অংশ। অংশ—অংশী হইতে ভিন্ন কোন পদার্থান্তর হইতে পারে না। উভয়ই এক।

হইয়া, তাহাই আবার কার্য্য-করণাত্মক * স্থূল-দেহে 'আধ্যাত্মিক' ইন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ত্র একই শক্তি ক্রিয়া করিতেছে; তাহাই আত্মা, তাহাই পুরুষ। এই পুরুষই দেহে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে ও এই পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। মহারাজ! আমার উপদেশ মত, এই এই ভাবে আত্মার উপাসনা করুন্; আপনার ক্ষত্রিয়-জন্ম সার্থক হউক্"।

রাজা বালাকির কথা শুনিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন— "মহাশয়! আপনার ব্রহ্ম-জ্ঞান কি এইটুকুই, না এতদপেক্ষাও অন্য কোনও রূপ বিশেষ জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন? যদি

। করণ=চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শক্তি। কার্য্য=চক্ষুঃ কর্ণাদির গোলক ও এই স্থূল ভূতাত্মক দেহ। অতএব, কার্য্য-করণ-সংঘাত=ভূতাত্মক উপাদান ও ইন্দ্রিয়াদিশক্তি সমন্বিত দেহ। এক প্রাণ-শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য ও করণ রূপে অভিব্যক্তি হইয়া আছে। 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে' ও 'অবতরণিকায়' আমরা এই প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সেই স্থলগুলি দেখিলেই বালাকির কথার অর্থ বুঝা যাইবে। আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিভাগের কথাও তাহাতে আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক আধিদৈবিক-শক্তিপুঞ্জেরই অংশ, পরিচ্ছিন্নভাবে আধ্যাত্মিক পদার্থের আকার ধরিয়াছে। অংশী ও অংশ— একাত্মক। অংশ—অংশীরই রূপান্তর বা অবস্থাভেদমাত্র, সুতরাং 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থান্তর নহে। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর পদার্থই প্রকৃতপক্ষে একই।—(১।৫।১১ ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি)।

এইমাত্রই আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের পরিমাণ হয়,—যদি আপনার উপদেশের মর্ম্ম এইটুকুই হয়,—তবে উহা আর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না। এইরূপ অভেদ-জ্ঞান জন্মিলেই যে যথেষ্ট ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে, ইহা মনে করিবেন না। আপনি যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাধিকারীর উপযুক্ত" *।

* পাঠক বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, বালাকি উচ্চ—অধিকার লাভ করিতে এখনও সক্ষম হন নাই। সর্ব্বাতীত, নির্গুণ, একরস ব্রহ্মের ধারণা এখনও তাঁহার অনুভব-গোচরে আইসে নাই। যে ব্রহ্ম-শক্তি সূর্য্য-চন্দ্রাদি-আধিদৈবিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত এবং যে ব্রহ্ম শক্তি সংস্থান-ভেদে আধ্যাত্মিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াকারে বিকাশিত, সেই ব্রহ্ম-শক্তিকেই -প্রাণ-শক্তিকেই —বালাকি, শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়াদির চালক, ক্রিয়ানির্ব্বাহক কর্ত্তা ও সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বিশেষ বিশেষ উপাধিতে প্রকাশিত—বাহ্যিক পদার্থে ও প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশিত -যে ব্রহ্ম, তাহা সোপাধিক (Conditioned)। সর্ব্বাতীত, পরিপূর্ণ, বিকারা-তীত ব্রহ্মের প্রকৃত-স্বরূপ ইহা হইতে পৃথক্। তিনি প্রাণেরও প্রাণ। তাঁহার শক্তিতেই প্রাণ-শক্তি বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব-জ্ঞান, সর্ব্বানন্দস্বরূপ; তিনি কোন বিশেষ ক্রিয়া বা বিশেষ পদার্থের স্বরূপ নহেন। তিনি পূর্ণ স্বভাব, অতএব তিনি বিশ্বাতীত। বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া, সমুদয় জ্ঞান,—তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত; সুতরাং তিনি উহাদের অতীত হইয়া বর্ত্তমান; ইহাই ব্রহ্মের নিরুপাধিক স্বরূপ। কথাটা আধু-নিক-ভাবে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, বালাকি বুঝিয়াছিলেন—ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপই এই বিশ্বে বিকাশিত রহিয়াছে; এই বিশ্বই তাঁহার পূর্ণ-স্বরূপ। ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপই যে এই বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছে,

বালাকি,রাজার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ে যে গর্ব্ব জন্মিয়াছে; এ গর্ব্ব নিতান্তই অনুপ-যুক্ত। বালাকি লজ্জিত হইয়া, রাজার নিকটে বিনীত ভাবে মুখ্য—ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিল*। রাজা হাসিয়া বলি-লেন,—"ক্ষত্রিয়-জাতি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইবে, ইহা ত দেখিতেছি বিপরীত ব্যবস্থা। তথাপি আমি আপনাকে ব্রহ্ম-বিদ্যা বলিয়া দিব, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন্"। এই বলিয়া রাজা, সস্নেহে, লজ্জিত বালাকিকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন এবং উভয়ে সেই বিশাল রাজ-ভবনের অন্য এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

ইহাঁরা সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী গৌর-দেহ, পূর্ণায়ত বলিষ্ঠ পুরুষ শয্যায় শুইয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। রাজা তাহাকে 'হে পাণ্ডুর-বাসা পুরুষ, হে চন্দ্র, হে সোম, গাত্রোত্থান কর'—এই বলিয়া, বিবিধ নামে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু সে পুরুষের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না। তখন রাজা তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন। তখন সেই পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে

প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা হইতে পারে না। এ বিশ্ব, তাঁহার স্বরূপের আংশিক বিকাশমাত্র; এ বিশ্ব-ব্যতিরেকেও, তাঁহার স্বরূপ স্ব-মহিমায় সদা বর্ত্তমান আছে। তাহাই নিরুপাধিক-রূপ। তিনি বিশ্বাকারে প্রকাশিত হইয়াও বিশ্বাতীত।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, ও বিস্মিত হইয়া দেখিল,—রাজা স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণ-সহ উপস্থিত *।

এস্থলে সুষুপ্ত পুরুষকে রাজা,—'পাণ্ডরবাস, চন্দ্র, সোম' প্রভৃতি বিবিধ নামে কেন ডাকিলেন, পাঠকগণকে তাহার মর্ম্মপ্রদান করা কর্ত্তব্য। বালাকির সোপাধিক ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়াছিল একথা পাঠক শুনিয়াছেন। বালাকি মনে করিত যে, ব্রহ্ম প্রাণ-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রথমতঃ চন্দ্র-সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থের আকারে পরিণত হইয়াছেন। তৎপরে, এই প্রাণ-শক্তিই ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মে (উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুরূপে পরিণত হইয়া) ক্রমে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থাকারে সেই প্রাণ-শক্তিই বিকাশিত রহিয়াছে। এইরূপে, ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

দেহে সেই প্রাণ-শক্তি যখন বুদ্ধিরূপে পরিণত, সেই বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়াই আত্মা—কর্ত্তা, ভোক্তারূপে অবস্থিত; এতদ্ব্যতিরিক্ত আত্মার অন্য স্বরূপ নাই। আত্মা,—বিজ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তারূপেই অবস্থিত। আত্মা,—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি এবং অন্তঃকরণাদিরূপে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত আছেন। বালাকি এইরূপেই আত্ম-স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন; এইরূপেই ব্রহ্ম-স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। বালাকি,—আত্মাকে বিষয়-ভোক্তা

---

* সুষুপ্ত পুরুষের নিকটে গার্গ্যকে লইয়া যাওয়ার তাৎপর্য্য আছে। জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা বিবিধ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় বোধে ব্যস্ত ও আকুল থাকে। সে অবস্থায় জীবাত্মার বিষয়াতীত স্বরূপ সহজে বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন। কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় বিষয় ব্যাকুলতা থাকে না। তখন আত্মার বিষয়াতীত স্বরূপটী বুঝাইয়া দেওয়া সহজ হয়।

রূপেই অবগত ছিলেন। আত্মার যে অন্তঃকরণাতীত একটি স্বরূপ আছে, আত্মা যে প্রাণেরও অতীত তাহা বালাকি জানিতেন না। রাজা অজাতশত্রু, আত্মার এই নির্গুণ (Transcendental) ও সর্ব্ব বিকারাতীত স্বরূপের তত্ত্বও জানিতেন। সোপাধিক স্বরূপ ব্যতীত যে আত্মার নিরুপাধিক স্বরূপ আছে, এই তত্ত্বটি বালাকিকে সহজে বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়েই, রাজা সুষুপ্ত পুরুষের নিকটে তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। বালাকি ইতঃপূর্ব্বেই রাজাকে শুনাইয়াছিল যে, যে পুরুষ চন্দ্রাকারে অভিব্যক্ত, সেই পুরুষই মনের আকারে মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান আছে। রাজা তখন বালাকিকে বলিয়াছিলেন যে, চন্দ্র—অপ্ ধাতুর আশ্রিত এবং তজ্জন্য 'অপ্' চন্দ্রের বস্ত্ররূপে কল্পিত হয় এবং চন্দ্রকে সেই জন্য লোকে 'সোম পাণ্ডরবাস' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকে। তেজোময় চন্দ্র জলের আশ্রয়ে ক্রিয়া করে, ইহা বুঝাইতে গিয়া * রাজা তখন চন্দ্রের 'পাণ্ডরবাস' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্যই এই পূর্ব্বোক্ত কথাটুকু স্মরণ করিবেন। এখন, আত্মাকে যদি কেবল বিষয়ভোক্তা মাত্র বলিয়াই স্থির করিয়া লওয়া যায়,—বিষয়ভোক্তৃত্ব ব্যতিরেকে আত্মার যদি অন্য কোন স্বরূপ আর না থাকে—তবে বিষয় উপস্থিত হইবা-মাত্রই আত্মা তাহা ভোগ করিবেই। ইহা বুঝাই-

* শক্তি তাহার আধার ব্যতীত, Motion উহার আশ্রয় Matter ব্যতীত, থাকিতে পারে না। চন্দ্র তেজোময়, সুতরাং Motion এরই অবস্থান্তর। জল, Matter এরই অবস্থান্তর। সুতরাং চন্দ্র—'পাণ্ডরবাসাঃ'। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক—সকল অবস্থায়ই পদার্থ মাত্রই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। "অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ জগৎ সমস্তং ··কার্য্যাত্মকং করণাত্মকঞ্চ"।—ভাষ্যকার।

বার জন্য রাজা সুষুপ্ত-পুরুষকে (আত্মাকে),—পাণ্ডরবাস নামে ও সোম নামে এবং চন্দ্রনামে সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেন না, এই সংজ্ঞাগুলি নাম; নাম ত বিষয়মাত্র; নাম বা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় (Object)। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়ভোগই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে শব্দ দ্বারা ডাকিলে, নিশ্চয়ই পুরুষ জাগরিত হইবে। কিন্তু বালাকি দেখিল, পুরুষ ত জাগিল না। অজাতশত্রুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। বিষয় উপস্থিত সত্ত্বেও, যখন তাহাতে আত্মার ভোগ হইতেছে না, তখন ভোক্তৃত্ব ব্যতিরিক্ত অন্য রকম আর একটী স্বরূপ আত্মার নিশ্চয়ই আছে। বালাকিকে এই তত্ত্বটী সহজে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য, রাজা ঐ সকল নামে পুরুষটীকে ডাকিয়াছিলেন। কোন পদার্থই আপন স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। দাহ করাই অগ্নির স্বভাব; দাহ্য তৃণ-খণ্ড উপস্থিত হইলে, অগ্নি তাহা দগ্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব বিষয়-ভোগই যাহার স্বভাব,—সেই আত্মার পক্ষে, শব্দাদি-বিষয় উপস্থিত হইলেই, তাহার উপলব্ধি না হইয়া পারে না। সুতরাং নাম ধরিয়া ডাকাতে সুষুপ্ত-পুরুষটী যে জাগিল না;—ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিষয়োপলব্ধি করাই আত্মার একমাত্র স্বরূপ নহে। বিষয়-ব্যতিরিক্তও আত্মার একটী স্বরূপ আছে। যদি বলা যায় যে, বিষয়াতিরিক্ত (নিরুপাধিক) আত্মার সহিতও ত নাম রূপাদি-বিষয়ের সম্বন্ধ আছেই (কেন না, সে আত্মা ত সর্ব্বব্যাপী), তবে সম্বোধন করিয়া যখন সুষুপ্ত-পুরুষকে ডাকা হইয়াছিল, তখন সেই নিরুপাধিক আত্মাই (পুরুষই) বা জাগিলেন না কেন? এ কথার উত্তর এই যে,—বিষয়মাত্রেরই সঙ্গে ত তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তবে আর কেবল শব্দ-বিষয়ে (সম্বোধন-শব্দে) তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ কেন হইবে? যাঁহার সমগ্র-দেহটীর সহিত সাধারণ-সম্বন্ধ আছে, তাঁহার আবার কেবল হস্তাঙ্গুলিতেই বিশেষ সম্বন্ধ কেমন করিয়া হইবে?

অর্থাৎ কথাটা এই যে, সুষুপ্তাবস্থায় সমুদয় ইন্দ্রিয়-গুলি প্রাণে বিলীন হইয়া যায়, তখন আত্মার বিষয়াতীত স্বরূপ লাভ হয়; সুতরাং বিষয়ে অভিমান বা আত্মমনঃ-সংযোগ না থাকায়, তৎকালে বিষয়োপলব্ধি হয় না; তৎকালে ইন্দ্রিয়-গুলির কোন ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি হয় না। কেননা, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি এক প্রাণ-শক্তিতেই বিলীন থাকে। তখন বিশেষ-বিজ্ঞান ও বিশেষ-ক্রিয়া (Phenomenal) তিরোহিত হইয়া, সকল ক্রিয়া ও সকল বিজ্ঞানের সাধারণ অধিষ্ঠানরূপে (Noumenon) আত্মা অবস্থিত রহেন। অতএব প্রাণাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ, আত্মা ইন্দ্রিয়েরও অতীত। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা না থাকিলে,—এক ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) যাহাকে দেখিয়াছিল, আজ ত্বগিন্দ্রিয় তাহাকেই স্পর্শ করে কেমন করিয়া? মনই বা তাহাকে স্মরণ করে কেমন করিয়া? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলিকেই এক একটা ভিন্ন ভিন্ন আত্মা* বলিয়া ধরিয়া লইলে,—'যে আমি একটা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই তাহার গর্জ্জন শুনিতেছি, আবার সেই আমিই কল্য সেই আগ্নেয়াস্ত্রটার কথা স্মরণ করিব',—এই প্রকারের একত্ব-প্রতীতি কদাপি হইতে পারে না। এইরূপ, দেহাতীত আত্মাও আছেন ইহাও প্রমাণ করা কঠিন নহে। সেই সুষুপ্ত-পুরুষ হইতেই একথাও বুঝা যায়। পুরুষটিকে যখন হস্তদ্বারা বিশেষ একটু পেষণ করা হইয়াছিল, তখনই সে ব্যক্তি জাগিয়াছিল। দেহই যদি আত্মা হয়, তবে এই বিশেষ পেষণের আবশ্যক কি? অল্প একটু স্পর্শ করিলেই ত পুরুষটী জাগিয়া উঠিত! মৃদু, মধ্যম, কঠিনাদি-ভেদে স্পর্শের যে বিশেষ বিশেষ প্রকার-ভেদ আছে,—সমগ্র দেহটিই যদি আত্মা হয়,—তবে স্পর্শের ভেদ হওয়া ত সম্ভব হয় না। কেন না, দেহের সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমান বোধ রহিয়াছে, অংশ-বিশেষে বিশেষ-প্রকারের স্পর্শ-বোধ ত তাঁহার সম্ভবে না। অতএব, যিনি, পুরুষটিকে হস্ত-পেষণ দ্বারা ডাকার পরই, স্বপ্রকাশরূপে

প্রতিবুদ্ধ হইলেন এবং জ্ঞান ও চেষ্টার উদয় হওয়ায় যেন সুপ্ত-নিশ্চেষ্ট দেহকে সজীব—সজাগ—করিয়া দিলেন, তিনিই দেহাতিরিক্ত আত্মা। আত্মা যে প্রাণাতিরিক্ত তৎসম্বন্ধে আর এক যুক্তি এই যে, সংহত-পদার্থ-(Aggregate)-মাত্রই, তদতিরিক্ত অন্য কাহারও প্রয়োজন-সাধন করিবার জন্যই সংহত হইয়া থাকে ;—এই অনুমান-বলে,—প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহাদি সমুদয় গুলিই ত সংহত-পদার্থ; সুতরাং ইহাদের সকলের অতিরিক্ত আত্মা আছেন *। অতএব আত্মার বা ব্রহ্মের সগুণাতিরিক্ত, একটি নির্গুণ-স্বরূপ আছে। আমরা এই তাৎপর্য্যটি শঙ্কর-ভাষ্য হইতে গ্রহণ করিলাম।

সেই সুষুপ্ত-পুরুষটী এইরূপে জাগিয়া উঠিলে, রাজা অজাত-শত্রু বালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই পুরুষটী যখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, তখন ইহার আত্মা কোথায় ছিল এবং পরেই বা কোথা হইতে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল”? বালাকি, রাজার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারায়, রাজা বলিতে লাগিলেন—

“এই পুরুষ যখন গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন ইহার আত্মা,—ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়গত সামর্থ্য উপসংহৃত করিয়া, হৃদয়াকাশে লীন ছিল। গাঢ় সুষুপ্তিকালে আত্মা স্বকীয় স্বরূপে অবস্থান করে। অন্তঃকরণাদির বিশেষ বিশেষ বিষয়-প্রকাশ-

* “সংহতত্বাচ্চ পারার্থ্যোপপত্তিঃ প্রাণস্য।...স্বাবয়ব-সমুদায়-জাতীয়-ব্যতিরিক্তার্থং সংহন্যতে ইতি”—ভাষ্যকার। “প্রাণাদিঃ স্বাতিরিক্ত-দ্রষ্ট্রশেষঃ সংহতত্বাৎ...ইতি সিদ্ধো দ্রষ্টা নির্ব্বিকারঃ”—আনন্দগিরি।

সামর্থ্য, তখন হৃদয়াকাশে এক সাধারণ-শক্তিবীজে লীন হইয়া যায়। ইহাই আত্মার নিরুপাধিক স্বরূপাবস্থা। ইহাকেই আত্মার সুষুপ্তি-অবস্থা বলে। তখন চক্ষুঃ, কর্ণ, বাক্য, অন্তঃকরণাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি একাকার হইয়া, আত্মায় অবিভক্ত-ভাবে অবস্থান করে *। অভিমান-আরোপই, বিশেষ বিজ্ঞানের হেতু।

পুরুষ যখন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করিয়া থাকে, তখন,—জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা যাহা অনুভূত হইয়াছিল, তাহাই সংস্কারাকারে অন্তঃকরণে উদিত হয়। পুরুষ তখন—সেই সকল সংস্কার বশতঃই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। এই জন্যই স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যিক চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া না থাকায়, জাগ্রদবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে যাহা অনুভব করিয়াছিল, তাদৃশ অনুভবের সদৃশ বাসনা বা সংস্কার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয় এবং 'এই আমি রাজা হইয়াছি', 'এই আমার প্রজাবর্গ',—এই প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হয়। ঐ গুলি, অন্তঃকরণে অঙ্কিত সংস্কারেরই ফল। জাগ্রদবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বার দিয়া পুরুষ যে রূপাদি

* সুষুপ্তাবস্থায় অন্তঃকরণের দর্শন-স্মরণাত্মক স্পন্দন-গুলি তিরোহিত হইয়া যায় এবং প্রাণ-শক্তিতে লীনভাবে থাকে। "দর্শন-স্মরণে এবহি মনঃস্পন্দিতে, তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্। নিগুণ্ডি-চ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীত্যব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে"—শঙ্করভাষ্য, গৌড়পাদীয়শ্লোক, ১।৩।

দর্শন ও সুখ-দুঃখানুভব করে;—ইহা যেমন আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ নহে; এইরূপ অন্তঃকরণস্থ সংস্কারের প্রভাবে যে স্বপ্ন-দর্শন-কালে নানারূপ সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, তাহাও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। আত্মা এই দুই অবস্থারই অতীত বস্তু *। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিষয়াদি-যোগে নানা ক্রিয়া হইতে থাকে

* "তস্মাৎ অন্যোঽসৌ দৃশ্যেভ্যঃ স্বপ্ন-জাগরিত-লোকেভ্যো দ্রষ্টা।"—ভাষ্যকার। অন্তঃকরণরূপ দ্বার যোগেই স্বপ্ন-দর্শন হয়। তখন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না; ইন্দ্রিয়-গুলি অন্তঃকরণে লীন হয়; কিন্তু তখন অন্তঃকরণের বৃত্তি-গুলি বাসনাকারে (স্মৃতি-রূপে) জাগরূক থাকে। অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি গুলি, আত্মার জ্ঞেয় বা দৃশ্য; আত্মা উহাদের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। সুতরাং সে কালেও আত্মা অন্তঃকরণ-বৃত্তি হইতে পৃথক্ রহিয়া যান; কেন না, দ্রষ্টা কখনই দৃশ্য হইতে পারে না। অতএব তখনও আত্মার প্রকৃত স্ব-প্রকাশ-স্বরূপ নষ্ট হয় না। আত্ম-প্রকাশ দ্বারাই তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তি-গুলি প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তাবস্থায়, এই অন্তঃকরণ-বৃত্তি-গুলিও ক্রিয়া করে না; উহারা প্রাণ-শক্তিতে লীন হইয়া যায়। তখনও, প্রাণ-শক্তি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মার স্ব-প্রকাশ-স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তি-গুলি ক্রিয়া করে না বলিয়াই বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না। কেন-না, যে দ্বার দিয়া অনুভূত হইবে, সেই দ্বারটী তখন রুদ্ধ, নিশ্চেষ্ট থাকে। তখন অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণের ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয় না। যখন অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণের ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়, তখনই স্বপ্ন-দর্শন হইয়া থাকে। অতএব, এই সকল অবস্থায়—অন্তঃকরণ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক্ বলিয়া—আত্মার স্ব-প্রকাশত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না।—প্র—উ ভাষ্য।

বলিয়াই, ঐ গুলির দ্বারা—আত্মার প্রকৃত একরস, নিত্য, নির্ব্বি-কার-স্বরূপ আবৃত হইয়া পড়ে এবং আত্মাকে ঐ সকল ক্রিয়ার সহিত তখন একীভূত বলিয়া বোধ হয় *। এই জন্যই, কি জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায়, উভয় অবস্থাতেই আত্মাকে সুখ-দুঃখাত্মক ও নানা ক্রিয়াশীল কর্ত্তা, ভোক্তারূপে, ধারণা হয়। আত্মা যে এই সকল দৃশ্যবর্গের অতীত, আত্মার এই 'স্বাতন্ত্র্যের' কথাটী আর তখন বোধ হয় না। অতএব এই দৃশ্যবর্গ অসত্য ; কেন না, এগুলি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে।

কিন্তু গাঢ় সুষুপ্তির অবস্থায়, আত্মা নিজ-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া বা বিষয়-সম্পর্ক থাকে না বলিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। সর্ব্বক্রিয়া-সাধারণ ও সর্ব্ববিজ্ঞান-সাধারণ-রূপে তখন আত্মা অবস্থিত থাকেন, তখন আর কোন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ ক্রিয়া থাকে না। কেন না, তখন বিশেষ-ক্রিয়া ও বিশেষ-বিজ্ঞানের হেতুভূত অন্তঃকরণ ও

---

* জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল অনুভূতি হয়, সে গুলি আত্মার 'দৃশ্য'। সুতরাং আত্মা, এই দৃশ্যবর্গ হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং এই অনুভূতিগুলি আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ হইতে পারে না। অথচ আমরা জাগ্রদ-বস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় এই সকল অনুভূতিকেই আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ বলিয়া মনে করি। ইহাই ভ্রম। এই জন্য গীতাভাষ্যে (১৮।৫০) শঙ্কর বলিয়া-ছেন—"নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং সর্ব্বৈরভ্যুপগম্যতে,সর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমানত্বাৎ।...বাহ্যাকার-নিবৃত্তিবুদ্ধীনাম্ভ নান্তঃ পরং সুখমস্তি... আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্তুন্তরামুপলব্ধেঃ"।

ইন্দ্রিয়-গুলি একাকার হইয়া, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ অবিকারী আত্মাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাই সুষুপ্তির অবস্থা,—অব্যাকৃত অবস্থা; ইহাই আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ।

হৃদয় বা মেরুদণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া, দ্বিসপ্ততি সহস্র (অসংখ্য) শিরা-জাল *, অশ্বত্থপত্রের শিরার ন্যায় দেহের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জাগ্রদবস্থায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির চালক ও অধিষ্ঠাতা বুদ্ধি (বিজ্ঞান-শক্তি), ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলিকে ঐ সকল শিরা-পথে ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ স্থানে (গোলকে) প্রসারিত করিয়া দেয়।/বিজ্ঞানময় আত্মা, ঐ সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি-সংসর্গে নিজেও প্রকাশিত হন। ইহাই জাগ্রদবস্থা। এইরূপে জাগ্রদবস্থায় আত্মা, বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে বুদ্ধিবিকাশ করেন। আবার ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি যখন ঐ সকল শিরা-পথ বহিয়া হৃদয়ে প্রতিসংহৃত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-চৈতন্যও প্রতিসংহৃত হন। ইহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা। তৎকালে বুদ্ধির সংস্কার-রাশি † আত্ম-চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়। আবার সুষুপ্তি-

---

* শিরা-জাল—Nerves. আধুনিক তন্ত্রের মতে, স্নায়ুগুলি (Nerves) মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। "এই শিরাগুলি অন্নরসের পরিণতি মাত্র"—ভাষ্য। পদ্মাকৃতি মাংসপিণ্ডই 'হৃদয়'। এই হৃদয়াকাশেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের স্থান।

† "স্বপ্নদ্রষ্টুর্মনস এব বাসনাবত্তঃ স্বপ্নে বিষয়ত্বাৎ অতিরিক্ত-বিষয়াভাবাৎ"।

কালে, এই বুদ্ধিও প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং তখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-নিবহের সহিত ক্রিয়াভাব-বশতঃ সম্পর্ক-শূন্য হওয়ায় *, আত্ম-চৈতন্যে শোক-দুঃখ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তখন আত্মা,—পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তিরূপে স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ণানন্দেরও অবস্থা। সেই আনন্দের অংশ-ভূত বিশেষ বিশেষ সুখ-দুঃখের প্রতীতিও তখন আর থাকে না। কেন না, বিশেষ-বিজ্ঞানের হেতুভূত অন্তঃকরণ তখন লীন হইয়া গিয়াছে. সুতরাং মুখ্যব্রহ্ম, সকল বিকারের অতীত।

যেমন উর্ণনাভ আপন শরীব হইতে তন্তুজাল বাহির করে; এবং তন্তুগুলি উহার শরীর হইতে, একান্ত ভিন্ন বস্তু নহে, যেমন এক অগ্নি হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ আপনিই বহির্গত হয়; এবং এই স্ফুলিঙ্গ-গুলি অগ্নিরই অবয়ব, কোন 'ভিন্ন' বস্তু নহে; তেমনই এক চৈতন্য-শক্তি হইতে আপনিই,—সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, অগ্ন্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ-সমূহ, স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থ বাহির হইয়াছে। উহারা স্থিতিকালে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে, আবার প্রলয়ে সেই পূর্ণ-শক্তিতেই অবিভক্তরূপে লীন হইয়া যাইবে। ইহারা সকলেই ব্রহ্ম-সত্তাতেই পূর্ব্বে ছিল, এখনও উহারা ব্রহ্ম-সত্তা হইতে একান্ত

* "নহি সুষুপ্তিকালে শরীর-সম্বন্ধোঽস্তি"—ভাষ্যকার।

'ভিন্ন'রূপে উৎপন্ন হয় নাই।* এই আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বাতীত, সাধারণ ও পূর্ণ। প্রাণাদি তাবৎ বস্তুই 'সত্য'। ব্রহ্মবস্তু এই সত্য হইতেও 'পরমসত্য'। এই ব্রহ্মবস্তু—নামরূপ, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য ও নির্ব্বিশেষ"।

এই সকল উপদেশে বালাকি, সর্ব্বাতীত শুদ্ধ-চৈতন্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে আরো কয়েকটী প্রয়োজনীয় তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই স্থলেই পাঠকবর্গকে সেই-গুলি শুনাইব। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন——

(১) জীবাত্মা প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহেন। জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় যে পুরুষ-চৈতন্য দর্শন-শ্রবণাদি বিষয় উপলব্ধি করেন, সুষুপ্তাবস্থাতেও সেই পুরুষ-চৈতন্যই অবস্থিত থাকেন। যতদিন সংসারে বিষয়ানুভূতি করেন, ততদিনই, ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই "জীবাত্মা" শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যতদিন অবিদ্যা বা ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে, ততদিনই বিষয়বর্গে ও সুখ-দুঃখাদিতে অভিমান ও মমত্ব অর্পণ করিয়া, জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রকৃত-পক্ষে এই জীব-চৈতন্য, পরমাত্ম-চৈতন্য ব্যতীত অপর কোন 'ভিন্ন' বস্তু হইতে পারে না। সকল অবস্থার মধ্যেই পরমাত্ম-চৈতন্য ঠিকই থাকেন। অবস্থার ভেদে প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার কোন ভেদ হয় না। যে পদার্থের যে ধর্ম্ম বা স্বরূপ, সেই ধর্ম্ম বা স্বরূপটী কদাপি কোন অবস্থান্তর দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় না। উপবেশনের সময়ে, দ্রুতগমনাবস্থায় ও শয়নাবস্থায়—এই সকল অবস্থাতেই

* "তস্মাদাত্মন ইতি আত্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরাভাবাৎ"। "কুতশ্চিদাগাৎ অন্তস্মাৎ অন্ত ইতি·····বুদ্ধিঃ নিবর্ত্তয়িতব্যা" ।—ভাষ্য।

একটী অশ্ব, অপর কোন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয় না। সে পূর্ব্বেও যে অশ্ব,- এই সকল উপবেশন, শয়নাদি অবস্থান্তরের মধ্যেও সেই অশ্ব-ই রহিয়া যায় *। সুতরাং পরমাত্মার সংসারাবস্থাই বল, আর জাগ্রদাদি যে কোন অবস্থাই বল, সকল অবস্থান্তরের মধ্যেই সেই পরমাত্মাই থাকেন; তিনি অপর কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ হইয়া উঠেন না। সর্ব্বাতীত, সকলের কারণ, এই পরমাত্ম-চৈতন্য হইতেই নামরূপাত্মক বিবিধ বিকার-সঙ্কুল এই জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তিনিই সর্ব্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া "জীবাত্মা" রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং, জীবাত্মা—সেই পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহেন।

শ্রুতিতে এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—"অগ্নি হইতে যেমন সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, এক পরমাত্ম চৈতন্য হইতেও তদ্রূপ সহস্র জীব-চৈতন্য বহির্গত হইয়াছে"। আবার "জীব, পরমাত্মারই অংশ"—এরূপ কথাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল উক্তি দ্বারা জীব-চৈতন্যকে পরমাত্মার কোন 'বিকৃত-অবস্থা' বা 'অংশ-বিশেষ' মনে করা সঙ্গত নহে। কেন না, পরমাত্ম-চৈতন্যের কোন অবয়ব নাই, কোন বিকার নাই। তিনি নিরবয়ব, নির্ব্বিকার। সুতরাং তাঁহার 'অংশ' সম্ভব হইতে পারে না। পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই, এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। লৌকিক বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে, অজ্ঞাত ব্রহ্ম বস্তুর নির্ণয়

---

* "নহি লোকে গৌ স্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বা অগৌ র্ভবতি, শয়ানস্তু অশ্বাদি-জাত্যন্তর-মিতি। যদ্ধর্ম্মকো যঃ পদার্থঃ প্রমাণেন অবগতো ভবতি, স দেশ-কালাবস্থান্তরেষপিত দ্ধর্ম্মক এব ভবতি। স চেত্তদ্ধর্ম্মকত্বং ব্যভিচরতি, সর্ব্ব-প্রমাণাদিব্যবহারো লুপ্যেত"।

করা সম্ভব নহে। ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই, এই সকল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা জানি যে, অগ্নি হইতে যে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, এই স্ফুলিঙ্গ সকল প্রকৃত-পক্ষে অগ্নি ব্যতীত 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহে; উহারা অগ্নি-ই। অংশ-সকল—অংশী হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু হইতে পারে না *। হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণ হইতে একান্ত 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহে; ইহারা প্রকৃত-পক্ষে স্বর্ণ-ই। এই রূপে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত-দ্বারা ব্রহ্ম-বস্তুর একত্ববোধ দৃঢ় করিয়া দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। জগতের নাম-রূপাত্মক বিবিধ বিকারবর্গ যখন ব্রহ্ম সত্তা হইতেই উৎপন্ন, তখন ইহারা প্রকৃত-পক্ষে, সেই ব্রহ্ম সত্তা হইতে একান্ত 'ভিন্ন' নহে। এই প্রকারে নাম-রূপাদি বিকার দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম-সত্তার একত্ববোধ দৃঢ় করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের বিবরণও শ্রুতিতে প্রদত্ত হইয়াছে †। ব্রহ্মের স্বরূপ বোধের জন্যই, নাম-রূপাদির বিকাশ। যাহা কার্য্য, তাহা কথনই কারণ-সত্তা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে না। যাহা কার্য্য, তাহা কারণ-সত্তারই অবস্থান্তরমাত্র, বিশেষাকার মাত্র; কারণ-সত্তারই পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র ‡।

* "অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গো অগ্নিরেবেতি—একত্ব-প্রত্যয়ার্হৌ দৃষ্টৌ লোকে। তথাচ অংশঃ অংশিনা একত্ব-প্রত্যয়ার্হঃ"। পাঠক দেখিবেন শঙ্কর জগৎকে উড়াইয়া দিতেছেন না।

† "পরমাত্মৈকত্বপ্রত্যয়দ্রঢ়িম্নে উৎপত্তিস্থিতিলয়-প্রতিপাদকানি বাক্যানি"। 'তস্মাৎ একত্বপ্রত্যয়-দার্ঢ্যায়ৈব সর্ব্ববেদান্তেষু উৎপত্তিস্থিতি-লয়াদিকল্পনা, ন ভেদপ্রত্যয়করণায়" ॥

‡ 'কার্য্যস্ত কারণাত্মত্বম্',—বেদান্ত-ভাষ্য, (২।১।৬) 'কারণাৎ ব্যতি-

কিন্তু অবস্থান্তর দ্বারা, পদার্থটী একবারে ভিন্ন হইয়া যায় না *। যাহা পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র, তাহাকে স্বতন্ত্র, পৃথক্, বস্তু বলিয়া বোধ করা অজ্ঞানীর কার্য্য। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, কার্য্য—কারণ-সত্তা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, উহা অগ্নি ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু ছিল না; বহির্গত হওয়াতেও উহা সেই অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছু ভিন্ন জিনিষ হইয়া উঠে নাই †। নাম-রূপাদি বিকারও, পরম-কারণ ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই বহির্গত হইয়াছে। উহারা পূর্ব্বেও ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না; এখনও উহারা ব্রহ্ম-সত্তা ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে নাই। যাঁহাদের অবিদ্যা নষ্ট হয় নাই, তাঁহারাই এই সকল নাম-রূপাদি বিকারকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই বোধ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ভেদ-দৃষ্টি বড়ই প্রবল। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, এই সকল অবস্থার ভেদে প্রকৃত-পক্ষে পরমাত্মার কোন ভেদ হয় নাই।

রেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য’—ইত্যাদি। ‘বিকারে অনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং ‘তদিদং সর্ব্বমিত্যুচ্যতে’, কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তম্’। বেঃ ভাঃ ১।১।২৫ ‘আকাশ স্তল্লিঙ্গাৎ’ (লিঙ্গং-পরিচায়কং চিহ্নম্)। ইত্যাদি দেখ। “কার্য্যেণ লিঙ্গেন কারণ ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বং সৃষ্টি শ্রুতীনাম্’—বেদান্ত-দর্শন, রত্নপ্রভা, ১।৪।১৪॥

* “ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ’। বেঃ ভাঃ ২।১।১৮॥

† বিস্ফুলিঙ্গস্য, প্রাগগ্নেঃ ভ্রংশাৎ, অগ্ন্যেকত্বদর্শনাৎ, একত্বপ্রত্যয়-দার্ঢ্যায় সুবর্ণমণিলোহাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্তা, ন উৎপত্ত্যাদিভেদপ্রতিপাদন-পরাঃ”। ভাষ্যকার।

তাঁহারা বুঝেন যে, একই কারণ-সত্তা সকল-বিকারে অনুগত ও অনুস্যূত রহিয়াছে; এই সকল বিকার, সেই সত্তারই অবস্থান্তর মাত্র; ইহারা সেই কারণ-সত্তা হইতে একান্ত 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহে। এই প্রকারে তত্ত্বদর্শীগণ সকল ভেদের মধ্যে সেই অদ্বৈত-সত্তার অনুভব করেন; তাঁহাদের চক্ষে অভেদ-দৃষ্টিই প্রবল হইয়া উঠে; ভেদ-দৃষ্টি থাকে না *। তাঁহাদের চক্ষে এই সকল বিকার কেবল ব্যবহারিক-ভাবে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; পরমার্থতঃ তাঁহারা এক অদ্বৈত-সত্তাই অনুভব করেন। অতএব, বিকার,অংশ, শক্তি, জীবাত্মা—প্রভৃতি কিছুই এক একটা 'স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া তত্ত্বদর্শী অনুভব করেন না। সমস্তই এক ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র, এইরূপ অনুভব দৃঢ়তা লাভ করে। এই প্রকারে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত, একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম-সত্তারই একত্ব-প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে; এই সকল দৃষ্টান্তের এবং শব্দ প্রয়োগের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই †।

(২) শঙ্করাচার্য্য এই ভাষ্যে আরো একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ

---

* "ন তদা তত্র বিবেকিনাং পরমাত্মৈকদেশঃ 'পৃথক্'-সংব্যবহার-ভাগিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। অবিবেকিনাং মিথ্যাবুদ্ধিত্বাৎ, বিবেকিনাঞ্চ সংব্যবহার-মাত্রাবলম্বনার্থত্বাৎ'।...ন চ পরমার্থতঃ কুক্ষোরস্কো বা আকাশো ভবিতুমর্হতি'। ইত্যাদি ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† "অংশাদি-শ্রুতিস্মৃতিবাদাশ্চ একত্বার্থা, নতু ভেদপ্রতিপাদকাঃ'।' —ভাষ্য।

প্রিয় পাঠক,ভাষ্যকারের এই সকল উক্তি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন। তিনি জগতের কোন পদার্থকেই উড়াইয়া দিতেছেন না। দ্বৈত-পক্ষেও কিপ্রকারে অদ্বৈত-বোধ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকে না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যকে 'মায়াবাদী' বলিয়া উপহাস করে।

করিয়াছেন। পাঠক তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেখুন্। তিনি বলিয়াছেন,—

যদিও শ্রুতি, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম-বস্তু ব্যতীত নামরূপাদি বিকারবর্গকে অসার, অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত, অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ব্রহ্ম-বিদ্যার যে কোন বিরোধ আছে, তাহা মনে করা ভুল *। যে ব্যক্তির চিত্ত যতটুকু সংস্কৃত, যতটুকু বিশুদ্ধ, সেব্যক্তি সেই প্রকার সাধনেরই অবলম্বন করিয়া থাকে। যাহার মতি যে প্রকার, যাহার মনের ইচ্ছা যেরূপ, সে ব্যক্তি তদনুসারেই সাধন অবলম্বন করে। যাহারা রাগ দ্বেষ-চালিত, তাহারা স্বর্গাদি-সুখের কামনায় সকাম ক্রিয়াকাণ্ড আচরণ করিয়া থাকে। আর যাঁহারা বিষয়ে বিরক্ত, যাঁহারা বিশুদ্ধ-চিত্ত, তাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র কাহাকেও কোন বিষয়ে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত করেন না। কোন বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্তও করেন না। লোক আপন রুচি অনুসারে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লয় এবং তদনুসারে সাধন গ্রহণ করিয়া থাকে। সকাম-কর্ম্মের নিন্দাবাদ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় এবং শ্রুতি সেই অদ্বয় ব্রহ্ম-তত্ত্বেরই একমাত্র সত্যতা খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া, শ্রুতি কাহাকেও জোর

---

* নামরূপাদি ভেদের একমাত্র উদ্দেশ্য অভেদ-প্রতিপাদন। সকল প্রকার স্বতন্ত্রতা, সকল প্রকার-ভেদ, সকল-প্রকার বিকার—ব্রহ্মের একত্বের জ্ঞান দৃঢ় করিয়া দেয়, পাঠক একথা উপরে পাইয়াছেন। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে ভেদবুদ্ধি লইয়াইত সংসার; কর্ম্ম-কাণ্ডাদি সকলইত ভেদবুদ্ধি লইয়া। তবে কি কর্ম্ম-কাণ্ড নিরর্থক? এই আশঙ্কার উত্তর দিবার জন্যই শঙ্কর এই ভাষ্যাংশটী লিখিয়াছেন।

করিয়া কোন সাধন-বিশেষ গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। লোকে শ্রুতির উপদেশ পড়িয়া, আপন রুচি অনুসারে ইচ্ছা হয়, ব্রহ্ম-পথের পথিক হউক্; আর যদি সে দিকে চিত্ত ধাবিত না হয়, সকাম কর্ম্ম-কাণ্ডই গ্রহণ করুক্। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞান-কাণ্ডের কোনই বিরোধ নাই। যতদিন স্বতন্ত্রতা-বোধ আছে, যতদিন ভেদবুদ্ধি প্রবল থাকে; ততদিনই লোক স্বর্গাদি-কামনায় দেবতা-বর্গকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া লইয়া, তদনুরূপ সকাম উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভেদবুদ্ধি অপগত হইলে, সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তার প্রতীতি দৃঢ় হইলে, কাহাকেই ত আর 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ থাকে না; তখন ত আর উপাস্য ও উপাসক এরূপ ভেদবোধও থাকে না; সুতরাং তখন আর কর্ম্মেরও কোন আবশ্যকতা থাকে না। তখন কেবল এক জ্ঞানেরই উপযোগিতা থাকে। সর্ব্বপদার্থে এক ব্রহ্ম-সত্তার বিচার, সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব,—ইহাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। সুতরাং, কর্ম্ম ও জ্ঞান—ইহাদের বিষয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহাদের সাধকও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব, কর্ম্ম ও জ্ঞানে কোনই বিরোধ নাই। এই জন্য বুঝা যাইতেছে যে, দ্বৈত-সত্ত্বেও যেমন অদ্বৈত-বোধ জন্মিতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই যে, কর্ম্মকাণ্ড নিরর্থক হইয়া গেল, তাহা নহে *। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদিও শ্রুতিতে

---

* শঙ্করাচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত হইতেও আমরা আরও একটী তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি। এতদ্দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনি এজগৎকে উড়াইয়া দেন নাই। যাহাদের কর্ম্ম (যজ্ঞাদি,) কর্ম্মফল (স্বর্গাদি) ও কর্ম্ম-কর্ত্ত্বাদি ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মই কর্ত্তব্য। আর যাহা-

ব্রহ্মের একত্ব-বোধই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা যেমন এই বহুত্ব-পূর্ণ জগৎ উড়িয়া যায় না ; তদ্রূপ আবার কর্ম্ম-কাণ্ডাদি উপাসনাও নিরর্থক হইয়া উড়িয়া যায় না *।

দের ভেদবুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কেবল জ্ঞানেরই চর্চ্চা আবশ্যক। একথায় সংসার উড়িয়া যাইতেছে না। সংসারের কার্য্যও উড়িয়া যাইতেছে না। না বুঝিয়া লোকে শঙ্করকে দোষ দেয়।

* বৃহদারণ্যকের অন্যস্থলেও একথা ভাষ্যকার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সলিলফেন-দৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বাৎ, মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ। যদা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মতত্ত্বাৎ অন্যত্বেন নিরূপ্যমানে নামরূপে মৃদাদিবিকারবদ্বস্তন্তরে তত্ত্বতো ন স্তঃ, সলিলফেনঘটাদিবিকারবদেব,—তদা তদপেক্ষয়া একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থদর্শন-গোচরত্বং প্রতিপদ্যতে। যদা তু স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া......নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোঽস্তি।......অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা"।—বৃহ০ভা০, ৩৷৫৷১॥ পাঠক দেখুন্ কেমন স্পষ্ট নির্দ্দেশ। আবার, কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডেও যে বিরোধ নাই, তাহাও অন্যত্র সুস্পষ্ট। "স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া যুক্তায়...যথাভিমতপুরুষার্থসাধনং কর্ম্ম উপদিশত্যগ্রে ; পশ্চাৎ ক্রিয়াকারকাদি-দোষদর্শনবতে···তদুপায়ভূতাং আত্মৈকত্বদর্শনাত্মিকাং ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতি।......তথা প্রতিপুরুষং পরিসমাপ্তং শাস্ত্রমিতি ন শাস্ত্রবিরোধগন্ধোঽপ্যস্তি"—বৃহ০ ভাঃ। ৫৷১৷১॥ পাঠক দেখুন্ কেমন স্পষ্ট নির্দ্দেশ। এ সকল দেখিয়াও কেন যে লোকে শঙ্করাচার্য্যকে "মায়াবাদী" প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বৃহ০ ৪৷৫৷১৫ ভাষ্যেও পাঠক ইহার মীমাংসা দেখিবেন।

প্রিয় পাঠক, ভাষ্যকারের এই দুই প্রকার সিদ্ধান্ত ভুলিবেন না। লোকে ভাষ্যকারের এই সকল গূঢ়-তত্ত্ব মনোযোগ দিয়া দেখেনা বলিয়াই, শঙ্করাচার্য্যের মত-সম্বন্ধে বহু অপসিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই গ্রন্থে, ভাষ্যকারের মতের প্রকৃত যাহা উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য, তাহাই প্রদর্শন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•০•:—

(মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান।)

পূর্ব্বকালে, যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুইটী পত্নী ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক্য, বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলন-উদ্দেশে, বিষয়-কোলাহল হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া, মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি! আমি বিষয়-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, একাকী নির্জ্জনে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাইবার সময়ে, আমার যাহা কিছু দ্রব্যাদি ও সম্পত্তি আছে, তাহা তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব মনঃস্থ করিয়াছি। অতএব তুমি কাত্যায়নীকেও এইখানে লইয়া আইস"। মৈত্রেয়ী স্বামীর এইরূপ কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! আপনি যে ধন-সম্পত্তির কথা বলিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, এই সাগর-মেখলা সমগ্র পৃথিবী যদি ধন-ধান্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া, আমার অধিকার-ভুক্ত হয়, তবে প্রভু! আমি

কি অমরত্বলাভ করিতে পারিব ? আর, এই ধন-সম্পত্তি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিলেই কি আমি অমর হইতে পারিব" ? যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর এতাদৃশ সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া বড় আহ্লাদে উত্তর দিলেন,—"না মৈত্রেয়ি ! তাহা কেমন করিয়া হইবে ? বিভবশালী ব্যক্তির যেমন কোন প্রকার সাংসারিক অভাব থাকে না, সে যেমন সাংসারিক—বিবিধ সুখলাভে সমর্থ হয় ; তোমার এই ধন-সম্পত্তি দ্বারা তাদৃশ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা হইতে পারিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রিয়তমে ! তুমি যে অমরত্ব-লাভের কথা বলিলে, এ ধন-সম্পত্তি-দ্বারা সে অমরত্ব-লাভের আশা কখনও করা যাইতে পারে না" । মৈত্রেয়ী স্বামীর এই উত্তর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত বিমর্ষ-অন্তঃকরণে, স্বামীকে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্ ! তবে এ ধন-সম্পত্তি, বিষয়-বিভব লইয়া আমি কি করিব ? যাহা আমাকে অমরত্ব দিতে পারিবে না, যাহা হইতে আমি অমৃতত্ব-লাভে বঞ্চিত হইব, এরূপ অসার ধন-সম্পত্তিমাত্র লইয়া আমার কি হইবে ? স্বামিন্ ! আপনি যে বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাকে সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন্" ।

যাজ্ঞবল্ক্য দেখিলেন, মৈত্রেয়ী ধন-সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, বিত্তাদির লোভে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র প্রলুব্ধ হইল না,—ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মৈত্রেয়ি ! তুমি চিরদিনই আমার প্রিয় ; কিন্তু আজ আমি

তোমার এইরূপ কথায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আজ আমার নিতান্তই প্রিয় হইলে। আইস; আমার নিকটে উপবেশন কর; আমি তোমায় অমৃতত্ব-লাভের উপদেশ প্রদান করিতেছি; মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর——

পতি যে জায়ার প্রিয় হন, তাহা পতির প্রয়োজন-সাধনার্থ নহে, আত্মারই প্রয়োজনে পতি জায়ার প্রিয় হন। এইরূপ, পুত্র, কন্যা, ধন, রত্নাদি বিশ্বের তাবৎ বস্তুই;—আত্মারই প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, লোকের নিকটে প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। এই সকল বস্তু, আত্মার প্রীতি-সাধন করিয়া থাকে বলিয়াই প্রিয় বোধ হয়; নতুবা কোন বস্তুই স্বাধীনভাবে—সেই বস্তুরই জন্য—কাহারই প্রিয় হইতে পারে না। আত্মাই লোকের মুখ্যরূপে প্রীতির বস্তু; আর সকল-পদার্থ গৌণ-ভাবে প্রীতির বস্তু। এই তত্ত্বটী তুমি বিশেষ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে। জানিবে, জগতে আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের পদার্থ, ভালবাসার সামগ্রী। জগতের যত কিছু খণ্ড খণ্ড বৈষয়িক-প্রেম, স্নেহ, আসক্তি, ভালবাসা দেখিতে পাও—সকলই সেই মহা-প্রেমের অন্তর্ভূত এবং সেই মহা-প্রেমেরই অংশভূত *। সেই পরমা-প্রীতি লাভের জন্যই,

* শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন যে "খণ্ড খণ্ড নাম ও রূপগুলি, অখণ্ড নাম ও রূপেরই অন্তর্ভুক্ত"। "নাম সামান্যাৎ সর্ব্বাণি নামানি প্রবিভজ্যন্তে বিশেষাণাঞ্চ সামান্যে অন্তর্ভাবাৎ"। "তস্মান্ন বস্তুতঃ পৃথক্ সন্তি"। ইত্যাদি দেখ। (বৃ০ ভা০) অতএব পাঠক দেখুন, আমাদের এই ব্যাখ্যাই শঙ্করের নিতান্ত অনুগত ব্যাখ্যা।

জগতের অন্যান্য প্রীতি রহিয়াছে। সেই পরমা-প্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদের সত্তা নাই। সুতরাং সেই পরমা-প্রীতি হইতে ভিন্ন করিয়া দিলে, এসকলের কোনই সার্থকতা থাকে না। পিতৃভক্তি, পত্নী-প্রেম, অপত্য-স্নেহ, বন্ধু-প্রীতি, ধনাদির প্রতি আসক্তি—এইরূপ যতকিছু প্রীতির সামগ্রী দেখিতেছ, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য, সেই মহাপ্রেম-লাভ *। জগতের সমস্ত প্রীতিই, সসীম, বিকারী, ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই মহা-প্রেম—অখণ্ড, নিত্য, ভূমা। ইহারা সেই মহা-প্রেমেরই আংশিক বিকাশ †। নিজের ক্ষুদ্র আত্ম-গণ্ডী হইতে আরম্ভ করিয়া, এই প্রীতি ক্রমে বাড়াইতে হয়। আত্ম-নিষ্ঠ প্রীতিকে অপত্যাদির প্রীতিতে; পারিবারিক প্রীতিকে পরকীয় প্রীতিতে; পরকীয় প্রীতিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের প্রীতিতে ক্রমে সম্প্রসারিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে সমগ্র-মানব-সমাজের প্রীতিতে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই সম্প্রসারণ ক্রমে বিশ্ব-প্রীতিতে পরিণত হইয়া,

---

* "যো হি নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্ব্বপ্রযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি।... সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ"—বৃহঃ ভাষ্য, ১।৪।৮। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" ইত্যাদি।

† "অস্য পরমানন্দস্য মাত্রা অবয়বাঃ ব্রহ্মাদিভির্মনুষ্যপর্য্যন্তৈর্ভূতৈরুপজীব্যন্তে"—ভাষ্য, ৪।৩।৩২ "অস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"।—ইত্যাদি। "বিশেষাণাঞ্চ সামান্যেঽন্তর্ভাবঃ"—বৃহ০ ভা০ ১।৬।৩॥

ব্রহ্ম-প্রেমে যাইয়া পর্য্যবসিত হয় *। অতএব, সেই এক অখণ্ড বিশাল প্রেম-সাগর হইতে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতির পৃথক্ স্বাধীন সত্তা নাই। ইহারা সকলেই সেই অখণ্ড প্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত। অখণ্ড পরমাত্ম-প্রেমই নিত্য-প্রেম। এই প্রেমেরই জন্য অন্যান্য প্রেমের বিকাশ। অতএব, এই মহাপ্রেম-সাগর পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। এই রস-স্বরূপকে আচার্য্য ও উপনিষদাদির বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপর, যুক্তি, তর্ক ও মননের বলে এই মহা-তত্ত্বটী হৃদয়ে ধারণা করিবে। এই প্রকারে সুনিশ্চিত আত্মাকে সর্ব্বদা ধ্যানযোগে

---

* আপাততঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এই ব্যাখ্যাটী শঙ্করের অভিপ্রায়ানুরূপ নহে। কিন্তু তাহা নহে। শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগুলি কতকগুলি জাতির (Species) অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গুলি আবার এক মহা-জাতির অন্তর্ভুক্ত। "অনেকে হি বিলক্ষণাঃ সামান্য-বিশেষাঃ। তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা একস্মিন্ মহাসামান্যেঽন্তর্ভাবঃ" —বৃহ০, ২।৪।৯। আবার তিনি বলিয়াছেন যে, 'যাহা বিশেষ, তাহা সামান্যেরই অন্তর্ভুক্ত' এবং 'সামান্যই বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে'। "নামবিশেষাণাং নাম-সামান্যাদাত্মলাভ" ইত্যাদি (১।৬।২)। শঙ্করের মত এই ক্রম-নিম্ন-স্তর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ক্রমোর্দ্ধ বিকাশে সৃষ্টি। সুতরাং আনন্দেরও ক্রমোর্দ্ধপরম্পরা আছে। "আনন্দমাত্রাবয়বদ্বারেণ মাত্রিণং পরমানন্দমধিগচ্ছতি।...অয়মানন্দঃ শতগুণোত্তরোত্তর-ক্রমেণ বর্দ্ধমানঃ যত্র গণিত-ভেদো নিবর্ত্ততে" ইত্যাদি (৪।৩।৩৩) স্থলে আনন্দের ক্রমোর্দ্ধ-বিকাশ ও ব্রহ্মে সেই বিকাশের পরাকাষ্ঠা বলা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যাই শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায়-সূচক।

ভাবনা করিবে। এইরূপে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে করিতে, আত্মার একত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এই ভাবে আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, বিশ্বের আর কোন বস্তুই জানিতে বাকী থাকে না। পরমাত্মাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের আশ্রয় এবং পরমাত্মার সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুরই পৃথক্, স্বাধীন সত্তা নাই। তাবৎ-পদার্থই আত্ম-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া, আত্ম-সত্তার আশ্রয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং জগতের লয়কালে ইহারা সেই আত্ম-সত্তাতেই বিলীন হইয়া রহিবে। তখন সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে ইহারা আত্ম-সত্তায় অবিভক্ত-ভাবে বিলীন হইয়া যাইবে *। পরমাত্ম-সত্তা ব্যতীত, কাহারই কোন অবস্থায়, পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং এই জগৎ সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্ম-ই ; সকলই আত্মা-মাত্র †। মৈত্রেয়ি ! এই মহাতত্ত্বটী বিশেষ করিয়া হৃদয়ে ধারণা কর।

---

* "নন্থ জগদিদং বিলীয়মানং শক্তিশেষমেব বিলীয়তে; তথা চ কুতো ব্রহ্মৈকরসস্য প্রতিপত্তিরিত্যাহ—শক্তিশেষলয়েঽপি তস্যা দুর্নিরূপত্বাৎ একরসস্য ধীরবিরুদ্ধা" ।—আনন্দগিরি।

† মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান হইতে আমরা শঙ্করের 'অদ্বৈত-বাদ'টী উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। 'সকলই ব্রহ্ম', 'এই জগৎই ব্রহ্ম',—বেদান্তের এই প্রকার উক্তির প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছেন ; সুতরাং ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। "যৎস্বরূপব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মত্বমেব দৃষ্টং লোকে"। বেদান্ত-দর্শনেও "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম"—এই প্রকার কথার অর্থ করা হইয়াছে যে, কারণ-সত্তা ব্যতীত কার্য্য-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না।

এই যে তোমায় ব্রহ্মের একত্বের কথা বলিলাম, মৈত্রেয়ি! ইহা বুঝিতে পারিলে ত? এই জগতের স্থিতিকালে, সৃষ্ট যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ, ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত ইহাদের কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। স্থিতিকালেও কি প্রকারে জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্ম-মাত্র, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। সেই চিদ্বস্তুই, সকল পদার্থে অনুস্যূত ও অনুগত হইয়া আছেন। যাহার স্বরূপ-ব্যতিরেকে, যে বস্তুকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সে বস্তু তৎস্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়। সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্ম-সত্তা-মাত্র। কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝা যাইতে পারে। শুন, মৈত্রেয়ি! দুন্দুভি নামক বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিলে, তাহা-হইতে সেই আঘাত-জনিত শব্দ উত্থিত হয়। তারপর, উহাতে ক্রমে অল্প-বিস্তর আঘাত করিতে থাকিলে, মৃদু-তীব্রাদি শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই সকল মৃদু-তীব্রাদি বিশেষ বিশেষ শব্দ-গুলিকে, কি কখনও দুন্দুভির আঘাত-জনিত সাধারণ-শব্দ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া গ্রহণ করা যায়? এই সকল মৃদু-তীব্রাদি বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি, সেই আঘাত-জনিত সাধারণ-শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত; ইহারা সেই সাধারণ-শব্দ হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে *। এইরূপ, আত্মার সত্তা-ব্যতীত, কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র

'বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি' কার্য্যঞ্চ"কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"।

* 'দুন্দুভ্যাঘাতবিশিষ্টস্য শব্দসামান্যস্য গ্রহণেন তদ্গতা বিশেষা গৃহীতা ভবন্তি; ন তু ত এব নির্ভিদ্য গ্রহীতুং শক্যন্তে"—ভাষ্য'।

সত্তা নাই। আত্মা-সত্তা হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, কাহারই সত্তা থাকে না। মুখে বায়ু পূর্ণ করিয়া শঙ্খে ফুৎকার দিলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইহার বিশেষ বিশেষ মৃদু-তীব্রাদি ধ্বনি-গুলি, শঙ্খের সেই এক সাধারণ-ধ্বনিরই অন্তর্ভুক্ত। শঙ্খের সেই সাধারণ-ধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, উহার বিশেষ বিশেষ প্রকারের ধ্বনি-গুলিকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া বীণা বাজাইলে যে শব্দ বহির্গত হয়, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, বীণার মৃদু-তীব্রাদি বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-গুলিকে বুঝিতে পারা যায় না। উহার বিশেষ প্রকারের ধ্বনি-গুলি, তন্ত্রীর আঘাত-দ্বারা উত্থিত সাধারণ-ধ্বনিরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ, জগতের স্থিতিকালে, ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান বিশেষ বিশেষ পদার্থ-মাত্রই, সেই এক ব্রহ্ম-সত্তারই অন্তর্ভুক্ত। সেই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত, কোন পদার্থেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তা হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, কোন পদার্থকেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব, কোন পদার্থই আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, স্থিতি-কালেও এই জগৎ ব্রহ্ম-মাত্রই হইতেছে।

উৎপত্তিকালেও, এই জগৎ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। ধূম, তেজঃ, স্ফুলিঙ্গ ও অঙ্গার প্রভৃতি বস্তু অগ্নি হইতে বিভক্ত হইয়া দেখা দিবার পূর্ব্বে, এক অগ্নিই ত বর্ত্তমান থাকে। ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অগ্নিতেই অবিভক্ত-ভাবে ছিল। বিবিধ নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া দেখা দিবার পূর্ব্বে, এই জগৎও—

সেই প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-সত্তায় অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল। মনুষ্যের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন বিনা আয়াসে, বিনা যত্নে, আপনা-আপনি ও অতিসহজে বহির্গত হয়, তদ্রূপ সেই একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বও উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্-সাম-যজু-অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রাত্মক বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণাদি অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ-ভাগ *—সেই প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম হইতেই অভি-ব্যক্ত হইয়াছে। ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্ যেমন সমুদ্র-জলেরই অবস্থান্তরমাত্র; উহারা যেমন সমুদ্র-জল হইতে ফেন-তরঙ্গ-বুদ্-বুদ রূপে বিভক্ত হইয়া দেখা দিবার পূর্ব্বে, কেবল এক সমুদ্র-জলের মধ্যেই অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত থাকে; তদ্রূপ, অনি-র্ব্বচনীয় † নাম-রূপ-শক্তি—বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত

* মূলে আছে—ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান। ভাষ্যকার এই গুলিকে অষ্টবিধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে উর্ব্বশী-পুরূরবা-সংবাদ, প্রাণ-সংবাদ প্রভৃতি আছে, তাহাই 'ইতিহাস'। 'ইহা অগ্রে অসৎই ছিল' —ইত্যাদি পুরাতন বাক্যই 'পুরাণ'। নৃত্যগীত শিল্পাদি 'বিদ্যা';—ইহারাও ব্রাহ্মণ-ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। "প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে, 'সত্যের সত্য'—ইত্যাদি উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ-প্রভব 'শ্লোক'। বস্তুসং-গ্রহ-সূচক 'সূত্র' (যেমন—'আত্মেত্যেব উপাসীত', 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং') । মন্ত্রের ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান।

† 'অনির্ব্বচনীয়'—নাম-রূপ-শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে 'ভিন্ন'ও বলা যায়না, আবার "অভিন্নও' বলা যায় না। এই জন্যই উহা অনির্ব্বচনীয়। ভিন্ন

হইবার পূর্ব্বে, প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্মে অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল। এই নাম-রূপ তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহাতেই অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত। সুতরাং জগতের উৎপত্তি-কালে সেই ব্রহ্ম-সত্তাই ছিলেন এবং এই জগৎও, কেবল ব্রহ্ম-সত্তা মাত্ররূপেই বর্ত্তমান ছিল *। এই ব্রহ্ম-সত্তাই বিশ্বের আকারে বিবর্ত্তিত ও অভি-ব্যক্ত হইয়াছে।

বলা যায় না এই জন্য যে, কার্য্য কখনই কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। পূর্ণ ব্রহ্ম-সত্তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎ-সৃষ্টির উন্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং উন্মুখাবস্থাটী ত ব্রহ্ম-সত্তারই একটা বিশেষ-আকার; সুতরাং উহা ব্রহ্ম ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কিছুই নহে। আবার, অভিন্নও বলা যায় না এই জন্য যে, ব্রহ্ম চেতন, ইহা জড়। "নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ; নাপি ঈশ্বরাদন্যত্বং—কল্পিতস্য পৃথক্ সত্তা-স্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ" —বেদান্ত-দর্শন, রত্নপ্রভা, ২।১।১৪।

অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে। অব্যাকৃত অবস্থাটী সামান্যাবস্থা; ব্যাকৃত অবস্থাটী বিশেষাবস্থা। অব্যাকৃত অবস্থায় সমুদয় নামরূপের সাধারণ শক্তি বর্ত্তমান থাকে। সেই সাধারণ-শক্তিই বিশেষ বিশেষ আকার (নামরূপ) ধারণ করে। "বীজাবস্থং জগৎ অব্যাকৃতং, নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত"। যাহা সামান্যাত্মক, তাহাই বিশেষ হইয়াছে। বিশেষ, সামান্যেরই বিকাশ; অপূর্ণ, পূর্ণেরই অভিব্যক্তি; পূর্ণেরই লিঙ্গ বা পরিচায়ক॥

* "কার্য্যেণ হি লিঙ্গেন কারণং ব্রহ্ম অদৃষ্টমপি 'সৎ' ইত্যবগম্যতে। অন্যথা গ্রহণদ্বারাহভাবাৎ তস্য কারণতাপি নস্যাৎ"।—গৌড়পাদ ভাষ্য॥

আবার, জগতের প্রলয়-কালেও, এই জগৎ ব্রহ্ম-সত্তা রূপেই বিলীন হইয়া থাকিবে। তখনও সেই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতিরেকে, জগতের অবস্থিতি সম্ভব হইবে না *। যখন নদী-কূপ-বাপী-তড়াগাদির বিশেষ বিশেষ জল-গুলি সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন সমুদ্র-জলই—ঐ সকল বিশেষ বিশেষ জল-গুলির একমাত্র সাধারণ আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়; তখন ঐ ভিন্ন ভিন্ন জল-গুলি—এক সমুদ্র-জলেই অবিভক্ত ভাবে বিলীন হইয়া থাকে; তখন সমুদ্র-জল ব্যতীত ইহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। প্রলয়-কালেও তদ্রূপ, শব্দ-স্পর্শাদি গ্রাহ্য বিষয়-বর্গ † এবং উহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্গ, সকলই একমাত্র প্রজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়; ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কাহারই আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। কি প্রকারে প্রলয়ে সকল পদার্থ ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।

মৃদু, কর্কশ, কঠিন, পিচ্ছিলাদি বিবিধ প্রকারের স্পর্শ-গুলি—এক সাধারণ স্পর্শেন্দ্রিয়েরই (ত্বকের) বিশেষ বিশেষ অবস্থা-

---

"প্রাণশব্দিতং বীজ মজ্ঞাতং ব্রহ্ম সল্লক্ষণং তদাত্মনেতি যাবৎ। তদেব-মচেতনং সর্ব্বং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ বীজাত্মনা স্থিতং প্রাণঃ"—আনন্দগিরি টীকা।

* "জগদিদং বিলীয়মানং শক্তিশেষ মেব বিলীয়তে······শক্তি শেষ-লয়েঽপি তস্যা দুর্নিরূপত্বাৎ বস্ত্বেকরসত্ব ধীরবিরুদ্ধা"।—আনন্দগিরি ॥

† বিষয়বর্গ = Sense-objects.

ভেদ বা আকার-ভেদ মাত্র। ঐ সকল বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পর্শ—এক সাধারণ স্পর্শেন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এক সাধারণ স্পর্শ ব্যতিরেকে, মৃদু-মধ্যম-কঠিনাদি স্পর্শগুলির 'স্বতন্ত্র' অস্তিত্ব থাকিতে পারে না *। এইরূপ, যাবতীয় বিশেষ বিশেষ গন্ধগুলি—এক সাধারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় বিশেষ বিশেষ রূপগুলি—এক সাধারণ রূপাত্মক চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি—এক সাধারণ শ্রবণেন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় বিশেষ বিশেষ রসগুলি—এক সাধারণ জিহ্বেন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, গ্রাহ্য বিষয়-বর্গ

---

* যাহা 'বিশেষ', তাহা 'সামান্য' হইতে বিভক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাহা বিশেষ, তাহা সামান্যাত্মক। ঘট যেমন মৃত্তিকাত্মক, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; তদ্রূপ যাহা বিশেষ, তাহা সামান্য হইতে ভিন্ন নহে; উহা সামান্যেরই আকার-ভেদ মাত্র। সামান্যই, সকল প্রকার বিশেষের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। সুতরাং বিশেষ, সামান্যেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার, যাহা বিশেষ,—তাহা সামান্য হইতেই আত্ম-লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং উহা সামান্য হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে না।—শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র এই যুক্তি-গুলি দিয়াছেন। পাঠক ইহা স্মরণ রাখিবেন। ইহাই তাঁহার অদ্বৈত-বাদের মূল ভিত্তি। "নাম-সামান্যাৎ সর্ব্বানি-নামানি যজ্ঞদত্তো দেবদত্ত ইত্যেবমাদি প্রবিভাগানি উৎপদ্যন্তে প্রবিভজ্যন্তে; কার্য্যঞ্চ কারণেন অব্যতিরিক্তম্। তথা বিশেষাণাঞ্চ সামান্যে অন্তর্ভাবঃ। কিঞ্চ, আত্মলাভাবিশেষাচ্চ নাম-বিশেষাণাম্। যস্য চ যস্মাদাত্মলাভো ভবতি, স তেন অবিভক্তো দৃষ্টো যথা ঘটাদীনাং

—উহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্গ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। সুতরাং বিষয়-বর্গ, ইন্দ্রিয়-বর্গে বিলীন হইয়া যায় *। ইন্দ্রিয় বর্গ—বিষয়-বর্গেরই রূপান্তর বা আকারভেদ মাত্র; উহারা স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে †। সুতরাং ইন্দ্রিয়-ব্যতিরেকে বিষয়-বর্গের স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন সত্তা নাই। আবার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি এক সঙ্কল্পাত্মক মনেরই অন্তর্ভূত। মন ব্যতিরেকে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রি-

মৃদা। এবং কার্য্য-কারণ-ত্বোপপত্তেঃ, সামান্য-বিশেষোপপত্তেঃ, আত্ম-প্রদানোপপত্তেশ্চ—নাম-বিশেষাণাং শব্দমাত্রতাসিদ্ধা"। বৃহঃ ভাঃ ১।৬।১১॥ "নাম-সামান্যং দেবদত্তাদিনা বিশেষনাম্না-সংযোজ্য সামান্য-বিশেষবানর্থো নামব্যাকরণ-বাক্যে বিবক্ষিতঃ"।—আ০ গিঃ॥

* গ্রাহ্য বিষয় ও উহাঁদের গ্রাহক ইন্দ্রিয় বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। "গ্রাহ্যেণ গ্রাহ্যস্বরূপং ন সিধ্যতি, কিন্তু গ্রাহকেন। এবং গ্রাহকমপি গ্রাহ্যমনপেক্ষ্য ন সিধ্যতি। তস্মাৎ সাপেক্ষত্বাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকদ্বয়ং বস্তুতো ন ভিন্নম্। —রত্নপ্রভা। আবার, "ইন্দ্রিয়ানি অধিকৃত্য গ্রাহ্যভূতমাত্রা বর্ত্তন্তে; ইন্দ্রিয়ানি গ্রাহ্য-ভূতজাতমধিকৃত্য বর্ত্তন্তে ইতি গ্রাহ্য-গ্রাহকয়োঃ মিথঃ সাপেক্ষ ত্বম্।" কৌষীতকীভাষ্যে শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন—"সূত্র ব্যতিরেকে বস্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং সূত্র ও বস্ত্র বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। এইরূপ ইন্দ্রিয় ও বিষয় বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। তদ্রূপ, বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) ও ইন্দ্রিয় বস্তুতঃ ভিন্ন নহে"।

† "বিষয়সমানজাতীয়ং করণং (ইন্দ্রিয়ং) মন্যতে শ্রুতি র্নজাত্যন্তরম্। বিষয়স্যৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণং নাম। ...এবং সর্ব্ববিষয়-বিশেষাণামেব স্বাত্মবিশেষপ্রকাশকত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি প্রদীপ-বৎ"।—ভাষ্যকার।

য়ের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে না *। আবার নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি ব্যতীত, সংকল্পাত্মক মন ক্রিয়া করিতে পারে না; সুতরাং মন,—বুদ্ধিরই অন্তর্ভুক্ত; বুদ্ধি-ব্যতিরেকে মনের স্বতন্ত্রতা নাই,—স্বাধীন সত্তা বা ক্রিয়া নাই। কিন্তু এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান-শক্তিও, সেই সর্ব্বাশ্রয় প্রজ্ঞান-ঘনেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ, বচন-গ্রহণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-নিচয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুলি, একমাত্র প্রাণ-শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত; প্রাণ-শক্তি-ব্যতিরেকে এই সকল বচন-গ্রহণাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু এই প্রাণ-শক্তিও সেই সর্ব্বাশ্রয় প্রজ্ঞান-ঘনেরই অন্তর্ভুক্ত। জীবের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুলির দ্বার-স্বরূপ এই বিজ্ঞান-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি উভয়ই—একই শক্তিমাত্র †। জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, যাহা বিজ্ঞান-শক্তি বা বুদ্ধি; ক্রিয়ার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তাহাই প্রাণ-শক্তি। স্বরূপতঃ উভয়ই এক; উভয়ই এক ব্রহ্ম-শক্তি হইতেই আবির্ভূত।

---

* "মনঃ-সংকল্পবশানি হি ইন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে"—বৃ০ ভা০।

† যোবৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ"—কৌষীতকী উপনিষদ্। "ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রজ্ঞালোচনপূর্ব্বিকা, প্রাণবায়ু-প্রেরিতাচেত্যেবং লোক-ব্যবস্থিতিঃ"—অনুভূতি প্রকাশ। "উপনিষদের উপদেশ" তৃতীয় খণ্ড. ১১৫পৃঃ টীকা দেখ। প্রদীপ যেমন নিজে রূপবিশেষ হইয়াও, রূপের প্রকাশক হয়; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ সংস্থান-ভেদে বিষয়-গ্রাহকরূপে অবস্থিত। একই শক্তি—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক,

মৈত্রেয়ি! বোধ হয় তবে বুঝিতে পারিলে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে, স্থিতিকালে এবং প্রলয়াবস্থায়, ব্রহ্ম-শক্তি হইতে ব্যতিরিক্তভাবে,—স্বতন্ত্ররূপে—বিশ্বের সত্তা বা

---

৭ আধ্যাত্মিক বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকারে, গ্রাহ্য বিষয়-বর্গ উহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্গে বিলীন হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়-গুলি, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে বিলীন হয়। এই অন্তঃকরণ আবার প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির সাধারণ আশ্রয়-অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি বুদ্ধিরই পরিণামমাত্র। বুদ্ধির পরিণাম এই বিজ্ঞান-গুলি, ক্রিয়াত্মক-রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। "বুদ্ধি-তন্ত্রাণি ইতরাণি করণানি, তেন বুদ্ধিঃ কর্ম্মবশাৎ শ্রোত্রাদীনি কর্ণশস্কুলাদিভ্যঃ স্থানেভ্যঃ প্রসারয়তি, প্রসার্য্য চ অধিতিষ্ঠতি"। শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান বা বিষয়-গুলিও ক্রিয়াত্মক বা মনেরই স্পন্দনাত্মক। "মনসি সতি বিষয়-বিষয়ি-ভাবদর্শনাৎ, অসতি চ অদর্শনাৎ, মনঃ-স্পন্দিতমাত্রং বিষয়জাতং, তস্ত তদ্বিষয়মাত্রে প্রবিষ্টস্ত তদতিরেকেণাসত্ত্বম্"। অতএব মন ও প্রাণ-শক্তি বস্তুতঃ একই। "নহি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ, চলনব্যাপারপূর্ব্বকাণ্যেব হি স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যন্তে করণানি"। ইন্দ্রিয় ও বিষয়,—মনেরই পরিণাম, মনেরই স্পন্দনফলমাত্র। মনই ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হয়, এবং ইন্দ্রিয় আবার বিষয়াকারে পরিণত হয়। সুতরাং, মনও প্রাণেরই অন্তর্ভুক্ত। "সর্ব্ব-কর্ম্মবিশেষাণাং মনন-দর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়া-সামান্তমাত্রে (প্রাণে) অন্তর্ভাবঃ"। আবার, প্রাণ-শক্তি পরিণত হইয়া যতদিন ইন্দ্রিয়ের স্থান-গুলি নির্ম্মিত করিয়া না দেয়, ততদিন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির প্রাদুর্ভাব হয় না; এইজন্য বিজ্ঞান-শক্তিকে,—প্রাণ-শক্তির শেষ অভি-

ক্রিয়া থাকিতে পারে না। যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে, তখন সাধকের বুদ্ধিতে জাগতিক পদার্থের ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ সত্তা ও ক্রিয়া অনুভূত হয় না। এই অর্থেই এ জগৎ ব্রহ্ম; —বোধ হয় এখন এই মহাতত্ত্বটীও বুঝিলে। কিরূপে এই বিদ্যার অনুশীলন করিতে হয় এবং এই ব্রহ্ম-বিদ্যা কিরূপ, এখন তোমাকে তাহাই বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর *।

ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। "শরীরদেশে ব্যূঢ়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যমান উপলভ্যতে"; এবং "চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ"। সুতরাং প্রাণ ও বুদ্ধি উভয়ই এক। ব্রহ্মই এই প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান। এই প্রাণ-শক্তি-যোগেই ব্রহ্মকে, "জগৎ-কারণ" ও "সৎ" ব্রহ্ম বলা যায়। কথাটা এই যে, এক অখণ্ড জ্ঞানের উপরেই শক্তির বিবিধ পরিণাম-হেতু বিবিধ বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়। "ত্বদ্দেহাশ্রিতমেব জ্ঞানং সর্ব্বং হে প্রাণ!"—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে শঙ্কর।

* সাধক বিশ্বের সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে, কোন পদার্থকেই ব্রহ্মাতিরিক্ত-ভাবে দর্শন করেন না;—ইহাকেই "বুদ্ধিকৃত লয়" বলা যায়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক "প্রাকৃত-প্রলয়" নামে কথিত। যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী, তাঁহারা এই প্রকারে বুদ্ধি দ্বারা সকল পদার্থকে লয় করিবেন,—অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এই তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন। পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, দ্বৈতসত্ত্বেও অদ্বৈত-বোধ হইয়া থাকে। সৃষ্ট-পদার্থের ধ্বংসের কথা তিনি বলিতেছেন না। বেদান্ত-দর্শনে তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদিকে নাশ করা অসম্ভব। তবে বুদ্ধি দ্বারা নাশ করা সম্ভব (৩।২।২১)।

কঠিন লবণ-খণ্ড, জলেরই বিকার,—জলেরই রূপান্তর। এই লবণ-খণ্ডকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে, তাহা সেই জলে বিলীন হইয়া গিয়া অবিভাগ প্রাপ্ত হয়। জলই জমিয়া কঠিন হইয়া লবণাকারে পরিণত হইয়াছিল ; সেই কাঠিন্য অদ্য স্বীয় উপাদানের (জলের)সংসর্গে অপগত হইল। অতি নিপুণ-ব্যক্তিও এখন সেই লবণ-খণ্ডকে সহজে জলের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া তুলিয়া লইতে পারিবেন না। যে স্থান হইতেই এই জল গ্রহণ কর না কেন, লবণের স্বাদ অনুভূত হইতে থাকিবে। কিন্তু এখন উহার সেই পার্থক্যের অবস্থা—কাঠিন্যভাব—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; এই যেমন দৃষ্টান্তটী দেখিলে তদ্রূপ তুমিও মৈত্রেয়ি ! সেই ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত হইয়াছ। কার্য্য-করণাত্মক উপাধি-সংপর্ক-বশতঃ, অদ্য তুমি ক্ষুধিত, পিপাসিত, জরা-মরণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, মর্ত্ত্য-মানবীরূপে সেই লবণ-খণ্ডের ন্যায় স্থূলভাব ধারণ করিয়া, সংসারের বিবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছ। লবণ-খণ্ড যেমন উহার কারণীভূত জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ তুমিও এই কার্য্য-করণাত্মক উপাধি বিগমে, স্বযোনিভূত, মহা-সাগরতুল্য—সেই অজর, অমর, অভয়, অপার, অনন্ত, শুদ্ধ, প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে *। তখন অবিদ্যা-জনিত ভেদ-ভ্রান্তি থাকিবে না।

* লবণের দৃষ্টান্তটী বিশেষরূপে প্রণিধান করিবার যোগ্য। জলে স্থূল ভাব বিলীন হইয়া গেলেও যেমন উহার স্বাদটী ছিল, তদ্রূপ ইহা বুঝা যাইতেছে যে, করণাদি সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভাগ রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্ম-

সমুদ্র হইতে যেমন ফেন-তরঙ্গ-বুদ্বুদাদি উত্থিত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত হইয়া নামরূপ—এই কার্য্য-করণাত্মক বিষয়াদির আকারে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় তৎ-স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে। জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় এবং স্বচ্ছ স্ফটিক-মণিতে অলক্তকের লোহিত-ছায়া বিম্বিত হয়, তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছ ; জলের অপনয়নে যেমন সূর্য্য-বিম্ব, এবং অলক্তকের অপনয়নে যেমন স্ফটিক, আত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ অবিদ্যা-ধ্বংস হইলে, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর তাহাকে জীব-রূপে উত্থিত হইতে হয় না। তখন আর জীবের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা,নামাদি থাকে না ; কেন না, বিশেষ-বোধের হেতু-ভূত অবিদ্যা বা ভেদ-বুদ্ধি তখন আর থাকে না। অতএব মৈত্রেয়ি! প্রকৃত-পক্ষে দেখিতে গেলে,— সুখ-দুঃখ,

---

চৈতন্যে লীন থাকিবে। শক্তির ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর আছে মাত্র। এইজন্যই প্রলয়াবসানে, জীবের পুনরুত্থান সিদ্ধ হয় ;—একান্ত ধ্বংস বা অভাব হয় না। এই জন্যই মুক্তি পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে, একথা অন্যস্থলে শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেবল তখনকার অন্তঃকরণের সংস্কার-গুলি রূপান্তরিত হইয়া যায় ; ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ সে অন্তঃকরণে থাকে না। "প্রজ্ঞান-ঘন" শব্দটীও প্রণিধানের উপযুক্ত। 'অয়োঘন' প্রভৃতির ন্যায়, 'ঘন' শব্দটী থাকায়, জ্ঞানাতিরিক্ত জাত্যন্তর নিষিদ্ধ হইতেছে।

'আমি ইঁহার ভার্য্যা,' 'আমি ইঁহার পুত্র', ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধগুলি মিথ্যা,—অসত্য। ইহারা অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত। ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে, এই অজ্ঞানতার উচ্ছেদ হইলে,—এরূপ ভিন্নতা-বোধ—বিশেষ-দৃষ্টি— আর থাকিতে পারে না। ইহারই নাম পরমার্থ-দর্শন। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম অদ্বৈত, ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই নাই। অবিদ্যার প্রতাপ এইরূপ যে, সে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্-রূপে, ভিন্ন-ভাবে, পদার্থান্তর-রূপে,—যাবতীয় বস্তুর প্রতীতি জন্মায় *। অবিদ্যা-নাশ হইলে এই ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যায়। তখন আর চক্ষুঃ-কর্ণাদির ভিন্নতা-বোধ নাই ;—তবেই তখন আর কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে বা শুনিবে? যিনি সকলের বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইতে পারে? জ্ঞাতা কি কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন? আত্ম-ব্যতিরেকে তখন কোন ক্রিয়ারও পার্থক্য-বোধ থাকে না †। তখন সমুদয় বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি,—সেই এক পূর্ণ-ভাবেরই বিকাশরূপে এবং

---

*শঙ্করাচার্য্য ভেদ-বুদ্ধিকেই 'অবিদ্যা' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একথা পাঠক ভুলিবেন না। "অন্যত্বদর্শনলক্ষণা সা"।...ভিন্নমিব বস্ত্বন্তরং উপ-লক্ষ্যতে ..ইতরোঽসৌ পরমাত্মনঃ।—ইত্যাদি। পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করাই অবিদ্যা। এইটীই মহাভ্রম।

† 'আত্মত্বাদেব সর্ব্বস্য নাত্মব্যতিরেকেণ কারকং, ক্রিয়া, ক্রিয়াফলং বা অস্তি।......নহি পরমার্থতঃ আত্মব্যতিরেকেণ অস্তি কিঞ্চিৎ।

পরিচায়ক চিহ্নরূপে, প্রতীত হইতে থাকে *। সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে,—সেই এক অখণ্ড মহা-শক্তিরই দর্শন হইতে থাকে। পরমার্থতঃ, আত্ম-ব্যতিরেকে কিছুরই স্বাধীন-সত্তা বা ক্রিয়া নাই ; অবিদ্যাই এই অনাত্ম-কল্পনার,—এই পদার্থান্তর-বোধের মূল। অবিদ্যাবস্থায়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের বোধ হয়, সেই ইন্দ্রিয়টী সেই বিজ্ঞেয়-বিষয়টীতেই সম্যক্ বিনিযুক্ত থাকে বলিয়া তখন, জ্ঞাতার কেবল জ্ঞেয়-বিষয়-বোধেই চেষ্টা পর্য্যবসিত হয়। নিজেই নিজের 'বিষয়' হইতে পারে না ; সুতরাং অবিদ্যা-বস্থায়, আত্মা নিজের 'বিষয়' (জ্ঞেয়) নন বলিয়া আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান তখন জ্ঞাতার উদিত হয় না, শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়ের জ্ঞানই হইতে থাকে। যিনি পরমার্থদর্শী, তাঁহার নিকটে 'জ্ঞেয়ের' পৃথক্ সত্তা থাকে না, এক বিজ্ঞাতাই দুই দিকে থাকেন। তাঁহার চক্ষে, জ্ঞাতাও আত্মা ; জ্ঞেয়ও আত্মা। তখন এক বিজ্ঞাতা নামই অবশিষ্ট থাকে। এই বিজ্ঞাতা-ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহা কারণান্তর-শূন্য। হে মৈত্রেয়ি! এই যে ব্রহ্মের একাত্ম-ভাবের উপদেশ শুনিলে, সর্ব্বদা ইহা চিত্তে ধারণা করিতে হইবে। সর্ব্বদা এই পরমাত্মাকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবে। ইহার ফলে, বিষয়-দর্শনের পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে ; তখন অবিদ্যা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার ফলে, বিষয়-

* ভাব—সুখ, দুঃখ, কামনা প্রভৃতি feeling 'নান্যঃ কাৰ্য্যিতব্যঃ বস্তন্তরভূতঃ পদার্থো ভবতি…সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ—ভাষ্য ৫।৪।৬। "পরমানন্দস্যৈব বিষয় বিষয্যাকারেণ মাত্রা প্রসূতা ৫।৩।৩২।

কামনার পরিবর্ত্তে, পরমাত্মা-কামনা প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন কামনা ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাম-ধ্বংসে, সর্ব্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-শক্তি-দর্শনও প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম নামক হৃদয়-গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং প্রকৃত পরমার্থ-জ্ঞান লাভ হইবে।”

আমরা মৈত্রেয়ীর এই আখ্যায়িকা হইতে যে উপদেশ-গুলি পাইয়াছি, সেইগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল——

১। বিষয়-কামনা হইতে চিত্তের প্রত্যাহার করিয়া, তাহাকে আত্মাভিমুখী করিবে।

২। আত্মাই মুখ্য-ভাবে প্রীতির বস্তু, অন্যান্য প্রীতির পদার্থ-গুলি গৌণ।

৩। বিশ্বের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা ছিল না; সৃষ্টির পরেও তাহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; বিশ্বের প্রলয়-সময়ে, যখন বিশ্ব তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখনও উহার ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ সত্তা থাকিবে না।

৪। বিশ্বের তাবৎ পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস করিবে। কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-শক্ত্যতিরিক্ত সত্তা ও ক্রিয়া নাই।

৫। ব্রহ্ম-সত্তাতিরিক্ত ভাবে পদার্থান্তরের বোধ অবিদ্যার কার্য্য।

৬। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি এক জাতীয় উপাদানের বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

৭। বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে এবং বুদ্ধি ও প্রাণকে,—সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যে বিলীন করিবে। জীবে বিজ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি আছে। বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদির ক্রিয়াকে প্রাণ শক্তিতে এবং বিষয়ের

সহিত চক্ষুরাদি-বিশেষ-বিজ্ঞান-গুলিকে বুদ্ধিশক্তিতে বিলীন করিবে। বুদ্ধি ও প্রাণ-শক্তি স্বরূপতঃ একই ;—উহারাও ব্রহ্ম-চৈতন্যে বিলীন হয়।

৮। এই সকল উপাধিতে অভিমানের আরোপ করাতেই জীবের জীবত্ব। এই উপাধি-গুলিতে আত্মাভিমানের আরোপ না করিলেই ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়।

৯। পার্থক্য-বোধ বা ভেদ-বুদ্ধিই,—মায়া বা অবিদ্যা। পূর্ণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্তভাবে কাহারও স্বাধীন, নিরপেক্ষ সত্তা বা ক্রিয়া নাই। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ,—সেই পূর্ণ-স্বরূপের পরিচয় দিবার জন্যই অবস্থিত আছে। এই বোধ জন্মিলে, ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়।

১০। ভেদ-বুদ্ধি না থাকিলেই মুক্তি হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও পণ্ডিত-মণ্ডলী।

পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ বিদেহনগরে জনক নামে এক সম্রাট্ ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, এই বিশ্রুত-যশাঃ সম্রাটের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপ উদ্‌ঘোষিত হইত এবং প্রত্যেক জনপদে, প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মুখে, এই ভূপতির কথা অহরহঃ আন্দোলিত এবং প্রীতি ও ভক্তির সহিত কীর্ত্তিত হইত। সেই নরপতি কেবল যে ক্ষত্রিয়োচিত ভুজ-বীর্য্য, রাজনীতি-কুশলতা এবং প্রজাপালন-পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ মহাজ্ঞানী পুরুষ তৎকালে ব্রাহ্মণ-গৃহীদিগের মধ্যেও অতি বিরল ছিলেন। যাহাতে ভারতে ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলন জাগরূক থাকে এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক-দুরূহ তত্ত্ব-গুলি সুমীমাংসিত হইয়া লোকমধ্যে প্রচারিত হয়, এই অভিপ্রায়ে, সেই নরপতি একটী চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিটীর দ্বারাই আবার তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিশেষভাবে

প্রচারিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি প্রতি বৎসর কোন এক যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ করিয়া, আপন রাজধানীতে একটী প্রকাণ্ড সভার উদ্‌যোগ করিতেন এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, সেই সেই প্রদেশের প্রধান জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত সহস্র সহস্র পণ্ডিতকে সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া সভাস্থলে আহূত করিয়া আনিতেন। এই উপায়ে সেই সভায় সমগ্র ভারতের তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীগণকে একত্র পাওয়া যাইত। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক নানাবিধ তত্ত্ব লইয়া বিচার করিতেন। এই ভাবে কত কত দুরূহ তত্ত্ব অতি সুন্দর-রূপে মীমাংসিত হইয়া যাইত এবং কত কত ভ্রম ও সন্দেহের নিরসন হইয়া যাইত। নরপতি জনক, স্বয়ং বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই বিচার শুনিতেন। এইরূপে তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যানু-শীলনের যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সাধা-রণ লোকও দার্শনিক অনেক তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিত এবং পণ্ডিত-বর্গের মধ্যেও অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা অতি সহজে মীমাংসিত হইয়া যাইত। জনক-প্রবর্ত্তিত এই বিদ্বৎ-গোষ্ঠী ভারতে বড়ই প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, এবং ইহার ফল-স্বরূপ সর্ব্বদা গৃহে গৃহে ব্রহ্ম-নাম উচ্চারিত,ব্রহ্ম-কথা গীত এবং ব্রহ্ম-তত্ত্ব অনুশীলিত হইত।

একদা মহারাজ জনক এইরূপ এক বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, সমুদায় আয়োজন সংগ্রহ করিলেন। কুরু ও পাঞ্চাল নামক প্রসিদ্ধ দুইটি জনপদ হইতে সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ বহু বিদ্বান

ব্যক্তি ঐ যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক পণ্ডিতকে একত্র উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ কে—ইহা জানিবার জন্য, রাজার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। এই সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যিনি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ তাঁহাকে দান করিবার জন্য, রাজা জনক, এক সহস্র, সুস্থ, সবল ও সুশ্রী গাভী সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের শৃঙ্গ ও ক্ষুর সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ সুমহৎ পরিষদের মধ্যে কেহই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য নামে একটী ব্রাহ্মণ, তাঁহার সঙ্গী এক শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি সুবর্ণ-মণ্ডিত এই সহস্র গাভীকে আমার আশ্রমে লইয়া যাও"। গুরুবাক্যে প্রণোদিত হইয়া শিষ্য, তাহাই করিতে উদ্‌যোগী হইল। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী, যাজ্ঞবল্ক্যের এই দারুণ অহঙ্কার জনিত স্পর্দ্ধা অবলোকন করিয়া অতীব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-বিদ্যার গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য, একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

১। আর্ত্তভাগের প্রশ্ন।—আর্ত্তভাগ নামক একটী ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! এ সংসারে কয়টী গ্রহ ও কয়টী অতিগ্রহ আছে"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—মহাশয়! আটটী গ্রহ এবং তাহার আটটী অতিগ্রহ আছে। এই গ্রহ ও অতিগ্রহ লইয়াই সংসার।"

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আটটী গ্রহ ও আটটী অতিগ্রহের কথা বলিলেন, তাহারা কি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন্"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! বিশ্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি শক্তি-সকল আধিদৈবিক বস্তু বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আধিদৈবিক শক্তি-সকল পরিণত হইয়া, শব্দ-স্পর্শাদি অধিভূত পদার্থের আকারে এবং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃ-করণাদি অধ্যাত্ম পদার্থের আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। * এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত বস্তু-গুলিই, যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও বিষয় নামে পরিচিত। এই ইন্দ্রিয়কে গ্রহ এবং এই বিষয়-গুলিকে অতিগ্রহ বলা যায়। এই গ্রহ ও অতিগ্রহ,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয় লইয়াই এ সংসার। আমরা যেমন বিষয়ে শব্দ-স্পর্শ রূপ-রসাদির আরোপ করি—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি অবগুণ্ঠণে অবগুণ্ঠিত করিয়া বিষয়ের উপলব্ধি করি,—তেমনই আমরা তাহাতে অভিমানাদিরও আরোপ করি। ইহাই অবিদ্যা। আবার, আমরা ঈশ্বর-কামনার পরি-বর্ত্তে বিষয়-কামনাতেই রত। আমরা যে সকল কার্য্য করি তাহা কর্ত্তব্যার্থ বা ঈশ্বরার্থ না হইয়া, রাগ-দ্বেষ দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা—অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বিষয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ি। এই বিষয়-রাজ্য ব্যতিরেকে যে অন্য কোন রাজ্য আছে তাহা মনেও ভাবি না। দেহাভিমান-বশতঃ সকল পদার্থকেই নিজের সুখার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি।

* ৩৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপে, আমাদের বিষয়ে উন্মত্ততা জন্মিয়া থাকে। বিষয়ে এইরূপ আত্মাভিমান * স্থাপন না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে † এই লিপ্ততাই সংসার। ইহাই বন্ধনের হেতু। ‡ এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়কেই,—গ্রহ ও অতিগ্রহ বলে। কিরূপে ইন্দ্রিয়-গুলি—অবিদ্যা-কামাদি দ্বারা দূষিত ইন্দ্রিয়-গুলি—বিষয়-গ্রহণ করিয়া থাকে,—বিষয়ে লিপ্ত হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গ্রহ বলা যায়; এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ দ্বারা গৃহীত হয়, আয়ত্তীকৃত হয়;—সুতরাং গন্ধকে অতিগ্রহ বলে। বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহ বলা যায় এবং বক্তব্য বচনকে তাহার অতিগ্রহ বলে। কেননা, বক্তব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) একটী গ্রহ এবং রস তাহার অতিগ্রহ। চক্ষুরিন্দ্রিয় একটী গ্রহ এবং রূপ তাহার অতিগ্রহ। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়, মন, হস্ত, ত্বক্—ইহারা

---

* ইহাই Ethics শাস্ত্রে Egoism, Hedonism বলিয়া কথিত।

† ইন্দ্রিয়ের বিষয়—Sense-objects.

‡ কিরূপে এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহা অশ্বলের প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি ও অন্তঃকরণ,—এই 'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম' দ্বারা দূষিত। বিষয়কে এই দূষিত-ভাবে দর্শন না করিয়া যদি ব্রহ্মাত্ম-ভাবে দর্শন করা যায়, তবেই এই বিষয়-লিপ্ততা বা অবিদ্যাদির বন্ধন ধ্বংস হয়। কিরূপে ব্রহ্মাত্ম-ভাবে বিষয়-দর্শন হইতে পারে, তাহা সেই স্থলেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে;—তাহারই নাম বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন।

প্রত্যেকে এক একটী গ্রহ; এবং শব্দ (শ্রোতব্য-বিষয়), কামনা, ক্রিয়া ও স্পৃশ্য পদার্থ,—ইহারা যথাক্রমে এক একটী অতিগ্রহ। বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয় নিতান্ত আয়ত্তীকৃত। ইন্দ্রিয়াদি —এই বিষয়-গুলিতে অভিমান ও কামনাদির আরোপ করিয়া থাকে, এবং সেই রূপেই বিষয়ে বদ্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষকে ইহারা বদ্ধ করে বলিয়া, গ্রহাতিগ্রহকে পণ্ডিতেরা "মৃত্যু" বলিয়াও বলিয়া থাকেন"।

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! মৃত্যুর কি মৃত্যু নাই"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—"মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। যাঁহার বলে এই গ্রহাতিগ্রহ নামক মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহাই মৃত্যুরও মৃত্যু। বিষয়-লিপ্ততারূপ বন্ধন নাশ হইলেই ত মোক্ষ-প্রাপ্তি ঘটে। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা বিষয়ে অভিমান ও কামনাদির আরোপ করিয়া থাকি। বিষয়ে এই আত্মাভিমানের পরিবর্ত্তে, বিষয়ে ব্রহ্মাত্ম-ভাব আনিতে পারিলেই, এই বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহারই নাম বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন। ব্রহ্ম-শক্তিরূপে বিষয়-দর্শন করিতে * সর্ব্বদা অভ্যস্ত হইতে হয়। এই অভ্যাস

* উপনিষদের ইহাই বিশেষত্ব। প্রতি-পদার্থে কিরূপে ব্রহ্ম-দর্শন করা অভ্যাস করিতে হয়, উপনিষদে তাহার বিস্তর প্রণালী আছে। শ্রুতি,—বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ করিতে উপদেশ দেন না। কিরূপে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-গুলিকে ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ বলিয়া ধারণা করিতে হয়, তাহাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পরিপক্ক ও সুদৃঢ় হইলে অদ্বৈত-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখনই মুক্তি। এই ভাবে ব্রহ্মাত্ম-দর্শনই মৃত্যুর মৃত্যু" *।

২। অশ্বলের প্রশ্ন।—আর্ত্তভাগ প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া, তদ্বিষয়েই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া মনে মনে বুঝিয়া দেখিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে যজ্ঞে নিযুক্ত অশ্বল নামে একটী ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! এই যে আপনার সম্মুখে, এই সভা-মণ্ডপের এক পার্শ্বে, পুরোহিত-বর্গ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেছেন;—কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে এই যাজ্ঞিকেরা মৃত্যুর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন? যদি ইহা আপনার জ্ঞাত থাকে, তবে বলুন"। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—"মহাশয়! কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই দুই প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকের ধনাদি-কামনায় বা পরলোকে স্বর্গাদি-প্রাপ্তি কামনায় যাঁহারা যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অজ্ঞানী। তাঁহাদের পিতৃ-যান পথে † গতি হয়। ইহাঁরা নিকৃষ্ট সাধক। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা পরমেশ্বরার্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। উত্তম সাধকেরা যজ্ঞে ব্রহ্ম-দর্শন করিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ ভাবনাময় যজ্ঞ করিতে পারেন; তাঁহাদেরই যজ্ঞে ব্রহ্ম-দর্শন সম্পন্ন হয়। যেমন বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন তেমনই যজ্ঞাদি-কর্ম্মে ব্রহ্ম-দর্শনের কথা বলিতেছি। এইরূপ

* আমরা আর্ত্তভাগের প্রশ্ন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি।

† 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য।

দর্শন অভ্যাস করিতে পারিলেই, এই যাজ্ঞিক-গণ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবেন। এই যাজ্ঞিকেরা অগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ইঁহারা যদি,—আধ্যাত্মিক বাক্য-গুলি আধিদৈবিক অগ্নিরই বিকাশ,—সুতরাং ব্রহ্ম-শক্তিরই অভিব্যক্তি,—এই ভাবে বাক্যে অগ্নি-দর্শন অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইঁহাদের একাত্ম-ভাব অভ্যস্থ হইবে *। আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি,—অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপ্ত। ইহারাই, অধিভূত ও অধ্যাত্ম বস্তুর আকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছে। এই অবস্থায়, অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূত বস্তুর আকারে,—ইহারা পরিচ্ছিন্ন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়,—সেই আধি দৈবিক শক্তি-গুলিরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ মাত্র। কিন্তু এই আধিদৈবিক শক্তি-গুলি সেই এক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি †। অতএব বিষয় ও ইন্দ্রিয়, প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ

* "অধ্যাত্মাধিভূতপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মনা দৃষ্টং যৎ, সা মুক্তিঃ, সৈব অতিমুক্তিঃ"—ভাষ্য।

† ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্গীথ-প্রকরণে নানারূপে এ তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। 'ইন্দ্রিয়গণের কলহে' আমরা দেখি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বুঝিতে পারিল যে ইন্দ্রিয়েরা প্রাণ-স্বরূপ। ইন্দ্রিয় গুলি (প্রকাশাত্মক এবং) ক্রিয়াত্মক; ক্রিয়ামাত্রই প্রাণ-শক্তির স্পন্দন-জাত। অতএব প্রাণ-শক্তিই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলির মূল বীজ। আবার আমরা বৃহদারণ্যকে দেখিতে

বা পরিণাম। এই ভাবে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলে, সর্ব্ব বস্তুতেই ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান লাভ হইবে। এই দর্শনই, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদি বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ বা মোক্ষ। এইরূপেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়" *।

অশ্বল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই সকল যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞ করিতেছেন, ইহাঁরা যজ্ঞের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। এই কাল ত অহোরাত্র্যাত্মক এবং তিথ্যাত্মক। কি উপায়ে এই যাজ্ঞিকেরা কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"কালে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস করিতে পারিলেই কালের বন্ধন ছিন্ন করা যায়। তখন আর কালের পার্থক্য-বোধ থাকে না। কিরূপে ইহা সম্ভব,

---

পাই, বাক্য-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অগ্নি-প্রভৃতির মধ্যে চলিয়া গেল (১।৩।১—২৮);—এই উপাখ্যানেও আমরা বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্তই ক্রিয়াত্মক বলিয়া, এক স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিই উহাদের মূল-বীজ; সুতরাং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গ এবং আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদি সকল পদার্থই,—সেই স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র। 'সংবর্গ-বিদ্যা'তেও এই মহাতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্গীথ-প্রকরণেও, ঋক্ ও সামাদি মন্ত্র-গুলি বাক্যাত্মক বলিয়া, উহারাও এক প্রাণ-শক্তিরই স্পন্দন-জাত। এইরূপে সমুদয় পদার্থে ও যজ্ঞীয় মন্ত্রাদিতে ব্রহ্ম-শক্তি-দর্শন শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

* আমরা অনাবশ্যক বোধে, অশ্বল-কৃত চারিটী প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াছি।

তাহা বলিতেছি। লোকে চক্ষুর দ্বারাই অহোরাত্র অর্থাৎ দিনমান এবং রাত্রিমান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরাও চক্ষুর দ্বারাই দিবা ও রাত্রি প্রত্যক্ষ করেন। এই চক্ষুরিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-পদার্থ। ইহা আধিদৈবিক সূর্য্যেরই বিকাশ। এই জন্যই, সূর্য্যালোক চক্ষুর সহায় বা উপকারকরূপে কথিত আছে। চন্দ্রালোকও চক্ষুর দর্শন ক্রিয়ার সহায়, কেননা, চন্দ্রের যাহা আলোক তাহা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। অতএব চন্দ্রকে, আদিত্য-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া ভাবনা করিতে পারিলে, চক্ষুর আর অতিরিক্ত অস্তিত্ব-বোধ থাকিল না। ক্রিয়াত্মক সূর্য্যা-লোক এবং বৃদ্ধি-ক্ষয়-শীল চন্দ্র, ইহারা স্পন্দনাত্মক; সুতরাং ইহারা বায়ু বা প্রাণাত্মক। কালের অবয়বও ক্রিয়াত্মক; অর্থাৎ বায়ু বা প্রাণ-শক্তির বিকাশেই কালের উৎপত্তি। অতএব সূর্য্য, চন্দ্র ও কাল,—এক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি *। এইরূপে ভাবনা অভ্যাস করিলে, সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন হইতে থাকে। তখন মুক্তি হয়"।

অশ্বল পুনরায় বলিলেন,—"এই যাজ্ঞিকেরা যে সকল মন্ত্র (ঋক্) ও স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তদ্দ্বারা কোন্ লোক জয় করা যাইতে পারে"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"এই যজ্ঞের

* "বায়ুনিমিত্তৌ হি বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চন্দ্রমসঃ। তেন তিথ্যাদিলক্ষণস্য কালস্য কর্ত্তুরপি কারয়িতা—বায়ুঃ"—ভাষ্যকার। ("বায়ুঃ সূত্রাত্মা, তন্নিমিত্তৌ সাবয়বস্য চন্দ্রমসো বৃদ্ধি হ্রাসৌ। সূত্রাধীনাহি চন্দ্রাদের্জগতঃ চেষ্টা"—আনন্দগিরি)।

প্রত্যেক উপকরণে যদি স্বাত্মাভিমান তিরোহিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মাত্ম-বোধ উৎপন্ন হয়, তবে উৎকৃষ্ট লোক জয় করিতে পারা যায়। মন্ত্র ও স্তোত্রাদির উচ্চারণ করিতে মন ও বাক্য উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক। বাক্য,—প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি। সেই প্রাণ-শক্তিই,—সমুদায় ইন্দ্রিয়-শক্তির মূল বীজ। আবার মন,—চন্দ্রেরই বিকাশ বা অভিব্যক্তি। মন ও বাক্য উভয়ই অধ্যাত্ম-পদার্থ; ইহারা আধিদৈবিক শক্তিরই বিশেষ অভিব্যক্তি। যে শক্তি চন্দ্র, সূর্য্যাদিতে আলোক ও তাপরূপে ক্রিয়াশীল,—সেই শক্তিই পরিণত হইয়া প্রাণী-দেহে মন ও বাক্-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। আবার বাক্য,—অগ্নিরই অভিব্যক্তি। * অতএব বাক্য ও মনে—আধিদৈবিক শক্তি-পুঞ্জের এইরূপ ভাবনা করিলে, ক্রমে সকল পদার্থই যে এক ব্রহ্ম-শক্তি-সম্ভূত এই বোধ

* সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি—যথাক্রমে চক্ষুঃ, মন ও বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা বা অভিব্যক্তি-বীজ বলিয়া উল্লিখিত আছে। আলোক, তেজঃ প্রভৃতি সত্ত্ব-শক্তিরই বিকাশ; ইন্দ্রিয়-গুলিও সাত্ত্বিক। সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে যে শক্তি আলোক, তেজঃ প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত, তাহাই পরে প্রাণী-দেহে ইন্দ্রিয়-রূপে অভিব্যক্ত। কোন কোন স্থলে চন্দ্রকে মনের দেবতা না বলিয়া, সূর্য্যকে মনের দেবতা বলা হইয়াছে। শক্তি, করণাকারে ও কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হয়। আশ্রয় ব্যতীত, শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রাণী-দেহই, ইন্দ্রিয়াদি করণের আশ্রয়; সূর্য্য-চন্দ্রাদির স্থূলাংশই, তেজঃ-আলোকাদির আশ্রয়। "মনসোদ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যঃ"; "বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিঃ"—ইত্যাদি। শ্রুতিতে এই কথাই পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হইয়া যায়। এই ভাবে ভাবনা-শীল ব্যক্তি উত্তম লোকের অধিকারী হইয়া, ক্রমে মুক্তি লাভ করেন। এইরূপ প্রণালীতে ভাবনা করিতে শিখিলে,বিষয়-লিপ্ততা এবং আত্ম-সুখার্থমাত্র-রূপে বিষয়াচ্ছন্নতা দূর হইয়া যায়। তখন আর ব্রহ্ম-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পদার্থান্তরের দর্শন হইতে পারে না; সর্ব্ব পদার্থ কেবল ব্রহ্ম স্বরূপেরই পরিচায়করূপে প্রতীত হইতে থাকে। এইরূপ হইলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পবিত্রাণ লাভ করা যায়" *।

৩। আর্ত্তভাগের পুনরায় প্রশ্ন।—যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলকে যাহা যাহা বলিলেন, আর্ত্তভাগ মনোযোগ-সহকারে তৎ-সমস্ত শুনিয়া, পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট গিয়া বলি-লেন,—"মহাশয়! আমার আরও ,একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে; তাহার উত্তর জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি

* শ্রুতিতে এইরূপে, বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ে ও অন্তঃকরণে ব্রহ্ম-শক্তি-দর্শন নানাস্থানে ও নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞে ও যজ্ঞ-সাধন অগ্নিতে এবং মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতিতেও এইরূপে ব্রহ্ম-শক্ত্যনুভব উপদিষ্ট দেখা যায়। উদ্গীথ-প্রকরণেও, যজ্ঞের অঙ্গ-স্বরূপ প্রণবে ও সামাদি-গানে,—পৃথিবী-সূর্য্যাদি-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে,—এই সকল স্থলে সমস্ত ক্রিয়াই আধিদৈবিক শক্তি-গুলিরই বিকাশরূপে ভাবনার উপদেশ দিয়া, ক্রমে ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রবেশ করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞকে, ভাবনাত্মক-যজ্ঞে পরিণত করিয়া লওয়াই এ সকলের তাৎপর্য্য। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দৃষ্টি করিবার যে সকল উপদেশ আছে, সেগুলি এই ভাবনাত্মক যজ্ঞেরই অন্তর্গত। সকলের উদ্দেশ্যই এই।

যে যে ভাবে পরমাত্ম-দর্শনের কথা অশ্বলকে বলিতে ছিলেন, সেইভাবে বিশ্বস্থ তাবৎ-পদার্থে যিনি একাত্ম-দর্শন অভ্যাস করিতে পারেন,এরূপ সাধকের মৃত্যুর পর বাগাদি-গ্রহগুলি (ইন্দ্রিয়-গুলি) উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া যায় কিনা”? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—জীবের মৃত্যুর পর আদিত্যাদি দেবতা-শক্তি-গুলি, চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের উপরে আর ক্রিয়া করেন না। জীবিতাবস্থায়, সূর্য্য-অগ্ন্যাদি পদার্থ-সকল,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহায় হইয়া পরস্পরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পরে, ইন্দ্রিয়-গুলি ক্রমে ক্রমে প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। প্রাণ-শক্তিও আত্মাতে বিলীন হয়। যে সকল সাধকের অভেদ-বুদ্ধি জন্মিয়া, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের ধ্বংস হয়; তাঁহাদের আর এই লীন ইন্দ্রিয়-গুলি পুনরায় সে ভাবে প্রবুদ্ধ হয় না; কেননা, অবিদ্যা-কামাদিই ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে বিষয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া থাকে এবং বিষয়াবদ্ধতাই উহাদের পুনরুত্থানের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। সেই অবিদ্যা-কামনাদির উচ্ছেদ হওয়ায়, আর ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়ে জাগরূক হইতে পারে না। এরূপ সাধক, মৃত্যুর পরে, কেবল নাম-মাত্রাবশিষ্ট * হইয়া সর্ব্বলোকে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য দর্শনে নিমগ্ন রহেন, এবং ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যেসকল সাধকের এইরূপ পরমাত্ম-দর্শন অভ্যস্ত হয় নাই,—যাঁহাদের অবিদ্যা-

* “তখন জায়া, ক্ষেত্র, পুত্র প্রভৃতি পদার্থ কেবল নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; সে গুলিতে ব্রহ্ম-দর্শন হইতে থাকে। আকৃতির (রূপবদ্-বস্তুর) সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া এই নাম অনন্ত”।—আনন্দগিরি।

কামাদির উচ্ছেদ হয় নাই,—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি পুনরায় বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে"। আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অজ্ঞানী, অসম্যক্‌দর্শী পুরুষের মৃত্যুর পরে কিরূপে পুনরায় ইন্দ্রিয় ও দেহাদির পুনরুৎপত্তি হয়, তাহা ত বলিলেন না; এখন তাহাই আমাকে বলুন। কাহার দ্বারা বিলীন-ইন্দ্রিয়-গুলি পুনশ্চ বিষয়ে প্রেরিত হয়? এই পুরুষের আত্মায় পুনরায় কিসের বলে বিষয়-বাসনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে"? যাজ্ঞবল্ক্য,—সেই লোকপূর্ণ সভাস্থলে এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন তাহাঁরা একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া, বিচার দ্বারা কর্ম্মকেই বিষয়-বাসনোদ্রেকের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। উৎপত্তিকাল হইতেই, ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়-তৃষ্ণাবিশিষ্ট। এই তৃষ্ণা বা বিষয়-বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জীব সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাসনা-প্রেরিত হইয়া জীব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সংস্কার-রূপে চিত্তে নিবদ্ধ রহিয়া যায়। এই সংস্কারই ভবিষ্যৎ-কর্ম্মের বীজ হইয়া দাঁড়ায়। পরমাত্ম-দর্শন না হইলে,—বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যস্ত না হইলে,—সেই সংস্কারের ধ্বংস হয় না। সুতরাং এরূপ অজ্ঞানী জীব মৃত্যুর পরে পুনরায় সেই সংস্কার-বলে, বিষয়-বাসনারূপ জালে জড়িত হয়। অতএব কর্ম্ম-সংস্কারই,—বিষয়াসক্তি এবং ইন্দ্রিয়াদির পুনরুদ্রেকের কারণ। যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপ বিচার দ্বারা কর্ম্মকেই পুনরুৎপত্তির কারণ বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। এই কর্ম্ম-বন্ধন থাকিলেই, জীব পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে যাতায়াত করিতে থাকে। বিশুদ্ধ

ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা এই বন্ধন বিনষ্ট হইলে, সেই জীবকে আর কোথাও যাইতে হয় না। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হইতে সেই জীব,—ঊর্ম্মিমালা যেমন সমুদ্রে অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সাগরে লীন হইয়া অবস্থান করেন *।

৪। উষস্তের প্রশ্ন।—উষস্ত নামক আর এক পণ্ডিত, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! মুখ্য ব্রহ্মের স্বরূপ আপনি অবগত আছেন কি? নাম-রূপাদি বিবিধ বিকার হইতে আত্মা কি পৃথক বস্তু? যদি আত্মা নাম-রূপাদি বিকারের অতীত হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"এই স্থূলদেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়-শক্তিময় সূক্ষ্ম একটী দেহ আছে। মুখ্য-আত্মা সেই সূক্ষ্মদেহেরও অতীত এবং সেই আত্মা দ্বারাই এই সূক্ষ্মদেহ বা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি চালিত বা কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। যে আত্ম-চৈতন্যের অবস্থিতি-হেতু, দেহে ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা হয়, তাহাই মুখ্য আত্মা। ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি সকলই জড়-শক্তি। চেতনের প্রেরণা-ব্যতীত, জড় স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। আত্ম-চৈতন্য,—এই সকল জড়-

---

* মুক্তি,—কর্ম্মের ফল নহে; উহা জ্ঞান-দ্বারাই লব্ধ হয়। এস্থলে ভাষ্যকার একটী এতদ্বিষয়ক বিচার নিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই স্থলের ও অন্যস্থলের এই কর্ম্ম-কাণ্ডাত্মক বিচারাংশ 'অবতরণিকায়' আলোচনা করিয়াছি। পাঠক সেই স্থলেই ভাষ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

শক্তি হইতে নিতান্ত বিলক্ষণ পদার্থ, এবং আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই এই সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি চালিত ও স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহে সমর্থ হয়। ইহাই ব্রহ্মের মুখ্য-স্বরূপ *। এই সকল ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতেই ব্রহ্ম-শক্তির লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা যায়; নতুবা সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয়াদি জড়শক্তি-গুলি সমস্তই দৃশ্য-পদার্থ। আত্মা, এই সকল দৃশ্য-পদার্থের দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে নিত্য বর্ত্তমান। যিনি স্বয়ং দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতে গেলেই, তিনিও দৃশ্য বা জ্ঞেয় হইয়া পড়েন। কিন্তু যিনি জ্ঞাতা, তিনি ত জ্ঞেয় হইতে পারেন না। অতএব তিনি নিত্য দ্রষ্টা-রূপেই অবস্থিত। দৃষ্টি-শক্তি দুই প্রকার। এক—আত্মার দৃষ্টিশক্তি; ইহা নিত্য; অপর—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি; ইহা অনিত্য। চক্ষুর এই দৃষ্টিশক্তি বা দর্শন-ক্রিয়া অনিত্য। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবা মাত্র, বিষয় দ্বারা চক্ষুরাদির ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয় এবং অন্তঃকরণ চক্ষুর এই উদ্রিক্ত ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। অতএব, রূপাদি—অন্তঃকরণেরই বিষয়োপরঞ্জিত বৃত্তি বা আকার-বিশেষ। সুতরাং ইহা, বিষয় চলিয়া গেলে থাকে না। কিন্তু আত্ম-চৈতন্যের দৃষ্টিশক্তি এরূপ নহে। ইহা নিত্য, প্রকাশ-স্বরূপ। ইহা নিত্য একরূপ;—ইহা চক্ষুরাদির দর্শন-ক্রিয়ার

---

* "নহি চেতনাবদনধিষ্ঠিতস্ত প্রাণনাদিচেষ্টা বিদ্যতে।...তস্মাৎ সোঽস্তি কার্য্যকরণ-সংঘাত-বিলক্ষণো যশ্চেষ্টয়তি"।—ভাষ্য।

অনুগত রূপে প্রতীত হইয়া থাকে *। এইরূপে, এই নিত্য-শক্তিই,—দর্শনের দর্শন, শ্রবণের শ্রবণ, বুদ্ধির বুদ্ধি ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া কথিত হয়। নিত্য প্রকাশ-স্বভাব আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে, প্রাণাদি-শক্তি ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি, এই চৈতন্যের ক্রিয়ার দ্বার। ইনি সমুদয় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার,—অবিকারী, নিত্য কারণ। এই নিত্য কারণ-শক্তির কোন বিক্রিয়া বা বৈলক্ষণ্য হয় না †। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,—এই নিত্য-শক্তি দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নিত্য-শক্তিই আত্মার স্বরূপ। সর্ব্ব পদার্থের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই নিত্য-আত্মা অবিনাশী; আর সকলই বিনাশী। ইহাই মুখ্য আত্মার স্বরূপ।"

৫। কহোলের প্রশ্ন।—উষস্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সেই সভায় সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে কহোল নামক একজন পণ্ডিত, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনি এইমাত্র উষস্তের নিকটে ইন্দ্রিয়াদি বিকারের অতীত, অথচ ইন্দ্রিয়াদি-ক্রিয়ার কারণ-রূপে যে আত্ম-চৈতন্যের

---

* "সা (নিত্যা-দৃষ্টিঃ) ক্রিয়মাণয়া উপাধিভূতয়া দৃষ্ট্যা সংসৃষ্টেব ব্যপদিশ্যতে।"

সুতরাং আত্মা যে সাধারণ সামর্থ্য-স্বরূপ—পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপ—তাহা বুঝা যাইতেছে।

† "আত্মনো নিত্যত্বমুপপদ্যতে বিক্রিয়াভাবে। বিক্রিয়াবচ্চ নিত্যমিতি চ বিপ্রতিসিদ্ধম্"—ভাষ্যকার।

স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, জিজ্ঞাসা করি,এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারাতীত আত্মা কি নাম-রূপাদি সংসার-ধর্ম্মেরও অতীত ? এই আত্মাকে জানিতে পারিলে কি শোক-মোহাদির অতীত হইতে পারা যায় ? এবং তাহা হইলে কি উপায়েই বা শোক-মোহাদির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ? আপনি কি তাহা অবগত আছেন ?"

যাজ্ঞবল্ক্য, কহোলের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় ! যে আত্মার কথা আমি বলিয়াছি, তাহাই নাম-রূপাদি সমুদয় বিকারের অতীত,অথচ নাম-রূপাদি সমুদয়ই, সেই চৈতন্য-শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাম-রূপাদি কোন উপাধির সহিতই আত্মার বাস্তবিক সংসর্গ নাই ; আত্মা সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত ও সর্ব্বাতীত বস্তু। আকাশের যেমন রূপ ও বর্ণ নাই, আত্মারও তদ্রূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, শোক-মোহ, অথবা জরা-মৃত্যু নাই। দেহ ও অন্তঃকরণের সহিত সম্পর্ক-বশতঃই, আত্মাকেও সেই সেই উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিকারের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার যে নিত্য, অবিকৃত স্বরূপ বর্ত্তমান আছে,— সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। পরকীয় ধর্ম্মের আরোপ করিয়া যেমন আমরা ভ্রম-বশতঃ রজ্জু, শুক্তি ও আকাশকে—যথাক্রমে সর্প, রজত ও মলিন-আকাশ বলিয়া—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এক একটী পদার্থান্তর বলিয়া, মনে করিয়া লই ; সর্ব্বাতীত আত্মাকেও আমরা ভ্রম-বশতঃ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শোক-দুঃখাকুল বলিয়া মনে করি। ফেন-বুদ্বুদাদি যেমন সমুদ্র-জল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ঘট-শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ; তদ্রূপ

নাম-রূপাত্মক বিবিধ বিকারী পদার্থ সকল, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তু হইতে পৃথক্ নহে; অথচ আমরা উহাদিগকে পৃথক্ বস্ত্বন্তর-রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকি *। অবিদ্যার এমনই প্রবল পরাক্রম। প্রকৃত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান জন্মিলে, এই মহাভ্রম ঘুচিয়া যায় †। তখন কাহারই, ব্রহ্ম-শক্তি-নিরপেক্ষ স্বাধীন-সত্তার বোধ থাকে না। মন শরীরে অবস্থিত। কাম-শোকাদি সেই মনে অবস্থিত। কোন অভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তির

---

* "পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মতত্ত্বাৎ অন্যত্বেন নিরূপ্যমানে নামরূপে মৃদাদি-বিকারবৎ বস্ত্বন্তরে বস্তুতো ন স্তঃ, সলিলফেনঘটাদিবিকারবদেব। স্বাভা-বিক্যা অবিদ্যয়া নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোঽস্তি। নহি পরমার্থাবধারণ-নিষ্ঠায়াং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বং প্রতিপদ্যামহে।" পাঠক দেখুন, কেমন সুস্পষ্ট কথা। তথাপি লোকে না বুঝিয়া শঙ্করকে 'মায়াবাদীর' দোষারোপ করে!!

† পাঠক ভাষ্যকারের এই সকল দৃষ্টান্তের অর্থ বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিবেন। তাঁহার 'অদ্বৈত-বাদ' বুঝিতে হইলে' এই দৃষ্টান্ত-গুলি ভুলিলে চলিবে না। তিনি জগতের পদার্থ-রাশিকে উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার অদ্বৈত-বাদ সেরূপ নহে। কারণ-সত্তা ব্যতীত কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম এ জগতের কারণ। সুতরাং জগতের কোন বস্তুরই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া, পদার্থ-গুলিকে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই 'অবিদ্যা'। এই অবিদ্যা চলিয়া গেলে, কোন পদার্থকেই স্বতন্ত্র স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃতি এইরূপ। না বুঝিয়া লোকে তাঁহার দোষ দেয়।

জন্য চিন্তা করিলে, মনের যে অরতি—অস্বাস্থ্য—শোক—উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারাই কামনা পুষ্ট হইতে থাকে। সমুদ্রে যেমন উর্ম্মি-মালা নিয়ত উত্থিত হইতেছে, অন্তঃকরণেও তদ্রূপ কামাদি নিয়ত উত্থিত হইতেছে। এই কামাদি কেহই আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহারা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। এইরূপ জরা-মৃত্যু, শরীরের ধর্ম্ম, এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা—প্রাণের ধর্ম্ম; ইহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে। এই কাম, সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি অতি চঞ্চল; নিয়ত আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহারা সমুদ্র-বীচির ন্যায় অতীব চপল। আকাশ যেমন প্রকৃত-পক্ষে মালিন্যাদি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত; ব্রহ্মও তদ্রূপ প্রকৃত-পক্ষে অন্তঃকরণের এই চপল শোক-মোহাদি-ধর্ম্ম দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন;—যিনি একথা সুনিশ্চিত রূপে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর পদার্থান্তরের অভিলাষ থাকে না। একমাত্র আত্মাই তাঁহার অভিলাষের বস্তু হইয়া উঠে; কেননা তাঁহার চক্ষে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা থাকে না; তিনি সকল পদার্থকে ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচায়ক-রূপেই গ্রহণ করিতে থাকেন। পুত্রাভিলাষে, ধনাভিলাষে, স্বর্গাদি লোকাভিলাষে, ইঁহার চিত্ত প্রধাবিত হয় না। পুত্র-জায়াদি নিখিল পদার্থ আত্মার সত্তাতে সত্তাবান্; অতএব তাঁহার নিকটে এ সকলের ব্রহ্মাতিরিক্ত পার্থক্য-বোধ তিরোহিত হইয়া যায় *। আত্মার সত্তা ও শক্তিতেই,—সকলের

* ভাষ্যকার এস্থলে ইহাও বলিয়াছেন যে অদ্বৈত ও দ্বৈত-বোধে কোন বিরোধ নাই। কেননা, যাহারা অজ্ঞানী কেবল তাহাদেরই পক্ষে

সত্তা ও ক্রিয়া ; আত্মার প্রয়োজনার্থ,—সকল অবস্থিত ; কেহই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে,—এই বোধ দৃঢ়ীকৃত হইলে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ অভিলাষ এক ব্রহ্মাভিলাষেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহাকে আত্ম-কাম বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে সাংসারিক সমুদায় অভিলাষকে ব্রহ্মাভিলাষে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন। আত্ম-প্রাপ্তি যাহার উদ্দেশ্য নহে এরূপ সমুদয় প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ নিয়ত ব্রহ্ম-পদার্থের অনুসন্ধান করিবেন। সর্ব্ব-পদার্থে, সর্ব্ব-স্থলে, সর্ব্ব-কর্ম্মে ও সর্ব্ব-ভাবে কেবল-মাত্র ব্রহ্ম-পদার্থের অনুসন্ধান করিতে করিতে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া আর কোন পদার্থের বোধ থাকিবে না। এইরূপে, দৃঢ়তার সহিত, জ্ঞান ও বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্ম-বিদ্যা অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞান ও বল বিহীন, মূঢ় নর-গণ বিষয়-মদে আচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের ইন্দ্রিয়-বর্গও তাহাদিগকে তুচ্ছবিষয়-সমূহে নিযুক্ত করিয়া রাখে। জ্ঞান-হীন ও বলহীন ব্যক্তি কদাপি ব্রহ্ম-লাভে কৃতার্থ হইতে পারে না।

ব্রহ্ম—জ্ঞান-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। সংসারের যাবতীয় পদার্থ সেই এক ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ। যাবতীয়

ভেদ-বুদ্ধি। কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তার বোধ এবং কোন বস্তুরই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রতার বোধ থাকে না। সুতরাং সাংসারিক ব্যবহার উড়িয়া যাইতেছে না। "জ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চ। অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা"।

পদার্থই সেই অখণ্ড চিৎশক্তির বলে অভিব্যক্ত হইয়া, তাঁহারই পরিচয় দিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংসারে, প্রকৃতি-সংসর্গে আত্মায় যতকিছু খণ্ড, খণ্ড জ্ঞান দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই সেই এক অখণ্ড ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার এক অখণ্ড ব্রহ্মানন্দই, সাংসারিক নানাপ্রকার সুখ, হর্ষ, দৈন্য, আমোদ, সৌন্দর্য্যাদিরূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। খণ্ড-বস্তুতে এই ভাবে অখণ্ডের ধারণা করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্ম-বিদ্যা দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। এই বিদ্যা পরিপক্ব হইলে, আর কাহারই পৃথক্ সত্তার বোধ থাকে না। তখন জগতের ছবি পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। যাবতীয় পদার্থই, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপেরই বিকাশ করিতেছে বলিয়া তখন বোধ জন্মে। এইরূপ ধারণা দৃঢ়ীভূত হইলে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কি প্রকারে আর ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয়ের জন্য অভিলাষ করিবেন? তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে তখন সমুদয়ই ব্রহ্মভূত হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তিকে, বিষয়-সমূহ আর আকর্ষণ করিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত বল, ইহাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য। এই বল ও পাণ্ডিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মৌনভাবে * অবস্থান করিবেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই মনুষ্য

* শ্রুতি এই বলকে "বাল্য" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টির নাম "বাল্য"। বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণকে "পাণ্ডিত্য" বলে। সর্ব্বত্র মনের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুসন্ধানের নাম "মৌন"। অতএব বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন এই তিনের অবলম্বনে ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন উপদিষ্ট হইয়াছে।

কৃতার্থ হয়”। যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু-গম্ভীর কথা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, কহোল বিস্মিত-চিত্তে উপদিষ্ট বিষয়-গুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে, সভা-স্থলে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এই আখ্যায়িকার এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এই স্থলের ও ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পের ভাষ্য করিতে গিয়া, শঙ্করাচার্য্য সমুদয় ক্রিয়া-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যখন পূর্ণ-রূপে জন্মিয়া যায়, তখন কোন ক্রিয়ারই আবশ্যকতা থাকে না; তখন মনুষ্য ক্রিয়া-শূন্য হইয়া অবস্থান করিবেন। সর্ব্ববিধ অভিলাষ, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম এবং কর্ম্মের যত কিছু সাধন,—প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানীর পক্ষে এসকলই বর্জ্জনীয়। শঙ্করাচার্য্যের এইসকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্যক। আমরা মূলে ভাষ্যের যে অনুবাদ ও মর্ম্ম দিয়াছি, তাহা হইতেই কথাটা পরিস্ফুট হইয়াছে, মনে করি। তথাপি এ স্থলেও শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ব্রহ্ম-সাধকের দুইটী অবস্থা শঙ্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম সাধনাবস্থা, দ্বিতীয় সিদ্ধাবস্থা। সাধনাবস্থায় কর্ম্মের স্থান আছে। এ অবস্থায় শম-দমাদি, ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যাচরণ প্রভৃতি এবং সর্ব্বদা ধ্যান-ধারণা উপদিষ্ট আছে। এ অবস্থায় উপাসনা একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কাম্য-কর্ম্মের পরিহার-উদ্দেশ্যে সনির্ব্বন্ধ উপদেশ বারংবার উক্ত আছে। যে কর্ম্ম ও সাধনের লক্ষ্য ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র ফল-প্রাপ্তি,—অর্থাৎ পুত্র-পশু-বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভ যাহার উদ্দেশ্য,—তাদৃশ কর্ম্ম বর্জ্জনীয়। কেন না, ইহা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের প্রতিকূল। কর্ম্ম ও সাধন মাত্রেরই একমাত্র সেই এক, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি লক্ষ্য হওয়া বিধেয়, একথা

মহাত্মা শঙ্কর বারংবার বলিয়া দিয়াছেন। যাহাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থান্তরের উদ্দেশ্যে অভিলাষ ও কর্ম্ম না করা হয়,—এই জন্ম আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থ-গুলিকে, আধিদৈবিক-শক্তিরই বিকাশ বলিয়া গ্রহণের উপদেশ আছে; এবং সেই আধিদৈবিক শক্তি-গুলি এক বিশ্ব-ব্যাপ্ত প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি,—এবং প্রাণ-শক্তিই ব্রহ্ম-শক্তি,—একথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ সকলেরই উদ্দেশ্য—বিষয়মাত্রেই ব্রহ্ম-দর্শন। এই জন্যই, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ-গুলিকে ভাবনাময় যজ্ঞে পরিবর্ত্তিত করিবার উপদেশও দৃষ্ট হয়। * ইহারও ফল,—সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন। ইহা বলিতে গিয়া শ্রুতি, যজ্ঞের সাধন-গুলিকে, আধিদৈবিক শক্তিরই অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই শ্রুতির উদ্গীথ-সামাদিতে পৃথিব্যগ্ন্যাদিদৃষ্টির উপদেশ। আবার দৈহিক স্বাভাবিক ক্রিয়া-গুলিতেও এই জন্যই যজ্ঞ-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে †। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দৃষ্টি দৃঢ় করিয়া লওয়াই, এ সকল উপদেশের উদ্দেশ্য। এইরূপে, সর্ব্ব-পদার্থে এবং সর্ব্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন এবং উপাসনা-ধ্যানাদি নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্ব-পদার্থের পরিত্যাগ ও সর্ব্বকর্ম্মের বর্জ্জন আসিতেছে না, পাঠক অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া, যখন সাধকের ব্রহ্ম-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল, তখনই তিনি সিদ্ধা-

* আবার, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ-গুলিকে দেবতা ও স্বর্গ-ফলোদ্দেশে করিতে নিষেধ করিয়া, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-উদ্দেশেই করিবার ব্যবস্থা আছে।

† তবেই যজ্ঞ কদাপি ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিরোধী হইতেছে না, পাঠক ইহাও দেখিবেন। Paul deussen প্রণীত "Philosophy of the Upanisads" গ্রন্থে এ বিষয়ে ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বস্থায় আরোহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, সাধনাবস্থার নাম রাখিয়াছেন "বিবিদিষা" এবং সিদ্ধাবস্থার নাম রাখিয়াছেন "বিদ্বৎ-সন্ন্যাস"। সিদ্ধাবস্থাটী ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা। এ অবস্থায় সর্ব্ব-পদার্থে ও সকল-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন দৃঢ় হইয়া গিয়া, পদার্থান্তরের ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা ও ক্রিয়া তিরোহিত হইয়াছে। নিজের জন্য এখন আর ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তির কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না *। তবে জগতের মঙ্গলার্থ কর্ম্ম করা যাইতে পারে; কিন্তু জগতের স্বাতন্ত্র্য-বোধও তখন তাঁহার তিরোহিত; সকলই ব্রহ্ম এই ধারণা দৃঢ়ীভূত। ইহাই জীবন্মুক্তি। মৃত্যুর পরও, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মেই একীভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রুতি ও ভাষ্যকারের প্রকৃত অভিপ্রায়। এই গভীর তথ্য-সম্বন্ধে অবতরণিকায় আলোচনা করা গিয়াছে; এ স্থলে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

৬। গার্গীর প্রশ্ন।—এইরূপে সভাস্থ কোন পণ্ডিতই যাজ্ঞবল্ক্যকে নিরুত্তর করিতে পারিলেন না। এই সময়ে ভারতবর্ষ ব্রহ্ম-বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে সমাজে, বিদুষী রমণীগণও ব্রহ্ম-বিদ্যায় প্রকৃষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মহিলাগণও তখন প্রকাশ্য সভায়, দিগ্দিগন্তর বিশ্রুত-কীর্ত্তি ব্রহ্ম-বিদ্ পণ্ডিত-বর্গের সঙ্গে ব্রহ্ম-বিষয়ক তত্ত্ব সকলের আলোচনায় যোগ দিতেন, অনেক কঠিন তত্ত্বের মীমাংসা করিতেন এবং অনেক বিদ্বান্ পুরুষ অপেক্ষাও এই সকল রমণীর জ্ঞান ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর এবং চিত্ত বিশুদ্ধতর ছিল।

* এইরূপ পরিপক্ক জ্ঞানের সঙ্গেই, সকাম যজ্ঞাদি-কর্ম্মের বিরোধ, শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।

হায়! আমাদের সেই দিন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে? ব্রহ্ম-বিদ্যা ত দূরের কথা, রমণীকুলের পক্ষে যে লৌকিক-বিদ্যারই প্রয়োজন আছে, এবিষয়েও আমরা সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি!! হা! দুরদৃষ্ট!!!

কহোলের আসন পরিগ্রহ করিবার পর, বচক্নুর দুহিতা গার্গী নাম্নী একটী মনস্বিনী রমণী, যাজ্ঞবল্কের সম্মুখে বিনীত-ভাবে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! কার্য্য-কারণের নিয়মানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন, তাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক কারণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, পার্থিব স্থূল পদার্থ সকল উহার কারণীভূত জলীয় পরমাণু দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে *। জল ত স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং এই জলও কোন কিছুতে অবশ্যই ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত আছে। মহাশয়! কোন্ উপাদান জলকে ব্যাপিয়া আছে তাহা আমাকে বলুন্ এবং তাহাই বা আবার কাহার দ্বারা ওত-প্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত আছে, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য দেখিলেন, গার্গী বড়ই সূক্ষ্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। মনে মনে গার্গীর উপরে বড়ই প্রীত

* পার্থিব, জলীয়, বায়বীয়, তৈজস প্রভৃতি পাঁচ উপাদানের অর্থ কি, তাহা অবতরণিকায় বলা হইয়াছে। "পার্থিবং ধাতুজাতম্‌অদ্ভিঃ সর্ব্বতোব্যাপ্তং, অন্যথা সক্তু-মুষ্টিবৎ বিশীর্য্যেত"—ভাষ্য।

হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"গার্গি! মনোযোগ দিয়া আমার উত্তর শ্রবণ কর। আমি তোমাকে সকল তত্ত্বই বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি কার্য্য-কারণ-প্রক্রিয়ার যেরূপ প্রণালীর কথা বলিলে, তাহাই ঠিক। কার্য্যের কারণাতিরিক্ত ভাবে স্বাধীন-সত্তা থাকিতে পারে না। কারণ দ্বারাই কার্য্য ব্যাপৃত থাকে *। তুমি যে রসাত্মক জলের কথা বলিলে, বায়ুই উহার কারণ। অগ্নি হইতেই জলীয় উপাদান অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি আমি যে 'জল, বায়ু-দ্বারাই ওত-প্রোত রহিয়াছে' বলিলাম, ইহার অভিপ্রায় এই যে,—অগ্নি.কাষ্ঠাদি পার্থিব বা জলীয় ধাতুর সংসর্গ-ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে আত্ম-বিকাশ করিতে পারে না; কিন্তু বায়ু, আত্ম-প্রকাশের জন্য, জলাদি অন্য কোন ভূতের অপেক্ষা রাখে না †। আবার দেখ, জল যেমন বায়ু-দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত; তদ্রূপ বায়ু, অন্তরীক্ষ-লোক দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অন্তরীক্ষাদি লোক সকল, এই পঞ্চ-ভূতাত্মক উপাদানেরই পরস্পর মিশ্রণ-জাত অবস্থা বিশেষ। এই উপাদান ব্যতিরেকে, এই সকল লোকের স্বতন্ত্র-ভাবে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

---

* ব্যাপ্তি তিন প্রকার। যাহা কার্য্য, তাহা কারণ-দ্বারা ব্যাপ্ত। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা তদপেক্ষা ব্যাপক বস্তু দ্বারা ব্যাপ্ত। যাহা স্থূল, তাহা সূক্ষ্ম-দ্বারা ব্যাপ্ত। কার্য্য-মাত্রই—স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন।

† "অগ্নেঃ পার্থিবং বা আপ্যং বা ধাতুমনাশ্রিত্য ইতরভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি"—ভাষ্য।

এইরূপ, অন্তরীক্ষ-লোক, গন্ধর্ব্ব-লোক দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রণালী-ক্রমে, ক্রম-সূক্ষ্ম তারতম্যের অনুযায়ী, গন্ধর্ব্ব-লোক আদিত্য-লোক দ্বারা, আদিত্য-লোক চন্দ্র-লোক দ্বারা এবং চন্দ্র-লোক নক্ষত্র-লোক দ্বারা; নক্ষত্র-লোক দেব-লোক দ্বারা, দেব-লোক ইন্দ্র-লোক দ্বারা, এবং ইন্দ্র-লোক স্থূল ভূতাণুর সমষ্ট্যাত্মক প্রজাপতি-লোক দ্বারা ব্যাপ্ত। প্রজাপতি-লোক, সূক্ষ্ম-ভূতের সমষ্ট্যাত্মক ব্রহ্ম-লোক দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। মূল পঞ্চ-সূক্ষ্ম-ভূতই, সর্ব্বত্র প্রাণী-বর্গের আশ্রয় ও উপভোগের জন্য, সেই সেই বিশেষ বিশেষ লোকের আকারে পরিণত হইয়া আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-লোক সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ও ব্যাপকতম উপাদান দ্বারা রচিত এবং অন্তরীক্ষ-লোক অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদানে রচিত। সূক্ষ্মতার ক্রমিক তারতম্যানুসারে এই লোক-গুলি, সূক্ষ্ম-ভূতেরই মিশ্রণ হইতে জাত। ইহারা সেই সেই লোকবাসী জীব-বর্গের আশ্রয়স্থান ও ভোগভূমি"।

গার্গী পুনরায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! এই সূক্ষ্মতম ব্রহ্ম-লোকই বা কাহাতে ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থান করিতেছে? কার্য্য-কারণের প্রণালী অনুসারে, এ প্রশ্ন করিবারও ত আমার অধিকার আছে। আপনি 'ব্রহ্ম-লোক' বলিয়াই নিরস্ত হইলেন কেন? এই ব্রহ্ম-লোক যতই কেন সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা রচিত হউক্ না, ইহা অপেক্ষাও কোন সূক্ষ্ম ও অপরিচ্ছিন্ন কারণ নিশ্চয়ই

আছে *। সেই কারণটী কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি, আমাকে বলুন”।

গার্গীর কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“গার্গি! আর অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করিও না। তুমি যে পদার্থের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। সুতরাং তর্ক-শাস্ত্রের অবলম্বিত কার্য্য-কারণ-প্রণালী দ্বারা সে পদার্থের স্বরূপ নির্ণীত হইবে না †। ব্রহ্ম-পদার্থ, অর্থাৎ যাঁহাতে জাগতিক উপাদান ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত আছে, সে পদার্থটী—অনুমানের রাজ্যের বহির্ভূত। উহা কেবলমাত্র শ্রুতিবাক্য দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। কোনরূপ প্রমাণ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায় না। সুতরাং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া সে বিষয়ে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না”। গার্গী আর

* গার্গী সূক্ষ্ম-ভূতের উপাদান ‘সূত্র’ (স্পন্দন-শক্তির) বা হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ব এবং সূত্রেরও যাহা মূল ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

† পাঠক দেখিবেন সেই অতি প্রাচীনকালেও, কিরূপ ন্যায়-সঙ্গত বিচার-প্রণালী অবলম্বিত হইত। সাংখ্য-দর্শন প্রণেতা মহাপুরুষ কপিলও, একদিন সেই প্রাচীনকালে এই জন্যই “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। আত্ম-প্রমাণের উপরেই জগৎ-কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সেই আত্ম-প্রমাণ অভ্যুপগম মাত্র। ‘আমি আছি’, একথার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, কিছু সন্দেহ করিবারও নাই। কিন্তু তর্ক-শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমাণিত করা যায় না। এইজন্যই বুদ্ধদেব, কেহ আত্মা বা ব্রহ্মের কথা বলিলে, মৌন হইয়া থাকিতেন।

কোন কথা বলিলেন না; মৌনভাবে স্বীয় আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

৭। উদ্দালকের প্রশ্ন।—গার্গী আসন পরিগ্রহ করিলে, উদ্দালক নামক একজন পণ্ডিত, যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মদ্রদেশে কপিঞ্জল নামক একটী ব্রাহ্মণের গৃহে আমি যজ্ঞ-বিদ্যার জ্ঞান-লাভার্থ কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলাম। সেই সময়ে কপিঞ্জলের ভার্য্যার মুখে * একটী সূত্রের কথা শুনিয়াছিলাম, সেই অন্তর্যামী সূত্রের কথা জানিতে পারিলে, সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। আমি সেই সূত্রের তত্ত্ব অবগত আছি। মহাশয়! আপনি সেই অন্তর্যামী সূত্রের তত্ত্ব জানেন কি? যদি তদ্বিষয়ে আপনার কোন অভিজ্ঞতা না থাকে তবে আপনি এই যজ্ঞস্থল হইতে কদাপি মহারাজ জনকের প্রদত্ত এই গাভী-গুলি স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারিবেন না"। যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালকের এই গর্ব্বোক্তি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ যুবককে সম্বোধন করিয়া, অন্তর্যামী সূত্র সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সভা নীরব শান্ত ভাব ধারণ করিল। মহারাজ জনক এবং সভাস্থ সমবেত পণ্ডিত-বর্গ, সকলেই একাগ্র

---

* মূলে আছে যে ভার্য্যাটী, অদৃশ্য একজন গন্ধর্ব্ব দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে এই 'সূত্রের' তত্ত্ব বাহির হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বটী তর্কের অতীত, কেবল আগম-প্রমাণেই ইহা জানা যাইতে পারে।

চিত্তে, যাজ্ঞবল্ক্যের সেই গম্ভীর ব্রহ্ম-তত্ত্বগুলি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন——

"মহাশয়! সেই অন্তর্যামী সূত্রের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি আপনারা সকলে মন দিয়া শ্রবণ করুন। সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনকেই 'সূত্র' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই প্রাণ-স্পন্দনই নানাকারে ও নানাভাবে বিকাশিত হইয়া আছে। সমস্ত পদার্থই এই প্রাণ-সূত্রে গ্রথিত। এই প্রাণ-শক্তিই কার্য্য ও করণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে *। কিন্তু এই প্রাণ-স্পন্দনেরও একজন নিয়ন্তা আছেন। তিনি প্রাণ-শক্তির অতীত থাকিয়া, প্রাণ-শক্তির প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু-রূপে অবস্থিত। তিনিই প্রকৃত অন্তর্যামী সূত্র †। সেই অন্তর্যামী সূত্রের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারিতেছে না, পৃথিবী যাঁহার

---

* কার্য্য = দেহ ও দেহাবয়ব। করণ = ইন্দ্রিয়-গুলি। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

† "যঃ কশ্চিদ্বৈ তৎসূত্রং ··বিজানীয়াৎ, তঞ্চ অন্তর্যামিণং সূত্রান্তর্গতং তস্যৈব সূত্রস্য নিয়ন্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি।—ভাষ্য। "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং ...সূক্ষ্মং বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাদীনাং যদাত্মকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং ...যস্য বাহ্যভেদাঃ সপ্ত সপ্ত মরুদ্গণাঃ সমুদ্রস্যেব ঊর্ম্ময়ঃ...তৎ তত্ত্বং সূত্রমিত্যভিধীয়তে।...যেন সূত্রেণ অয়ঞ্চ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দব্ধানি সংগ্রথিতানি ভবন্তি"—ভাষ্য।

শরীর;—তিনিই পৃথিবীর ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি জলে থাকিয়া, জলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহাকে জল জানিতে পারিতেছে না, জল যাঁহার শরীর;—তিনিই জলের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া, অগ্নির অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে অগ্নি জানিতে পারিতেছে না, অগ্নি যাঁহার শরীর;—তিনিই অগ্নির ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া, অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে অন্তরীক্ষ জানিতে পারিতেছে না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর;—তিনিই অন্তরীক্ষের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া, বায়ুর অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে বায়ু জানিতে পারিতেছে না, বায়ু যাঁহার শরীর;—তিনিই বায়ুর ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি দ্যুলোকে থাকিয়া, দ্যুলোকের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে দ্যুলোক জানিতে পারিতেছে না, দ্যুলোক যাঁহার শরীর;—তিনিই দ্যুলোকের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি সূর্য্যে থাকিয়া, সূর্য্যের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে সূর্য্য জানিতে পারিতেছে না, সূর্য্য যাঁহার শরীর;—তিনিই সূর্য্যের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি দিক্‌সকলে থাকিয়া, দিক্‌সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে দিক্‌সকল জানিতে পারিতেছে না, দিক্‌সকল যাঁহার শরীর;—তিনিই দিক্‌সকলের ক্রিয়া-[illegible], অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি চন্দ্রে ও তারকা-সকলে থাকিয়া, চন্দ্র ও তারকা-সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে চন্দ্র ও তারকা-সকল জানিতে পারিতেছে না, চন্দ্র ও তারকা-সকল যাঁহার শরীর;—তিনিই চন্দ্র ও তারকা-সকলের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি আকাশে থাকিয়া, আকাশের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে আকাশ জানিতে পারিতেছে না, আকাশ যাঁহার শরীর;—তিনিই আকাশের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি বাহ্য আলোক ও অন্ধকারে থাকিয়া, আলোক ও অন্ধকারের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে আলোক ও অন্ধকার জানিতে পারিতেছে না, আলোক ও অন্ধকার যাঁহার শরীর;—তিনিই আলোক ও অন্ধকারের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

এই আমি আপনাদিগকে সেই অন্তর্যামী সূত্রের আধিদৈবিক রূপের তত্ত্ব বলিলাম। এখন তাঁহার আধিভৌতিক রূপের কথা বলিব।

যিনি শব্দ-স্পর্শাদি-ভূত-সমূহে থাকিয়া, শব্দ-স্পর্শাদি-ভূত-

সমূহের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে ভূত-সকল জানিতে পারিতেছে না, ভূত-সকল যাঁহার শরীর;—তিনিই ভূত-সকলের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

এখন তাঁহার আধ্যাত্মিক রূপের কথা বলিব।

যিনি প্রাণে * থাকিয়া, প্রাণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে প্রাণ জানিতে পারিতেছে না, প্রাণ যাঁহার শরীর;—তিনিই প্রাণের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি বাক্যে থাকিয়া, বাক্যের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে বাক্য জানিতে পারিতেছে না, বাক্য যাঁহার শরীর;—তিনিই বাক্যের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া, চক্ষুর অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে চক্ষুঃ জানিতে পারিতেছে না, চক্ষুঃ যাঁহার শরীর;—তিনিই চক্ষুর ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি কর্ণে থাকিয়া, কর্ণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে কর্ণ জানিতে পারিতেছে না, কর্ণ যাঁহার শরীর;—তিনিই কর্ণের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি মনে থাকিয়া, মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে মন জানিতে পারিতেছে না, মন যাঁহার শরীর;—তিনিই মনের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, † অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

---

* এখানকার প্রাণশব্দের অর্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

† সংকল্প-বিকল্পই মনের মুখ্য-বৃত্তি বা ক্রিয়া। বস্তু-প্রত্যক্ষ সময়ে,

যিনি বুদ্ধিতে থাকিয়া, বুদ্ধির অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে বুদ্ধি জানিতে পারিতেছে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর;—তিনিই বুদ্ধির ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, * অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

'ইহা নীলরূপ কি পীতরূপ' ইত্যাকারে যে মনের সংশয় তাহাই 'সংকল্প-বিকল্প'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ।

* অধ্যবসায় বা বস্তু-নিশ্চয়-করণই বুদ্ধির মুখ্য-বৃত্তি বা ক্রিয়া।

মন এবং বুদ্ধিকে একত্রে অন্তঃকরণ বলা যায়। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, ধৃতি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি সমস্তই এই অন্তঃকরণের বৃত্তি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি এই অন্তঃকরণেরই বিষয়োপরক্ত বৃত্তি। কেনোপনিষদ্‌ভাষ্যে, শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতো যৎপ্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি সংহতানাং পরার্থত্বাদবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা"। ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য, সেই আত্ম-চৈতন্যেরই অধিষ্ঠান জন্য। আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে, ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়ায় সক্ষম হইত না। "সঙ্ঘাত-ব্যতিরিক্তস্ত স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণ (Free will) এবং মন-আদি-প্রেষয়িতৃত্বম্"। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া স্বাধীন নহে; ইহারা স্ব স্ব বৃত্তির বশীভূত;—ইহাদের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া-গুলি ইহাদের উদ্রিক্ত-বৃত্তি অনুযায়ী হইয়া থাকে। এক চৈতন্য-শক্তিই, ইহাদিগকে বশে আনিতে সমর্থ; চৈতন্য-শক্তিই স্বাধীন। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ন্যায়, এই চৈতন্য-শক্তির নিজের কোন বিশেষ বৃত্তি বা ব্যাপার নাই; ইহাদের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতেই ইঁহারও বিশেষ বিশেষ ব্যাপার হয় বলিয়া মনে হয়। এক নিত্য, স্বাধীন সাধারণ আত্ম-শক্তিদ্বারা প্রেরিত না হইলে,—অন্তঃকরণাদি স্ব স্ব বিষয়ের সংকল্পাদি ক্রিয়া করিতে পারিত না। বুদ্ধি যে

যিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ে থাকিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় জানিতে পারিতেছে না, স্পর্শেন্দ্রিয় যাঁহার শরীর;—তিনিই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

এই অন্তর্যামী আত্মা চক্ষুর দর্শনের বিষয়ীভূত হন না; ইনি নিত্য দ্রষ্টা-রূপে চক্ষুর সন্নিধানে থাকায়, চক্ষুঃ দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে,—ইনিই সকলের দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা-রূপে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার, নির্ব্বিকার সাধারণ-সামর্থ্য-বীজ; কোনপ্রকার বিশেষ ক্রিয়ায় ইনি ব্যাপৃত নহেন। ইনি ভিন্ন অপর কেহই বিজ্ঞাতা নাই, অপর কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই। ইনিই অন্তর্যামী, অমর আত্মা। ইঁহাকে ছাড়িয়া, কাহারই পৃথক্ সত্তা

শব্দ-স্পর্শাদি নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে, তাহাও এই আত্ম-চৈতন্যই জ্ঞাতা বলিয়া। সুতরাং যাঁহার নিত্য-জ্ঞানের প্রভাবে মন নীল-পীতাদি ভেদে (সংকল্প-বিকল্প করিয়া) বস্তু বুঝিতে পারে, এবং বুদ্ধি নিশ্চয় (অধ্যবসায়) করিয়া বিষয়-বিজ্ঞাতা;—তাঁহাকে মন ও বুদ্ধি জানিবে কিরূপে? অতএব তিনিই সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে সাক্ষী রূপে অবস্থিত। "রূপাদিগুণ-হীনত্বাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বারকধীভিত্ত্বাবদাত্মা ন প্রাপ্যতে; মনসশ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারোপলব্ধবিষয়াতিরেকেণ স্বতন্ত্রস্য বিষয়স্যানিরূপণাৎ"—উপদেশ-সাহস্রী টীকা।

নাই, ক্রিয়া নাই; খণ্ড খণ্ড সত্তা ও ক্রিয়া,—ইঁহারই সত্তা ও শক্তির অন্তর্ভুক্ত"। অরুণ-পুত্র উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল জ্ঞান-গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। অগণিত জন-সমাকীর্ণ সভা নিস্তব্ধ হইল।

৮। গার্গীর পুনরায় প্রশ্ন। পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রায় পরাস্ত দেখিয়া, গার্গী পুনরায় সভাস্থল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পণ্ডিত-বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়গণ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ত আপনাদের সকল প্রশ্নেরই সুসঙ্গত উত্তর দিলেন। আমি নিজেও ইঁহাকে একটী তত্ত্বের মীমাংসা করিতে দিয়াছিলাম, তাহারও উত্তর আপনারা শুনিয়াছেন। এক্ষণে আমি পুনরায় ইঁহাকে দুইটীমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ইচ্ছা করিয়াছি। ইনি যদি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন, তবে এই সভায় সমবেত কোন পণ্ডিতই ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনারা অনু-মোদন করিলেই, আমি ইঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি"। পণ্ডিতেরা অনুমোদন করিলে, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ-লোকের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং ঊর্দ্ধদেশ ও অধোদেশ কাহার দ্বারা ওত-প্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে? লোকে যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, সেই কালই বা কাহাতে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে"?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—"গার্গি! তুমি খণ্ড-কাল * এবং খণ্ডদেশ † সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। ইহারা, আমার বিবেচনায়, এক অখণ্ড অসীম আকাশ ‡ দ্বারা ওত-প্রোত রহিয়াছে" §।

গার্গী বলিলেন,—"মহাশয়! আমার উত্তর হইয়াছে, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রদান করুন। আপনি বলিলেন যে, খণ্ড খণ্ড দেশ এবং খণ্ড খণ্ড কাল,—ইহারা এক নিত্য আকাশ দ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে। আমি আপনার একথা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই অখণ্ড আকাশই

---

* খণ্ড-কাল—Limited Time.

† খণ্ড-দেশ—Limited Space.

‡ অখণ্ড-আকাশ—Infinite-Space.

§ পাঠক এস্থলে একটী তত্ত্ব অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। খণ্ড-দেশ ও খণ্ড-কাল বলাতে ব্যক্ত জগৎকে বুঝাইতেছে। কেন না সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অব্যক্ত-শক্তি (প্রাণ-শক্তি) সর্ব্ব প্রথমে মহাকাশে স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হয়। শ্রুতিতে এই স্পন্দন-শক্তি—সূত্র, হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই স্পন্দনই পরে 'করণ'-রূপে ও 'কার্য্য'-রূপে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হইয়া জগৎ গড়িয়া তুলে। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য। অতএব 'অখণ্ড-আকাশ' বলাতে অব্যক্ত-শক্তিকেই বুঝাইতেছে। "যদেতদ্ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকং জগৎ তৎ অব্যাকৃতাকাশে বর্ত্ততে উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়ে চ।"—ভাষ্যকার।

বা * কাহাতে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—"গার্গি! অব্যক্ত আকাশ যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে এক, অক্ষর, অবিনাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন †! তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, তিনি হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন। স্থূলাদি পরিমাণ দ্রব্যের ধর্ম্ম,—তাঁহাতে সেরূপ কোন দ্রব্যের ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব-প্রকার বর্ণ ও রস বিবর্জ্জিত। অগ্নি জলাদির যে লৌহিত্য ও স্নেহাদি গুণ আছে, তাঁহাতে সেরূপ গুণ কিছুই নাই। বায়ু ও আকাশের ধর্ম্ম—স্পর্শ-শব্দাদি তাঁহাতে নাই। তিনি চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ, বাক্য, প্রাণ ও মন বর্জ্জিত। তাঁহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব-প্রকার বিশেষণ বর্জ্জিত। তিনি অন্তরও নহেন, বাহিরও নহেন।

---

* বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য, মায়া-শক্তি বা প্রাণ-শক্তিকে 'আকাশ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ক্বচিৎ আকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টং... মায়াশক্তিরিতি" ইত্যাদি ১।৪।৩ দেখ। ছান্দোগ্যেও এই কথা আছে—"আকাশো বৈ নাম নাম-রূপয়োনির্ব্বহিতা" ৮।১৪।১) ।

† অব্যক্ত-শক্তি বা মায়া-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি—পূর্ণ ব্রহ্মেরই জগৎ-সৃষ্টিকালীন অভিব্যক্তি হইবার উন্মুখ-অবস্থা মাত্র। সুতরাং ইহা সেই পূর্ণব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। "প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতং...সৎ-কার্য্যাভিমুখং...ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি সদাসীৎ"—ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য। অতএব মায়া-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই 'অক্ষর-পুরুষ' নামে শ্রুতিতে পরিচিত। ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। ইনি সৃষ্ট-জীবের প্রয়োজনবিৎ; সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া লোকের উপকারকরূপে বিধৃত রহিয়াছে। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে. সাবয়ব ও গুরুত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ-লোক বিশীর্ণ হইয়া স্বস্থান-চ্যুত হইতেছে না। ইনিই ইহাদের নিয়ন্তা। ব্রহ্ম-ব্যতীত ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র স্বাধীনতা নাই।

গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, কালের অবয়ব—মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, মাস, ঋতু, সংবৎসর—ইহারা নিয়মিত ও বিধৃত রহিয়াছে। ইঁহারই প্রশাসনে, হিমাচলাদি পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া, পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী নদী সকল পূর্ব্বাভিমুখে, পশ্চিম-দিগ্‌গামিনী নদী সকল পশ্চিমাভিমুখে নিয়ত ধাবিত হইয়া চলিয়াছে। ইনিই ইহাদের নিয়ন্তা। ইনি ব্যতীত ইহাদের কাহারই স্বাধীন সত্তা নাই।

গার্গি! এই অক্ষর পুরুষই সমুদয় কর্ম্মের যথা-বিধানে ফলদাতা। ইঁহার শক্তি ব্যতিরেকে, কোন ক্রিয়ার স্বাধীনতা নাই।

গার্গি! যিনি ইঁহাকে না জানিয়া বহুবৎসর তপশ্চর্য্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়। যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জানিতে না পারিয়া অন্তকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তিনি নিতান্তই

কৃপণ, নিতান্তই দয়ার্হ। কিন্তু যিনি ইঁহাকে জানিতে পারিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

গার্গি! এই অক্ষর পুরুষ—চক্ষুর বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, ইঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না; ইনিই নিত্য-দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত। ইনি শ্রবণের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, ইহাঁকে কেহই শুনিতে পায় না, ইনিই নিত্য-শ্রোতা রূপে অবস্থিত। ইনি মনের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, কেহ ইহাঁকে মনন করিতে পারে না; ইনিই মনের ক্রিয়া-নির্ব্বাহক-রূপে নিত্য অবস্থিত। ইনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, কেহ ইহাঁকে নিশ্চয় জানিতে পারে না; ইনিই বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ দ্বার-যোগে বিজ্ঞাতারূপে নিত্য অবস্থিত। ইনি ব্যতীত, দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা আর কেহ নাই। ইনি দর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতি ক্রিয়ার মূলে অবিকারী কর্ত্তারূপে নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। তুমি যে আকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই আকাশ,—এই অবিনাশী অক্ষর পুরুষেই ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত আছে"।

সূর্য্য-চন্দ্রাদি এবং চক্ষু-বুদ্ধি প্রভৃতি 'বিষয়'-বর্গ সমুদয়ই জড়; ইহাদের ক্রিয়াও জড়-ক্রিয়া মাত্র। এই জড়ীয়-ক্রিয়ার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এখানে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহাই বলিতেছি। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বারংবার বলিয়াছেন যে, জড়ের স্বাধীন-ক্রিয়া নাই। চেতন-শক্তি-কর্ত্তৃক চালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই, জড়-বর্গকে ক্রিয়া-শীল দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল কর্তৃত্ব, সেই চেতনেরই। চেতনই প্রযোক্তৃ-শক্তি-স্বরূপ। মন, বুদ্ধি প্রভৃতির খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, যেমন সেই এক অখণ্ড-জ্ঞানেরই (চেতন) নানাবিধ বিকাশ *; সেইরূপ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-গুলিও, সেই এক সাধারণ মূল কারণ-শক্তি হইতেই জাত। সর্ব্ববিধ বিশেষ-বিজ্ঞান এবং সর্ব্ববিধ বিশেষ-ক্রিয়ার অন্তরালবর্ত্তী মূল সত্তা যিনি, তিনি অবশ্যই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহার বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাকেও বিকারী (Phenomenal) বলিতে হয়। কিন্তু তিনি যে সকল গুণ ও সকল ক্রিয়ার সাধারণ মূল-বীজ (Noumcnon) একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমুদয় পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য-সত্তা স্বীকার না করিলে, পরিবর্ত্তনই বুঝিতে পারা যায় না। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, পর-মুহূর্ত্তেই গম্ভীর-নাদে বজ্রধ্বনি হইল; এই দুই ক্রিয়া একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ; ইহারা সেই শক্তিরই চিহ্নমাত্র। সেই কারণ-শক্তি হইতেই ইহারা কার্য্যাকারে দেখা দিয়াছে;—একথা না ভাবিয়া আমরা পারি না। এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। একটি বন্ধু আমায় সেদিন বলিতেছেন যে আমার বিদেশস্থ পুত্রটীর পীড়া হইয়াছে। সেই দিন বিকালে আমি পুত্রের পত্রেও তাহার পীড়ার কথা শুনিলাম এবং সেই পূর্ব্ব-শ্রুত কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলাম। উহার পত্র পাইবার পর-দিবস আমি পুত্রকে একখণ্ড পত্র লিখিলাম। এস্থলে 'আমিই' যে এক স্থির, অপরিবর্ত্তিত পুরুষ এতগুলি কার্য্য করিয়াছি,—তাহা না বুঝিয়া থাকিতে পারা যায় না। এক 'আমিই' পুত্রের পত্র পাইয়াছি; আবার

* "বিশেষাঃ সামান্যে কল্পিতাঃ"—রত্নপ্রভা, ১।৪।২৩ "সামান্যা-দ্বিশেষাঃ উৎপদ্যন্তে"—শঙ্কর (বেঃ দঃ ২।৩।৯)।

সেই 'আমিই' বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়াছি; আবার সেই 'আমিই' পুত্রের পত্রের উত্তর দিয়াছি। এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও বোধের সঙ্গে সঙ্গে, সেই এক অপরিবর্ত্তিত 'আমিত্ব-বোধ' রহিয়াই যাইতেছে। আমাদের জ্ঞানের স্বরূপই এই। গুণ ও ক্রিয়া সকলের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের অন্তরালবর্ত্তী নিত্য, অবিকারী সত্তার বোধও অনুস্যূত থাকে। কিন্তু সেই সত্তা বা শক্তিটাই, সেই সেই বিশেষ প্রকারের গুণ ও ক্রিয়াদিতে পরিণত হইয়া যায় না। যে 'আমি' দেখিয়াছি, স্মরণ করিয়াছি, পত্র লিখিয়াছি, পত্র পাইয়াছি,—সেই 'আমিই' এতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার অন্তরালে স্থির রহিয়াছি। কিন্তু সেই আমিই যে,—এই সকল দেখা, স্মরণ করা, পত্রলেখা প্রভৃতি ক্রিয়াতেই পরিণত হইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের মূলস্থ 'আমিত্বের' বোধও পরিস্ফুট হইতেছে। জ্ঞান-গুলি আমার; জ্ঞান-গুলিই আমি নহি। এইজন্যই জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ কপিলাচার্য্য "ষষ্ঠী-ব্যপদেশাৎ" (সাংখ্য-দর্শন, ৬।৩) এই সূত্র করিয়া তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞান-ভিক্ষুও বলিয়াছেন, "তাশ্চ বুদ্ধি-বৃত্তয়ো (States of consciousness) নাজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি; অতস্তাসাং সদাজ্ঞাতত্বাৎ তদ্‌দ্রষ্টা অপরিণামী"। এইজন্যই শ্রুতিতে আত্ম-চৈতন্যকে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ, প্রাণস্য প্রাণং, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ"—বলা হইয়াছে। সমস্ত বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়ার, নিত্য অপরিণামী মূল বীজ,—সেই অক্ষর, অবিনাশী পুরুষই। জ্ঞাতা আছে অথচ তাহার জ্ঞেয় নাই,—একথাও যেমন অশ্রদ্ধেয়, সেইরূপ জ্ঞেয় আছে অথচ তাহার জ্ঞাতা নাই, একথাও ততোধিক অশ্রদ্ধেয়। জ্ঞেয়, জ্ঞাতাকে সূচিত করে; আবার জ্ঞাতাও, জ্ঞেয়ের সংবাদ দেয়*। আমাদের জ্ঞানের

* এই জন্যই উপনিষদে ও হিন্দু-দর্শনে "অজ্ঞেয়বাদ" অবলম্বিত হয় নাই। তথাপি Paul Deussen তাঁহার নবপ্রকাশিত Philosophy of

স্বরূপই এই। এই কথা বুঝাইবার জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ন হি দৃশা ব্যাপ্যত্বং বিনা জড়বর্গস্থ কাপি প্রবৃত্তিঃ।" আনন্দগিরিও বলিয়াছেন, ..."কার্য্যস্থ সাক্ষ্যধীনা প্রবৃত্তিঃ"।

৯। **বিদগ্ধের প্রশ্ন।**—অনন্তর বিদগ্ধ নামে একজন পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! দেবতা কত প্রকার? দেবতার সংখ্যা শাস্ত্রে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—বিদগ্ধ! শাস্ত্রে দেবতার প্রকৃত সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে যে কোথাও ৩০০৩ বা ৩০৩টীর কথাও উল্লিখিত দেখা যায়, তাহা সেই ৩৩টী দেবতারই মহিমা বা বিভূতির দিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে *। প্রকৃত-পক্ষে শাস্ত্রোক্ত দেবতার সংখ্যা ৩৩টীর অধিক নহে। আপনাকে সেই তেত্রিশটী দেবতার নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছি। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য,—এই একত্রিশটী এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে

---

the Upanisads নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে নাকি 'অজ্ঞেয়-বাদ'ই অবলম্বিত হইয়াছে!!! অবতরণিকায়—আমরা ইহা আলোচনা করিয়াছি।

* দেবতা সম্বন্ধে এই মত, ঋগ্বেদাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ,—অগ্নিঃ পৃথিবী-স্থানঃ,বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরীক্ষ-স্থানঃ, সূর্য্যো দ্যু-স্থানঃ। তাসাং মাহাভাগ্যাৎ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি,অপি চ কর্ম্ম-পৃথক্ত্বাৎ—যথা হোতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা

লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টী দেবতা হইতেছেন। অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই আটটীকে বসু বলে। কেননা, সৃষ্ট-পদার্থ মাত্রই ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই বাস করিতেছে। জীবদেহে বর্ত্তমান দশটী ইন্দ্রিয় ও মন,—এই

উদ্গাতা একস্য সতোঽপি বা পৃথগেব স্যুঃ” (যাস্ক, নিরুক্ত, ৭।৫)। অর্থাৎ নিরুক্তকার মহামতি যাস্ক বলিতেছেন যে,পৃথিবী,অন্তরীক্ষ, আকাশ, এই স্থান-ত্রয়-ভেদে দেবতা তিন-প্রকার মাত্র। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, এবং আকাশে সূর্য্য-দেবতা বর্ত্তমান আছেন।* যেমন একই ব্যক্তি কার্য্যভেদে,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,সেইরূপ কার্য্য-ভেদ-বশতঃ অথবা বিকাশের তারতম্য-নিবন্ধন,—এই তিন মূল দেবতাই বিবিধ নামে অভিহিত হন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। “সূর্য্যো নো দিবঃ পাতু, বাতোঽন্তরীক্ষাৎ, অগ্নি র্নঃ পার্থিবেভ্যঃ” (ঋগ্বেদ, ১০।১৫৮।১)। যাস্ক অন্য এক স্থলেও যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও বিশদ। সে স্থলটী এই—“একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি, অপিচ সত্ত্বানাং প্রকৃতি-ভূমভিঃ ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ প্রকৃতি-সর্ব্বনাম্নাচ্চ (i, e, Universality of nature in the celestial existence) ইতরেতর-জন্মানো ভবন্তি ইতরেতর প্রকৃতয়ঃ (৭।৪)। একই আত্মার বিকাশাত্মক-ক্রিয়াভেদে দেবতার ভেদ। আত্মারই কার্য্য-শক্তির নাম দেবতা ;—ইহাই যাস্কের অভিপ্রায়”। “উপনিষদের উপদেশ” তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, ঋগ্বেদের দেবতা-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠক, তাহা দেখিয়া লইয়া, এই স্থানটী পড়িবেন।

একাদশটীই রুদ্র নামে খ্যাত। ইহারা জীবের মৃত্যুকালে যখন দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন জীব 'রোদন' করে বলিয়া, ইহা-দিগকে রুদ্র বলা যায়। একটী বৎসরে দ্বাদশটী মাস; এই দ্বাদশ মাসের নামই দ্বাদশ আদিত্য। বৎসরের (কালের) অবয়ব-স্বরূপ এই মাস-গুলি পুরুষের আয়ু হরণ করিতেছে বলিয়া, ইহাদের নাম আদিত্য। আকাশের বিদ্যুৎকেই ইন্দ্র-দেবতা বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; প্রাণী-দিগের দেহে ইহাই বল বা বীর্য্যরূপে অবস্থান করিতেছে। যজ্ঞ-সাধন পশুই প্রজাপতি দেবতা বলিয়া উক্ত হয়"।

যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলিতে লাগিলেন—"এই যে অষ্ট-বসুর কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্য হইতে চন্দ্র ও নক্ষত্রকে ছাড়িয়া দিলে, * ছয়টীমাত্র বসু অবশিস্ট থাকে। অন্যান্য দেবতা-গুলি এই ছয়টীরই অন্তর্ভুক্ত †। তবেই দেবতার সংখ্যা মোটে ছয়টী মাত্র দাঁড়ায়। আবার দেখুন, আধার ও আধেয় ভাবে পৃথিবী ও অগ্নিকে এক ধরিয়া লইলে এবং সেই ভাবে আকাশ ও সূর্য্যকে এক ধরিয়া লইলে,—এবং অন্তরীক্ষ ও বায়ুকে এক ধরিয়া লইলে, দেবতার সংখ্যা মোটে তিনটী হয়। আর সকল দেবতা এই তিন প্রধান দেবতারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, শাস্ত্রে

* চন্দ্র ও নক্ষত্রের জ্যোতিঃ,—সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

† প্রাণী-দেহের ইন্দ্রিয়াদি-শক্তি,—সূর্য্য-চন্দ্রাদিরই পরিণতি। শ্বেত-কেতুর উপাখ্যান দেখ।

দেবতার তিনটীমাত্র সংখ্যাও দেখিতে পাওয়া যায় *। আবার কাহারও মতে,—অন্ন ও প্রাণ এই দুইটীমাত্র দেবতা ; অন্যান্য দেবতা-গুলি এই দুই মূল দেবতারই অন্তর্ভুক্ত। আবার প্রকৃত-পক্ষে অন্নও, প্রাণেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া,—দেবতার সংখ্যা একটীমাত্র দাঁড়ায় †। সকল পদার্থ এই প্রাণ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এই প্রাণই একমাত্র দেবতা। এই প্রাণ-শক্তি,—সর্ব্ব-ব্যাপক ব্রহ্মেরই শক্তি। দেবতার সংখ্যা সহস্রই হউক্ বা একটী হউক্,—সকলই সেই প্রাণ-ব্রহ্মে নিহিত আছে। নাম, রূপ, কর্ম্ম, গুণ ও শক্তি-ভেদে—সেই এক প্রাণ-দেবতাই বহুভাবে বিকাশিত আছেন"।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এই প্রাণ-ব্রহ্মই

---

* বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি—ইহারা আধেয় (motion) এবং অন্তরীক্ষ, আকাশ, পৃথিবী—ইহারা যথাক্রমে আধার (Matter)। এস্থলে শ্রুতির ইহা বলাই তাৎপর্য্য। "পৃথিবী···বাহ্য আধার অপ্রকাশঃ ; জ্যোতীরূপং করণং পৃথিব্যা আধেয়-ভূতম্। আধারত্বেন পৃথিবী ব্যবস্থিতা কার্য্যভূতা ; অগ্নিরাধেয়ঃ করণ-রূপো······পৃথিবী-মনু-প্রবিষ্টঃ"—ইত্যাদি সর্ব্বত্র। (বৃং ভাং, ১।৫।১১, ১৩ ইত্যাদি)।

† আধার ভিন্ন শক্তির কল্পনা করা যায় না। শক্তির সেই আধারই শ্রুতিতে 'অন্ন' (Matter) নামে পরিচিত। এই আধারও, সেই শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এই জন্যই এক প্রাণ-শক্তিই একমাত্র দেবতা এবং ইহাই সকল পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য ; শ্বেতকেতুর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য। "সপ্তান্ন-বিদ্যা" দ্রষ্টব্য।

বহুবিধ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই প্রাণ-শক্তিই আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থের আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রাণ-শক্তি,—ব্রহ্ম-শক্তিই। সুতরাং সকল পদার্থই চৈতন্য-সম্বলিত; চৈতন্য-বিহীন কিছুই নাই। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই, সকল পদার্থ চৈতন্য-সম্বলিত। এই পদার্থ-গুলিকে চৈতন্যের 'শরীর' রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, প্রাণ-শক্তি সেই চেতন পুরুষের শরীর। যে পুরুষ—স্থূল আধিভৌতিক পদার্থ-গুলিতে (ব্যষ্টি-ভাবে) অবস্থিত, সেই পুরুষই, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সকলে (ব্যষ্টি-ভাবে) এবং তাহাদের কারণ-স্বরূপ আধিদৈবিক অগ্ন্যাদি পদার্থেও (সমষ্টি-ভাবে) অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুরুষের আশ্রয়েই, প্রাণ-শক্তি বিবিধ পরিণাম পাইতেছে। এই পুরুষের আশ্রয়েই প্রাণ-শক্তি—আধিদৈবিকাদি ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে" *।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বিদগ্ধকে বলিলেন,—"মহাশয়! এই পুরুষ হৃদয়েই (বুদ্ধিতে) অবস্থিত আছেন। হৃদয়স্থ এই পুরুষকে জানিতে পারিলে, সকল পদার্থের সহিত একাত্ম-ভাব

* আমরা শ্রুতির এই অংশের কেবল তাৎপর্য্যমাত্র নিবদ্ধ করিয়াছি; যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। পৃথিবী, জল, রূপ প্রভৃতি অষ্ট-পদার্থে,—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে প্রাণ-শক্তি বিকাশিত আছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত হয়; কেননা, সকল পদার্থই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য-দেবতা অবস্থিত আছেন। ঐ সূর্য্যই, প্রাণী-দেহে চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সূর্য্য, চক্ষুতেই প্রতিষ্ঠিত। আবার দেখুন, চক্ষুঃও রূপাত্মক; শুক্ল, কৃষ্ণ, পীতাদি রূপ-সকলের,—রূপ-সামান্যাত্মক চক্ষুঃই আশ্রয়। এই রূপ, বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত। কেন না, বুদ্ধিই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দ্বারা প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়াকারে (দর্শনাকারে) পরিণত হয়; পরে এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ই রূপাকারে পরিণত হইলে, তবে রূপ-দর্শন-ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণেতেই, রূপও প্রতিষ্ঠিত থাকে *। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক অন্তঃকরণেতেই—দিক্, সূর্য্য, চক্ষুঃ ও রূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আবার দেখুন, ঐ যে দক্ষিণ দিকে অগ্নি দেখা যাইতেছে; এই অগ্নি প্রাণী-দেহে বাগিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; এই বাক্য বুদ্ধিরই পরিণাম। সুতরাং এক অন্তঃকরণেই—দিক্, অগ্নি, বাক্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আবার দেখুন, সমষ্টি-ভাবে সকল জলকে বরুণ শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বরুণ, পশ্চিমদিকে † অবস্থিত

---

* "বুদ্ধেশ্চক্ষুরাদ্যাত্মনা পরিণামো ভবতি; চক্ষুরাদেশ্চ রূপাদ্যাত্মনা পরিণামঃ"—জ্ঞানামৃতযতিঃ।

† দিকে—i, e, In Space, উত্তর ও ঊর্দ্ধ দিক্ সম্বন্ধেও মূলে এইরূপ বর্ণনা আছে।

আছে। বাপী, কূপ, তড়াগাদির জল প্রাণী-দিগের দ্বারা পীত হইয়া, আধ্যাত্মিক মূত্র ও রসাদিরূপে পরিণত হয়। এই মূত্র, রেতঃ, রসাদি, হৃদয়েই অবস্থিত থাকে; —রেতঃ প্রভৃতিকে বৃত্তি বা শক্তিরূপে ধরিলে *, ইহারা এক অন্তঃকরণেরই বৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়। অতএব কার্য্য-কারণভাবে দেখিতে গেলে, এক অন্তঃকরণেতেই—দিক্, বরুণ ও রেতঃ-রসাদি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, একথা বুঝা যায়। আবার শ্রদ্ধা, সত্যাদি বৃত্তি-গুলিও হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত।

আবার বুঝিয়া দেখুন,—এই অন্তঃকরণ ত দেহেই প্রতিষ্ঠিত আছে; আবার দেহটীও 'নামরূপ কর্ম্মাত্মক' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; সুতরাং ইহা অন্তঃকরণেই প্রতিষ্ঠিত। এই দেহ ও অন্তঃকরণ উভয়ই, প্রাণ-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব শরীর,

* কাম, অন্তঃকরণের একটা বৃত্তি; অন্তঃকরণের এই বৃত্তির উদয়ে, রেতঃ ক্ষরিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত এই উপদেশ-গুলির মর্ম্মার্থ এইরূপ —সকল পদার্থের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্নভাবে বোধ করিতে শিক্ষা দেওয়া এই উপদেশের প্রকৃত তত্ত্ব। আমার হৃদয়াত্মাই পাঁচদিকে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া, জগতের সকল পদার্থের সহিত অভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান আছেন; আমিই সেই দিগাত্মা। হৃদয় বা অন্তঃকরণ সকল-দিকেই প্রসৃত হইয়া থাকে; সকল-দিকে স্থিত পদার্থ-মাত্রকেই হৃদয় আয়ত্ত করিয়া থাকে; সুতরাং এই অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ-বোধ জন্মিলে, সকল পদার্থে অভেদ-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ অভেদ-ভাবনাই এই উপদেশ-গুলির উদ্দেশ্য।

অন্তঃকরণ (হৃদয়) ও প্রাণ—ইহারা পরস্পর পরস্পরে প্রতি-ষ্ঠিত। আত্মার প্রয়োজন-সাধনার্থ, এই দেহ, বুদ্ধি ও প্রাণ, প্রত্যেকে প্রত্যেকেতে নিয়মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। অতএব এখন বুঝিয়া দেখুন, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পদার্থ-সমূহ, কার্য্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়া, এক আত্ম-চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; কেন না, বুদ্ধি আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং দেহ ও প্রাণ বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্ম-চৈতন্য সর্বোপাধি-বর্জ্জিত, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত হইয়া, সক-লের মূল নির্ব্বিকার কারণ-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইনি অমূর্ত্ত, অসংহত, নিরবয়ব। ইনি নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত। ইঁহার শোক-দুঃখ, বধ-বন্ধন অসম্ভব। উপনিষদ্ হইতেই কেবল এই পুরুষের স্বরূপ জানা যায়"। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের গভীরতা বুঝিয়া, বিদগ্ধ লজ্জায় মাথা নামাইলেন এবং অধোবদনে বসিয়া পড়িলেন *।

এইরূপে সেই জনক-সভায় সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে, আর কোন ব্যক্তিই যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই তাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য, পণ্ডিত-বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদিগকে আমি

* মূলে আছে "মূর্দ্ধা বিপপাত"। আমরা তাহার অর্থ 'লজ্জায় মাথা নামাইলেন' এইরূপ করিলাম। ভাষ্যকার 'মৃত্যু' অর্থ করিয়াছেন।

কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাদিগের মধ্যে যে কেহ হউন, উত্তর প্রদান করুন। পুরুষের দেহকে বন-মধ্যস্থ মহীরুহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই দেহ-বৃক্ষের,—কেশ-রাজিকে পত্র স্বরূপ এবং চর্ম্মকে বৃক্ষ-ত্বক্ স্বরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৃক্ষের ত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে যেমন রস নির্গত হইতে থাকে, পুরুষ-চর্ম্ম ছিন্ন বা কর্ত্তিত হইলেও তদ্রূপ রুধির ক্ষরিত হইয়া থাকে। দেহের মাংস-গুলিকে, উহার ত্বকের অন্তর্গত কাষ্ঠ-স্তরের স্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৃক্ষের অন্তঃসার-ভূত কঠিন অংশকে অস্থি-স্বরূপে ধরা যায়। অস্থির মধ্যস্থ মজ্জা ও বৃক্ষ-মধ্যস্থ মজ্জা প্রায়ই একরূপ। বৃক্ষটীকে কাটিয়া ফেলিলে শিকড় বা মূলদেশ হইতে উহা পুনরায় উত্থিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহা আমরা নিত্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন মৃত্যু জীবকে আক্রমণ করে, তখন কোন্ মূল হইতে জীব পুনরায় জন্মলাভ করে? শুক্র-ধাতুকে জীবোৎপত্তির মূল কারণ বলা যাইতে পারে না; কেন না, প্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে শুক্র-ধাতু থাকিতে পারে না। বীজ হইতে বৃক্ষ উদ্ভূত হয়; বৃক্ষটীকে কাটিয়া ফেলিলে, তাহার বীজ হইতেই আর একটী বৃক্ষ উদ্ভূত হয়। কিন্তু বৃক্ষের বীজটীকেও যদি বিনাশ করিয়া ফেলা যায়, তবে আর তাহা হইতে কদাপি বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ, যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় ও দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কোন্ মূল বীজকে অবলম্বন করিয়া,

পুনরায় জীব জন্মগ্রহণ করে? আপনারা এই তত্ত্বটী অবগত আছেন কি”?

পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অপর কেহই এ তত্ত্ব অন্তরে অনুভব করেন নাই। সুতরাং কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন,—“মহাশয়-গণ! ব্রহ্ম-চৈতন্যই জীব-চৈতন্যের মূল-কারণ, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে অবগত হউন। চেতনের অভিব্যক্তি চেতন হইতেই হইতে পারে। মৃত্যুতে সে চেতনের ধ্বংস হয় না; মৃত্যুতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে মাত্র। সেই মূল চেতনকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। সেই ব্রহ্ম সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। ইহা অবিনাশী। এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য”।

———:০-০:———

এতদূরে এই বৃহৎ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। ইহা হইতে আমরা ব্রহ্ম-বিষয়ে বিবিধ তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছি। এস্থলে সেই উপদেশ-গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিবদ্ধ হইল।

১। উষস্ত এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত-বর্গের প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হইতে, আমরা বুঝিয়াছি যে,—

(ক) ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বর্গ লইয়াই জীবের সংসার-ভোগ। জীব এইগুলি দ্বারা জড়িত হইয়াই, সুখ-দুঃখ ভোগ করে ও সাংসারিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। ইহারাই জীবের বন্ধন-রজ্জু। এই ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বৈষয়িক-সংস্কার প্রভাবে জীব, জন্মান্তর লাভ করে এবং সংসারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সমুদয় বস্তুতে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, সেই সকল বস্তু-প্রাপ্তি-

কামনায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। এই সংসার ব্যতীত যে অন্য কোন জগৎ আছে, তাহা আর তাহার মনে আসে না। ক্রমে এই সংসারে গাঢ়তর রূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই বিষয়-বাসনার প্রভাব অতিক্রম করা আবশ্যক, নতুবা আত্মার কল্যাণ নাই। বিষয়-দর্শনের স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বিষয়াচ্ছন্নতা দূর হয় না, মুক্তিও ঘটে না।

(খ) ইন্দ্রিয়-গুলি, আত্মশক্তি দ্বারাই মূলতঃ চালিত। আত্মাই চক্ষুর চক্ষুঃ, বাক্যের বাক্য। সেই শক্তি নিত্য ও স্বতন্ত্র, সুতরাং অবিকারী। সেই বিশ্ব-ব্যাপিনী শক্তি, বিবিধ-ভাবে ও বিবিধ-আকারে ক্রিয়া করিয়া বেড়াইতেছে।

২। পরবর্ত্তী প্রশ্ন ও উত্তরে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এই সকল উপদেশ পাওয়া গিয়াছে——————

(ক) ব্রহ্মই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাংসারিক বিষয়-কামনার পরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনাই মনুষ্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব দৃঢ় হইলে, ক্রমে প্রকৃত-জ্ঞান জন্মিতে থাকে।

(খ) ব্রহ্মই সকলের মূল কারণ। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় পদার্থই ব্রহ্ম-শক্তি-প্রসূত। সমুদয় পদার্থের অন্তরে সেই ব্রহ্ম-চৈতন্য অধিষ্ঠিত আছেন।

(গ) ব্রহ্ম-শক্তি সমুদয় পদার্থের চালক; অথচ তিনি সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র।

(ঘ) "দেবতা" গুলি, ব্রহ্ম-শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। প্রাণ-শক্তিই বিবিধ পদার্থাকারে পরিণত। দেহেও এই প্রাণশক্তিই ক্রিয়া-নির্ব্বাহক।

* (ঙ) প্রাণ-শক্তি,—ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই শক্তি।

৩। ইহার পরের প্রশ্ন ও উত্তর হইতে নিম্নলিখিত উপদেশ পাওয়া যায়।——

(ক) বিবিধ পদার্থকে, ব্রহ্ম-চৈতন্যের শরীররূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সকল পদার্থের অভ্যন্তরে চৈতন্য বর্ত্তমান। সকল পদার্থ,—প্রাণ-শক্তিরই পরিণাম; অতএব প্রাণ-শক্তি সেই চেতন-পুরুষের দেহ-স্বরূপ। সেই চৈতন্যই, প্রাণ-শক্তির অভ্যন্তরে অবস্থিত।

(খ) এই প্রাণ-শক্তিই বিবিধ পরিণাম পাইতেছে বলিয়া, চেতনেরও (জ্ঞানের) অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক পক্ষে, জ্ঞানের বিবর্ত্তন হয়, কিন্তু পরিণাম হয় না *।

(গ) মৃত্যুর পরও আত্মা বর্ত্তমান থাকেন। কোনরূপ অবস্থার ভেদে আত্মার প্রকৃত-পক্ষে অবস্থা-ভেদ হয় না। স্বতন্ত্র বলিয়া, মৃত্যুর পরেও আত্মার নিত্যতা অনিবার্য্য।

(ঘ) জীব চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত †। উভয়ই এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই জীবের জ্ঞান আসিয়াছে এবং তাঁহার শক্তি হইতেই জীবের ইন্দ্রিয়, দেহ ও বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* যাহা স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে। যাহার স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়—পরিণত হইয়া পড়ে—অবস্থান্তরিত হয়—তাহাকে 'পরিণাম' বলে।

† "বিষয় বিলক্ষণত্বাৎ ন প্রাণেন বীজাত্মনা তেষাং (জীবানাং) উৎপাদনম্। ন চ উৎপাদ্যানাং জীবানাম্ উৎপাদকাৎ চিদাত্মনো ভিন্নত্বম্"। —মাণ্ডুক্যে আনন্দ-গিরিঃ। "বিষয়-ভাবেন ব্যবস্থিতান্ পুনর্ভাবান প্রাণো জনয়তি"—তত্রৈব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——
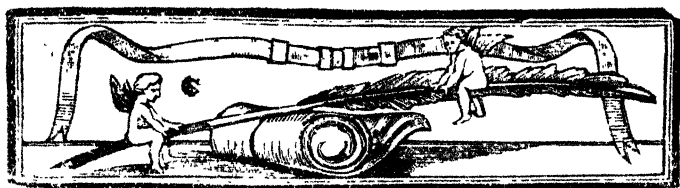
(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ)

প্রথম দিবস।

বিদেহ-রাজ জনক একদিন সিংহাসনে সমুপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, তৎকালে ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ জনকও, ধন-জন-রাজ্য-সমৃদ্ধি-পরিবৃত হইয়াও একজন নির্লিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ভারতবর্ষে বিশেষ প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যাজ্ঞবল্ক্যই, মহারাজ জনকের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহারই সাহায্যে ও উপদেশের বলে, রাজর্ষি জনক তাদৃশ-জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া, জনক সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া, অতি আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ক কথোপকথন হইতে লাগিল।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“রাজন্! আচার্য্য-দিগের নিকট হইতে আপনি অবশ্যই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া থাকিবেন। কিরূপ উপদেশ পাইয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি”।

জনক বলিতে লাগিলেন,—“শিলিন-পুত্র মহাত্মা জিত্বা নামক মদীয় উপদেষ্টা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে বাক্যই ব্রহ্ম। যে পুরুষ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, সে পুরুষ ত পশু-তুল্য। বাক্যই আত্মার প্রকৃষ্ট চিহ্ন; সুতরাং বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য”। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, —“মহারাজ! জিত্বা যে বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বাক্যের আশ্রয় ও মূল-কারণের বিষয়েও উপদেশ দিয়া থাকিবেন। বলুন্ ত মহারাজ! এই বাক্যের আশ্রয় ও মূল-কারণ কি”? মহারাজ জনক বলিলেন, তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ পান নাই এবং যাজ্ঞবল্ক্যকেই তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“মহারাজ! গুণ বা উপাধি-ভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। ইনি নিয়ত একরূপ। বাক্যের দেবতা অগ্নি। আধ্যাত্মিক-রাজ্যে ব্যষ্টি-ভাবে যাহাকে বাক্-শক্তি বলা যায়; আধিদৈবিক-রাজ্যে সমষ্টি-ভাবে তাহাই অগ্নি-শক্তি নামে অভিহিত। এই অগ্নিই প্রাণী-দেহে বাক্-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয় এই বাক্যের আশ্রয়; অব্যাকৃত বীজ-শক্তি

এই বাক্যের মূল-কারণ। এই বাক্-শক্তিকে 'প্রজ্ঞা' রূপে, অর্থাৎ এক জ্ঞানেরই অবস্থা-ভেদ বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র"। রাজা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কাহাকে 'প্রজ্ঞা' বলেন? বাক্য কিরূপে প্রজ্ঞা হইতে পারে"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"মহারাজ! এই বাক্যই প্রজ্ঞা। বাক্য-দ্বারাই আমরা বন্ধুকে জানিতে পারি; ঋগ্বেদাদি গ্রন্থ-নিচয়, ইতিহাস-পুরাণ, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা—সমস্তই বাক্য-দ্বারা জানিতে পারা যায়। যজ্ঞ, হোম, অন্নাদি-দান-জনিত ধর্ম্ম, এই বাক্য-দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায়। অতএব বাক্য জ্ঞান-স্বরূপ; এই বাক্যই ব্রহ্ম। যিনি এই ভাবে এই বাক্যের উপাসনা করেন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর দেব-লোকে দেব-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হন"। জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রীত হইলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"ব্রহ্ম-বিদ্যার সমুদয় উপদেশ না দিয়া আমি কিছুই গ্রহণ করিব না"।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কোন আচার্য্য আপনাকে কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি"। রাজা বলিলেন,—"শুল্বপুত্র মহাত্মা উদঙ্ক, আমায় বলিয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম; কেন না, প্রাণ-শূন্য পুরুষ পুরুষই নহে। প্রাণ বা ক্রিয়া-গুলিই আত্মার প্রকৃষ্ট চিহ্ন বা পরিচায়ক; সুতরাং দৈহিক ক্রিয়া-গুলিকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য"। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ!

এই প্রাণ-ব্রহ্মের আশ্রয় ও মূল-কারণের বিষয় অবগত আছেন কি"? জনক বলিলেন, তিনি তাহা জানেন না; এবং তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকেই তাহা বলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"গুণ বা উপাধি-ভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও, স্বরূপতঃ তাঁহার ভেদ নাই; তিনি নিয়ত একরূপ। দৈহিক ক্রিয়াগুলির প্রাণ-শক্তিই আশ্রয়। বায়ু এই প্রাণ-শক্তির দেবতা। আধ্যাত্মিক ভাবে, ব্যষ্টি-রূপে, যাহাকে প্রাণ-শক্তি বলা যায়; আধিদৈবিকভাবে, সমষ্টি-রূপে, তাহাই বায়ু-শক্তি-রূপে কথিত। এই বায়ুই প্রাণী-দেহে প্রাণেন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই প্রাণের মূল-কারণ। এই প্রাণ-শক্তিকে 'প্রিয়' বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র। দৈহিক ক্রিয়া-শক্তিই যখন প্রাণ-শক্তি, তখন ইহা সকলেরই 'প্রিয়'। প্রিয় না হইলে,—সুখ না পাইলে,—কেহই কোন ক্রিয়া করিত না *। প্রাণ সকলেরই প্রিয় বস্তু।

* "নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে"ও আমরা এই কথাই পাই। "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি"। সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারই, সকল কর্ম্মের প্রেরক। কিন্তু তথায় আছে—'পরিমিত বস্তু সুখ দিতে পারে না; ভূমা ব্রহ্মই কেবল প্রকৃত সুখ দিতে পারেন'। সুষুপ্তাবস্থায়, যখন সকল ইন্দ্রিয় প্রাণে বিলীন হয়, তখন আনন্দমাত্র থাকিয়া যায়, একথাও উপনিষদে আছে। এ সকলের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ-শক্তি—আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই শক্তি।

এই প্রাণেরই প্রয়োজনার্থ লোকে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-চৌরাদির ভয় থাকিলেও, এই প্রাণের সুখার্থই, লোকে তাদৃশ ভয়-সঙ্কুল প্রদেশেও গমনাদি করিয়া থাকে। অতএব প্রাণ-শক্তিকে প্রিয় বলিয়া জানিবেন এবং প্রিয় বলিয়া ইহার উপাসনা করিবেন। এই প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই ভাবে এই প্রাণ-ব্রহ্মের ভাবনা করেন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর, দেব-লোকে দেব-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হন"। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া এক সহস্র গো দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যার সমগ্র উপদেশ না দিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! আর কোন আচার্য্য কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি"। জনক বলিলেন,—"বৃষ্ণ-পুত্র মহাত্মা বর্কু বলিয়াছিলেন, চক্ষুঃই ব্রহ্ম, চক্ষুঃই আত্মার একটী পরিচায়ক চিহ্ন; চক্ষুকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য"। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! এই চক্ষুর আশ্রয় ও মূল-কারণ অবগত আছেন কি"? জনক বলিলেন,—"আপনিই আমাকে সে কথা বলিয়া দিন, আমি এ বিষয়ে কোন উপদেশ পাই নাই"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"গুণ বা উপাধি-ভেদে,—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত হইলেও, স্বরূপতঃ তাঁহার কোন ভেদ নাই। ইনি নিয়ত একরূপ। চক্ষুর আশ্রয় দর্শনেন্দ্রিয়। সূর্য্যই,—দর্শনেন্দ্রিয়ের দেবতা। আধিদৈবিক রাজ্যে সমষ্টি-ভাবে, যাহা সূর্য্য-নামে পরিচিত; তাহাই আধ্যাত্মিক-রাজ্যে,

ব্যষ্টি-ভাবে, দর্শনেন্দ্রিয়। এই সূর্য্য-জ্যোতিঃই প্রাণী-দেহে তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মূল-কারণ। 'সত্য' বলিয়া এই চক্ষুঃ-শক্তির উপাসনা করা বিধেয়। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের একপাদ মাত্র"। রাজা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কাঁহাকে 'সত্য' বলেন? চক্ষুঃই বা কিরূপে সত্য হইতে পারে"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! কোন ব্যক্তি যখন চক্ষুঃ-দ্বারা কোন পদার্থ দর্শন করে, তখন সেই পদার্থকে সে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করে; সুতরাং চক্ষুঃকে সত্য বলা যাইতে পারে। এই চক্ষুঃই ব্রহ্ম। যিনি এই ভাবে এই চক্ষুঃ-ব্রহ্মের ভাবনা করেন, তিনি দেহান্তে, দেব-লোকে দেব-পদবী লাভ করেন"। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে জনক সন্তুষ্ট হইয়া, সহস্র গো দান করিতে উদ্যত হই-লেন; কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যার সম্যক্ উপদেশ না দিয়া তিনি দান গ্রহণ করিলেন না।

পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! আর কোন আচার্য্য কি কোন উপদেশ দেন নাই"? রাজা বলিলেন, "ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন গর্দ্দভী-বিপীত নামক আচার্য্য বলিয়াছি-লেন যে, শ্রবণ-শক্তিই ব্রহ্ম; শ্রবণ-ক্রিয়া আত্মার একটী পরিচায়ক চিহ্ন; শ্রবণ-ক্রিয়াকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য"। জনকের কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, —"মহারাজ! আপনি বোধ হয় এই শ্রবণ-ক্রিয়ার আশ্রয় ও মূল-কারণের কথা জানেন না। মহারাজ! গুণ বা উপা-

ধির ভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ; স্বরূপতঃ তাঁহার কোন ভেদ নাই। তিনি নিয়ত একরূপ। শ্রবণেন্দ্রিয়ই—এই কর্ণের আশ্রয়। এই শ্রবণ-শক্তির দেবতা দিক্ (আকাশ)। আধ্যাত্মিক-ভাবে, ব্যষ্টি-রূপে, যাহাকে শ্রবণ-শক্তি বলা যায় ; তাহাই আধিদৈবিক-রূপে সমষ্টি-ভাবে, দিক্‌নামে অভিহিত। দিক্ বা আকাশীয় উপাদানই প্রাণী-দেহে শ্রবণ-শক্তি রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল-কারণ। এই শ্রবণ-শক্তিই ব্রহ্ম। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের একপাদ মাত্র। এই শ্রবণ-শক্তিকে 'অনন্ত' বলিয়া ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যে দিকেই গমন করুন না কেন, তাহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। অতএব এইভাবে, যিনি এই শ্রোত্র-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, দেহান্তে দেব-লোকে তিনি, দেব-পদবীলাভ করিতে সমর্থ হন"। মহা-রাজ জনক এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে এক সহস্র গো দিতে চাহিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্ম-বিদ্যার সমস্ত উপদেশ না দিয়া তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আর কাহা-রও নিকট কোন উপদেশ পাইয়া থাকিলে, তাহাও আমাকে বলুন"। রাজা বলিলেন,—"জবালার পুত্র সত্যকাম আমায় বলিয়াছেন, মনই ব্রহ্ম ; কেন না, মন-শূন্য পুরুষ পুরুষই নহে। মনঃ-শক্তি আত্মার মুখ্য পরিচায়ক"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

"এই মনের মূল-কারণের কথা জানেন ত" ? রাজা তাহা জানিতেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! ব্রহ্ম-পদার্থ স্বরূপতঃ ভেদ-শূন্য ; কেবল গুণ বা উপাধির ভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম নিয়ত একরূপ। চন্দ্র-জ্যোতিই এই মনের দেবতা *। যাহা আধ্যাত্মিক-ভাবে, ব্যষ্টি-রূপে, মনঃ-শক্তি বলিয়া কথিত ; তাহাই আধিদৈবিক-ভাবে, সমষ্টি-রূপে, চন্দ্র-জ্যোতিঃ বলিয়া কথিত। তৈজস চন্দ্রই প্রাণী-দেহে মনঃ-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই মনের মূল-কারণ। এই মনই ব্রহ্ম ; কিন্তু ইহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র। এই মনকে 'আনন্দ' বলিয়া ভাবনা করিবে। কেন না, মনের দ্বারাই লোকে সুন্দরী সুশীলা পত্নী লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং আত্মানুরূপ প্রিয় পুত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। যিনি এই মনকে এই ভাবে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করেন তিনি দেহাবসানে দেব-লোকে, দেব-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হন"। বিদেহ-রাজ, যাজ্ঞবল্ক্যকে পূর্ব্ববৎ সহস্র গো পুরস্কার দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি এবারেও তাহা লইলেন না।

পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্য, জনক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

* ইংরেজী মতেও কি তাই ? চন্দ্রের প্রভাব দ্বারা মন যে বিকৃত হয়, তাহা ইউরোপেও কি স্বীকৃত নহে ? Lunacy মনের বিকৃতাবস্থার নাম কেন ?

"আর কে আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন" ? রাজা বলিলেন যে, একদিন শাকল্য-বংশোদ্ভব মহাত্মা বিদগ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হৃদয় বা বুদ্ধিই ব্রহ্ম ; কেন না বুদ্ধি-শক্তিহীন পুরুষ পশু-তুল্য। যাজ্ঞবল্ক্য, রাজাকে হৃদয়ের আশ্রয় ও মূল-কারণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, রাজা তৎসম্বন্ধে কিছুই জানেন না; তিনি নিজেই বলিয়া দিলেন—"মহারাজ ! উপাধিব ভেদ-বশতঃ —বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মে ভেদ কল্পিত হয় ; স্বরূপতঃ তিনি নিয়ত একরূপ। তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। হৃদয়ই এই বুদ্ধির আশ্রয়। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই বুদ্ধির মূল-কারণ। এই বুদ্ধিকে 'স্থিতি' বা 'আয়তন' বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কেন না, হৃদয়েই সকল ভূত আশ্রিত : হৃদয়ই নাম-রূপ-কর্ম্মের আশ্রয়-ভূমি। সকলের আধার এই হৃদয়ই, ব্রহ্ম-পদার্থ। যিনি এই ভাবে, হৃদয়-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি মরণান্তে দেব-পদবী লাভ করেন। জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বিবিধ উপাধিতে সেই এক ব্রহ্মের ভাবনা বা উপাসনা করিতে করিতে, সাধক ক্রমে সকল উপাধির অতীত এবং সকল উপাধির কারণ-স্বরূপ শুদ্ধ-ব্রহ্মের ধারণা করিবার যোগ্য হইয়া উঠেন"। মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ-গুলি হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। রাজা এই উপদেশ-গুলির পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই জগৎ পরিণাম-শীল। এই জগতের প্রতি পদার্থ, জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও অন্যান্য অবস্থান্তরের নিয়ত অধীন। এই জগৎ কার্য্য-সমষ্টি

(Aggregate of Effects) মাত্র; সুতরাং, এই বিশ্বের নিশ্চয়ই একটী পরিণামী-উপাদান আছে। এই উপাদানই পরিণত হইয়া বিবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থে পরিণত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই পরিণামী-উপাদানটী শ্রুতিতে "প্রাণ-শক্তি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"সর্ব্ব-ভাবানা মুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণ-বীজাত্মনৈব সত্বমিতি" (গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১।৬)। আনন্দগিরি ইহার অর্থ করিয়াছেন—"তদেবমচেতনং সর্ব্বং জগৎ প্রাগুৎপত্তে বীজাত্মনা স্থিতং প্রাণঃ"। এই প্রাণ-শক্তিকেই এই আখ্যায়িকায় "অব্যাকৃত বীজ-শক্তি" বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-চৈতন্যই এই শক্তির অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম-চৈতন্যই—জ্ঞাতা, দ্রষ্টা এবং এই শক্তি তাঁহার জ্ঞেয়, দৃশ্য। তিনি বিষয়ী, ইহা বিষয়; তিনি পুরুষ, ইহা প্রকৃতি। এই শক্তি-দ্বারাই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধ হয়। নতুবা ব্রহ্ম, কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত, শুদ্ধ, নিরুপাধিক *। এই পরিণামী, কারণ-বীজই বিবিধ কার্য্যের আকারে অভি-

* ব্রহ্ম পূর্ণ-স্বরূপ। সৃষ্টিকালে শক্তি পরিণামোন্মুখিনী হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে শক্তি ব্রহ্মে একাকার হইয়া অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকে। পরিণামোন্মুখিনী এই শক্তি-দ্বারাই ব্রহ্মকে 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা যায়। ব্রহ্ম যেন সৃষ্টিকালে প্রাণ-শক্তিকে আপনা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া দিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাই, ব্রহ্ম এই শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলিয়াই, নির্গুণ-ব্রহ্মে ও কারণ-ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। কেবল যখন এই পৃথক্-কৃত শক্তির সহিত একীভূত বলিয়া মনে করা যায়, তখনই ইহাকে 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা হইয়া থাকে মাত্র। এই জন্যই বেদান্ত-ভাষ্যের টীকাকার বলিয়াছেন, "ঈক্ষিতৃত্বেন ব্যাকর্ত্তৃত্বেন চ ঈক্ষণীয়-ব্যাকর্ত্তব্য-প্রপঞ্চাৎ পৃথক্ ঈশ্বর-সত্বশ্রুতে র্ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ" ২।১।২৭।

ব্যক্ত হয়। এই কার্য্য ও কারণের যিনি অধিষ্ঠান—যে অধিষ্ঠানে এই কারণ-শক্তি কার্য্যাকারে পরিণত হইতেছে,—তিনি অবিকারী, নিয়ত একরূপ *। এই প্রাণ-শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও ক্রিয়া নাই। ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু এই শক্তির কোন স্বতন্ত্রতা নাই।† ইহা ব্রহ্মেরই আত্ম-ভূত, ব্রহ্মই। এই শক্তি-সম্বলিত ব্রহ্মই—সৎ-ব্রহ্ম, কারণ-ব্রহ্ম—বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই শক্তির অধিষ্ঠান, শক্তি হইতে স্বতন্ত্র,—তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; তিনি কারণও নহেন। ‡

---

* আনন্দগিরির কথা শুনুন্—"স হি কার্য্য-কারণাভ্যামসংস্পৃষ্টো-বর্ত্ততে। তথা চ স চিদ্ধাতুঃ তজ্জন্মাদি-সমস্ত-বিক্রিয়া-শূন্যত্বেন কূটস্থঃ"। "বিষয়-ভাবেন ব্যবস্থিতান্ ভাবান্ প্রাণো জনয়তি"। "সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমব্যক্তং, তস্য (অব্যক্তস্য) পরমাত্ম পারতন্ত্র্যাৎ পরমাত্মন উপচারেণ 'কারণত্ব' মুচ্যতে, নতু অব্যক্তবদ্বিকারিতয়া। অব্যক্তস্য পারতন্ত্র্যং চ পৃথক্-সত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, আত্ম-সত্তয়ৈব সত্তাবত্ত্বাচ্চ"। "তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" (ভাষ্য দেখ)।

† কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাভেদেঽপি অধিষ্ঠানস্য ততোভেদঃ—রত্নপ্রভা, ১।১ ১৭। "ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চঃ, ন প্রপঞ্চ-স্বভাবং ব্রহ্ম"—শঙ্করঃ ৩।২।২১ (বেঃ ভাঃ) "কারণং কার্য্যাদ্ভিন্ন-সত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নং" রঃ প্রঃ ১।১।৮।

‡ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম—অনন্ত-জ্ঞান ও অনন্ত-শক্তিস্বরূপ। তিনি সেই অনন্ত ভাণ্ডার হইতে কতক-গুলি মাত্র শক্তিকে যেন আপনা হইতে পৃথক করিয়া দিয়া জগৎ-সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। পুরুষ-যজ্ঞে এই আত্ম-ত্যাগের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

কার্য্যাকারে বিবিধ হইলেও, এই বীজ-শক্তি যে কারণাকারে এক, তাহা প্রতিপাদন করাই, এই আখ্যায়িকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং এই শক্তি যে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত, তাহাও এই আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য।

এই প্রাণ-শক্তি পঞ্চ-ভূতাত্মক বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাণ-শক্তি,—আকাশীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে জলীয় ও পার্থিব আকারে ক্রমে সংহত হইয়া স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়। তেজঃ,—এই সংহতাবস্থা-প্রাপ্তির সহায়; কেন না, তেজের আকারে শক্তি-ক্ষয় না হইলে, সংহত হইবে কিরূপে? প্রত্যেক স্থূল-পদার্থই তবে এই এক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, দিক্ প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থের বায়বীয়, আকাশীয় ও তৈজস অবস্থাই প্রধান; প্রাণী-দেহের ইন্দ্রিয়-গুলিতেও ঐ প্রকার উপাদানের প্রাধান্য। এই জন্য শ্রুতিতে আধিদৈবিক পদার্থই, আধ্যাত্মিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উক্ত আছে। শ্রুতি, আকাশীয় ও বায়বীয় উপাদানকে 'করণাত্মক' এবং তৈজস, জলীয় ও পার্থিব উপাদানকে 'কার্য্যাত্মক' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক।

এই আখ্যায়িকা হইতে আরও একটী তত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কথা না বলিয়া, কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়েরই কথা বলা হইল কেন? এই বিশ্ব, নাম-রূপ-কর্ম্মাত্মক। যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই নামাত্মক, রূপাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক। যে কোন নাম (শব্দ) হউক্ না কেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ই উহাদের আশ্রয়; আমরা শ্রোত্র দ্বারাই শব্দ-গ্রহণ করিয়া থাকি। শুক্ল-কৃষ্ণ-লোহিতাদি-রূপ-গুলির,—এক দর্শনেন্দ্রিয়ই আশ্রয়; চক্ষু-দ্বারাই যাবতীয় রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। আবার, প্রাণী-দেহেই, সকল ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া

থাকে। দর্শন-মননাদি এবং চলনাদি সকল ক্রিয়াই, শরীরাশ্রিত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই এই আখ্যায়িকায় চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও দেহের কথামাত্র প্রধানতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। আবার, নাম ও রূপের সাধারণ আশ্রয় অন্তঃকরণ (মন এবং বুদ্ধি)*। এবং চলনাত্মক যাবতীয় ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রয় জৈব-প্রাণ। এই জন্যই, অন্তঃকরণ ও প্রাণের কথা এই আখ্যায়িকায় উল্লিখিত হইয়াছে। নাম, রূপ এবং ক্রিয়া,—ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়; কেহই কাহাকে ছাড়িয়া কদাপি থাকিতে পারে না। রূপাত্মক বিষয়ের আশ্রয়ে, নাম ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে; এবং নাম ও ক্রিয়ার আশ্রয়ে, রূপ আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-গুলি সকলই ক্রিয়াত্মক। বিষয়-সংযোগ হইলে, বিষয়-গুলি, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক করাইয়া দেয়; তখন অন্তঃকরণেরও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব নাম ও রূপের আশ্রয় অন্তঃকরণও—ক্রিয়াত্মক, বলিয়া—সর্ব্ব-ক্রিয়ার মূল প্রাণ-শক্তিতেই আশ্রিত। এই জন্যই আনন্দগিরি অন্য স্থলে বলিয়াছেন—"সর্ব্বা ক্রিয়া নাম-রূপ-ব্যঙ্গ্যা প্রাণাশ্রয়া চ"। দর্শনাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় অন্তঃকরণ (বিজ্ঞান-শক্তি)। এই বিজ্ঞান-শক্তি

*মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি এ স্থলে উল্লেখ-যোগ্য। "(১) যস্য অসন্নিধৌ রূপাদিগ্রহণসমর্থস্যাপি সতঃ চক্ষুরাদেঃ স্ব স্ব বিষয়-সম্বন্ধে রূপ-শব্দাদি-বিজ্ঞানং ন ভবতি; অহমন্যত্রমনা আসং নাদর্শম্। (২) যস্মাচ্চক্ষুষো হ্যগোচরে পৃষ্ঠতোঽপ্যুপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ হস্তস্যায়ং স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বা বিবেকেন ন প্রতিপদ্যতে; যদি বিবেককৃন্মনো নাম নাস্তি, ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেক—প্রতিপত্তিঃ"॥

ও প্রাণ-শক্তি একই। কেন না, প্রাণ-শক্তি প্রাণী-দেহে প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়া যদি চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্থান-গুলি নির্ম্মাণ করিয়া না দিত, তবে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে পারিত না।

অতএব এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দেহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই এক "প্রাণ-শক্তি"ই মূল-শক্তি। ইহাই জ্ঞানের অভিব্যক্তির হেতু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।)

দ্বিতীয় দিবস।

পরদিন প্রদোষ-সময়ে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সায়ংকৃত্য সমাপনানন্তর, মহারাজ জনককে বলিতে লাগিলেন——

"মহারাজ! দূরদেশে গমনার্থী ব্যক্তি যেমন গমনোপযুক্ত রথ বা পোতাদি সংগ্রহ করিয়া তদবলম্বনে গমন করে, আপনিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন। আত্ম-জ্ঞান-লাভার্থ আচার্য্য-দিগের মুখে আপনি যথাবিধি ব্রহ্ম-বিষয়িণী কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; উপনিষদাদি ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থ-নিচয় অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং আপনি তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। উপযুক্ত

পাত্র বিবেচনায়, আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। বলুন ত মহারাজ! এই জড়-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ লোকে আপনার গতি হইবে? যদি এ তত্ত্ব আপনার জানা না থাকে, তবে আমি স্বয়ংই এ তত্ত্ব আপনাকে শুনাইব; আপনি শ্রবণ করুন——

মহারাজ! জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সহায়ে বাহ্য-বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে।। এই অবস্থায়, যাবতীয় বিষয় প্রকাশিত হয় বলিয়া, পণ্ডিতেরা, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই পুরুষ-চৈতন্যকে "ইন্ধ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কেন না, সে সময়ে বিষয় 'ইন্ধমান' হইতে থাকে, অর্থাৎ বিষয় প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু লোকে এই আত্মাকে 'ইন্ধ' না বলিয়া, পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই 'ইন্দ্র' নামটী আত্মার গৌণ নাম। ইন্দ্রিয়-গুলি তাঁহার পরিচায়ক লিঙ্গ বা চিহ্ন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার "ইন্দ্র" নাম। অথবা 'ইদং পশ্যতি"—(ইনি) বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন—এই ব্যুৎপত্তি লইয়াও, আত্মাকে 'ইন্দ্র' শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কথাটা এই যে, জাগ্রদবস্থায়, আত্মা ইন্দ্রিয়-দ্বার-যোগে বিষয়ের উপলব্ধি করেন বলিয়া, এই অবস্থায় আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। এই অবস্থায়, বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপ * উপাধির যোগে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়;

* বাহ্য ইন্দ্রিয়—Outer senses.

সুতরাং ইহা আত্মার গৌণ স্বরূপ। ইহা স্থূল-স্বরূপ। স্থূল বিষয় সকলই এ অবস্থায় আত্মার ভোগ্য ও পোষক।

জীব যে সময়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে, তখন জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল বিষয় থাকে না। পূর্ব্বানুভূত স্থূল-বিষয় সকলের সংস্কার সূক্ষ্ম-রূপে—বাসনাকারে (স্মৃতিরূপে)—মনে নিহিত থাকে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল সূক্ষ্ম বৈষয়িক-সংস্কার-গুলি আত্মায় কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু ইহাও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ নহে। অন্তঃকরণের যোগে বিষয়ের সূক্ষ্ম-সংস্কারময় অনুভূতি তখন হইতে থাকে বলিয়া, ইহাও আত্মার গৌণ-রূপ। অন্তঃকরণরূপ * উপাধির সংযোগ থাকে বলিয়া, এ অবস্থায় আত্মাকে "তৈজস" বলে। সূক্ষ্ম সংস্কারাত্মক বিষয়-গুলিই এ অবস্থায় আত্মার ভোগ্য ও পোষক। আমরা অন্ন-পানাদি যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা জঠরাগ্নি-দ্বারা পরিপক্ক হইয়া, দ্বিবিধ অবস্থা বা বিকার প্রাপ্ত হয়; একটী স্থূল, অপরটী তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। স্থূল অংশ মল-মূত্রাদিরূপে বহির্গত হয়; সূক্ষ্ম-অংশ পুনরায় জঠরাগ্নি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া দুইপ্রকার রসে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত স্থূল রস-গুলি শুক্র-শোণিতাদিরূপে দেহের পুষ্টি-সাধন করে; অন্য প্রকারের রস-গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; এবং উহারাই 'লোহিত-পিণ্ডাকারে' † হৃদয় হইতে প্রসারিত স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়;

* অন্তঃকরণ—*i. e.* Inner senses.

† লোহিত পিণ্ড—"Red lump."

ইহাই সূক্ষ্ম-শরীরের পোষক। সূক্ষ্ম-শরীরের ইহা ভোগ্য বলিয়া, সূক্ষ্ম-শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মারও উহা ভোগ্য এবং পোষক। হৃদয় হইতে সহস্র শিরা-জাল দেহের সর্ব্বাংশে প্রসৃত হইয়া ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শিরাপথ-গুলিই সেই 'লোহিত-পিণ্ডের' সঞ্চরণ-মার্গ। সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি দ্বারাই সূক্ষ্ম-শরীর গঠিত। এই সূক্ষ্ম-শরীরেই * বৈষয়িক সংস্কার-গুলি নিহিত থাকে। সুতরাং এই সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাধি-যোগে, আত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। অতএব, স্বপ্নাবস্থায়ও, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। এই সূক্ষ্ম-দেহই, আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। স্থূল বিষয় ও ইন্দ্রিয়-গুলি তৎকালে উপরত হইলেও—অন্তঃকরণে উহাদের সংস্কার প্রবুদ্ধ থাকে ; তদ্দ্বারাই জীবের স্বপ্ন-দর্শন হয় ; তদ্দ্বারাই জীব বাসনাময় বিষয়-সকলের প্রত্যক্ষ করে।

এই দুই অবস্থা ব্যতীত, জীবের 'সুষুপ্তাবস্থা' নামে আর একটী অবস্থা আছে। সে অবস্থায় জীব কোন প্রকার বিষয় দর্শন করে না। ইহা জীবের গাঢ় নিদ্রাবস্থা। তখন বাহ্য বা আন্তর কোন প্রকার বোধ থাকে না—কোনপ্রকার বাসনা থাকে না। এ অবস্থায় অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তি (রূপাদির জ্ঞান ও তাহার স্মৃতি) বিলীন হইয়া প্রাণ-শক্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ইহাও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক

---

* সূক্ষ্ম শরীরে—Subliminal Region.

স্বরূপ নহে। তখন সকল বিজ্ঞান, সকল বাসনা,—প্রাণ-শক্তিতে বীজ-ভাবে লুক্কায়িত থাকে। এই বীজ-রূপ উপাধি গূঢ়ভাবে থাকে বলিয়াই জীব, নিদ্রা-ভঙ্গে(সমুদয় বাসনা-কামনাদি লইয়া) পুনরুত্থিত হয়। এই জন্যই, ইহাও আত্মার গৌণ-রূপ। তখন প্রাণের সহিত আত্মা একীভূত হইয়া থাকেন বলিয়া, পণ্ডিতেরা আত্মাকে, এই অবস্থায়, "প্রাজ্ঞ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এ সময়ে জীবের সমুদয় বিশেষ-বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্ত-পুরুষের দেহে ক্রিয়া হইতে দেখা যায় বলিয়া, নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায় যে, তখন প্রাণ-শক্তির ধ্বংস হয় না। আত্মা এই প্রাণ-শক্তির সহিত এক হইয়া অবস্থিত রহেন এবং বিজ্ঞান-শক্তিও এই প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে *। জাগরিত হইলে, পুনরায় বিষয়-সংযোগে ইহারা, কারণাবস্থা—বীজাবস্থা—পরিত্যাগ করিয়া, আবার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার আকারে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই বীজ বা শক্তিরূপ উপাধির সম্বন্ধ থাকে

* বিশেষ দেশ, কাল ও বস্তুর পরিচ্ছিন্ন-বোধ এবং আমি, আমার প্রভৃতি অভিমানের আরোপ তৎকালে (সুষুপ্তি-সময়ে) থাকে না। এইজন্যই তৎকালে প্রাণ-শক্তির ধ্বংস না হইলেও, তখন প্রাণ-শক্তি 'অব্যাকৃত অবস্থায়' থাকে। "পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণলয়ো মরণং, তত্রাভিমাননিরোধে প্রাণো নাম-রূপাভ্যামব্যাকৃতো বথোচ্যতে;—তথা প্রাণাভিমানিনোঽপি তদভিমান-নিরোধেনাবিশেষাপত্তিঃ সুষুপ্তিঃ',—মাণ্ডুক্যভাষ্যে আনন্দগিরি-টীকা।

বলিয়াই, এ অবস্থাতেও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

মহারাজ! আত্মার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত; তাহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পৃথক্। সেই অবস্থাটীকে বোধের বিষয়ীভূত করিতে হইলে,—'ব্রহ্ম ইহা নহেন', 'ব্রহ্ম তাহা নহেন',—এই ভাবে করিতে হয়। এই স্বরূপের অনুভূতি জন্মিলে, তখন জানা যায় যে, আত্মা কোনরূপ উপাধি দ্বারা প্রকাশিত বা গ্রাহ্য হইতে পারেন না। আত্মাকে কেহ ধ্বংস বা বিশীর্ণ করিতে পারে না; ইনি অসঙ্গ। ইঁহার বন্ধন নাই এবং ইনি ভয়-ক্লেশ-বিমুক্ত। মহারাজ! আপনি এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। দেহান্তেও আপনি এইরূপ ভয়-শূন্যই থাকিবেন"।

মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের এই জ্ঞান-গভীর উপদেশ পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া, আপনার ধন-জন-রাজ্যাদি যাহা কিছু আপনার বলিতে বুঝায়,—তৎসমস্তই অর্পণ করিলেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যদিও সংসার-দশায় জীবাত্মাকে হর্ষ-শোক-জড়িত, ক্লেশ-তাপ-পীড়িত, এবং সংসার-পাশ-নিগড়িত বলিয়াই বোধ হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আত্মা বিষয়ের অতীত ও বিষয় হইতে পৃথক্। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী

অবস্থা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই তিন অবস্থা উত্তমরূপে বিচার ও প্রণিধান করিয়া দেখিলে, জীবাত্মার প্রকৃত-স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে বলিয়া, উপনিষদের নানা স্থানে, এই ত্রিবিধ অবস্থার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য, আমরা এ স্থলে এই বিষয়টীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখিব।

জাগ্রৎ-অবস্থাকেই জীবের সংসারাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিশ্ব-পট উদঘাটিত থাকে এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ, আত্মা এই স্থূল বিষয়-গুলি লইয়াই ক্রীড়া করিতে থাকেন। আত্মা, বিষয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ও বিষয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত থাকেন। এই স্থূল-বিষয়-সকল, ইন্দ্রিয়-পথে ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া আত্মাতে কতকগুলি অনুভূতির উদ্রেক করায়। এইরূপেই বিষয়-প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু, বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপটী ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে, এ অবস্থাতে, আত্মা যে বিষয় হইতে পৃথক্,—বিষয়ের অতীত,—তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটী বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উহা ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে থাকে। এই ক্রিয়ার ফলে ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুলিতে মনঃ-সংযোগ না করা যায়, ততক্ষণ উহারা কোথা হইতে আসিল, উহারা কিসের ক্রিয়া, ক্রিয়া-গুলি কোথায় অনুভূত হইতেছে,—এ সকলের কিছুরই বোধ হইতে পারে না। মনঃ-সংযোগ (Attention) করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয়টী আমার বাহিরে থাকিয়া, আমাতে বিশেষ প্রকারের কতকগুলি অনুভূতি উদ্রেক করাইয়াছে। তৎপরে আত্মা, স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা এই অনুভূতি-গুলির সাদৃশ্য (Assimilation) এবং বৈসাদৃশ্যের (Differentiation) বিচার করে। এইরূপ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচারকে দর্শন-শাস্ত্রে "আলোচনা" বলিয়া কহিয়া

থাকে*। এই আলোচনার সময়ে, অনুভূতি-গুলি হইতে আত্মা যে পৃথক্, তাহাও বুঝা যায়†। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যে আত্মা এইরূপে-

---

* "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং। ততঃ পরং পুনর্বস্তু-ধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা" (সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী)। প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সামান্যাকারে পদার্থ আলোচিত হইয়া, পরে বুদ্ধি-দ্বারা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে বিবেচনা হইয়া থাকে। এই বিবেচনাতে, বস্তুটী—অনুগত (Similar) ও ব্যাবৃত্ত (Dissimilar) ধর্ম্ম সহকারে বিবেচিত হইয়া পদার্থ নিরূপিত হয়; ইহাই প্রত্যক্ষ। এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দু-দর্শনের যাহা মত উদ্ধৃত হইল, তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণের অবিকল মিল আছে—"Our idea of an object exists *first* as an undivided unit, on which the several qualities come to the front one after another through the experience of *Similars* with a *Difference*; and we may say these qualities were implicit (নির্ব্বিকল্পক), before they were explicit" (সবিকল্পক)—*Martineau's Study of Religion Vol, I*

† প্রত্যক্ষকালে, সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে (অন্তঃকরণ-স্বরূপে মনের সজাতীয় বুদ্ধি প্রভৃতি, বিজাতীয় বৃক্ষাদি) পৃথক্ করতঃ আত্মার পরিচয় প্রদান করে। "সমানা-সমান-জাতীয়াভ্যাং ব্যবচ্ছিন্দন্ মনো লক্ষয়তি" (বাচস্পতি মিশ্র)। "I can not *know* myself, but as antithetic to the outer world, or the outer world but as other than myself. All knowledge consists in *distinguishing*, marking off this from that. The differentia-

বিচার-শক্তির প্রয়োগ করিয়া অনুভূতি গুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লন তিনি অবশ্যই, অনুভূতি-গুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। যে আত্মাতে সর্ব্বদা বিষয়ের অনুভূতি জন্মিতেছে, সে আত্মা যে নিত্য, অবিকৃত ও এক-রূপ ;—এবং অনুভূতি-গুলি যে নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল ও রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে ;—এই তত্ত্বটী আমরা জাগ্রৎ-বস্থায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আমাদের স্বপ্নাবস্থাতেও, এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারা যায়। স্বপ্নাবস্থায়, স্থূল বিষয় থাকে না ; কেবল অন্তঃকরণ, পূর্ব্ব-লব্ধ রূপ-রসাদির সংস্কার লইয়া, ক্রীড়া করিতে থাকে। জাগ্রৎ-অবস্থায়, ইহাদের যে দেশ-কাল-বদ্ধ স্থূল আকার ছিল, এখন সেই স্থূল আকার আর নাই। এখন অনুভূতি-গুলি বাসনাত্মক সূক্ষ্ম-আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু, যদিও বিষয়-গুলি রূপান্তর ধারণ করিয়াছে, তথাপি যে আত্মা পূর্ব্বে জাগ্রৎ-বস্থায় বিষয়ের স্থূল অনু-ভূতিলাভ করিয়াছিল ;—সেই এক নিত্য, অবিকারী আত্মাই, স্বপ্নাবস্থা-তেও, বিষয়ের সূক্ষ্ম-অনুভূতিলাভ করিতেছে। সুতরাং শব্দ-স্পর্শাদির রূপান্তর ঘটিলেও, বিষয়ী-আত্মার কোন রূপান্তর ঘটিতেছে না। এই তত্ত্বটী আবার গাঢ়-নিদ্রা বা সুষুপ্তির সময়েও বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায়, শব্দ-স্পর্শাদির অন্যরূপ আকার হইয়া যায়। স্বপ্ন-দর্শন-কালে, যে শব্দ-স্পর্শাদির সংস্কার লইয়া মন ব্যস্ত ছিল ;—এখন সুষুপ্তির সময়ে, সেই সংস্কার-গুলিও মন হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই নিত্য, অবিকারী আত্মা জাগরিত থাকেন। জাগ্রৎ অবস্থায় যে আত্মা বিষয়ের স্থূল অনুভূতি পাইয়া ছিলেন ; স্বপ্ন-দর্শন-কালে যে আত্মা বিষয়ের সূক্ষ্ম

---

tion of object from object is but the result of our *self-differentiation* from each—the effect upon ourselves of the one and of the other being the measure of their contrast."—Ibid, Vol, 1.

বাসনাময় সংস্কার লইয়া খেলা করিয়াছিলেন; সেই আত্মাই,—এই সুষুপ্তিরও অনুভব-কর্ত্তা। অতএব আমরা উত্তম বুঝিতেছি যে, আত্মা নিয়ত স্থির, অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যাইতেছেন; কিন্তু বিষয়-গুলিই নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে;—ইহারা এক এক অবস্থায় এক এক মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। বৈষয়িক রূপ বা আকার-গুলি একেবারে তিরোহিত হইলেও, আত্মার কোন রূপান্তর বা ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটিবে না; কেন না, আত্মা বিষয়ের অনুভব-কর্ত্তা হইয়াও, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব, অনুভূতি-গুলির পরিবর্ত্তনে আত্মার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে না। অনুভূতি পাইবার পূর্ব্বেও আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন; অনুভূতির পরেও সেই আত্মাই বর্ত্তমান থাকিবেন।

এই জন্যই শ্রুতিতে এই তিন অবস্থা ছাড়া, আত্মার একটী "তুরীয়" স্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এইটীই আত্মার প্রকৃত, নিরুপাধিক স্বরূপ। প্রকৃতি হইতে আত্মার সর্ব্ববিধ-সম্বন্ধ-শূন্য বা স্বতন্ত্র অবস্থা, ইহাই। সুষুপ্তি-কালে স্পর্শাদি ও কামনা-বাসনাদির সংস্কার গূঢ়-ভাবে,—শক্তি বা বীজ-ভাবে—আত্মায় লুক্কায়িত থাকে। জাগিলে, আবার ঐ বীজ-শক্তিই,—বিষয়যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। সুতরাং প্রকৃতির অতীত অবস্থাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই, শ্রুতি "তুরীয়" স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইবার জন্য ব্রহ্মের যে কয়টী শক্তি মিলিয়া মিশিয়া ক্রিয়া করিতেছে, সমষ্টি-ভাবে (Collectively) সেই কয়েকটী শক্তির নাম "প্রকৃতি"। কিন্তু ব্রহ্ম ত অনন্ত-শক্তি-স্বরূপ। এই কয়েকটীমাত্র শক্তি-দ্বারাই কি অনন্ত ব্রহ্ম-স্বরূপের ইয়ত্তা হইতে পারে? এই কয়েকটী শক্তি-দ্বারাই কি ব্রহ্মের স্বরূপ নিঃশেষ-রূপে (Exhaustively) প্রকাশিত হইতে পারে? কখনই না। এই জন্যই মহাত্মা জীব গোস্বামী ব্রহ্মের—"স্বরূপ-শক্তি" ও "প্রকৃতি-শক্তি" এই দ্বিবিধ শক্তির

উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে "তুরীয়" স্বরূপের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মেরই স্বরূপ অবশ্য এই বিশ্বে সমষ্টি-ভাবে ও ব্যষ্টি-ভাবে উভয় ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমষ্টি-ভাবে ও ব্যষ্টি-ভাবে, প্রতি পদার্থই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করিতেছে; কিন্তু তিনি প্রতি পদার্থ হইতেই, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়-ভাব হইতেই পৃথক্। পদ্ম, যুথী, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি প্রত্যেক পুষ্পটীতে তাঁহারই মহা-সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইতেছে; আবার সমগ্র পুষ্প-জাতিতেও তাঁহারই সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, ব্যষ্টি-ভাবে, গোলাপই বল, আর পদ্মই বল, কিংবা যূথীই বল, আর কদম্বই বল,—কোনটীই তাঁহার সে বিশাল, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না। আবার সমষ্টি-ভাবে বিশ্বের সমগ্র পুষ্প-জাতিও,—সে বিশাল, অনন্ত সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না!! এই মহা-রহস্য বুঝাইবার জন্যই, শ্রুতিতে সেই 'তুরীয়' রূপের বর্ণনা আছে।

———:০:———

আমরা এই আখ্যায়িকার প্রথম দুই দিবসের কথোপকথন হইতে যে যে উপদেশ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি—

১। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ও শক্তি-স্বরূপ। জ্ঞানেরই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থাকে শক্তি বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মের কতক-গুলি শক্তি, জগৎ রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে; এই শক্তি-গুলিকে, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের, জগৎ-রচনা-সম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

২। যে সকল শক্তির বিকাশে জগৎ রচিত হইয়া চলিয়াছে, সেই শক্তি-গুলি প্রথমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দিক্ প্রভৃতির আকারে সৌর-

জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাণী-দেহে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি, ঐ সকল পদার্থেরই উপাদানে রচিত। সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে যাহা শক্তিরূপে ক্রিয়া-শীল, তাহাই যথাকালে প্রাণী-দেহে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়; নতুবা ইহারা পরে কোথা হইতে আসিল? এই মর্ম্মেই শ্রুতিতে,—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকে,—চক্ষুঃ, বাক্য প্রভৃতির দেবতা বা সমষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে *।

৩। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—এই তিনটী জীবের অবস্থা। বিষয়-গুলি, অবস্থার সঙ্গে, নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করে; জীবের আত্মাতে সে গুলির অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিণামশীল অনুভূতি-গুলির যিনি অনুভব-কর্ত্তা, তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না; তিনি নিয়ত একরূপ।

৪। আত্ম-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য স্বরূপতঃ এক।

৫। প্রকৃতি-শক্তি, অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপের, নিঃশেষ ইয়ত্তা করিতে পারে না।

* এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা "শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে" করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ)।

তৃতীয় দিবস।

পরদিন রাজর্ষি জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীব-সকল কোন্ আলোকের সহায়তায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? কাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্যক্ষম হয়? সেই আলোক কি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, না দেহাদিরই অন্তর্ভুক্ত? এ বিষয়টী অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে বুঝাইয়া দিন"। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমি ক্রমে আপনার প্রশ্নের যাহা প্রকৃত উত্তর, তাহা প্রদান করিতেছি, আপনি বুঝিতে চেষ্টা করুন। এই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ সূর্য্যালোকই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শন-ক্রিয়ার সহায়রূপে বর্ত্তমান আছে; সূর্য্যালোকই দেহেন্দ্রিয়াদির

চালক। সূর্য্যের আলোকের সহায়তায় জীব ক্রিয়া-নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে"।

মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"মহর্ষে! সূর্য্যালোক ত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে না। যখন সূর্য্য অস্তগমন করে, সে সময়ে কোন্ জ্যোতির সহায়তায় জীব ক্রিয়া-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? যদি বলেন যে, সূর্য্য অস্তগমন করিলেও, চন্দ্র ত বর্ত্তমান থাকে; তখন জীব চন্দ্রালোকের সহায়তায় দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র, উভয়ের অভাবে, কোন্ জ্যোতির সহায়তায় ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়"? যাজ্ঞবল্ক্য, রাজার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! সূর্য্য অস্তগমন করিলে এবং চন্দ্রেরও অভাব হইলে, অগ্নি ত বর্ত্তমান থাকে। তখন এই অগ্নির প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াই জীব ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। আর, এই অগ্নিও যখন শান্ত হয়, তখন জানিবেন, বাক্য-রূপ জ্যোতির সহায়তায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শাসিত; শব্দ-দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে, মন বস্তু-নির্দ্ধারণে সমর্থ হয়; সেই মনের দ্বারা তখন বাহ্য-চেষ্টার উদ্রেক হয়। অতএব বাক্য-রূপ জ্যোতিঃ-দ্বারাই তখন মনুষ্যের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মহারাজ! আপনি কি দেখেন নাই যে, নিবিড়-প্রাবৃট্কালে,—ঘন-ঘোরান্ধকারে যখন নিকটস্থ একটী বস্তুকেও গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; যখন সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্ন্যাদির জ্যোতিঃ তিরো-

হিত হইয়া যায়;—তখন কেবল এই শব্দ-দ্বারাই বস্তু নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব বাক্যালোকের সহায়তাতেই জীবের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় * সম্বন্ধেও, এইরূপই বুঝিতে হইবে। গন্ধাদি দ্বারা যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জীবের ক্রিয়া হইতে থাকে। যখন জীব জাগরিত থাকে, তখন বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়-বর্গই, বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। তখন সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির আলোক, এই ইন্দ্রিয়-বর্গের সহায়রূপে অবস্থিত থাকে। কিন্তু যখন জীব নিদ্রিত বা সুষুপ্ত থাকে, তখন ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহ্য-বিষয় ও বাহ্য আলোকাদির অভাবেও, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত এক আলোক দ্বারাই জীবের, স্বপ্ন-দর্শন বা সুখ-সুপ্তি নির্ব্বাহ হয়। স্বপ্নাবস্থায়, যখন বাহ্য-শব্দাদি বিষয়-সকল থাকে না ও বাহ্য ইন্দ্রিয়াদিরও কোন ক্রিয়া থাকে না;—তখনও ত জীব স্বপ্নে বন্ধুর সহিত সংযোগ-বিয়োগ, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া থাকে, আবার গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে, যখন জীব নিদ্রিত থাকে, তখন সেই নিদ্রা হইতে পুনর্জ্জাগরিত হইয়াই ত জীব অনুভব করে যে, সে কেমন সুখে নিদ্রা গিয়াছিল। অতএব মহারাজ! এখন ত দেখিতে পাইতেছেন যে, প্রকৃত-পক্ষে, কোন্ আলোকের সাহায্যে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ

* বিষয়—Sense-obiects.

পৃথক্ এবং বাহ্য-বিষয় ও সূর্য্য-চন্দ্রাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটী জ্যোতিঃ আছে;—যে জ্যোতির বলে, জীব-সকল জাগ্রৎ ও নিদ্রাদি অবস্থার সময়ে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই আত্ম-জ্যোতিঃ নামে পরিচিত। ইহাই আত্মার আলোক বা চৈতন্যের প্রকাশ। এই আত্মালোক, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই আলোকের বলেই, দেহেন্দ্রিয়াদি পরিচালিত ও কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে। এই আলোক, চক্ষুরাদির গ্রাহ্য নহে। বাহ্য সূর্য্য-চন্দ্রাদিও এই আলোকের বলেই ক্রিয়াশীল হয়। এই আত্মালোক, সমুদয় পদার্থ হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সমুদায় পদার্থের অবভাসক ও চালক। ইহা ভৌতিক পদার্থ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ।

কোন কোন তার্কিক এই স্বতন্ত্র আত্ম-জ্যোতিঃ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, সমান-জাতীয় পদার্থই,—সমান-জাতীয় পদার্থান্তরের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে বা উপকার সাধন করিতে পারে। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির যিনি চালক বা প্রকাশক, তিনি অবশ্যই দেহেন্দ্রিয়াদি সমান-জাতীয়, তিনি কখনই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ পদার্থ হইতে পারেন না। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইলেই যে, সেই আলোকটীকে নিতান্ত বিলক্ষণ পদার্থ মনে করিতে হইবে, তাহাও হইতে পারে না। কেননা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলিও ত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, কিন্তু তাহাদের দ্বারা ত রূপাদি দর্শন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এইরূপ

যুক্তির বলে এই সকল তার্কিকেরা, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-নির্ব্বাহক সেই জ্যোতিটীকে জড়-শক্তি বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সকল যুক্তির অসারতা সহজেই ধরা পড়ে। দেখুন, সমান-জাতীয় পদার্থই যে সর্ব্বত্র তৎসমান-জাতীয় পদার্থের উপকার করিয়া থাকে, এমন কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই; ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ দ্বারাও উপকারাদি সাধিত হইতে দেখা যায়। ভিন্ন-জাতীয় জল দ্বারা ত বৈদ্যুতাগ্নির প্রজ্বলনাদির উপকার দেখা যায়, জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হইতেও ত দেখা যায়।

অপর এক শ্রেণীর তার্কিক আছেন, তাঁহারা এই প্রকাশক আত্ম-জ্যোতিকে, দেহেরই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাঁরা দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র দ্রষ্টা স্বীকার করেন না। দেহ থাকিলেই চৈতন্য থাকে, দেহ না থাকিলে থাকে না; অতএব চৈতন্য,—দেহেরই ধর্ম্মমাত্র; তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের মতে, এই দেহই দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে; দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা নাই। তবে যে কখনও দর্শন-শ্রবণাদি হয়, আবার কখন হয় না;—দেহের স্বভাবই তাহার হেতু। দেহের স্বভাবই এই যে, সর্ব্বদা সকল ক্রিয়া হয় না। মহারাজ! এ সকল যুক্তি নিতান্তই অসার, তাহা আপনাকে দেখাইতেছি। দেহই যদি দ্রষ্টা হয়, দেহাতিরিক্ত যদি স্বতন্ত্র দ্রষ্টা না থাকে, তবে যাহার চক্ষুঃ দুইটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ত কদাপি স্বপ্ন দেখিতে সমর্থ হইত না। যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়া-

ছিল, স্বপ্নে সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুরই দর্শন হয়। দেহ-ব্যতিরিক্ত যদি স্বতন্ত্র দ্রষ্টা না থাকে, তবে যে চক্ষুঃ (দেহাবয়ব) দ্বারা অন্ধ পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, সে চক্ষুঃ দুইটী অস্ত্রাদি দ্বারা নষ্ট করিয়া দেওয়ার পর, সেত সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে দেখিতে পাইত না; কেন না, যদ্দ্বারা স্বপ্ন দেখিবে, সেই চক্ষুই ত নাই। কিন্তু অন্ধ-ব্যক্তিরও ত স্বপ্ন-দর্শন ঘটিয়া থাকে। আবার ভাবুন, যিনি কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ত পরে সেই বস্তুটী স্মরণ করিয়া থাকেন। এ স্থলেও দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা প্রমাণিত হইতেছে। কেন না, দেহই যদি দ্রষ্টা হয়, দেহাতিরিক্ত যদি দ্রষ্টা না থাকে,—তবে, দেহাবয়বভূত চক্ষুঃ-দুইটী মুদ্রিত করিলে ত আর পূর্ব্ব-দৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হইতে পারিত না। কেন না, স্মরণ করিবে কে? যে স্মরণ করিবে, সে দেহ বা দেহাবয়ব চক্ষুঃত মুদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু দেখুন, আমরা ত চক্ষুঃ-মুদ্রিত করিয়াও পূর্ব্ব-দৃষ্ট পদার্থ স্মরণ করিয়া থাকি। অতএব দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা প্রমাণিত হইতেছে। একই আত্মা, দর্শন ও স্মরণ উভয়েরই কর্ত্তা। আবার ভাবুন, দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র দ্রষ্টা না থাকিলে, মৃত ব্যক্তিরও দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারিত; কেন না, তখনও ত দেহ ঠিকই আছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দেহে যে পদার্থটী থাকিলে দর্শনাদি ক্রিয়া-নির্ব্বাহিত হয়, না থাকিলে হয় না;—তাহাই দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র দ্রষ্টা, স্বতন্ত্র আত্ম-জ্যোতিঃ।

মহারাজ! তবেই স্থির হইল যে, আত্ম-জ্যোতিঃ, দেহাদি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ এবং এই আত্ম-জ্যোতিঃ,

—দেহ বা দেহের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই আত্ম-জ্যোতিঃ যে ইন্দ্রিয়-গুলি হইতেও স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাও প্রমাণ করা কঠিন নহে। ইন্দ্রিয়-গুলিই যদি দর্শনাদি ব্যাপারের কর্ত্তা হইত, তবে যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই আবার তাহা স্পর্শ করিলেন, এরূপ ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারিত না। কেননা, একজনের দৃষ্ট ও অনুভূত পদার্থকে, অপর একজন কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব চক্ষুরাদি এক একটী ইন্দ্রিয়কেও দ্রষ্টা বলা যায় না। এইরূপ মনকেও দ্রষ্টা বলা যায় না; কেননা মনও ইন্দ্রিয়মাত্র; এবং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের ন্যায়, মনও বিষয়মাত্র *। আত্মার পক্ষে, মনও বিষয় বা দৃশ্য; উহা বিষয়ী বা দ্রষ্টা হইতে পারে না। অতএব দ্রষ্টা † বা আত্ম-জ্যোতিঃ—দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ। এই আত্ম-জ্যোতিই দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক ও ক্রিয়া-নির্ব্বাহক।

মহারাজ! এই নিত্য, স্বতন্ত্র, আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারাই দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই আলোকে আলোকিত হইয়াই বুদ্ধি,—শব্দ, স্পর্শ, ভয়, লজ্জাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়। এই আলোকেই আলোকিত হইয়া প্রাণ,—দর্শনাদি-ক্রিয়া এবং রস-রক্তাদির পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। এই আত্ম-জ্যোতিঃ,—বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি তাবৎ পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ তাবৎ পদার্থেরই

* বিষয়—*i. e.* obiect বা দৃশ্য। † দ্রষ্টা—*i. e.* subject.

অন্তঃস্থ। এই আত্ম-জ্যোতিঃ না থাকিলে বুদ্ধি-প্রাণাদি কেহই প্রকাশিত ও ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। বুদ্ধি এই আত্মার নিতান্ত সমীপস্থ বলিয়া, আত্মালোকে আলোকিত হইয়া বুদ্ধি বিষয়-প্রকাশে সমর্থ হয় বলিয়া, লোকে এই বুদ্ধিকেই "বিজ্ঞান-ময়" আত্মা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকৃত-পক্ষে বুদ্ধি,—আত্মার জ্ঞান-প্রকাশের প্রধান দ্বার। এই বুদ্ধি দ্বারাই, আত্মা, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক। আলোক যেমন হরিত, নীল, লোহিতাদি বর্ণের প্রকাশক হইয়া, স্বয়ং হরিত-নীল-লোহিতাদি বর্ণ-সদৃশ হইয়া পড়ে;—আত্মাও তদ্রূপ বুদ্ধির প্রকাশক হইয়া বুদ্ধি-দ্বারাই সমগ্র দেহটীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই আত্ম-জ্যোতিঃ, বুদ্ধ্যাদি তাবৎ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। হর্ষ, শোক, লজ্জা, ভয়াদি,—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিরই পরিণাম; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিও বিষয়-দ্বারা উপরক্ত বুদ্ধিরই পরিণাম। আত্ম-জ্যোতিঃ এই সকল বুদ্ধির পরিণাম হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, এই গুলির অনুগত হইয়াই প্রকাশিত হয়; কেন না, বুদ্ধিই আত্মার জ্ঞান-প্রকাশের দ্বার। এই-জন্য, অবিবেকী লোক-সকল এই বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। বুদ্ধি বা বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যতিরিক্ত, আর কোন নিত্য-প্রকাশ-স্বরূপ আত্ম-জ্যোতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। বুদ্ধিই তাহাদের মতে আত্মা; অথবা বুদ্ধি-বৃত্তির * সম-

* বুদ্ধি-বৃত্তি—States of consciousness or ideas.

ষ্টিই আত্মা, তদতিরিক্ত আর আত্মা নাই;—তাহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। ইহারা বিজ্ঞান-বাদী নামে প্রসিদ্ধ।

মহামতি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এই স্থলের ভাষ্যে, এই বিজ্ঞান-বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে বিজ্ঞান-বাদীর মত এবং শঙ্করাচার্য্যের খণ্ডনাত্মক যুক্তির উল্লেখ করিব। বিজ্ঞান-বাদীগণ বলেন যে, আমাদের মনোরাজ্যের বিশ্লেষণ করিলে আমরা বৃক্ষজ্ঞান, লতাজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ক্রোধজ্ঞান, ক্ষুধাজ্ঞান—এইরূপ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান (Successive states of consciousness or ideas) ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। এই গুলি লইয়াই আমাদের জ্ঞান-রাজ্য পর্য্যবসিত। এই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলি প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে এবং স্রোতঃ-প্রবাহের ন্যায়, ধারাবাহিক-ভাবে, একটীর পর অন্যটী, তৎপর আর একটী, এইরূপে আসিতেছে ও যাইতেছে। একটী অপরটীর সহিত দুশ্ছেদ্য-সম্পর্কে গ্রথিত হইয়া, এই বিজ্ঞান-গুলি দেখা দেয়। এই গুলি দ্বারাই আমাদের জ্ঞানের রাজ্য গঠিত।" ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাদের জ্ঞান হইবার অন্য কোন পথ নাই।

এই বিজ্ঞান-বাদী দিগের মধ্যে, দুই শ্রেণীর তার্কিক দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) একশ্রেণীর তার্কিকেরা মনে করেন যে, এই যে আমাদের অন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তে নানাবিধ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান উপস্থিত হইতেছে, ইহারা অবশ্যই ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার ফল। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলিই (Changes) বিজ্ঞান নামে পরিচিত। কিন্তু বাহির হইতে কোন কিছু, ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া উৎপাদন না করিলে, আর কে করিবে? অবশ্য আমাদের এই বিজ্ঞান-গুলিকেই জানিবার অধিকার আছে, বাহিরের সেই 'কারণটী'কে আমাদের জানিবার

কোন অধিকার বা উপায় নাই। আমরা সেই কারণটীকে কেবলমাত্র, ক্রিয়ার উৎপাদকরূপে বুঝিতে পারি; অন্য কোন রূপে তাহাকে জানিতে পারি না। আমরা জানিতে পারি কেবল সেই ক্রিয়া-গুলি। এই ক্রিয়া-গুলিই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান-গুলি আমাদের অন্তরেই নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়া ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে। অন্তরের এই বিজ্ঞান-গুলিই, বাহিরে বৃক্ষ, লতা, শব্দ, স্পর্শাদিরূপে অবস্থিত আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই বিজ্ঞান-গুলির প্রকৃতি এইরূপ। আমাদের বোধের অনিবার্য্য প্রকৃতিই এই যে, উহারা প্রকৃত-পক্ষে অন্তরেই অবস্থিত; তথাপি উহাদিগকে বাহিরেও অবস্থিত বলিয়াও মনে হয়।

(খ) অন্য একশ্রেণীর তার্কিকেরা মনে করেন যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত কিছুই নাই। এই যে বিজ্ঞান-গুলিকে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, উহা ভ্রম মাত্র। বিজ্ঞান-গুলি আমাদের অন্তরেই নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে, উহারা বাহিরে থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলির উৎপাদক কারণ-রূপে যে বাহিরে একটা সত্তার প্রতীতি হয়, প্রকৃত-পক্ষে, বাহিরে সে সত্তারও কোনই অস্তিত্ব নাই। আমরা যখন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলি মাত্রকেই জানিতে পারি, তখন অন্য কোন প্রকার সত্তা স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই। অবশ্য আমাদের বোধের অনিবার্য্য প্রকৃতিই এইরূপ যে, আমরা বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি বিজ্ঞান-গুলিকে বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই মনে করিয়া লই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদের এই ভ্রম ধরা পড়ে। আমাদের যখন বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞান জন্মিবার মোটেই অধিকার নাই, তখন বাহিরে সেই বিজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? বিজ্ঞান অন্তরেরই পদার্থ; উহা অন্তরেই বর্ত্তমান। অতএব বাহিরে কোন প্রকার সত্তা নাই। বিজ্ঞান-গুলি অন্তরেই সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতেছে।

এই দুই প্রকারের মত উল্লিখিত হইল। ইহাঁদের মধ্যে কেহই আত্ম-চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উভয় শ্রেণীর পণ্ডিতেরাই, এই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিকে স্ব প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। এই বিজ্ঞান-গুলি উপস্থিত হইলেই, উহাদিগকে জানা যায়। উহারা নিজেই নিজকে (প্রদীপের ন্যায়) প্রকাশ করে। ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য, স্বতন্ত্র কোন আত্ম-জ্যোতির আবশ্যক নাই। ইহাঁদের উভয়ের মতেই,—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, বিষয়ী ও বিষয়ের, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের,—পৃথক্ অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানই,—জ্ঞাতা; বিজ্ঞানই,—জ্ঞেয়। বিজ্ঞান গুলি নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে; আপনিই আপনার নিকটে আত্ম-প্রকাশ করে। ইহারা স্ব-প্রকাশ স্বরূপ। যদি 'আত্মা' বলিতে হয়, তবে এই পর-পর-জায়মান বিজ্ঞান-প্রবাহকেই 'আত্মা' বলিতে পার। বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন আত্মা নাই।

উপরে বিজ্ঞান-বাদ উল্লিখিত হইল। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এই দুই শ্রেণীর মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। এখন আমরা সেই খণ্ডনের যুক্তি-গুলি দেখিতে অগ্রসর হইব। বিজ্ঞান-গুলির প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র এক আত্মা স্বীকার করা নিতান্তই আবশ্যক। ইহারা যখন বিজ্ঞান, তখন অবশ্যই এই জ্ঞান-গুলি কাহারও 'জ্ঞেয়' তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান,—বিজ্ঞানেরই জ্ঞেয়, ইহা হইতে পারে না *; এই বিজ্ঞান-গুলি অবশ্য আমারই বিজ্ঞান,—ইহারা আত্মারই জ্ঞেয়।

---

* কেন না, কেবল যে ইহাতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে; অনবস্থাদোষও (Regressus ad Infinitum) হয়। আবার, দুঃখাদি, দুঃখাদিরই জ্ঞেয়, বা সুখ-দুঃখাদি নিজেরই প্রয়োজনের জন্য রহিয়াছে, ইহাও বলিতে হয়।

এই বিজ্ঞান-গুলি নিয়ত অন্তরে উপস্থিত হইতেছে,—ইহারা সর্ব্বদা দেখা দিতেছে; সুতরাং ইহারা 'দৃশ্য'। কিন্তু বিজ্ঞান গুলি দেখা দিতেছে, অথচ কেহ উহাদিগকে দেখিতেছে না, এ কিরূপ যুক্তি? ইহারা নিজেই নিজের দৃশ্য,—ইহারা নিজের নিকটেই নিজকে দেখা দিতেছে, এরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহাদিগের একটী স্বতন্ত্র জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিজ্ঞান-গুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াই উপস্থিত হয়; কোনটীই একাকী উপস্থিত হয় না। এইজন্য বিজ্ঞান-বাদীরা ইহাদিগকে বিজ্ঞান-ধারা বা বিজ্ঞান-প্রবাহ বলিয়া থাকেন। ইহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে, একটী অন্যটীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উপস্থিত হয়, নতুবা ইহাদিগকে জানা যাইতে পারিত না। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বোধই সমুদায় জ্ঞানের মূল। একটী বিজ্ঞান, অন্যটীর সদৃশ বা একটী বিজ্ঞান অন্যটী হইতে বিসদৃশ;—এইরূপ বোধ না হইলে কোন বিজ্ঞানকেই বুঝিতে পারা যায় না। তবেই, বিজ্ঞান-গুলি যে নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে, এ যুক্তি টিকিল না। একটী বিজ্ঞান, স্বাত্ম-প্রকাশের জন্য,—অন্য একটী সদৃশ বা বিসদৃশ বিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আবার, এই যে বিজ্ঞান-গুলি ধারাবাহিক রূপে আমাদের অন্তরে নিয়ত উপস্থিত হইতেছে; এই বিজ্ঞান-গুলির মধ্যে যে, একটী বিজ্ঞান অন্যটীর সদৃশ বা অন্যটী হইতে বিসদৃশ, এই তুলনা—এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিচার—কে করিয়া থাকে? বিজ্ঞান-গুলি নিজেই এ বিচার করিতে সমর্থ নহে; অতএব ইহাদের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটী জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা স্বীকার করিতেই হইবে। বিজ্ঞান-বাদীদিগের মতে, পর-পর উপস্থিত এই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলি 'ক্ষণিক';—আসিতেছে, যাইতেছে। বিজ্ঞান-গুলিকে ক্ষণিক বলিলে,—একটী বিজ্ঞান যে অন্যটীর সদৃশ বা অন্যটী হইতে

বিসদৃশ, এই সাদৃশ্য-বোধ বা বৈসাদৃশ্য-বোধ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। সাদৃশ্য-বোধের প্রকৃতি এই যে, আমি একটী বস্তু দেখিবার পরে, যখন আর একটী বস্তু দেখিলাম, তখন পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুটীর স্মরণ হইল, পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুটীর স্মরণ হইলে তবে বর্ত্তমান-দৃষ্ট বস্তুটী তাহার সদৃশ কিনা তাহা আমি বলিতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানবাদে, প্রথম বস্তুটীর দর্শন ত একটী বিজ্ঞান, সে বিজ্ঞানটী ত ক্ষণিক; সুতরাং তাহা তখনই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার তাহার স্মরণ একটী বিজ্ঞান, সেটীও ক্ষণিক বলিয়া, অন্য একটী বস্তু দর্শনের সময় পর্য্যন্ত তাহা উপস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং, বিজ্ঞানাতিরিক্ত দ্রষ্টা না থাকায়, বিজ্ঞানবাদে, সাদৃশ্য-বোধ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আরও একটী কথা এই যে, বিজ্ঞান-গুলি যে নিরত একটীর পর অপরটী এইভাবে সম্পৃক্ত হইয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহাদের ভিন্নতা বোধ না থাকিলে কি ইহাদিগকে বুঝা যাইত? অন্ধকার-জ্ঞানটীকে, আলোক-জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া না লইলে কি আমাদের অন্ধকার-জ্ঞান হইতে পারে? এই বিজ্ঞান-গুলি কি নিজেই নিজকে এইরূপে পৃথক্ করিয়া দেয়? বিজ্ঞান-গুলির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটী পদার্থ না থাকিলে, কে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিত? কে তাহাদিগের পার্থক্য-বিচার করিত? অতএব এই বিজ্ঞান-গুলি,—স্বতন্ত্র একটী জ্ঞাতারই জ্ঞেয়। এই বিজ্ঞান বাদের আর একটী বৃহৎ দোষ এই যে, একটী বিজ্ঞানের পরে অপর একটী বিজ্ঞান উপস্থিত হইতেছে,—এই যে বিজ্ঞানের ধারা চলিতেছে; এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একটী বিজ্ঞানের পর আর একটী বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, এই দুই বিজ্ঞানের অন্তরালে তবে কোনই বিজ্ঞান নাই, ইহাই কি দাঁড়াইতেছে না? তবে কি, দুই বিজ্ঞানের অন্তরালে অন্য কোন বিজ্ঞান না থাকায়, তখন একেবারেই জ্ঞানেরই অভাব দাঁড়ায় না? বিজ্ঞান-বাদীরা এই গুরুতর প্রশ্নের কোনই

উত্তর দিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে, জল-স্রোতের ন্যায়, পূর্ব্বের বিজ্ঞানটী পরের বিজ্ঞানের অঙ্গে মিশিয়া গিয়া, উভয় বিজ্ঞানই এক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং এই ভাবেই বিজ্ঞান-গুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; একথা সত্য হইলেও, বিজ্ঞান-বাদীর তাহাতে কোন বিশেষ লাভ নাই। উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে কাল-গত ভিন্নতা সর্ব্বদাই থাকিয়া যায় ; একটী বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান, অন্যটী অতীত কালের বিজ্ঞান। এই দুই বিজ্ঞানের অন্তরালবর্ত্তী কালটী শূন্য রহিয়াই যাইতেছে। অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটী জ্যোতিঃ রহিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিবিধ বৃত্তি-গুলি (বিজ্ঞান-গুলি) প্রকাশিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আত্মার, সুখ-দুঃখ ও তাপ-ক্লেশাদি-মালিন্য দূর করিয়া দিবার জন্য উপাসনাদির ব্যবস্থা আছে। যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা না যায়, তবে এই শোক-দুঃখ ও তাপ-ক্লেশাদি, বিজ্ঞানেরই অংশ বা স্বরূপ হওয়াতে, ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় থাকে না। কেননা, যেটী যাহার স্বভাব বা স্বরূপ তাহার বিয়োগ ঘটান অসম্ভব। অতএব এই সকল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের দ্রষ্টা, এক স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করিতেই হইবে।

মহারাজ! বিজ্ঞান-বাদীদিগের মত নিতান্তই ভ্রান্ত। আত্মা,—দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি তাবৎ পদার্থের প্রকাশক ; তাবৎ পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। আত্মাই,—শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিকে নিয়ত আত্ম-জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছেন। আত্ম-চৈতন্য,—নিয়ত স্বতন্ত্র শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা এই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলিকে সঙ্ঘীভূত, শৃঙ্খলিত, এবং একত্র গ্রথিত করিয়া লইতেছেন, নতুবা ইহারা আমাদের

বোধের বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। এই আত্ম-জ্যোতিঃ দেহে-ন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক এবং বুদ্ধির সমুদয় বৃত্তি-গুলির অবভাসক। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকাশক বলিয়াই, বুদ্ধির অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এই আত্ম-জ্যোতিরও প্রকাশের তারতম্য প্রতীত হয়, স্বরূপতঃ ইনি প্রকাশ-স্বরূপ, ইঁহার প্রকাশের কোন তারতম্য নাই। জাগ্রৎ-অবস্থায়, যখন অন্তঃকরণ বিবিধ বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হয়, তখন ইনি স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই বিষয়-গুলিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিদ্রাবস্থায়, যখন অন্তঃকরণের বাসনাত্মক ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বপ্নাদি-দর্শন সংঘটিত হয়, তখন, আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা ইনিই সেই অন্তঃকরণের বাসনাময়-বৃত্তিগুলি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। অতএব নিত্য-প্রকাশাত্মক এই আত্ম-চৈতন্যই বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন”।

মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে আত্ম-জ্যোতির প্রকৃত স্বরূপ কি, এই বিষয়ে যে সকল উপদেশ পাইলেন, সেই উপদেশ-গুলি পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা চিত্তে ধারণা করিতে লাগিলেন এবং সেই দিন, ব্রহ্ম-বিষয়ে, মহর্ষির সঙ্গে আর কোন কথা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— o:*:o ——
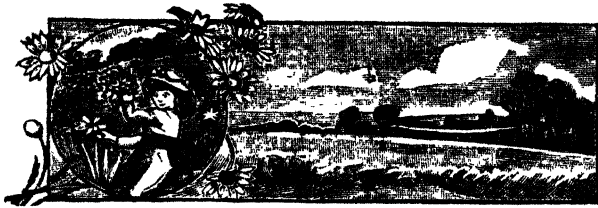
(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ)

চতুর্থ দিবস।

পরদিবস, যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় রাজা জনকের নিকটে উপস্থিত হইলেন। জনক, তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া আসন পরিগ্রহ করাইলেন এবং পূর্ব্বদিবস শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র যে আত্ম-জ্যোতির সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, রাজার ঔৎসুক্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজ! আত্ম-জ্যোতিঃ যে দেহেন্দ্রিয়াদি ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়াও, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক, একথা জাগ্রদবস্থা অবলম্বন করিয়া আমি আপনাকে বলিয়াছি। আত্মা যে স্বতন্ত্র থাকিয়াই এ সকলের প্রবর্ত্তক হন, অদ্য তাহা জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থার দ্বারা বুঝাইয়া দিব। আত্মার জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, জন্ম ও মৃত্যু,—এই অবস্থা-গুলির প্রকৃতি

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। স্থূল-জড়াংশ এবং ইন্দ্রিয়াদি-সূক্ষ্মশক্তি বিশিষ্ট, এই কার্য্য-করণাত্মক * দেহ গ্রহণ করাকেই আত্মার জন্ম এবং এই কার্য্য-করণাত্মক দেহ পরিত্যাগকেই আত্মার মৃত্যু বলা যায়। এইরূপ, জাগ্রৎ-অবস্থায় এই কার্য্য-করণাত্মক দেহের বিষয়াদি-যোগে যে লৌকিক ব্যবহার তাহা সম্পাদন করাকেই, আত্মার জাগ্রৎ-অবস্থা; এবং এই কার্য্য-করণাত্মক দেহের সংসর্গ-ত্যাগ করতঃ, অন্তঃকরণের যে বাসনাত্মক পরিণতি তাহারই প্রকাশ করিয়া দেওয়াকে, আত্মার স্বপ্নাবস্থা বলা যায়। এই জন্ম ও মৃত্যু, জাগরণ ও স্বপ্ন,—সকল অবস্থাতেই আত্মা যে স্বপ্রকাশ-স্বরূপ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। কেন না, স্বতন্ত্র না হইলে, কোন একটী বিশেষ অবস্থাতেই আত্মা নিয়ত নিবদ্ধ রহিয়া যাইত, এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অন্য একটী অবস্থা গ্রহণ করিতে পারিত না।

আত্মার—ইহলোক ও পরলোক এই দুইটীমাত্র স্থান আছে। শরীরেন্দ্রিয় ও বিষয়-বাসনাদির অনুভব করাই ইহলোক এবং শরীরেন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগানন্তর যাহা অনুভব করা যায়, তাহাই পরলোক। এই উভয় লোকের মধ্যে আর একটী আত্মার স্থান আছে। সেটী আত্মার স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায়, ইহলোকের

* কার্য্য—দেহ ও তাহার স্থূল অবয়ব-গুলি। করণ—ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম শক্তি সকল।

(জাগরিতাবস্থার) অনুভূত বিষয়-বাসনাদি, এবং পরলোকে যাহা অনুভূত হইয়াছিল, সে গুলিও—অনুভূত হইতে থাকে। এই উভয় লোকের অনুভূত বিষয়ের, স্বপ্নে সংস্কারাত্মক বোধ হইয়া থাকে বলিয়াই, স্বপ্নকে 'সন্ধি-স্থান' বলা যাইতে পারে।

দেহেন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া, মৃত্যুর পর, আত্মা কিং আশ্রয় করিয়া পর-লোকে প্রস্থান করে? ইহকালে জীব যাদৃশ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও কর্ম্ম করিয়াছে, সেই-গুলির সংস্কার-আশ্রয়ে পরলোকে প্রয়াণ করে।

মহারাজ! আমি প্রথমতঃ আপনাকে আত্মার স্বপ্নাবস্থার কথা বলিতেছি, তৎপরে পর-লোকের কথা বলিব।

জাগ্রৎ-অবস্থায়, সূর্য্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করায়, ইন্দ্রিয়-গুলি আধিভৌতিক জড়-বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, অন্তঃকরণের নানাবিধ বিষয়-বাসনা জাগরিত হইয়া বৈষয়িক জ্ঞান ও বৈষয়িক বিবিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। যখন জীব নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করে, তখন বাহ্য আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি এবং আধিভৌতিক বিষয়-গুলি ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া প্রবুদ্ধ করে না। তখন অন্তঃকরণে জাগরিত-কালের অনুভূত বৈষয়িক সংস্কার-গুলি মাত্র প্রবুদ্ধ হয়। তখন বাহ্য-বিষয় থাকে না; কিন্তু তখন এই বাসনাময় সংস্কার-গুলিই আত্মার 'বিষয়'-রূপে ক্রিয়াশীল হয়। আত্মা স্বকীয়, স্বতন্ত্র জ্যোতিঃ দ্বারা এই সংস্কারাত্মক বিষয়-গুলির প্রকাশ করেন। সুতরাং সেই আত্ম-জ্যোতিঃ যে বাসনাত্মক অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র, তাহা

বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কেন না, বিষয় প্রকাশ করাই আত্মার স্বরূপ এবং বিষয় হইতে বিষয়ী নিয়ত স্বতন্ত্র।

জাগ্রৎ-অবস্থায়, বাহ্য পদার্থ-গুলি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করিয়া ইন্দ্রিয়-গুলিকে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। স্বপ্নাবস্থায় তাহা নাই। সুতরাং আত্মা যে সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু স্বপ্নে, জাগরিতাবস্থার ঠিক অনুরূপ অনুভূতি-গুলি সংস্কারাকারে অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে *। আত্মা তখন স্বীয় জ্যোতিঃ-দ্বারা সেই বাসনাময়-অন্তঃকরণকেই প্রকাশিত করেন। তখন বাসনাকারে চিত্তের যে পরিণাম হয়, আত্মা তখন সেই পরিণাম-ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অবস্থিত থাকেন; কেন না আত্মার নিজের কোন বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব নাই; তিনি সর্ব্ব-ক্রিয়ার সাধারণ-শক্তি। অন্তঃকরণ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াই, স্বীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

আত্ম-শক্তি চির-নিত্য; এ শক্তি কদাপি বিলুপ্ত হয় না। এই নিত্য-শক্তিই সকল-ক্রিয়ার বীজ। জাগরিত কালের অন্তঃ-করণ স্থূল বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়-যোগে যে ক্রিয়া করে,—তাহারও মূলে এই নিত্য-শক্তি। আবার স্বপ্ন-কালে অন্তঃকরণ যে কেবল বাসনাত্মক ক্রিয়া করিয়া থাকে,—তাহারও মূলে এই নিত্য-শক্তি। এই আত্মজ্যোতিই,—স্বপ্নে অন্তঃকরণ-সংসর্গে, বাসনাকার রথ, অশ্ব, তড়াগ, পুষ্করিণী, অন্ন-পানাদির উপভোগ করেন; আবার

* "পূর্ব্বদৃষ্ট-স্মৃতির্হি স্বপ্নঃ প্রায়েণ"—ভাষ্য।

এই আত্ম-জ্যোতিঃ,—জাগরিতাবস্থায় সেই অন্তঃকরণ ও বাহ্য-বিষয় সংসর্গে, এই শরীরের বিবিধ ক্রিয়া নিষ্পাদিত করিয়া থাকেন। আবার, সুষুপ্তাবস্থায়, অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম-বাসনাকার পরিণাম থাকে না। তখন অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তি বিলীন হইয়া বীজরূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং, তখন এই আত্ম-জ্যোতিও, বীজাকারে অবস্থিত সেই অন্তঃকরণের প্রকাশকরূপে অবস্থিত থাকেন। তখন কাজেই বিশেষ বিশেষ কোন বিজ্ঞান বা ক্রিয়া থাকে না। হায়! মনুষ্য এই স্ব-প্রকাশ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। জাগ্রৎ-অবস্থায় কার্য্য-কর্ম্মাত্মক দেহে ব্যাপৃত থাকিয়া সহস্র-প্রকারের কামনা ও কার্য্যে আচ্ছন্ন রহে; স্বপ্নে দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলেও, অন্তঃকরণের বিবিধ বাসনা জাগিয়া থাকে; সুতরাং তৎকালে সেই গুলিতেই আত্মা প্রবৃত্ত ও আচ্ছন্ন হয়। তথাপি জাগ্রৎ-অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নে কার্য্য-ব্যাকুলতা কিছু কম। আবার সুষুপ্তাবস্থায়, চিত্তের সর্ব্ববিধ পরিণাম শান্ত হওয়ায়, আত্মার ব্যাকুলতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মা শান্তি-লাভ করেন *। তবেই, এই জাগ্রদাদি অবস্থা-গুলি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে;—ইহারা আত্মার প্রকৃত স্বভাব নহে। স্বভাবের কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না। অগ্নির উষ্ণতার ও সূর্য্যের প্রভার কি পরিবর্ত্তন সম্ভব? এ সকল অবস্থাই বুদ্ধি-কৃত; বুদ্ধির সংসর্গ-বশতঃই আত্মার এই

* এই জন্যই সুষুপ্ত পুরুষকে ডাকিয়া জাগরিত করা উচিত নহে। হঠাৎ জাগাইলে, দুশ্চিকিৎস্য রোগ হয়।

সকল অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। বাস্তবিক-পক্ষে, জীবাত্মার এইরূপ কোন বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বা ক্রিয়াফল-ভোগ নাই। আত্মা নিরবয়ব। নিরবয়ব পদার্থের, সাবয়ব ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ ঘটিতে পারে না। এই জন্যই প্রকৃত-পক্ষে, আত্মা,—নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র। দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার সহিত তাঁহার প্রকৃত সংযোগ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে, এভাবে, দেহেন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না। তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার স্বতন্ত্র, নিত্য, দ্রষ্টা মাত্র।

অতএব, আত্মার নিজের স্বতঃ কোন বিশেষ কর্ত্তৃত্ব বা ভোগ নাই। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও ভোগ তাঁহাতে আরোপিত হয় মাত্র। অতএব কোন অবস্থাতেই আত্মার ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত হয় না*। এইরূপে, এই অসঙ্গ আত্মা জাগরিতাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন; আবার এইরূপেই সুষুপ্তির অবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থা, এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরিতাবস্থা প্রাপ্তি ঘটিতেছে। আত্মা পরমার্থতঃ এই তিন অবস্থারই অতীত; অথচ তাঁহারই এই তিন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই কথাগুলি দুইটী পার্থিব দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। একটী বলশালী বৃহৎ মৎস্য যখন মনের স্ফূর্ত্তিতে, নদীর এক কূল হইতে অন্য কূলে সন্তরণ করিয়া

* "কার্য্য-করণ-সংশ্লেষেণ হি কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ, স চ সংশ্লেষঃ সংযোগোঽস্য নাস্তি, যতোঽসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"।—ভাষ্য।

বেড়ায়, সেই সময়ে দুই-তটের অভ্যন্তরবর্ত্তী উত্তাল-তরঙ্গ-মালা যেমন মৎস্যটীকে কোন বাধা দিতে পারে না; উহা অনায়াসে সেই স্রোতো-বেগ অতিক্রম করিয়া উভয় কূলে যথেচ্ছ সঞ্চরণ করিতে পারে; সেইরূপ এই অসঙ্গ আত্মাও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির কোন ক্রিয়াই ইঁহাকে প্রকৃত-পক্ষে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না। এই আকাশ-মণ্ডলে একটী বেগবান্ পক্ষী বহুবার উড়িয়া উড়িয়া, যেমন শ্রান্ত-দেহে, স্বীয় পক্ষ-পুট বিস্তার করিয়া, নীড়াভিমুখে বিশ্রামার্থ ধাবিত হয়; তদ্রূপ এই জীবও, জাগরিত-কালে ও স্বপ্নাবস্থায়, সহস্র সহস্র কর্ম্ম-দ্বারা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, শ্রমাপনোদনার্থ সুষুপ্তাবস্থায় আত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। এ অবস্থায়, সর্ব্ব-কামনা সর্ব্ববিধ বিষয়-ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া যায়।

মহারাজ! আত্মার প্রকৃত নিঃসঙ্গ স্বরূপের কথা বলিলাম। প্রকৃত পক্ষে আত্মা সংসার-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। আত্মার এই সংসার-ধর্ম্ম কেবল উপাধি-জনিত মাত্র। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ যোগেই, ইহাঁর এই সংসার-ধর্ম্ম আরোপিত হয় মাত্র। ইহারই নাম অবিদ্যা। এখন এই অবিদ্যার স্বরূপ আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিব। জীবের দেহে সহস্র সহস্র শিরা-জাল, —শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত বর্ণের বিবিধ সূক্ষ্ম-রসে পরিপূর্ণ * আছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই সকল শিরা-জালকে আশ্রয় করিয়া

* ভুক্ত অন্নাদি হইতেই এই রস উৎপন্ন হয়। এই রস-গুলির বর্ণ,—বাত-বাহুল্যে নীল, পিত্তাধিক্যে পিঙ্গল, শ্লেষ্মাধিক্যে শুক্ল হয়; সুতরাং তদ্-

জীবের লিঙ্গ-শরীর * অবস্থিত আছে। বিষয়-ভোগ-কালে, বিষয়ানুভব-জনিত বাসনা-সকল এই সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়েই থাকে। স্বপ্নাবস্থায়, এই সূক্ষ্ম-শরীরের বাসনাত্মক বৃত্তি-গুলি, জীবের আচরিত কর্ম্ম-প্রভাবে, উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই বাসনা-বশে জীব স্বপ্নে,—'এই আমি গর্ত্তে পড়িয়া গেলাম,' 'এই আমায় হস্তী শুণ্ডাঘাত করিল,'—ইত্যাকার নানাবিধ বাসনা বা ভাব উদিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে তখন কেহ গর্ত্তেও ফেলিয়া দেয় না, হস্তীও শুণ্ডাঘাত করে না; তথাপি জীব ঐ প্রকারের মিথ্যা বাসনাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহাই অবিদ্যা। জাগ্রৎ-কালে যেরূপ অনুভব করিয়াছিল, জীব স্বপ্নেও তদনুরূপ বাসনা করিয়া থাকে। জাগরিত কালে যদি জীব, অপকৃষ্ট বিষয়-বাসনাক্রান্ত হইয়া নিয়ত অপকৃষ্ট কার্য্যাদি করিতে থাকে, তবে তাহারই অনুরূপ অপকৃষ্ট বাসনাই স্বপ্নেও উদ্ভূত হয়। ইহাকে অবিদ্যা বলা যায়। আর যদি জাগরিত-কালে জীব, নিয়ত সর্ব্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-শক্তির ও ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিতে থাকে এবং ক্রমে তাহার সেইরূপ জ্ঞানই পরিপক্ক হয়, তবে স্বপ্নেও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট বাসনাই উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাকে বিদ্যা বলা যায়।

যোগে শিরা-গুলিরও বর্ণ-বিভেদ হয় (সুশ্রুত)। ইংরেজীমতেও, Artery, Veins এবং Nerves গুলির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-বিভেদ আছে।

* পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত, দশ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ—এই সপ্তদশটীকে লিঙ্গ-শরীর বলে।

বিষয়-গুলিকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত ভাবে দেখিলে,—কেবলমাত্র শব্দ-স্পর্শাদি, ধন-জন-গৃহাদিরূপেই অনুভব হইলে, এবং তাদৃশ বিষয়ের জন্য কামনা করিতে থাকিলে এবং সেই কামনা-প্রেরিত হইয়া কর্ম্মাদি করিলে,—জীব ক্রমেই সংসারে নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি বিষয়-দর্শনের পরিবর্ত্তে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব করিতে শিক্ষা করা যায় এবং বিষয়-কামনার স্থলে ব্রহ্ম-কামনা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তবে তাহার আর স্বতন্ত্র ভাবে— ব্রহ্ম-নিরপেক্ষভাবে—বিষয়-দর্শন হয় না। ইহারই নাম বিদ্যা বা সর্ব্বাত্ম-ভাব। আর, ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ-ভাবে বিষয়-দর্শনের নাম অবিদ্যা। বিদ্যা উদিত হইলে, সর্ব্বাত্ম-ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; অবিদ্যার উদয়ে পরিচ্ছিন্নাত্ম-ভাব উপস্থিত হয়। জীবের অবিদ্যাবস্থায়, পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত, ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন বলিয়া, জীব, ধারণা করে। আত্মা হইতে,—ব্রহ্ম হইতে,—যে পদার্থটীকে নিতান্ত ভিন্ন,—স্বতন্ত্র—বলিয়া ধারণা হয়, সে পদার্থটী জীবকে 'মারিতে আসিবে,' 'গর্ত্তে ফেলিয়া দিবে,' 'বশীভূত করিবে,'—ইত্যাকার ভিন্নতা-বোধ হইবেই ত! অবিদ্যার কাণ্ডই এইরূপ!! অবিদ্যা, পদার্থ-মাত্রকে আত্মা হইতে নিতান্ত ভিন্ন-ভাবে, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন-রূপে উপস্থিত করে;—সর্ব্বাত্ম-ভাবের পরিবর্ত্তে, ভিন্নতা-বোধের প্রতিষ্ঠা করায়। ব্রহ্ম-শক্তি হইতে,—নিতান্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র পদার্থান্তররূপে, তখন বিষয়-দর্শন হয়। * সুতরাং তখন সেই

* "বিদ্যয়া শুদ্ধয়া সর্ব্বাত্মা ভবতি। অবিদ্যয়া চ অসর্ব্বো ভবতি,

বস্তুটী পাইবার আশায়, কামনা উদ্রিক্ত হয়। এই কামনা হইতে ক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং ক্রিয়া হইতে তাহার ফল-ভোগ হইতে থাকে। ইহারই নাম সংসার। ইহা অবিদ্যারই খেলা *। বিদ্যা উদিত হইলে, ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে কোন পদার্থকেই ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকে না; পদার্থ-মাত্রই সেই ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ; —ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক; সুখ-দুঃখাদি সেই ব্রহ্মানন্দেরই অভিব্যক্তি; এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারই স্বরূপের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে;—এই ভাবে তখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্ম-ভাব উপস্থিত হয় †। তখন আত্ম-সুখার্থ কোন পদার্থের কামনা উদ্রিক্ত হয় না; তখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মানন্দ-লাভই কামনার লক্ষ্য হইয়া উঠে। এই বিদ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই, অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়া যায়; তখনই মুক্তি উপস্থিত হয়। তখন 'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের গ্রন্থি' ছিন্ন হইয়া যায়। তখন সর্ব্ব-কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে। সুষুপ্তি-সময়ে যেমন কোন বিশেষ কামনা থাকে না, কোন বাসনাত্মক স্বপ্ন-দর্শন ঘটে না;—বিদ্যাবস্থার উদয়েও সেইরূপই

অন্যতঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি, যতো বিভক্তো ভবতি তেন বিরুধ্যতে।...আত্মনোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি।

* "অবিদ্যা—বস্ত্বন্তর-প্রত্যুপস্থাপিকা। অবিদ্যয়া হি দ্বিতীয়ঃ প্রবিভজ্যতে।"

† "ব্রহ্মতত্ত্বাৎ অন্যত্বেন বস্তু ন বিদ্যতে"। "পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মতত্ত্বাৎ অন্যত্বেন নিরূপ্যমানে নাম-রূপে মৃদাদিবিকারবদ্বস্ত্বন্তরে তত্ত্বতো ন স্তঃ"।

হইয়া থাকে। তখন সাংসারিক কর্ম্মাকর্ম্ম তিরোহিত হয়; কেননা তখন ত আর বিষয়ে আত্মাভিমান অর্পণ করিয়া তৎ-প্রাপ্তির আশায়, কেবল আপনার সুখের জন্য, কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে না। তখন ঈশ্বরার্থই সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সকল ভয় তিরোহিত হইয়া যায়।

সুষুপ্তাবস্থায় অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তি বিলীন হওয়ায়, জীবাত্মার তখন স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং তখন সমুদায় বিশেষ-বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। প্রিয়তমা কান্তা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গিত হইলে পুরুষ যেমন, বাহ্য ও আন্তর অন্য সকল প্রকার অনুভূতি-শূন্য হয়; তখন সেই পুরুষ যেমন তদতিরিক্ত পদার্থান্তরের বোধ-শূন্য হয়; তখন যেমন তাহার নিজের অন্তরেরও সুখ-দুঃখাদির বোধ থাকে না,—কেবলমাত্র আলিঙ্গনানন্দই অনুভব করিতে থাকে; সেইরূপ জীবও, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংসর্গের সময়ে স্বীয় প্রকৃত আনন্দময় স্বরূপ হইতে নিজকে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে এবং আপনাকে সুখী, দুঃখী প্রভৃতি বলিয়া অনুভব করিতে থাকে;—কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায়, পরমাত্ম-চৈতন্য দ্বারা গাঢ়ালিঙ্গিত হইলে, সেই ভিন্নতা-বোধ অপগত হয়; তখন ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। ইহাই জীবাত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তি।

এই একাত্ম-ভাব, এই সর্ব্বাত্ম-ভাবই জীবের প্রকৃত স্বাভাবিক স্বরূপ। এ অবস্থায় জীবাত্মা 'আত্মকাম' বা

'আপ্তকাম' হইয়া পড়েন। আত্মা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর জন্য কামনা উদিত হইলেই তাহাকে 'অনাপ্ত-কাম' বলা যায়। জাগরিতাবস্থায়, পদার্থান্তরের ভিন্নতা-বোধ থাকায়, তৎ-প্রাপ্তির আশায় কামনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। স্বপ্নাবস্থাতেও, এইরূপই হয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালে, আত্মা হইতে ভিন্ন-ভাবে, —স্বতন্ত্র-রূপে—কোন পদার্থান্তরের প্রতীতি থাকে না; সুতরাং তখন 'আত্ম-কাম' হইয়া যায় *। এইরূপ, বিদ্যার উদয়েও, কোন বস্তুই ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত নহে,—এতাদৃশ বোধ দৃঢ় হইলে, বস্ত্বন্তরের জন্য—ব্রহ্মাতিরিক্ত-ভাবে পদার্থান্তরের জন্য—কোন কামনা থাকিতে পারে না। সুতরাং কাম্য পদার্থান্তরের বোধ না থাকায় জীব, সর্ব্ব-শোক-শূন্য হইয়া যায়।

'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম' দ্বারা আত্মার যে বিষয়-বোধাদি হইয়া থাকে, তাহা আত্মার একটী আগন্তুক অবস্থা মাত্র; তাহা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে †। স্বাভাবিক স্বরূপাবস্থা-

---

* সুষুপ্তি-সময়ে গূঢ়-ভাবে অবিদ্যা থাকেই। কিন্তু অবিদ্যা থাকিলেও, তাহার অভিব্যক্তি থাকে না বলিয়া, পদার্থান্তরের বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে না। এই জন্যই সুষুপ্তের অবস্থাকে আত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন।

† আগন্তুক বলা হইয়াছে এই জন্য যে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ আছে বলিয়াই ত, শব্দ-স্পর্শাদিরূপে বিষয়ের প্রতীতি হয়; উহারা না থাকিলে বা উহারা অন্য প্রকারের হইলে, বিষয়ের এরূপ শব্দ-স্পর্শাদি-আকার থাকিত না।

প্রাপ্তি ঘটিলে, শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরও ভিন্নতা বোধ থাকে না। কামনাই সকল প্রকার কর্ম্মের হেতু। * এ অবস্থায়, ব্রহ্ম-স্বরূপাতিরিক্তরূপে যখন পদার্থান্তরেরই প্রতীতি থাকে না, তখন সেই পদার্থের প্রাপ্তির নিমিত্ত কামনাও থাকিতে পারে না; সুতরাং তজ্জনিত কর্ম্মও থাকে না। তখন কেবল ব্রহ্মোদ্দেশেই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং তখন কর্ম্মের সম্বন্ধের অতীত হইয়া যাওয়াতে, পিতা, মাতা, দেবতা, চৌর, চণ্ডালাদি কোন সম্বন্ধও প্রতীত হয় না। তখন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তাপস, বানপ্রস্থাদি সমুদয় বর্ণ ও আশ্রম একত্ব-প্রাপ্ত হয়। সমুদয়ই এক ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিকাশেরই পরিচায়ক হইয়া উঠে।

ইষ্ট বিষয়ের প্রার্থনাকে কাম বলা যায়; সেই প্রার্থিত বিষয়টীর লাভ না হইলে তাহাই শোকে পরিণত হয়; কেননা, তখন লোকে, যে বিষয়টী পাওয়া গেল না, তাহার গুণাদির চিন্তা করিতে করিতে, সন্তপ্ত হয়। এই কাম বা শোক,—বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধির আশ্রয়ে অবস্থিত †। যখন প্রকৃত বিদ্যার উদয়ে আত্মার স্ব-স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখন বুদ্ধির সত্ত্ব-গুণ

* "কামশ্চ কর্ম্মহেতুর্বক্ষ্যতি হি 'যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি"।

† "কাম, হৃদয়ে বা বুদ্ধিতেই আশ্রিত থাকে; ইহা আত্মাতে থাকে না। কামকে আত্মাশ্রিত মনে করিলে, কামাপগমে আত্মার বিশুদ্ধির উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। কেননা কামাদি যদি আত্মারই স্বরূপ হয়, তবে স্বরূপের বিচ্যুতি কিরূপে ঘটিবে? বিষয়-বর্গের দোষাদির ভাবনা দ্বারা যে সকল বৈষয়িক-কামনা নিবৃত্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ে বিলীন হইয়া গিয়া

প্রবল হইয়া উঠে ও উহার মালিন্য অপগত হয়। সুতরাং তখন অবিশুদ্ধ, মলিন, বিষয়াকুল বুদ্ধির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া, জীব সমুদয় শোক,—সমুদয় কামের অতীত হইয়া যায়। সুষুপ্তির অবস্থাতেও, বুদ্ধির সমুদয় বিষয়-প্রবণ বৃত্তি লীন হইয়া থাকায়, আত্মা কামাতীত হইয়া যান।

সুষুপ্তির অবস্থায় আত্মার, আত্ম-স্বরূপাতিরিক্ত-রূপে পদার্থান্তরের বোধ না থাকায়, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিজ্ঞান

অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে (অতীত), এবং যে সকল কামনার বীজ এখন হৃদয়ে আছে কিন্তু পরে (ভবিষ্যৎ) প্রবুদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ কামনার ধ্বংসের জন্য চেষ্টা আবশ্যক; বর্ত্তমানে যে সকল কামনা ক্রিয়া করিতেছে, তাহার ধ্বংসের জন্য বিশেষ যত্ন আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে কামকে হৃদয়ের আশ্রিত বলা হইয়াছে। 'হৃদয়াশ্রিত কাম ধ্বংস হয়'—শ্রুতির এই উক্তি দ্বারা আত্মাশ্রিতও যে কতক-গুলি কাম আছে, তাহা বুঝা বা মনে করা উচিত নহে। 'আত্ম-কাম' এই কথাটীও শ্রুতির নানাস্থলে আছে; তদ্দ্বারা কাম যে আত্মাশ্রিত ইহা মনে করিবার কোন আশঙ্কা নাই; কেননা, আত্ম-ব্যতিরেকে কোন পদার্থান্তরের কামনা না করাই, 'আত্মকাম' শব্দের তাৎপর্য্য। কাম,—আত্মার স্বভাব নহে, প্রকাশই আত্মার স্বভাব। স্বপ্নে কামাদি দৃশ্য-বর্গ হইতে, দ্রষ্টা আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। কামকে আত্মার ধর্ম্ম বলিলে, আত্মাকে কামের দ্রষ্টা বলা চলে না। কামনা, সুখ-দুঃখাদি,—অন্তঃকরণের আশ্রয়েই সঞ্জাত হয় এবং সেই অন্তঃকরণের সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, আত্মাকেই সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে মনে হয়। আবার, 'হস্তে বা মাথায় বেদনা বোধ

বিলুপ্ত হইয়া যায়, একথা আপনাকে বলিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না, একথার তাৎপর্য্য কি? রাজন্! মনোযোগ দিয়া আমার কথাগুলি শুনুন, আমি ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতেছি। বিষয়-প্রত্যক্ষ-কালে, জীব কিরূপে দর্শন-শ্রবণাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেইটী বুঝিলে, একথাটাও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, বিষয়-গুলি, ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ অনুভূতি বা ক্রিয়ার উদ্রেক করাইয়া দেয়; অন্তঃকরণ তখন সেই উদ্রিক্ত-ক্রিয়া-গুলিকে, স্বীয় শক্তি দ্বারা সজ্জিত ও গ্রথিত করে।' বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের এইরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-বশতঃ জীবের দর্শন-শ্রবণাদি হইয়া থাকে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া না হইলে, সাক্ষী-রূপে অবস্থিত আত্মার বিষয়-প্রত্যক্ষ হয় না। মহারাজ!

হইতেছে'—এই প্রকারে দেহেরই কোন অবয়বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দুঃখাদির প্রতীতি হয়, কেবল আত্মাতে হয় না। আত্মা বিষয়ী, সুখ-দুঃখাদি উহার বিষয়, সুতরাং সুখ-দুঃখাদি আত্মা হইতে পৃথক্। আবার, দুঃখাদি মনেরই স্পন্দনমাত্র, কিন্তু স্পন্দন,—সাবয়ব পদার্থেরই হইয়া থাকে; নিরবয়ব আত্মার স্পন্দনাদি বিকার সম্ভব নহে। অতএব মনই স্পন্দিত হইয়া আত্মাতে আরোপিত হওয়াতেই আত্মাকেও সুখী দুঃখী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কামনাদি কেহই আত্মাশ্রিত নহে, উহারা বুদ্ধিরই আশ্রিত"—ভাষ্যকার।

এখন বুঝিয়া দেখুন ; সুষুপ্তির অবস্থায় বিষয়-বর্গ থাকে না এবং অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না ; তখন অন্তঃকরণ প্রাণ-শক্তিতে বীজ-ভাবে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং বিশেষ-বিজ্ঞানের হেতু না থাকায়, আত্মার তখন কোন বিশেষ-বিজ্ঞান উদিত হয় না। আত্মা তখন প্রকৃত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তখন বিশেষ-দর্শনের হেতুভূত অবিদ্যার ধ্বংস হইয়া যায়, তখন সুতরাং আত্মার কোন বিশেষ-বিজ্ঞান থাকে না। আত্মার দৃক্-শক্তি বা চৈতন্য-জ্যোতিঃ কদাপি বিলুপ্ত হয় না। আদিত্য যেমন তাহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রকাশাত্মক-জ্যোতিঃ-দ্বারা, বস্তু-প্রকাশ করিয়া থাকেন, আত্মাও তদ্রূপ নিত্য অলুপ্ত-দৃক্-শক্তি বা আত্ম-জ্যোতিঃ-দ্বারা সমুদয় প্রকাশিত করেন। জীবের দর্শন-শক্তির ন্যায়, আত্মার এই নিত্য দৃক্-শক্তি ক্রিয়াত্মক নহে ; এ দৃক্-শক্তিতে ইন্দ্রিয়াদির কোন বিশেষ স্পন্দন বা ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এ দৃক্-শক্তির কদাপি বিলোপ ঘটে না। বিষয়-প্রত্যক্ষকালে, বিশেষ-দর্শনের হেতুভূত অন্তঃকরণ, চক্ষুঃ ও রূপ জাগরিত থাকে বলিয়া—ক্রিয়াশীল হয় বলিয়া—আত্মা তখন বিশেষ বিশেষ পদার্থের দ্রষ্টা, শ্রোতা হইয়া থাকেন। কিন্তু যখন বিদ্যার উদয় হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য এ উভয়ের কোন পার্থক্য-বোধ থাকে না ; তখন সমস্তই একীভূত হইয়া যায়। কেননা, তখন ব্রহ্ম-সত্তা ও ব্রহ্ম-শক্তি ব্যতিরেকে কোন বিশেষ স্বতন্ত্র দ্রষ্টা বা দৃশ্য বা দর্শন-ক্রিয়ার ভিন্নতা-বোধ থাকে না। তখন ইন্দ্রিয় ও বিষয় কাহারই, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্

সত্তা ও ক্রিয়ার বোধ না থাকায়, সমুদয় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব বিশেষ-বিজ্ঞান-শূন্যতাই আত্মার প্রকৃত স্বভাব; তিনি নিত্য, অবিলুপ্ত জ্ঞান-জ্যোতিঃ-স্বরূপ।

অবিদ্যার নিয়মই এই যে, ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত-রূপে পদার্থান্তরের বোধ জন্মায়; এই জন্যই অবিদ্যাবস্থায় পৃথক্, পৃথক্, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে এক একটী পদার্থের জ্ঞান হয়। অবিদ্যা নষ্ট হইয়া গেলে, এই ভিন্নতা-বোধ থাকে না। তখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হইতে থাকে; তখন অদ্বৈত-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান দ্বারা, আত্মা যে নিত্য-জ্ঞান-স্বরূপ তাহা অনুমিত হয়। আবার, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণাদি বিবিধ শক্তি দ্বারা, আত্মা যে নিত্য শক্তি-স্বরূপ তাহা অনুমিত হয়। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-গুলিই,—তাঁহার স্বরূপের পরিচায়ক লিঙ্গ বা চিহ্ন-স্বরূপে নানা আকারে বিদ্যমান আছে। তাহাই, ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা *। এ বিশ্ব বিবিধ প্রকারে তাঁহারই নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-শক্তিকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছে †। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানে,—সেই একই জ্ঞান প্রকাশিত। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায়,—সেই একই

* "কার্য্যেণ হি লিঙ্গেন (পরিচায়ক-চিহ্নেন) কারণ-ব্রহ্ম জ্ঞানার্থকত্বং সৃষ্টিশ্রুতীনাম্"। "কার্য্য-কারণ-সতত্ত্বাবধারণ-দ্বারেণ হি সত্যস্য সত্যং ব্রহ্ম অবধার্য্যতে"।

† "চক্ষুরাদিব্যাপারদ্বারানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মনঃ যে বিদুঃ" ইত্যাদি।—ভাষ্যকার।

মহা-শক্তি প্রকাশিত। অতি নির্ম্মল স্ফটিক যেমন হরিত-নীল-লোহিতাদি-বর্ণ-সংযোগে, নিজেও হরিতাদি আকার প্রাপ্ত হয়; স্ফটিকের স্বচ্ছতা-নিবন্ধনই যেমন ইহার ঐ সকল হরিতাদিভেদ কল্পিত হয়;—উহার স্বচ্ছ-প্রকৃতিটীকে বাদ দিয়া যেমন হরিতাদি-ভেদ কল্পিত হইতে পারে না; তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘন-স্বভাব আত্ম-চৈতন্যের নানাবিধ উপাধি-ভেদে দর্শন-ঘ্রাণাদি-ভেদ সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার জ্ঞানাত্মক ও শক্ত্যাত্মক স্বরূপকে বাদ দিয়া দর্শনাদি ভেদ কল্পিত হইতে পারে না *। চক্ষুরাদি দ্বার-যোগে পরিণত বুদ্ধি-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্য,—দৃষ্টি-শক্তি নামে কথিত হয়। ঘ্রাণাদি শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা। আদিত্য-জ্যোতিঃ,—প্রকাশ্য পদার্থের ভেদে যেমন (লোহিতাদি বর্ণময় কাচের মধ্য-দিয়া পড়িলে), নিজেও তত্তৎরূপে প্রতীয়মান হয়; যেমন আদিত্য-জ্যোতির হরিত-লোহিত-ভেদ সেই জ্যোতিঃ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না; উহার প্রকাশাত্মক-জ্যোতি-নিবন্ধনই যেমন হরিতাদি-ভেদ সংসাধিত হয়; তদ্রূপ এই চৈতন্য-জ্যোতিরও,—উপাধি-ভেদেই ভেদ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এই উপাধিকৃত ভেদ তাঁহার স্বরূপ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আকাশকে যে লোকে 'সর্ব্বগত' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্ব-পদার্থে

* প্রিয় পাঠক, শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিবেন। "নচাত্র স্বচ্ছস্বাভাব্যব্যতিরেকেণ হরিত-নীল-লোহিতাদিলক্ষণা ধর্ম্মভেদাঃ স্ফটিকস্য কল্পয়িতুং শক্যন্তে। তথা চক্ষুরাদিভেদসংযোগাৎ প্রজ্ঞানঘন-স্বভাবস্যৈব দৃষ্ট্যাদি-শক্তিভেদ উপলক্ষ্যতে"।

অনুগত উহারই সত্তা-নিবন্ধন। অতএব, এক চৈতন্যই নানাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে; ঐ সকল পদার্থ-ভেদেই চৈতন্যের ভেদ কল্পিত হয়; নতুবা চৈতন্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই *। এই জন্যই, এই বিবিধ-ভেদ-গুলি, চৈতন্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই জন্যই, আত্ম-চৈতন্যে যে দর্শন-শ্রবণাদি-শক্তিরূপ বিবিধ ধর্ম্ম কল্পিত হইয়া থাকে, সেই এক চৈতন্য-শক্তি ব্যতিরেকে দর্শনাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব, এক জ্ঞানই নানা-বিজ্ঞানাকারে অভিব্যক্ত এবং এক মহা-শক্তিই নানাবিধ ক্রিয়াকারে অভিব্যক্ত। এই বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি;—সেই মহা-জ্ঞান ও মহাশক্তি-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র নহে। মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও বিশেষতঃ সুষুপ্তির অবস্থা অবলম্বন করিয়া, আত্ম-চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। এখন আমি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আত্মার পরলোক-গতি

---

* এস্থলে শঙ্করাচার্য্য আর একটী বড় চমৎকার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা এই টীকাতেই উল্লেখ করিতেছি। "ঘনীভূত গন্ধই স্থূল পৃথিবী। এই ঘনীভূত পৃথিবীর পরম-সূক্ষ্ম অবয়বই পার্থিব পরমাণু; সুতরাং এই পরমাণু,—গন্ধ-স্বরূপ। গন্ধ ইহার ধর্ম্ম হইতে পারে না; কেন না, ইহা গন্ধ-স্বরূপই। যাহা গন্ধ-স্বরূপ, এক, তাহার গন্ধ 'গুণ' আছে ইহা বলা অসঙ্গত। তবে যে এই গন্ধাত্মক পরমাণুর গন্ধবত্ব ধর্ম্ম কল্পিত হয়, তাহা বিবিধ উপাধি সংসর্গেই। এইরূপ, ইহার যে রসাদি গুণ কল্পিত হয়, তাহাও জলাদি-উপাধি-সংসর্গেরই ফল"।

অবলম্বন করিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপের কথা বুঝাইব। কিন্তু অদ্য যাহা শুনিলেন, তাহাই হৃদয়ে ধারণা করুন। কল্য জীবের পরলোক গমনের তত্ত্ব বলিব"।
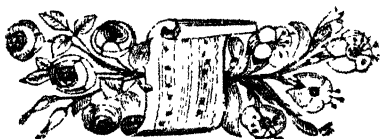
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।)

পঞ্চম দিবস।

পরদিন, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজ! সে দিন আপনাকে বলিয়াছি যে আত্মা স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, আত্মার স্বরূপাবস্থা-লাভ ঘটে। তখন আত্মা স্বীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই অবস্থা-প্রাপ্তিই পরম-লাভ, পরম গতি ও পরম সম্পদ। ইহা লাভ করিলেই পরম আনন্দ পাওয়া যায়। বিষয়-সুখ, এই মহানন্দেরই ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীব বিষয়-ভোগকালে, সেই বিশাল আনন্দ-স্বরূপের কণামাত্র আস্বাদন করিয়া থাকে। মনুষ্যের বিষয়-সুখের ক্রমশঃ প্রসারণ করিয়া দিয়া যেখানে সংখ্যা-গণনার শেষ হয়,—যেখানে আনন্দের আর ইয়ত্তা করিতে

পারা যায় না,—ইহা সেই আনন্দ *। এই মহানন্দের তুলনা আর কোথাও নাই। ইহাই আত্মার স্বরূপাবস্থা।

মহারাজ! এখন আমি আপনাকে জীবের এই দেহ-ত্যাগের পর, পর-লোকে দেহান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইব।

কাল-বশে জীবের দেহটী যখন জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে ও মরণকাল সমীপবর্ত্তী হয়, তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। জীবের কর্ম্ম-শেষ নিবন্ধন, এই প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তির জন্য, এই প্রাণই জীবকে দেহান্তর-গ্রহণার্থ লইয়া যায়। দেহের আশ্রয় ব্যতীত জীব, স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারে না; প্রাণ-শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া দেহ ও দেহাবয়ব-গুলি গড়াইয়া না দিলে, জীব কিরূপে কর্ম্ম-ফলভোগ করিবে? এই জন্য প্রাণ-শক্তিই, জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ যথাযোগ্য স্থানে জীবকে লইয়া যায় এবং দেহাদি রচনা করিয়া দেয়। যেমন কোন নরপতি নগর-দর্শনার্থ বহির্গত হইবার প্রাক্কালে, কর্ম্মচারী, সূত, পরিচারক ও অন্যান্য অনুচর-বর্গ পূর্ব্ব হইতেই সেই নগরে উপস্থিত হইয়া,

---

* এই স্থলে শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন লোক-বাসী ভিন্ন ভিন্ন জীবের আনন্দের তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-লোকের আনন্দকেই চরমানন্দ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। "আনন্দমাত্রাবয়বদ্বারেণ মাত্রিণং পরমানন্দমধিজিগমিষন্নাহ"।—ভাষ্য। "যত্রগণিতভেদো নিবর্ত্ততে অন্য-দর্শন-শ্রবণ-মননাভাবাৎ তং পরমানন্দং বিবক্ষন্নাহ"।

নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পুষ্প-মাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবেশ-পথে সুদৃশ্য তোরণাদি-নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ, তাহার ইন্দ্রিয়াদি-শক্তিও যথাযোগ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।

মরণ-কালে, আদিত্যাদির জ্যোতিঃ আর চক্ষুরাদি—ইন্দ্রিয়-বর্গের উপরে স্ব স্ব ক্রিয়া করে না। তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি স্ব স্ব স্থান হইতে উপসংহৃত হইয়া হৃদয়ে একীভূত হইয়া যায়। এই সময়েই জীবের রূপাদি-বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপে করণ-বর্গ অঙ্গ-সকল হইতে উপসংহৃত হইয়া যখন অন্তঃকরণে একীভূত হইয়া যায়, তখন সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ-বিজ্ঞান, তিরোহিত হইয়া যায় এবং জীবও মুগ্ধবৎ অবস্থান করে *। তখন অন্তঃকরণের বাসনাময় বৃত্তি-গুলিও প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। আত্ম-জ্যোতিঃ তখন এই প্রাণ-শক্তিকে বিদ্যোতিত —আলোকিত করিতে থাকেন। জীব এতদিন যেরূপ কর্ম্মের আচরণ করিয়াছে, যে ভাবে বিষয়ানুভব করিয়াছে এবং যে প্রকার কামনা-বশে বিষয়-ভোগ করিয়াছে ; তদনুরূপ প্রজ্ঞা, কর্ম্ম ও বাসনার সংস্কার, এই প্রাণ-শক্তিতে ঈষৎ অস্ফুট-রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এই সংস্কার-বলেই জীব উৎক্রান্ত হয় এবং তদনু-

* আধিদৈবিক সূর্য্য-জ্যোতিঃ ও অগ্নি প্রভৃতি যখন চক্ষুঃ, বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গের উপরে ক্রিয়া করে না, তখন বাহ্য রূপাদি-দর্শন আর থাকে না ;—তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি অন্তঃকরণে উপসংহৃত হইয়া যায়। অন্তঃ-করণেরও বৃত্তি গুলি পরে প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

রূপ স্থানে নীত হয় *। তথায় যে সকল ভূতোপাদান আছে, সেই সকল উপাদানের আশ্রয়ে করণ-বর্গের বৃত্তি লাভ হইতে থাকে। এইরূপে, সংস্কার-বশে সূক্ষ্ম-শরীরের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, সেই সকল বাহ্য উপাদানও স্থূল দেহাকারে পরিণত হইতে থাকে। এই ভাবে স্থূল-দেহের সহিত ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, সূর্য্যাদি দেবতারাও পুনরায় সেই সকল অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের উপরে স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং জীবেরও বিষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এইরূপে, পিতৃ-লোকে, গন্ধর্ব্ব-লোকে, প্রজাপতি-লোকে, ব্রহ্ম-লোকে বা অন্যান্য ভূতাত্মক-লোকে, জীবের, আত্ম-সংস্কারাদির অনুসারে জন্ম-পরিগ্রহ হইয়া থাকে।

আত্মা নিরবয়ব ও নিঃসঙ্গ। ইনি সর্ব্ব-জ্ঞান, সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপ। কোন বিশেষ বিজ্ঞান বা বিশেষ ক্রিয়ার সহিত ইহাঁর প্রকৃত-পক্ষে সম্পর্ক নাই। ইহারা ইহাঁর স্বরূপ-প্রকাশের দ্বার মাত্র; সুতরাং ইহারা আত্মার উপাধি। এই সকল উপাধি-সংসর্গে তাঁহাকে তত্তদুপাধিবিশিষ্ট বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়। জীবের উৎক্রমণকালে প্রাণ-শক্তিরূপ উপাধি-যোগেই * জীবাত্মার উৎ-

---

* তখন প্রাণ-শক্তিই আত্মার উপাধিরূপে,—বিষয়-রূপে—বর্ত্তমান থাকে। মরণ-সময়ে ভাবিদেহ-গ্রহণাত্মক বাসনা সকল ঈষৎ অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আত্ম-জ্যোতিঃ এই অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করে। ইহারই নাম "হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন"। আত্মার নিজের কোন গমনাগমন থাকিতে পারে না, প্রাণ-শক্তির যোগেই আত্মার গতি সিদ্ধ হয়।

ক্রমণ সিদ্ধ হয়; আবার যখন কোন বিশেষ-দেশে সেই প্রাণ-শক্তির* অভিব্যক্তি (পূর্ব্ব-বাসনানুরূপ) হইতে থাকে, তখন সেই সকল অভিব্যক্ত উপাধি-যোগেই আত্মাকেও সেই সেই উপাধি-বিশিষ্টরূপে মনে হয়। তখন প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অভিব্যক্তি হইলে, তাঁহাকেও প্রাণ-ময়, মনো-ময় ও বিজ্ঞান-ময় বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। রূপ-দর্শনকালে চক্ষুর্ময়, গন্ধগ্রহণ কালে ঘ্রাণময়—ইত্যাদি প্রকারে ইন্দ্রিয়-বর্গের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সময়ে, তত্তদাকারে আকারিত হইয়া পড়ে। এইরূপে, স্থূলদেহের অভিব্যক্তিতে আত্মাকে ভূতময়—দেহময়,—বলিয়া মনে হইতে থাকে। এইরূপে, আত্মা যখন স্বতন্ত্ররূপে (ব্রহ্মাতিরিক্ত-ভাবে) ভিন্ন ভিন্ন পদার্থান্তর দেখিতে থাকেন, তখন তজ্জন্য কামনা উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কাম-ময়; সেই কাম্য-বস্তুর প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলে তাহাই ক্রোধাকারে পরিণত হয় এবং তদ্‌যোগে আত্মাকেও ক্রোধময় বলিয়া মনে হয়। বিষয়-দোষ-দর্শনে এই কামাদি শান্ত হইলে, আবার তাঁহাকে তদ্‌যোগে, অকামময়, অক্রোধময়, শান্ত, কলুষ-রহিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। এইরূপে, এই সকল কামনাদির বশে চালিত

* এই প্রাণ-শক্তিতেই তখন অন্তঃকরণের যাবতীয় সংস্কার লীন থাকে। তখন অন্তঃকরণের ভাবি-দেহগ্রহণাত্মক সংস্কার-সমূহ অস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত থাকে বলিয়া, জীবাত্মার তৎকালে কোন স্বাধীনতা থাকে না। এই সংস্কার-সমূহের অধীনতা-শৃঙ্খল কাটাইবার উদ্দেশ্যে, এই জন্যই, সাধনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

হইয়া যিনি যেরূপ আচরণ করেন, তাঁহাকে তদনুরূপ কর্ম্মকারী বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এ প্রকার কামনা না থাকিলে, বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইলে, বিষয়ে ব্রহ্ম-স্বরূপানুভব হইতে থাকিলে—আর সেই প্রকারের কর্ম্মগুলি ফল উৎপাদন করিতে পারে না; তখন আর কর্ম্মগুলি কোনরূপ বন্ধনের কারণ বা হেতু হইতে পারে না। বিষয়-কামনা থাকিলেই সংসারের নিবৃত্তি হয় না; বিষয়-কামনা তাহার ফল-ভোগ করাইবার জন্য, জীবকে এ লোক হইতে লোকান্তরে এবং সে লোক হইতে মর্ত্ত্য-লোকে পুনঃপুনঃ লইয়া বেড়ায়। কিন্তু যাঁহার, বিশেষ কোন কামনার বস্তু না থাকায় কেবলমাত্র আত্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কামনা হইতে থাকে, তাদৃশ ব্যক্তি আপ্ত-কাম হইয়া যান *। পদার্থান্তর-বোধের পরিবর্ত্তে, যাঁহার সমুদয় পদার্থে ব্রহ্ম স্বরূপানুভব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাঁহার পক্ষে আত্মা-ব্যতিরিকে কোন স্বতন্ত্র পদার্থান্তরের কামনা থাকিতে পারে না। পদার্থান্তররূপে বস্তুর বোধ থাকিলে তবে ত সেই পদার্থান্তরের জন্য অভিলাষ উদ্রিক্ত হয় †।

আত্ম-কাম ব্রহ্ম-বিদের চক্ষে বস্তুর সেরূপ কোন স্বতন্ত্রতা-বোধ থাকে না। সুতরাং সে ব্যক্তি কোন বিশেষ পদার্থ-প্রাপ্তির

* "আত্মকামত্বেন আত্মৈব, নান্যঃ কাময়িতব্যঃ বস্ত্বন্তরভূত-পদার্থো ভবতি"।

† "জ্ঞায়মানো হি অন্যত্বেন পদার্থঃ কাময়িতব্যো ভবতি; ন চাসাবস্তো ব্রহ্মবিদ আত্মকামস্যাস্তি"।

উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিবেন কিরূপে? ভিন্নতা-বোধ না থাকায়, তিনি কোন বিষয়ের প্রাপ্তি-কামনাও করেন না, তৎ-পরিহারও ইচ্ছা করেন না। কর্ম্মাভাব বশতঃ, বিষয়-ভোগ-বাসনা না থাকায়, এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর পর কোন লোকান্তরে গিয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন না। তিনি মুক্ত হইয়া যান। তখন তাঁহার 'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের গ্রন্থি' ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব বিষয়-কামনাই বন্ধের কারণ; আত্ম-কামনাই মুক্তির হেতু। অজ্ঞানতার জন্যই, এই বিষয়-কামনা; সুতরাং অবিদ্যাই বন্ধের হেতু। জ্ঞান জন্মিলেই, পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে আত্ম-কাম হইয়া যায়; সুতরাং বিদ্যাই মুক্তির হেতু। ইহ-জন্মেই এই বিদ্যালাভ করিতে পারা যায়। ইহ-জীবনে এই বিদ্যা লব্ধ হইলে, আর দেহে অভিমান অর্পিত হয় না। তখন তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও, দেহের সুখের জন্য কোন কামনা করেন না; সর্ব্বত্রই ব্রহ্মাত্ম-দর্শন হইতে থাকে; সুতরাং তাঁহাকে তখন অশরীরী বলা যায় *।

ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা,—ইহাই মুক্তি-মার্গ। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ বলিয়াছেন—এই মুক্তি-মার্গ অতি সূক্ষ্ম, অথচ মহা বিস্তৃত; ইহা চিরন্তন কাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞ-গণের বিদিত। ব্রহ্ম-বিদেরা ঐই মার্গ অবলম্বনে, ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হন। এই পথ

* "অস্মিন্নেব শরীরে বর্ত্তমানো মোক্ষং প্রতিপদ্যতে" ভাষ্য।

অবলম্বনে, এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে, ব্রহ্মজ্ঞ-গণের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয় *।

যে সকল ব্যক্তি কেবল মাত্র সংসারে আচ্ছন্ন ও বিষয়-মদে মত্ত হইয়া কেবল আপনার সুখার্থ বিষয়-কামনায় দিবারাত্র রত থাকে,—তাহারা দেহান্তে, সূর্য্যালোক-

---

* শ্রুতিতে ও বেদান্ত-দর্শনে, সাধকের জ্ঞানের তারতম্যানুসারে ব্রহ্ম-বিদ্যারও শ্রেণী-বিভাগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রধানতঃ তিন প্রকার। (১) অহং গ্রহোপাসনা (২) প্রতীকোপাসনা (৩) কর্ম্মাঙ্গোপাসনা। অবতরণিকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। যিনি নিজের অন্তরে (বুদ্ধি-গুহায়) এবং সর্ব্ব-পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মানুধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী। আর যাঁহারা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞে ব্রহ্মের ভাবনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক বাহিরে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া, অন্তরে জ্ঞান-যোগে যজ্ঞের সম্পাদন করেন। ইঁহাদের জ্ঞান এবং ভাবনার পরিপাকের তারতম্যানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে,—নানাবিধ দেব-লোকে এবং ব্রহ্ম-লোক-পর্য্যন্ত লোকে, ক্রমে গতি হয়। কিন্তু ইঁহারা সকলেই 'দেবযান' পথ দিয়া গমন করেন। কেবল-কর্ম্মীর ন্যায় ইঁহাদের 'পিতৃযান' মার্গ দ্বারা গতি হয় না। যাঁহাদের সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বাত্ম-ভাব পরিপক্ক হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কোন লোকেই গতি হয় না। তাঁহারা মৃত্যুর পরে ব্রহ্ম-ভূত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই কারণেই এই স্থলের শ্রুতিতে "ব্রহ্মবিৎ" "পুণ্যকৃৎ" ও "তৈজস" (দহর-বিদ্যোপাসক)—এই তিন শ্রেণীর কথা একসঙ্গে বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু

বিহীন, তমসাচ্ছন্ন লোকে চলিয়া যায়। আর, যাহারা নিজেরই ইহ-লৌকিক সুখ-কামনায়, বা পুত্র-বিত্তাদি লাভের আশায়, কিংবা যশ ও সম্মান ক্রয় করিবার জন্য মহা-আড়ম্বরে, বহু-জীবকে কষ্ট দিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা তদপেক্ষাও অন্ধকারাবৃত লোকে গমন করে। * ইহারা ব্রহ্ম-বিদ্যার কিছুমাত্র সংবাদ রাখে না বলিয়া, ঐ সকল লোকে নানা দুর্গতি ও ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে।

যে সকল সৌভাগ্যশালী জীব, সর্ব্ব-ভূতস্থ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মার স্বরূপানুভব করিতে পারিয়াছেন. তাঁহার

শ্রুতির এই শ্লোক-গুলিকে একেবারে পরিপক্ক অদ্বৈত-জ্ঞানীর পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* সংসারাচ্ছন্ন, বিষয়-মত্ত, ইহ-লোক-সর্ব্বস্ব অজ্ঞানীকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম-মার্গ দেখাইবার উদ্দেশ্যে, প্রথমতঃ দেবতার উদ্দেশ্যে ও স্বর্গ-সুখ-লাভার্থ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ আছে। পরে, দেবতা ও স্বর্গের নিন্দাবাদ (ইহাদিগের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই—এই ভাবে) করিয়া, ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ও ব্রহ্ম-লোকলাভার্থ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান (নিষ্কামভাবে) কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই কোন কোন শ্রুতিতে বিদ্যা ও অবিদ্যাকে একত্র করিয়া লইতে বলা হইয়াছে এবং "বিদ্যা ও অবিদ্যার" পৃথক্ অনুষ্ঠান নিন্দিত হইয়াছে। তৎপরে, ক্রমে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে ভাবনাময় যজ্ঞের উপদেশ এবং অবশেষে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতির ব্যবস্থা ও উপদেশ দেওয়া আছে। [বিদ্যা = দেবতা-জ্ঞান ; অবিদ্যা = দেবতা-জ্ঞান-হীন কেবল কর্ম্ম]

আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের বোধ না থাকায়, তিনি আর কোন্ পদার্থের প্রাপ্তির আশায় অভিলাষী হইয়া চিত্তের অসন্তোষ উৎপাদন করিবেন?

নানা অনর্থকর শরীর-গহনে প্রবিষ্ট আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন যে এই আত্মা বিশ্বের কর্ত্তা, সকলের আত্মা, অদ্বিতীয় এবং এক।

অজ্ঞান-নিদ্রাচ্ছন্ন জীব-সমূহ যদি ইহলোকেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তবে সে জন্ম-জরা-মরণ-ক্লেশ পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতে থাকে। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃত হইয়া যান; তাঁহাকে না জানিতে পারিলে, শোক-দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

সমুদয় প্রাণীর কর্ম্ম-ফলের নিয়ন্তা সেই জ্যোতির্ম্ময় আত্ম-পদার্থের যিনি সাক্ষাৎ-লাভ করিতে পারেন, তাঁহার ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়; সুতরাং তিনি কোন পদার্থ হইতেই ভয় পান না।

তাঁহার দ্বারাই আহোরাত্রাত্মক কাল,—পরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে। আদিত্যাদির জ্যোতিঃ তাঁহার প্রকাশেই প্রকাশিত হইতেছে। এই জ্যোতিঃ অমৃত; দেবতারা এই জ্যোতির উপাসনা করিয়া থাকেন।

তিনি সকলের কারণ। তাঁহাতে গন্ধর্ব্বাদি পঞ্চ-লোক * এবং অব্যাকৃত মূল-শক্তি,—ওত-প্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে।

* গন্ধর্ব্ব-লোক, পিতৃ-লোক, দেব-লোক, অসুর-লোক, রাক্ষস-লোক।

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত। তাঁহাকে জানিতে পারিলে অমর হওয়া যায়।

আত্ম-শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই,—প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। চক্ষুরাদির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দ্বারাই তাঁহার শক্তি অনুমিত হয় *। এই জন্য, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মন, বলা যায়। সংস্কৃত-চিত্ত দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় †। কেন না, বিশুদ্ধ চিত্তে কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-ভাবে বোধ থাকে না। ব্রহ্মে যিনি ভেদ-কল্পনা করেন, তিনি ভ্রান্ত। অবিদ্যাই, এই ভিন্নতা-বোধের হেতু।

ইনি নিয়ত একরূপ; সর্ব্ব-বিক্রিয়া-শূন্য। ইনি অপ্রমেয়, ধ্রুব, নিত্য। আত্মাকে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় না; কেবল শ্রুতির প্রমাণেই ইহাঁকে জানা যায়। ইহাঁ হইতে পদার্থের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা আছে—এই বোধ নিবৃত্ত হইলেই, আত্মা বিজ্ঞাত হন। ইনি বিশ্বের কারণী-ভূত অব্যাকৃত-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র।

মহারাজ! এখন তবে জীবাত্মার—বিজ্ঞানময় আত্মার—প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মই এই আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। স্বরূপতঃ জীবাত্মা,—ব্রহ্ম-

* ব্রহ্মশক্ত্যধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদিসামর্থ্যং। ..চক্ষুরাদি-ব্যাপারদ্বারানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানং যে বিদুঃ”—ইত্যাদি ভাষ্য দেখ।

† “মনসৈব পরমার্থজ্ঞান-সংস্কৃতেন...অনুদ্রষ্টব্যম্”।—ভাষ্যকার।

চৈতন্যই। ইনি সকল হইতে স্বতন্ত্র, অথচ সকলের নিয়ন্তা,—প্রভু। ইনি স্বাধীন, কাহারই পরতন্ত্র নহেন *। ইনি সকলের অধীশ্বর, ইঁহারই অধিষ্ঠানে থাকিয়া সকল পদার্থ স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। অনাত্ম-বিষয়ক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের জন্য শম-দমাদি ও আত্ম-ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিবে †। এই অন্তর্জ্যোতিঃ বিজ্ঞান-ময় পুরুষ, সাধু বা অসাধু কোন কর্ম্ম দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে সম্বদ্ধ হন না ; কেন না কর্ম্ম-মাত্রই ইহাঁরই শক্তি-দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়।

ইনি সকল-ভূতের অধিপতি, পালক, নিয়ন্তা। ইনি পৃথিব্যাদি লোকের আশ্রয়-সেতু স্বরূপ। এই ভাবে যিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিতে পারেন, তিনিও স্বতন্ত্র ‡ এবং সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন। কাম্য-কর্ম্ম ব্যতিরেকে, অন্যান্য নিত্য-কর্ম্মাদি,—এই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। নিত্য উপনিষদাদির অধ্যয়ন দ্বারা, ইঁহাকেই সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের ব্যক্তি জানিতে

---

* জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ স্বাধীন (Free), এই সুস্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও,—সুপণ্ডিত Paul Deussen তাঁহার "Philosophy of the Upanisads" নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—"The standpoint of the Upanisads is rigid *Determinism*". এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা ভ্রান্ত। 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে' দেখ।

† শমপ্রধানানামমানিত্বাদীনাং মানসানাঞ্চ ধ্যানজ্ঞানবৈরাগ্যাদীনাং সন্নিপত্যোপকারকত্বং"—ভাষ্য।

‡ স্বতন্ত্র—*i. e.* Free.

ইচ্ছা করেন। নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ চিত্তে অনায়াসে ব্রহ্ম-জ্ঞান উদিত হয়। দান, তপশ্চর্য্যা, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-সেবা এবং দ্রব্য-যজ্ঞ ও জ্ঞান-যজ্ঞ এই উভয় প্রকারের যজ্ঞানুষ্ঠান,—এই সকল কর্ম্ম যদি কামনা-বর্জ্জন করিয়া অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তদ্দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছা উৎপন্ন হইলেই আর ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলেই মুনি হইতে পারা যায়,—জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত দেবতাদিগকে জানিলে, মুনি হইতে পারা যায় না; কর্ম্মী হইতে পারা যায়। কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মুনি হইতে পারা যায়। অতএব এইরূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবে। এই আত্ম-লোক-কামনায়, মোক্ষ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, সাধক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন *।

---

* এই স্থলের শঙ্কর-ভাষ্যে কর্ম্ম-সম্বন্ধে অন্য যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহার মর্ম্ম এই টীকাতেই উল্লেখ করিলাম। অবিদ্যাবস্থায়, লোকে কোন এক কামনা-প্রেরিত হইয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকে। পুত্র, বিত্ত এবং স্বর্গ-লোকাদি প্রাপ্তির কামনাতেই লোকে যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। এই সকল কামনাই যে সকল কর্ম্মের লক্ষ্য, সে সকল কর্ম্ম দ্বারা, তৎ-প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, এই সকল পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদিলোক-কামী ব্যক্তির তত্তৎ-প্রাপ্তি-সাধন কর্ম্মেই অধিকার। ইহারাই কর্ম্মী। কিন্তু যাঁহারা মুক্তির অভিলাষী, যাঁহাদের ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরই কামনা,—তাঁহাদের কাজেই সেরূপ কাম্য-যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোন অধিকার

এই নিমিত্তই, পূর্ব্বতন বিদ্বানেরা—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা—পুত্র-বিত্ত ও বাহ্য-লোকত্রয় প্রাপ্তির কামনা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তির কামনাতেই রত থাকিতেন। ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র-ভাবে পদার্থান্তরের বোধ তাঁহাদের না থাকায়,

---

নাই। ইঁহারা নিত্য-কর্ম্মের অধিকারী। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞও,—যখন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহাকে আর কাম্য কর্ম্ম বলা যায় না; তাহাও নিত্য-কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; কেন না, তখন পুত্রাদি বা স্বর্গাদি বা দেবতাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ত সেরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না। এই রূপ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ব্যতীত, ভাবনাত্মক যজ্ঞেও কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনাই থাকে। সুতরাং কাম্য-কর্ম্ম ছাড়া, বেদোক্ত নিত্য-কর্ম্ম, আত্ম-জ্ঞানোৎপত্তির দ্বার। সুতরাং মুমুক্ষুব্যক্তি নিত্য-কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ায় কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপের ভাবনা ও মনন হইতে থাকে বলিয়া, সে সাধকের সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগ হইয়া যায়। মূলে "প্রব্রজ্যা" শব্দটী যে আছে, এই প্রকার কর্ম্ম-ত্যাগই তাহার অর্থ। যাহারা বিত্ত-স্বর্গাদি-কামনায় যজ্ঞাদি-কর্ম্মরত, তাহাদের এরূপ প্রব্রজ্যায়, কাজেই, অধিকার নাই। অবিদ্যা-বশতঃই আত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তির কামনা ও তৎসাধক কর্ম্ম লোকে করে না। সর্ব্ববিধ এষণা-ত্যাগই (পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদি-কামনা-ত্যাগই) আত্ম-প্রাপ্তির সাধন। সর্ব্ববিধ এষণা-ত্যাগই,—সর্ব্ব-কর্ম্ম-নিবৃত্তি; ইহাই "পারিব্রাজ্য"। "আত্ম-লোকার্থিনঃ সর্ব্বৈষণানিবৃত্তিঃ পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মবিদো বিধীয়তে"। শঙ্করাচার্য্যের এই তাৎপর্য্য ভুলিয়া, লোকে মনে করে, বুঝি শঙ্কর ব্রহ্ম-জ্ঞানীর পক্ষে' প্রকৃতই কর্ম্ম-ত্যাগ করতঃ, 'জড়-ভরতবৎ' বসিয়া থাকিবে,—এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক ব্রহ্ম-কামনা ও ব্রহ্ম-সাধন ব্যতীত, অন্য কোন কামনা ও সাধন থাকিতে পারে না। তখন সকল কামনা ও সকল কর্ম্ম,—ব্রহ্ম-কামনা ও ব্রহ্মার্থ কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

এইরূপ ভাবনা,—সর্ব্ব-পদার্থে ও সর্ব্ব-কর্ম্মে এইরূপে ব্রহ্ম-দর্শন,—অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া অদ্বৈত-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর ব্রহ্মার্থ কর্ম্ম এবং কামনাও থাকে না। তখন সকলই ব্রহ্ম-ভূত হয় এবং সাধকের মুক্তি হয়। সকল কর্ম্ম তখন জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

এই আত্মা কাহারও গ্রাহ্য বা কাহারও সহিত লিপ্ত নহেন। এই আত্মার ক্ষয়োদয় নাই; এই আত্মা অসঙ্গ ও ভয়-শোক-শূন্য। এই আত্মার মহিমা ও স্বরূপের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনও ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কোনপ্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেন না। তখন সাধক, বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে উপশান্ত হইয়া, অন্তঃকরণের বিষয়-তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া,* পুত্র-বিত্তাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ করেন; তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের বাহ্য-বিষয়-নিবন্ধন স্পন্দন তিরোহিত হয় এবং সেগুলি তখন ব্রহ্মে একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার

* বাহ্য ও আন্তর যে সকল ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহার ত্যাগ অসম্ভব। কেবল যে সকল ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা ব্রহ্মার্থেই কর্ত্তব্য। নিদ্রালস্যাদি যে সকল কর্ম্মে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই—সে গুলির কিন্তু নিবৃত্তি বিধেয়।—আনন্দগিরি।

দেহাভ্যন্তরে বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ আত্মার দর্শন-লাভ ঘটে; সর্ব্বত্র তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব করেন। এইরূপেই ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান লাভ করিবে।

হে রাজন্! এইরূপে, মুখ্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিলে, সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান; কোন পাপ আর ইহাঁর তাপ জন্মাইতে পারে না; কেননা তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-ভাব —আত্ম-দর্শন—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই তখন, সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনরূপ বহ্নি দ্বারা পাপ, তাপ ধ্বংসীভূত করেন। তাঁহার সকল কামনা অপগত হয়; সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই আত্ম-লোক,—ইহাই সর্ব্বাত্ম-বোধ।

মহারাজ! আমাদের উভয়ের মধ্যে এই পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত কথোপকথনে আত্মার প্রকৃত যে স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইল, সেই জ্ঞান-স্বরূপ, অলুপ্তশক্তি-স্বরূপ ও পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাই,— প্রাণি-বর্গের ফলদাতা, জন্ম-রহিত, সর্ব্ব-ভূতের অন্তরস্থ। যিনি ইহাঁর নিয়ত ধ্যান করেন, এবং সর্ব্ব-পদার্থের নিয়ন্তারূপে, ভাবনা করেন, তাঁহার পরম কল্যাণ হয়। /এই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্ব-প্রকার বিকারাতীত এবং কাম-কর্ম্ম-মোহ প্রভৃতি মৃত্যু-পাশের অতীত। ইনি অভয়, এবং অবিদ্যা ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি নিয়ত ইহাঁর ভাবনায় রত এবং যিনি ইহাঁকে সর্ব্বদা সর্ব্বাতীতরূপে ধ্যান করেন, তিনিও ভয়শূন্য হইয়া যান।

রাজন্! জীবের জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা অবলম্বন করিয়া সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের

স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। আপনি এই ব্রহ্ম-বিদ্যা হৃদয়ে ধারণা করুন্”।

আমরা এই আখ্যায়িকার শেষ তিন দিবসের কথোপকথন হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, সেগুলিকে সংক্ষেপে একত্র গ্রথিত করিলে দেখা যায় যে—

১। আত্ম-জ্ঞান এবং আত্ম-শক্তি দ্বারাই, অন্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান-লাভ এবং দেহেন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

২। আত্ম-জ্যোতির প্রকাশেই, বাহ্য ও আন্তর সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়।

৩। এই আত্ম-জ্যোতিঃ, দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র।

৪। এই আত্ম-জ্যোতিঃ, অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিজ্ঞান-গুলি আত্মার জ্ঞেয়।

৫। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে, এবং দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ কালে,—এই আত্ম-জ্যোতির স্বতন্ত্রতার কোন হানি হয় না।

৬। এই আত্ম জ্যোতিঃ সর্ব্বাতীত, কিন্তু সকল ক্রিয়া ও জ্ঞানের মূলে অবস্থিত।

৭। সুষুপ্তি-অবস্থাকে, আত্মার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়াবস্থাতেই, স্বতন্ত্র আত্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত থাকে।

৮। ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান জন্মিলে, সর্ব্বাত্ম-ভাব উপস্থিত হয়। অবিদ্যাই, বিবিধ পদার্থকে ব্রহ্ম হইতে

অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে,—পদার্থান্তররূপে—প্রতীত করায়। এই অবিদ্যার ধ্বংসে, বিদ্যার উদয় হইলেই, পদার্থান্তরের পার্থক্য-বোধ চলিয়া যায়।

৯। ব্রহ্ম-পদার্থে কোনই ভেদ নাই; তিনি সর্ব্বদা একরূপ। উপাধির-ভেদেই তাঁহাতে ভেদ কল্পিত হয়। উপাধি-গুলি দ্বারা তাঁহার প্রকৃত-স্বরূপ কতকাংশে ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে বুঝিলে, ভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত হয়।

১০। যিনি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মের স্বরূপাভিজ্ঞ, যাঁহার ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যাইতেছে, তিনি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে কোন পদার্থান্তরের কামনা করেন না; সুতরাং তদুদ্দেশে কর্ম্মও করেন না; তাঁহার সকল কর্ম্ম ব্রহ্মার্থই সম্পাদিত হয়।

১১। পদার্থান্তরের কামনা-দ্বারা, তাহাই লব্ধ হয়। ঈদৃশ কাম্য-কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মলাভ ঘটে না। বৈরাগ্য, ধ্যান, সর্ব্বভূতে দয়া, উপাসনাদি নিত্য-কর্ম্ম, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হইলে, উহারা জ্ঞানোৎপত্তির সহায় হয়। সুতরাং, নিত্য-কর্ম্ম-সম্পাদন কর্ত্তব্য।

১২। এইরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটিলে, কর্ম্মাদি জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়। তখন অদ্বৈত-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং তখন কর্ম্মাদি কিছুই থাকে না। তখন মুক্তিলাভ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

(সপ্তান্ন-বিদ্যা।) *

সংসারী মনুষ্য, অবিদ্যার প্রভাবে সর্ব্বদাই বিষয়-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অবিদ্যার লক্ষণই এইরূপ যে উহা মনুষ্যের মনকে বহির্মুখী করিয়া দেয়। একমাত্র আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজিত। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে, মনুষ্য সেই আত্মাকে দেখিতে পায় না। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয় দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত থাকায়, মানুষ বিষয়াচ্ছন্ন হয় এবং তাহাতেই মত্ত হইয়া পড়ে। তাহার চিত্তের প্রবৃত্তি

---

* সপ্তান্ন=সাত প্রকার অন্ন। ভোজ্য-দ্রব্য, জল, হুত, প্রহুত, মন, বাক্য, প্রাণ, এই সপ্ত অন্ন।

যদিও 'সপ্তান্ন-বিদ্যা' আখ্যায়িকার অন্তর্গত নহে, ইহা উপাসনার অন্তর্গত, তথাপি আমরা এ গ্রন্থে তাহা গ্রহণ করিলাম। কিরূপ সুন্দর-প্রণালীতে শ্রুতি, বিষয়-মদাচ্ছন্ন পুরুষের চিত্তে, ক্রমে ক্রমে বিষয়-দর্শনের স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন করিবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন;—সেই প্রণালীটী দেখাইয়া দিবার জন্যই, আমরা ইহা গ্রহণ করিলাম।

এই বিষয়ের দিকেই তাহাকে আকর্ষণ করে এবং সে বিষয়-প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত হইয়া বিবিধ কর্ম্মে রত হয় এবং সংসারে নিতান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বৈষয়িক বাসনাবদ্ধ হইয়াই জীব সংসারে আইসে এবং যথাকালে এই বাসনা অভিব্যক্ত হইতে থাকে। তখন মনুষ্য সাংসারিক কর্ম্মের সহচরী-রূপে ভার্য্যার কামনা করে এবং পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুত্রাদি-লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। তখন ইহকাল এবং পরকাল উভয় লোকে সুখের উদ্দেশে ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জনে রত হয়। প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান না জানায়, স্বর্গ ও দেব-লোক প্রাপ্তির আশা করিয়া, বিত্তাদি দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে এবং ঐ সকল কর্ম্মেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত এবং কর্ম্ম,—এই গুলিই জীবের কামনার বিষয় হইয়া পড়ে। প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলে, কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-স্বরূপ-নিরপেক্ষ বোধ থাকে না—ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে কোন দ্রব্যেরই অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে না। কেননা, তখন প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্মের শক্তি, মহিমা, ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞানাদির পরিচায়ক-রূপে ব্রহ্ম-জ্ঞানীর নিকটে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্ব-বস্তুতে কেবল-মাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ-দর্শন হইতে থাকে। সুতরাং পদার্থের স্বাতন্ত্র্য-বোধ না থাকায়, সেরূপ ব্যক্তি কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইতে পারেন না এবং সেই-রূপ দ্রব্য-প্রাপ্তির কামনা না থাকায়, তাঁহার তদুদ্দেশে কোন কর্ম্ম করিবারও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বিষয়াচ্ছন্ন

জীবের সেরূপ জ্ঞান জন্মে না ; তাদৃশ ব্যক্তি, প্রাগুক্ত প্রকারে বহির্মুখ হইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিচ্ছিন্ন বিষয়-সমুদ্রে মগ্ন থাকে। অতএব, এইরূপ বিষয়-মদমত্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞান দিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে ঐরূপ স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদির অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের পরিবর্ত্তে, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে ; অসম্পূর্ণ বিষয়ের পরিবর্ত্তে, তাহাকে সম্পূর্ণতা-লাভের জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে এই সম্পূর্ণতা-লাভ সম্ভব ? কি উপায়ে এই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে ?

জীব, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার-বর্গের ভর্ত্তৃ-স্থানীয় প্রভু, এবং এই জীব, সংসার-দশায়, পরিবার-পরিবৃত্ত হইয়া বিত্তাদি অর্জ্জন করতঃ সংসারে বাস করে এবং ইহ-লোকে মান-কীর্ত্তি প্রভৃতি লাভার্থ নানাবিধ কর্ম্মে নিয়ত রত থাকে। কেহ কেহ বা পর-কালে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির উদ্দেশেও, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী পুরুষ তাদৃশ-ভাবে তাদৃশ-যজ্ঞাদিতে রত না হইয়া, ভাবনাত্মক যজ্ঞে নিরত হইবেন ; তবেই তাঁহার সম্পূর্ণতা-লাভ হইতে পারিবে। কিরূপে সাংসারিক দ্রব্যময়-যজ্ঞের স্থলে, ব্রহ্ম-ভাবনাত্মক-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। মনুষ্যের অন্তঃকরণই, সকল প্রবৃত্তি ও কামনার আধার। মনুষ্য-সমাজে জায়া-পুত্রাদি যেমন ভর্ত্তার অধীন, ভর্ত্তার নিয়োগের বশীভূত হইয়া তাহারা যেমন স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ; তেমনই

মনুষ্যের অপর ইন্দ্রিয়-বর্গ, এই অন্তঃকরণেরই অনুগত হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অতএব, অন্তঃকরণ বা মনই ভর্ত্তা। ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থীর মন বা অন্তঃকরণই ভর্ত্তৃ-স্থানীয়; মনই, ইন্দ্রিয়-রাজ্যের প্রভু;—মনই, চক্ষুরাদি পরিবার-বর্গের প্রভু *। বাক্যকে মনের পত্নী বলা যাইতে পারে। কেননা, মনই কর্ণ-রূপ দ্বার-যোগে বাক্য (শব্দ) গ্রহণ করিয়া থাকে; বাক্য মনের নিতান্ত অনুগত। অতএব বাক্যই মনের জায়া। প্রাণকে, মনের পুত্র-স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংসারে পতি-পত্নীর সংসর্গেই পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে; এস্থলেও, মন ও বাক্যের সংসর্গ নিবন্ধনই প্রাণের উৎপত্তি হয়। স্থতরাং প্রাণই, মন ও বাক্যের পুত্র। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভেদে সম্পত্তি দুই প্রকার। সংসারী জীব, ইহলোকে যশ-মানাদির জন্য চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া যে গবাদি ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করে, তাহাই ইহলৌকিক বিত্ত। আর আচার্য্যের নিকট ও গ্রন্থাদি হইতে স্বর্গ ও দেব-লোকাদির কথা কর্ণ-দ্বারা শুনিয়া, পর-কালের মঙ্গলার্থ বিত্তাদি দ্বারা যে যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাই পারলৌকিক বা দৈব-বিত্ত। ভাবনাত্মক-যজ্ঞকারীর পক্ষে, তাঁহার চক্ষুকেই ইহলৌকিক বিত্ত বলা যায়; কেননা তিনি

* "তবেই, মনকে এই ভাবনাত্মক-যজ্ঞের যজমান রূপে কল্পিত করা হইল"।—আনন্দগিরি।

চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া থাকেন। এবং আচার্য্য-প্রমুখাৎ ও উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে পরকালে ব্রহ্ম-লোক-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া, তিনি তদর্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বলিয়া, তাঁহার শ্রবণ বা কর্ণেন্দ্রিয়কেই দৈব-বিত্ত বলা যায়। শরীরের দ্বারাই কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া; শরীরকেই তাদৃশ সাধকের কর্ম্ম-স্থানীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই-রূপে, মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীর এবং চক্ষুঃ-শ্রোত্র *—এই পঞ্চ—পদার্থ দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী ব্যক্তি ব্রহ্ম-দর্শনাত্মক বা ভাবনাত্মক-যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। সাংসারিক গৃহী যেমন জায়া-পুত্রাদি পরিবৃত হইয়া সংসারে সম্পত্তির অর্জ্জন করে এবং তদ্দ্বারা ইহলৌকিক মঙ্গলার্থ কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে;—ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী সাধক তৎপরিবর্ত্তে বাক্য ও প্রাণের যাবতীয় চেষ্টা এবং চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া দ্বারা নিয়ত ব্রহ্ম-দর্শন করিতে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহলোকে এই সকল ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যস্ত হইলে, পরলো-কেও তুচ্ছ এবং নশ্বর স্বর্গ প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিবে।

যাহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহারাই দেবাদির উপাসনা করে। দেবতা প্রভৃতি সকলেই স্বতন্ত্র পদার্থ

* চক্ষুঃ ও শ্রোত্র উভয়ই বিত্ত-স্থানীয় বলিয়া, একটী পদার্থ-রূপে গণ্য করা হইয়াছে।

এরূপ জ্ঞান আছে বলিয়াই ত—ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেবতাদিগের অস্তিত্ব আছে মনে করে বলিয়াই ত—উহারা ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া, দেবতোপাসনায় রত হয় *। সর্ব্বাত্ম-বোধ জন্মিলে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন পদার্থেরই ত আর স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; সুতরাং তখন দেবতাদির উপাসনা আর কেমন করিয়া হইবে? তখন সর্ব্বত্র এক আত্মারই উপাসনা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাই হয়। অজ্ঞানীরাই স্বর্গাদি-কামনায় দেবতাদির উপাসনার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনশীল, তাঁহারা কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কামনায়, ব্রহ্মেরই উপাসনার্থ ব্রহ্মার্থ কর্ম্মেই নিযুক্ত হন; কেননা তাঁহাদিগের ত তখন স্বর্গাদি পদার্থের স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। জগৎ ও জগতের পদার্থ-গুলিকে অজ্ঞানীরা এক ভাবে দেখেন। এবং জ্ঞানীরা আর এক ভাবে দেখেন। জ্ঞানীর চক্ষে কোন পদার্থেরই স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে না। জ্ঞানীর চক্ষে পারলৌকিক কোন পদার্থেরও স্বাতন্ত্র্য-বোধ না থাকায়, তাঁহারা স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে দেবতার উপাসনা করেন না; তাঁহারা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের স্থলে ভাবনাত্মক-যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

* বৃহদারণ্যকের অন্যস্থলেও একথা বলা হইয়াছে,—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেব স দেবানাম্"।

প্রজাপতি সৃষ্ট-সংসার রক্ষার্থ সপ্ত প্রকার অন্ন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে এক-প্রকার অন্ন সর্ব্ব-প্রাণি-সাধারণ;—সকল প্রাণীই এই অন্ন ভক্ষণ করিয়া নিজ নিজ শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই অন্ন সকলেরই শরীর ধারণ ও শরীর স্থিতির হেতুভূত। এই অন্ন সকল-প্রাণি-সাধারণ, সর্ব্বভূতের শরীর-রক্ষার হেতু। যে ব্যক্তি, অন্যকে না দিয়া, কেবলমাত্র আত্ম-সুখার্থ এই অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি নরাধম। প্রজাপতি, 'হুত' ও 'প্রহুত' নামে অন্য দুই প্রকার অন্ন, দেবতাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হোমাদি করণই "হুত" এবং অবশিষ্টাংশ সকল-ভূতকে 'বলি-রূপে' বিভাগ করিয়া দেওয়াই "প্রহুত"। নিষ্কাম-ভাবে এই দেব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; ইহলোক বা স্বর্গাদি-লোকের সুখাদি কামনায় করিবে না *। প্রজাপতি আর এক প্রকার

* ইহলোক-সর্ব্বস্ব, আত্ম-সুখ-পরায়ণ ব্যক্তিরা, পর-লোকাদি অন্য কোন যে পদার্থ আছে, তাহা আদৌ জানে না। তাহারা মনে করে, ইহলোকই সব। তাহারা ভাবে, ইহলোকের সকল পদার্থই তাহাদেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। ঈদৃশ লোককে, বিষয়-ভোগের মধ্য-দিয়াই পর-লোকাদির তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য, দেবতোদ্দেশে স্বর্গার্থ যজ্ঞাদি সকাম-কর্ম্মের বিধান। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যই সকল পদার্থ বর্ত্তমান এরূপ ধারণা যাহাদের, তাহাদিগকে যদি বলা যায় যে "ইহলোক ছাড়াও স্বর্গ বলিয়া অন্য একটা লোক আছে, যেখানে ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট ও নানা-শক্তিশালী দেবতারা, তোমার মৃত্যুর

অন্ন কেবল মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। জলই * এই চতুর্থ প্রকারের অন্ন। প্রাণী জন্ম-গ্রহণ করিবা-মাত্র এই অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম সকল পদার্থই এই জলেই প্রতিষ্ঠিত। †

পরে, তোমারই বিশেষ-প্রকার সুখ বিধান করিবেন; অতএব তাঁহাদের জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর;—ইহা তোমারই মঙ্গলের জন্য"।—এই প্রকারের উপদেশের দ্বারা, ধীরে ধীরে সেই ইহলোক-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির চিত্ত, ক্রমে পরলোকের কথা ও ঈশ্বরের কথায় আস্থা স্থাপন করে। পরে ক্রমে, তাহাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। তখন দেবতার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মের কথা এবং স্বর্গ-সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের কথা ক্রমে বলিলে, তবে সে তাহাতে অনুরক্ত হইতে পারে। নতুবা, ওরূপ লোককে অকস্মাৎ বিষয়-বৈরাগ্যের কথা ও আত্ম-সুখোৎসর্গের কথা বলিলে কিছুই ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রুতিতে, এই প্রকার ইহলোক-পরায়ণ বিষয়াচ্ছন্নের চিত্তে ধীরে ও ক্রমে ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই, প্রথমে সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাণ্ডের ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা উত্তম সাধক, যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী;—তাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিবেন।

* মূলে আছে 'পয়' শব্দ; তাহার অর্থ দুগ্ধও হয়। প্রাণী জন্মিয়াই স্তন্য-দুগ্ধপান করিয়া থাকে।

† "সকল পদার্থই জলে প্রতিষ্ঠিত"—এ কথার একটা গূঢ়ার্থ আছে। ইহা শ্রুতিতে "পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা" নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থীর পক্ষে, যেমন সকল পদার্থেই এবং সকল কর্ম্মেই ব্রহ্ম-দর্শনের উপদেশ আছে; তদ্রূপ এই যে সূর্য্য-রশ্মি-যোগে বাষ্প উঠিয়া, মেঘ হইয়া, বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে

প্রজাপতি লোক-রক্ষার্থ এই চতুর্ব্বিধ অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণ বিষয়াচ্ছন্ন জীব, এই চারি-প্রকার অন্নকে সাধারণ-ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সকল পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শনার্থী তাঁহারা এই চতুর্ব্বিধ অন্নকে অন্য ভাবে গ্রহণ করিবেন। কি ভাবে গ্রহণ করিলে, চতুর্ব্বিধ অন্নে ব্রহ্ম-দর্শন করিতে হয়, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; এখন শ্রুতি-কথিত অবশিষ্ট তিন প্রকার অন্নের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রজাপতি, জীবের প্রয়োজনের জন্য আরও তিন প্রকার অন্ন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন, বাক্য এবং প্রাণই সেই ত্রিবিধ অন্ন। বাহ্য বস্তু সমূহ ইন্দ্রিয়-বর্গের উপরে ক্রিয়া করিতে থাকিলে, যদি মন সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয়—মিলিত না হয়—তাহা হইলে সেই বস্তু-গুলিকে আমরা জানিতে পারি না। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অন্তঃকরণ বা মনের অস্তিত্ব আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। মনঃ-সংযোগ না করিলে, দর্শন-

---

পতিত হয় এবং এই রস-দ্বারা উদ্ভিজ্জ-জগৎ বাঁচিয়া থাকে; আবার তদ্দ্বারা প্রাণীর দেহাদি রক্ষা হয়,—এ সকলের মধ্যেও ব্রহ্মেরই জগচ্চক্র-নির্ব্বাহন-সামর্থ্যের বোধ, ব্রহ্ম-দর্শনার্থীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে। আরও একটী গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। সাধারণ লোকে যাহাকে উদ্ভিদ্, বৃষ্টি, মেঘ প্রভৃতিরূপেই দেখে; তত্ত্ব-দর্শী তাহাতে জগচ্চক্র-নির্ব্বাহক ক্রিয়া দেখিতে পান। তদপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শীরা, ইহাতে জীবের পরলোকে গতি এবং পরলোক হইতে পুনরায় বৃষ্ট্যাদিযোগে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাবর্ত্তন ও দেহগ্রহণ, এ তত্ত্বও বুঝিতে পারেন। কিন্তু এতত্ত্ব "পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার" অন্তর্গত। আমরা নানা কারণে এ গ্রন্থে উহা পরিত্যাগ করিয়াছি।

শ্রবণাদির জ্ঞান লাভ হয় না বলিয়াই লোকে মনের দ্বারাই শ্রবণ করে, মনের দ্বারাই দর্শন করে; ইত্যাদি বলিয়া থাকে। চক্ষুর অগোচরে পৃষ্ঠ-দেশে কেহ স্পর্শ করিলে, ত্বগিন্দ্রিয়-যোগে আমাদের স্পর্শ-বোধ হয়; কিন্তু সেই স্পর্শ হস্ত দ্বারা করিল বা জানু-দ্বারা করিল এই যে পার্থক্য-বোধ, ইহা ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে;—তাহা কেবল অন্তঃকরণ দ্বারাই জানিতে পারা যায়। পার্থক্য-বোধের কারণ-স্বরূপ অন্তঃকরণ না থাকিলে, কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতে পারিত না। ইহাও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অন্তঃকরণের অস্তিত্বের প্রমাণ। কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, স্মৃতি প্রভৃতি এই অন্তঃকরণেরই রূপ,—অন্তঃকরণই। যে কোন শব্দ—তাহা প্রাণীর কণ্ঠোচ্চারিতই হউক বা বাদ্যযন্ত্র অথবা মেঘ প্রভৃতি প্রসূতই হউক,—উহা বাক্যমাত্র। ধ্বনিই, বাক্যের স্বরূপ। প্রকাশ করা বাক্যের ধর্ম্ম; অভিধেয় বস্তুর প্রকাশ করাই বাক্যের লক্ষণ; সুতরাং বাক্য,—প্রকাশক। সর্ব্ব-দেহে যাহা সর্ব্ব-বিধ চেষ্টার হেতু-স্বরূপ তাহাই প্রাণ-শক্তি। দেহান্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার মূলই এই প্রাণ। অতএব দেখা যাইতেছে, আত্মা যেন এই মনোময়, প্রাণময় এবং বাঙ্ময়। এগুলি আত্মার উপাধিমাত্র। এই সকল উপাধি-সংসর্গে আত্মাকে মনোময়, প্রাণময় এবং বাঙ্ময় বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত-পক্ষে, আত্মা এ সকলের অতীত।

তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা এই বাক্য, মন ও প্রাণকে জগদ্ব্যাপক বলিয়া বুঝিতে পারেন। একই মহাশক্তি,—আধিদৈবিক,

আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে *। এই মন, প্রাণ ও বাক্য,—সেই মহা-শক্তির আধ্যাত্মিক রূপ। সুতরাং, পরমার্থদর্শী জানেন যে, তাঁহার মন, প্রাণ, বাক্য-ছাড়া, এ বিশ্বে আর কোন পদার্থই নাই। প্রত্যেক স্থূল পদার্থই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক †। আত্ম-নিরপেক্ষ শক্তি কোথাও নাই।—আমরা আধার ব্যতীত কেবল শক্তির কল্পনা করিতে পারি না; শক্তি আধার ব্যতীত ক্রিয়া করিতে পারে না। এই আধারকে 'কার্য্যাত্মক' অংশ এবং শক্তিকে 'করণাত্মক' অংশ বলা যায় ‡। অমূর্ত্ত, সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে,—সকল পদার্থই মূর্ত্ত, স্থূল অবস্থায় আইসে। অমূর্ত্তাবস্থায় যাহা সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত; তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া, শক্ত্যাত্মক ও জড়াত্মক উভয়-রূপেই মূর্ত্তাবস্থায় পরিদৃশ্যমান হয়। ঘনীভূত হইতে হইলেই, শক্তি ও শক্তির আধার উভয়ই এক সঙ্গে ঘনীভূত হয় §। এই ঘনীভবনের নিয়ম এই—যাহা আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থায় কেবল শক্তি-

---

* (শ্বেতকেতুর উপাখ্যান)।

† কার্য্যাত্মক অংশ—Matter,

‡ করণাত্মক-অংশ Force বা Motion .

§ Concrete *motion* arises by the integration of diffi used motion and concrete *matter* arises by the aggregation of diffused matter,"—*Herbert Spencer*,

রূপে অবস্থিত;—সেই শক্তি ঘনীভূত হইবার সময়ে যতই তেজের আকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ততই শক্তির ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার বা জড়াত্মক অংশও ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলীয়-ভাব, পরে পার্থিব কঠিন-ভাবে দেখা দেয়।* সুতরাং তেজঃ, জল এবং পৃথিবী—এই ত্রিবিধ অবস্থাই শক্তির দৃশ্য বা মূর্ত্তরূপ, এবং আকাশ ও বায়ু—শক্তির অদৃশ্য বা অমূর্ত্ত-রূপ। সুতরাং দৃশ্য, মূর্ত্ত পদার্থ-মাত্রই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। অদৃশ্য, অমূর্ত্ত-রূপেই শক্তি কেবল করণাত্মক। আবার প্রাণী-দেহেও, করণাত্মক অংশ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে এবং কার্য্যাত্মক অংশ, দেহাবয়বরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আধিদৈবিক সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির যাহা করণাত্মক অংশ, তাহাই প্রাণী-দেহেও ইন্দ্রিয়াদি করণাত্মক অংশ। সুতরাং, বাক্য মন, এবং প্রাণ—ইহারা আধিদৈবিক শক্তিরই পরিণতি। আরও একটী কথা আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাহাকে 'কার্য্যাত্মক' অংশ বলা যাইতেছে, উহাও সেই শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। জড়ের অস্তিত্ব-বোধ আমাদের কিরূপে হয়? উঃ, আমাদের নিকট বাধাত্মক শক্তিরূপেই [illegible]। [illegible] এক বিশ্ব-ব্যাপ্ত অনন্ত-শক্তিই আধ্যাত্মিক বাক্, মন ও প্রাণ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবে ব্রহ্ম-দর্শী

* এই জন্যই, প্রাণ ও অন্ন উভয়কেই দেবতা বলিয়া, আবার শ্রুতি এক প্রাণকেই দেবতা বলিয়াছেন।

সাধক জগৎকে দেখিবেন। এইভাবে জগৎকে গ্রহণ করিলেই সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন সিদ্ধ হয়।

পৃথিবী, বাক্যের শরীর বা আধার; পার্থিবাগ্নি ইহার আধেয় বা করণ। অর্থাৎ বাক্য,—অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই দুইভাবে অবস্থিত আছে; পৃথিবী এই উভয় অবস্থারই আধার। এইরূপ, দ্যুলোক,—প্রজাপতির অন্নভূত এই মনের শরীর বা আধার; দ্যুলোকস্থ সূর্য্য-জ্যোতিঃ ইহার আধেয় বা করণ। অর্থাৎ মন,—অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই দুইভাবে অবস্থিত আছে; এই উভয় অবস্থারই আধার দ্যুলোক। বাহিরে এই অগ্নি ও আদিত্য এবং ভিতরে এই বাক্য ও মন, ইহারাই মাতা এবং পিতা। এই পিতা-মাতার পরস্পর সংসর্গে বাহিরে স্পন্দনাত্মক বায়ু এবং ভিতরে স্পন্দনাত্মক প্রাণের উদ্ভব হয় *। বাহিরে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই উভয়ের অন্তরালে অগ্নি ও আদিত্য ক্রিয়া করে। দেহের ভিতরে মন ও বাক্য সমুদয়-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। জল,—এই প্রাণের শরীর বা আধার; চন্দ্র-জ্যোতিঃ ইহার আধেয় বা করণ। অর্থাৎ প্রজাপতির অন্নভূত এই

* বৃহদারণ্যকের অন্যত্র (৫।৬-৯),—প্রাণকে পিতা, বাক্যকে মাতা এবং মনকে পুত্র বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মনের সংকল্প-দ্বারাই, আলোচিত-বিষয়ে বাক্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ-শক্তিই,—বাক্যাদির প্রবর্ত্তনের হেতু।—অন্যত্র বলা হইয়াছে, প্রজাপতি সংকল্প ও বাক্য (শব্দ) দ্বারা সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। বায়ু=Motion.

প্রাণ,—অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই দুইভাবে অবস্থিত আছে। জল-ধাতু এই উভয় অবস্থারই আধার।

আধিদৈবিক ভাবেই হউক বা আধ্যাত্মিক ভাবেই হউক, কার্য্য করিতে হইলেই, শক্তির জড়ীয় আধার আবশ্যক। যে শক্তি সূর্য্য-চন্দ্রাদির জ্যোতিরূপে ক্রিয়া করিতেছে, যে শক্তি বাক্য-মন-প্রাণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তি-রূপে ক্রিয়া করিতেছে,—পৃথিবী, অপ্ এবং দ্যৌঃ সেই শক্তির অধিষ্ঠান বা আধার। পৃথিবী, জল, দ্যৌঃ,—এগুলির দ্বারা জড়ীয় আধার ও প্রাণী-দেহই বুঝাইতেছে। সুতরাং শ্রুতি মতে একই শক্তি—অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মদর্শী সাধক, আপনার মন, প্রাণ, বাক্য প্রভৃতিকে এই ভাবে দর্শন করিতে অভ্যাস করিলে, এগুলিতে আর পরিচ্ছিন্ন ভাবে মত্ত হইতে পারিবেন না। তখন সর্ব্বত্রেই অপরি-চ্ছিন্ন ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে। জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি এই ভাবেই সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন করেন। অজ্ঞানী, বিষয়াচ্ছন্ন জীবেরাই বিষয়-গুলিকে পরিচ্ছিন্ন-ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ-রূপে দর্শন করিয়া, সেই সেই বিষয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পরিচ্ছিন্ন-ভাবে বিষয়-দর্শন হইলেই, তদ্দ্বারা শোক-দুঃখাদি উপ-স্থিত হয়। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে, অপরিচ্ছিন্ন-ভাবে বিষয়-দর্শন করেন, তাঁহাদের তাহাতে আত্মাভিমান অর্পিত হইতে পারে না *। সুতরাং শোক-দুঃখাদিও উৎপন্ন হইতে পারে না।

* বৃহদারণ্যকের উপাসনা-প্রকরণে যে 'দেবাসুর-সংগ্রামের' বিবরণ আছে, তাহাতেও এই তত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এই স্থলেই সেই

ব্রহ্ম-দর্শনার্থী গৃহস্থ, এইরূপে চক্ষুঃ ও শ্রোত্র-রূপ সম্পত্তি দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশে, ভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদন করি-

---

বিবরণের তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। শাস্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি আধিদৈবিক শক্তিরই বিকাশ—প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি। ইহাই ইন্দ্রিয়াদি-বৃত্তির দেব-ভাব। আর আমরা বিষয়-ব্যবহার কালে ইন্দ্রিয়-গুলিকে যে পরিচ্ছিন্ন ভাবে দর্শন করি ও তাহাতে অভিমান, শোক-দুঃখাদির আরোপ করি এবং উহাদিগকে আত্ম-সুখার্থ নিয়োজিত করি;—ইহাই ইন্দ্রিয়গণের আসুর-ভাব। সাধকের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে ইন্দ্রিয়-গুলিকে আধিদৈবিক-শক্তির বিকাশরূপে—প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তি-রূপে সর্ব্বদা ভাবনা করা। ইহাই দেবতার জয় এবং অসুরের পরাজয়। শ্রুতির এই স্থলেই, অন্ন ও পানকে—এই প্রাণ-শক্তির, আশ্রয় ও পুষ্টির-হেতু একথাও বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ-শক্তির বিশেষ কোন ক্রিয়া করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে উহার আধারও ঘনীভূত হইতে থাকে। ঐ আধার ঘনীভূত হইয়া যেমন দেহ ও দেহাবয়ব গঠিত হইতে থাকে, প্রাণ-শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। কথাটা এই যে, প্রাণ-শক্তি তেজঃ ও আলোকের আকারে বিকীর্ণ হইয়া যেমন সূর্য্য-চন্দ্রাদির বাহ্য জড়াংশ গড়িয়া তুলিয়া, তদাশ্রয়ে তাপাদি বিকীরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে; তদ্রূপ সেই প্রাণ-শক্তিই উহার জড়ীয়-আধারকে দেহ ও দেহাবয়বরূপে গড়িয়া তুলিয়া, তদাশ্রয়ে থাকিয়া, চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-শক্তির আকারে ক্রিয়া করিতেছে। আমরা যে অন্ন-পানাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারাই দেহ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই জন্য শ্রুতির নানা স্থানে, অন্ন ও জলকে প্রাণ-শক্তির 'শরীর'-রূপে কথিত হইয়াছে;

বেন। কর্ণ দ্বারা গুরুর মুখে উপদেশ শুনিয়া, চক্ষুরাদি দ্বারা যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পদার্থকে ব্রহ্ম-শক্তির বিকাশ-রূপে দর্শন করিতে শিখিবেন। ইহাই পরমার্থ-দর্শীর ভাবনাত্মক যজ্ঞ।

প্রজাপতি, প্রাণীর প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ বাক্য, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিলে, উহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা আপন আপন ব্যাপার হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিল। চক্ষুঃ, বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গ—শ্রবণ, দর্শন, কথনাদি নিজের নিজের ক্রিয়া সাধন করিবার জন্য অশ্রান্তভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুকাল পরেই ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কেবল মুখ্য প্রাণ-শক্তি অক্লান্ত-ভাবে আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্রিয়-বর্গ সকলেই

কোন স্থলে প্রাণকে 'অন্ন-বন্ধন' বলা হইয়াছে। কোথাও বা প্রাণ শক্তি অন্ন দ্বারা পুষ্ট' একথাও বলা হইয়াছে। আবার কোন স্থলে, জলকে প্রাণের বস্ত্র বা 'আচ্ছাদক' বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এ সকলেরই তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্র প্রাণ শক্তির [illegible] হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার প্রাণ-বায়ুই কণ্ঠাদি-স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বর্ণ বা স্বর রূপে ব্যক্ত হয়, সুতরাং প্রাণই সামাদিগান ও বাক্যের (নাম) মূল। আবার এই বাক্য, অন্নে (দেহে) প্রতিষ্ঠিত। অতএব রূপাত্মক ও নামাত্মক জগতের মূল,—এই প্রাণ-শক্তি;—একথাও এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

'প্রাণ-ব্রত' ধারণ করিল। বিষয়-প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের স্বভাব ; চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব রূপাদি বিষয়-গুলির প্রকাশ করে এবং ইহারা আবার স্ব স্ব বিষয়ে ক্রিয়াশীল হইয়াই বিষয়-প্রকাশ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বর্গের এই বিশেষ বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া-শীলতা, প্রাণ-শক্তি হইতেই লব্ধ। কেননা, প্রাণ-শক্তিই সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়ার মূল ও আধার। ইন্দ্রিয়-বর্গ যে স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, উহা প্রাণ-শক্তিরই প্রভাবে। অতএব, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ প্রাণ-শক্তি-দ্বারাই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া, বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব বিষয়-প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়-বর্গের স্বীয় রূপ এবং ইহারা যে বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্ত হয়— সেই প্রবৃত্তি-শীলতা, প্রাণেরই রূপ। এই-জন্য, ইন্দ্রিয়-গুলি সকলই প্রাণাত্মক ; লোকে ইন্দ্রিয়-গুলিকে 'প্রাণ' নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। প্রাণ-শক্তি না থাকিলে শরীর শুষ্ক হইয়া যাইত ; কেননা রস-রুধিরাদির পরিচালনাদি দ্বারা প্রাণই দেহের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপে যে সকল সাধক অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয়-বর্গকে প্রাণাত্মক বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হয়।

এইরূপ, প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকলও স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল এবং আলোক-দান, জ্বলনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া নিয়তরূপে করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ইহারা অবশেষে বুঝিতে পারিল 'যে,

ইহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া-গুলি প্রাণ-শক্তি হইতেই প্রাপ্ত। প্রাণ-শক্তি অক্লান্ত-ভাবে ক্রিয়া করে বলিয়াই, সূর্য্য-চন্দ্রাদি দেবতা-বর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।

আধ্যাত্মিক বাগাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে শান্ত হইয়া এই প্রাণ-শক্তিতেই লীন হইয়া যায়। আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদিও অস্তমিত হইয়া বায়ুতেই (প্রাণ-শক্তিতেই) লীন হয় *। অতএব, সূর্য্য-চন্দ্রাদি দেবতা ও বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়,—প্রাণ-শক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, আবার উহারা প্রাণ-শক্তিতেই অস্তগমন করে বা বিলীন হইয়া যায়। ইহাই 'প্রাণ-ব্রত' নামে অভিহিত। পুরুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়; আবার জাগরণকালে উহারা প্রাণ হইতেই বৃত্তি লাভ করে। সূর্য্য-চন্দ্রাদি দেবতাও এইরূপ বায়ুতেই অস্তগমন করে, আবার বায়ু হইতেই স্ব স্ব ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। প্রাণ ও বায়ু উভয়ই স্পন্দনাত্মক। সূর্য্য-চন্দ্রাদির স্ব স্ব ব্যাপার-গুলিও স্পন্দনাত্মক, ক্রিয়াত্মক; ইন্দ্রিয়-গুলিও স্পন্দনাত্মক। অতএব সেই সাধারণ স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিই,—উহাদের মূল স্থান। অতএব, এক প্রাণ-শক্তিই স্পন্দনের তারতম্যানু-সারে—অবস্থার ভেদ-বশতঃ—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক

* 'সংবর্গ-বিদ্যা দ্রষ্টব্য। বায়ু=Motion.

পদার্থাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যাবতীয় পদার্থই যথাকালে স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে উপরত হয়, কিন্তু প্রাণ-শক্তির কদাপি বিরতি নাই।

অতএব চন্দ্র-সূর্য্যাদির তাপ ও আলোক-বিকীরণাদি ক্রিয়া এবং চক্ষুঃ-কর্ণাদির রূপ-দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি,—সকলই সেই প্রাণ-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি। মৃদাত্মক ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা মৃত্তিকাই; তদ্রূপ সূর্য্য-চন্দ্রাদি এবং বাক্যাদি সকলই, প্রাণ-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে। উহারা প্রাণ-শক্তিই। এই অবিনাশিনী প্রাণ-শক্তিই ইহাদের সকলের ক্রিয়ার মূল। এই প্রাণ-শক্তির দ্বারাই আবার নাম-রূপ অভিব্যক্ত হয়। নাম-রূপই,—প্রাণ-শক্তির বাহ্য-আশ্রয় বা শরীর। প্রাণ-শক্তির যেমন নানা-প্রকারে ক্রিয়া-বিকাশ হইতে থাকে, উহার আশ্রয় জড়াংশও * সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ নাম ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। কাহাকেও ছাড়িয়া, কাহারই অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং প্রাণ-শক্তিই নানা-প্রকারে ক্রিয়া-বিকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, নাম-রূপকেও নানা-প্রকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। পদার্থ-মাত্রই আমাদের নিকটে কোন না কোন নামে পরিচিত এবং শুক্ল-কৃষ্ণাদি রূপ বা আকৃতি-গঠনাদি দ্বারাও উহারা পরিচিত। এই নাম-রূপ যেমন প্রাণ-ক্রিয়ার আশ্রয়, তদ্রূপ প্রাণের ক্রিয়াও এই নাম-রূপের আশ্রয়। নাম

---

* জড়াংশ—*i, e*, **Matter,**

ত শব্দমাত্র। আমাদের বাগিন্দ্রিয় আছে বলিয়া আমরা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি এবং শ্রোত্র দ্বারা সেই শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকি। আবার, রূপ বা আকৃতি আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। অতএব, নাম ও রূপ,—আমাদের বাক্, শ্রোত্র ও চক্ষুঃ এই তিন ইন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে *। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থূলাশ্রয়ে (জড়াশ্রয়ে) থাকিয়া যেমন প্রাণ-শক্তি সর্ব্বত্র নানা-প্রকারে ক্রিয়া-বিকাশ করিতেছে; তদ্রূপ উহার স্থূলাশ্রয়ও সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। সেই স্থূলাশ্রয়ই,—প্রাণ-শক্তির শরীর এবং ইহাই প্রাণ-শক্তির নাম-রূপাত্মক অংশ। অতএব নাম-রূপ ও ক্রিয়া (শক্তি) ভিন্ন, জগতে আর কিছুই নাই এক প্রাণ-শক্তিই, এই নাম-রূপ ও ক্রিয়াকারে পরিণত। অতএব তত্ত্বদর্শী সাধকের চক্ষে এ বিশ্ব প্রাণ-শক্তিময়। ব্রহ্মেরই স্বরূপাভিব্য-ক্তির উদ্দেশে প্রাণ-শক্তি,—নামরূপ-ক্রিয়ার আকারে পরিণত

* পাশ্চাত্য-দর্শনে, জড়ের অস্তিত্ব প্রধানতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুতরাং 'জড়ও', শক্তিরই রূপান্তরমাত্র শ্রুতি ও শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, জড়-বস্তুমাত্রই, কোন না কোন রূপ ও নাম দ্বারা পরিচিত। এই রূপ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে এবং নাম, শ্রোত্র ও বাক্যেন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয়,—ইহারা শক্তিবিশেষ, সুতরাং 'জড়', শক্তিরই রূপান্তরমাত্র।

হইয়া রহিয়াছে। এই প্রাণ-শক্তি, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে। প্রাণ-শক্তি—ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম-ই।*

সম্পূর্ণ।

* কেননা, প্রাণ-শক্তি—পূর্ণ-ব্রহ্ম-সত্তারই বিশেষ-আকার মাত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন—"যৎস্বরূপ-ব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মত্ব মেব দৃষ্টম্"। ব্রহ্ম-সত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণ-শক্তিকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং প্রাণ শক্তি—ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। "যস্য চ যস্মাদাত্মলাভঃ ভবতি, স তেন অবিভক্তো দৃষ্টঃ; যথা ঘটাদীনাং মৃদা"। প্রাণ-শক্তি যখন ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই 'আত্মলাভ' করিয়াছে, প্রাণ-শক্তি যখন ব্রহ্মাত্মক—তখন এই প্রাণ-শক্তি ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'বিভিন্ন' (স্বতন্ত্র) কোন বস্তু নহে। "যেষু আত্মবন্ত স্তে, ততোঽন্যো বস্তুতো ন সন্তি। যথা মৃদাত্মবন্তো ঘটাদয়ঃ বস্তুতঃ ততোঽন্যোন সন্তি।" (আনন্দগিরি)। পাঠক বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন যে, শঙ্করাচার্য্যের 'অদ্বৈত-বাদ' এই প্রকার। যাহা 'বিশেষ'—তাহা 'সামান্যেরই' অন্তর্ভুক্ত; সামান্যই—প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অনুস্যূত ("সর্ব্ববিশেষাঃ তৎ-সামান্যে কল্পিতাঃ প্রত্যেকং 'তদনুবিদ্ধত্বাৎ' রজ্জুসর্পবৎ"—আ গি০)। সুতরাং সামান্য হইতে 'স্বতন্ত্র' করিয়া লইয়া, বিশেষকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। শঙ্কর এই যুক্তিবলে, বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাত্মক জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। জগৎকে তিনি উড়াইয়া দেন নাই। "কার্য্য-কারণত্বোপপত্তেঃ, সামান্যবিশেষোপপত্তেঃ, আত্মপ্রদানোপপত্তেশ্চ নাম-রূপাদিবিশেষাণাং ব্রহ্মমাত্রতা॥"